পূর্ণ শশী।

মাসিক পত্র।

প্রথম খণ্ড।

" প্রমুদিত-সুজনা সমৃদ্ধ-শস্যা
ভবতু মহী বিজয়ী চ ভূমিপালঃ।
কবিভিরুপহিতা নিজ-প্রবন্ধে
গুণকণিকা হ্যনুগৃহ্যতাং গুণজ্ঞৈঃ ॥"

বিষয়। পৃষ্ঠা।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাতুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট, ৩ নং।

সন ১২৮০ সাল।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অনুষ্ঠান।

পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে তিমিরময়ী যামিনী যেমন পরিষ্কার শুভ্র আকার ধারণ করে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানরূপ প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ে মানবহৃদয় তদনুরূপ নির্ম্মল ও পবিত্র হয়। অধুনা এতদ্দেশে জ্ঞানকরী বিদ্যার আলোচনাকাল পুনরাগত হইয়াছে। এই রাজধানী এবং বিশেষ বিশেষ প্রদেশে বিবিধ সংবাদপত্র ও সাময়িক জ্ঞানরত্ন পত্রের প্রচারদ্বারা নানাবিষয়িণী সাধু বিদ্যার ক্রমশঃ উন্নতি ও অভ্যুদয় হইতেছে। কোনো অভাবের পূরণার্থ নয়, দশজনের আনন্দ ও উপকারের অংশী হইবার নিমিত্ত অদ্য এই হেমন্ত পূর্ণিমায় "পূর্ণশশী" নামে এই অভিনব পত্রিকাখানি আমরা প্রকাশ করিলাম।

পূর্ণশশীর উদ্দেশ্য মহৎ কি সামান্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না, জানিও না; তবে বাসনা এই যে, ইহাতে সাধারণ সাহিত্য, সামাজিক আচার ব্যবহার, পুরাণ ও পৌরাণিক উপাখ্যান, প্রাদেশিক ইতিবৃত্ত, চিত্তরঞ্জন নবন্যাস (Novel), প্রাকৃতিক ও শারীর বিজ্ঞান, এবং বিবিধ রসাশ্রিত কাব্য প্রভৃতি সন্নিবেশিত করিব। যত দূর সাধ্য, সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী ও ব্যবহারোপযোগী

করিবার চেষ্টার ক্রটী হইবে না। অকারণ কাহারও গ্লানি অথবা কাহারও সহিত অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে সাধারণ সাহিত্য-সমাজ পূর্ণশশীর প্রতি স্নেহপূর্ণ অনুরাগ প্রদর্শন করিলে আমরা পূর্ণমনোরথ হইব এবং সাধ্যমত ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নশীল থাকিব।

পূর্ণশশী।

বাসগৃহ।

সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে যবনাধিপত্য বিস্তারের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে এদেশীয়দিগের বাসগৃহ নির্ম্মাণপ্রণালী কি প্রকার ছিল, আয়াস-অনায়াস-প্রাপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিয়া, অথবা সমস্ত বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়া তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভগ্নাবশেষ নিদর্শনেও কোন প্রকার বিশেষ চিহ্ন সুলক্ষিত হয় না। এদেশের বহুপ্রাচীন পরিবার প্রতাপাদিত্যের বংশ এবং বর্দ্ধমানের রাজবংশ। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর নগর এক্ষণে অরণ্যময় হইয়াছে, বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবাটী নিতান্ত আধুনিক। প্রাচীন পরিখাবেষ্টিত গড়.ও মালিনীপোতা প্রভৃতি যাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে, তদ্দর্শনে কোন নিগূঢ় বিষয়ের মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা করা দুরাশা মাত্র। বিশেষতঃ রাজপ্রাসাদ কিম্বা ধনবানের অট্টালিকার সহিত মিলাইয়া সাধারণ

বাসগৃহের স্বরূপ নিরূপণ করাও কোনক্রমে সম্ভবপর নহে। তবে এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে, এদেশে স্থপতি-বিদ্যার সমাদর এবং স্থপতিগণের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কথিত আছে, আগ্‌রার সুপ্রসিদ্ধ তাজমহল এবং বর্দ্ধমানের প্রাচীন রাজবাটী এক সময়ে এক সাম্প্রদায়িক রাজমিস্ত্রীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীনত্বের এই পর্য্যন্ত ভিন্ন অপর প্রমাণ এক্ষণে নিতান্ত সুদুর্লভ।

যাহা সুদুর্লভ, তাহার আলোচনাও নিষ্ফল। বঙ্গ-দেশের বর্ত্তমান বাসগৃহ নির্ম্মাণপ্রণালী কি প্রকার, এবং তাহাতে কি কি গুণ, কি কি দোষ আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারই আলোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ভাগ্য-বানের অট্টালিকা অবধি দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন, ন্যূনাতিরেক পরিমাণে সকলগুলিরই অঙ্গসংস্থান প্রায় একই প্রকার। বৃহৎ বৃহৎ ইমারতগুলি প্রায়ই চকবন্দী করা, সম্মুখ ভাগে দেবার্চ্চনার ভবন, অপর তিন দিক অপ্রশস্ত বারাণ্ডাযুক্ত খণ্ড খণ্ড কতিপয় কক্ষে সুসজ্জিত। মধ্যস্থানে স্থানের আয়তন-অনুসারে এক একটী প্রাঙ্গণ বিদ্যমান থাকে। বাহ্য দর্শনে এই প্রকার বাটী অতি সুদৃশ্য বোধ হয় বটে, কিন্তু বিশেষরূপে ইহার আভ্যন্তরীণ ফলাফল গণনা করিয়া দেখিলে সেই সুদৃশ্যতার গৌরব করা যায় না। চকবন্দী বাড়ীর প্রত্যেক গৃহেই একটী কি দুটী দ্বার, এবং হস্তীনেত্রপ্রায় দুই

চারিটী গবাক্ষ। সেই সকল গবাক্ষও আবার এমনি অসম সূত্রে সন্নিবেশিত যে, একটীর সহিত অপরটীর রুজু মিলন থাকে না, অথবা সেরূপ মিলন রাখিবার উপায়ই নাই। কোন কোন কক্ষের এত দূর দুর্ভাগ্য যে, এক পার্শ্বের ভিত্তি এককালে সূক্ষ্ম ছিদ্রশূন্য অবরুদ্ধ। ইহার অতিরিক্ত একটী এই প্রথা আছে যে, কোন কোন গৃহস্থ পূর্ব্বকথিত গবাক্ষগুলি চিররুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাহাতে যে কত অপকার ঘটে, সহসা তাহা অনুভূত হয় না। এই প্রকারের চকবন্দী বাটীতে চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুর প্রবেশাধিকার অতি অল্পই থাকে।

যেসকল বাটীতে চক নাই, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক, দুই, বা তিন দিকে একতল, দ্বিতল, বা ত্রিতল গৃহশ্রেণী থাকে, তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে বায়ুসঞ্চালনযোগ্য হইলেও সঞ্চালনদ্বারস্বরূপ গবাক্ষাদির অপ্রশস্ততা ও অবরুদ্ধতা দ্বারা বিফল হইয়া যায়। মৃণ্ময়, তৃণাচ্ছাদিত গৃহের অবস্থা ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট; তাহাতে একটীমাত্র প্রবেশদ্বার থাকে, বাতায়নের সহিত প্রায়ই সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ বায়ুর সহিত বঙ্গীয় গৃহাভ্যন্তরের বহু বিচ্ছেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নির্ম্মাণপ্রণালীর এই পর্য্যন্ত সুসঙ্গতি। পরিচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াসও তদনুরূপ শিথিল। প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে আবর্জ্জনা, চারিদিকে দুর্গন্ধ, গৃহের কোণে কোণে ব্যবহার-

ত্যক্ত জঞ্জাল, দেয়ালে দেয়ালে পানের পিক, থুথু, শ্লেষ্মা, ইত্যাদি বসুধারার ন্যায় চিত্রিত, এক এক গৃহের পার্শ্বে (স্থলবিশেষে মধ্যেও) মূত্রত্যাগের পয়োনালা। একে গৃহমধ্যে বায়ুরোধ, তাহাতে নানাপ্রকার দূষিত সঞ্চিত বস্তুর বিষাক্ত দুর্গন্ধ নিশ্বাসে নিশ্বাসে উদরস্থ হইয়া শরীর বিষাক্ত করে, স্বাস্থ্যকে বিনাশ করে, এবং নানা প্রকারে গৃহবাসিগণকে অসুখী ও অসুস্থ করে, অথচ আশু বোধ হয় না বলিয়া তাহার প্রতি তাদৃশ ভ্রূক্ষেপ নাই।

যে কারণে এতদ্দেশে এতাদৃশ অবরোধপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও এস্থানে নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। যবনাধিকার সময়ে গৃহস্থগণের উপর নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য হইত। দুষ্প্রবৃত্তিশীল বিধর্ম্মী লোকেরা গৃহলুণ্ঠন ও কুলবধূর অপমান করণে সর্ব্বদাই প্রায় উত্তেজিত থাকিত। বর্গীর হাঙ্গামা তাহার মধ্যে অন্যতর। এই সকল কারণে গৃহসৌষ্ঠবে "আট ঘাট বন্ধ" প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল। সে অত্যাচারকাল দূরিত হইলেও চোর ডাকাইতের ভয়ে এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বসাবধানতার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। কারণগুলি কোনমতে ন্যায়পক্ষে অবজ্ঞেয় বা উপেক্ষণীয় নহে।

কেহ কেহ অন্যরূপ সিদ্ধান্তে চকবন্দী বাটীর পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহারা কহেন, বায়ুর চলাচল এক কালে বিবর্জ্জিত, এমন স্থান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, চকবন্দী বাটীতে

সঞ্চার অবশ্যই আছে, অথচ এইরূপ গৃহের উপযো-গিতা অধিক। বহু পরিবার একত্রে এক বাটীতে থাকিবার যেমন সুবিধা অন্য প্রকার রীত্যনুযায়ী প্রকোষ্ঠে হইতে পারে না। চকবন্দী বাটীতে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে অনেকগুলি কক্ষ থাকে, তাহাতে এক সংসারে বহুগোষ্ঠি হইলেও বিনা বিরোধে সকলে একমাত্র পৈতৃক বাটীতে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে পারে। তদন্যথায় অন্য প্রণালী অবলম্বন করিলে এক পরিবারের নিমিত্ত পৃথক পৃথক অনেক বাটী নির্ম্মাণ করাইতে হয়। তাহা অবশ্যই অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য এবং সকলের অবস্থা তাহার অনুকূল ব্যবস্থা প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হয়।

অবরোধের হেতু ও উপযোগিতা যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তাহা বাহ্য শ্রবণে শ্রুতিমধুর ও গ্রাহ্য বটে, কিন্তু যে উদ্দেশে গৃহপ্রশস্ততার আবশ্যকতা স্থিরীকৃত হয়, বর্ত্তমান প্রণালীতে সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। মনে করুন,— সচরাচর নিশ্বাস প্রশ্বাসে যে পরিমাণে বায়ুসঞ্চার ও বায়ু-বিগতির নিতান্ত প্রয়োজন, শারীরবিজ্ঞানের অনুকূল স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি যত টুকু গতিবিগতি সহায়, বর্ত্তমান রীতির অবরুদ্ধ প্রকোষ্ঠে তাহার সম্পূর্ণ না হউক, বহু অংশ অভাব হইতেছে। নিশ্বাসে নিশ্বাসে গৃহস্থিত বায়ু দূষিত হয়, সেই দূষিত বায়ু প্রায়ই ঊর্দ্ধ পথ ভিন্ন নিঃসৃত হইতে পায় না, কারণ সচরাচর বায়ু অপেক্ষা তাহা লঘু, সুতরাং

ঊর্দ্ধগামী হওয়া স্বভাবসম্মত।—এই কারণে স্বাস্থ্যা, দর্শী বৈজ্ঞানিকেরা আপন আপন শয়নগৃহে দ্বার বাতায়ন ব্যতীত রন্ধনগৃহের ধূমনির্গম-বিবরের ন্যায় গৃহশিখরে বায়ুনিঃসরণদ্বার রাখিয়া থাকেন। সামান্যত বলিতে হইবে তত দূর এক্ষণে আবশ্যক নাই। যে রীতিতে গৃহ প্রস্তুত করিলে সূর্য্য ও পবন অবিচ্ছেদে কক্ষমধ্যে গতিবিধি করিতে পারেন, সেই রীতির প্রবর্ত্তনই আদৌ বাঞ্ছনীয়।

কল্পনা করিয়াও আমরা এ সকল কথা বলিতেছি না, যে প্রণালী এক্ষণে আছে, তাহা আধুনিক, এবং যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাই পুরাতন।—যে কারণে তাহার লোপ হইয়াছে, সে আভাসও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যে কারণে পূর্ব্ব প্রণালীকে পুরাতন বলা হইল, তাহাও প্রতিপন্ন করিব, এবং তাহাই এক্ষণে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করিব। পূর্ব্ব কালের একটী সুবুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী রমণীর উপদেশ আছে ঃ—

"পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,
উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে,
ঘর বাঁধ্‌গে যা ভেড়ের ভেড়ে।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গৃহের পূর্ব্বদিকে হংস চরিবার যোগ্য স্থান অর্থাৎ পুষ্করিণী রাখা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে গৃহ সর্ব্বদা শীতল থাকে, অথচ তাহার বাষ্পে গৃহ তাদৃশ আর্দ্রও হয় না। দক্ষিণে পুষ্করিণী থাকিলে অনেক বাষ্প

মলয়মারুত সহকারে গৃহে আসিয়া স্বাস্থ্যের হানি করে। তাহা উত্তরে হইলে শীতকালের শীতল বায়ুও আর্দ্র হয়, কিন্তু তাহাতে গৃহস্থের কোন উপকার করেনা। গৃহের পশ্চিমে বাঁশ কল্পিত হইয়াছে; তাহার অভিপ্রায় এই যে, পশ্চিমে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষরাজী রাখা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে অপরাহ্নে সূর্য্যের প্রখর কিরণ গৃহের গ্রীষ্ম বর্দ্ধিত করিতে পারে না। ঐ বৃক্ষরাজী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আনিলে প্রাতঃকালের সুখকর রৌদ্রে গৃহ শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর হয় না, অথচ পূর্ব্বের পুষ্করিণী পশ্চিমে গিয়া না অপরাহ্নের রৌদ্রই আচ্ছাদিত করে, না বায়ুকোণের কাল বৈশাখী ঝড়ের আপদ নিবারণ করে। ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম কালের দক্ষিণাগত মলয় সমীরণ অতি স্বাস্থ্যকর পদার্থ। তাহার সমাগমের নিমিত্ত বাটীর দক্ষিণ পরিষ্কার খোলা রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়, ইহা অনায়াসেই সকলের মনে উদিত হইবে। তন্নিমিত্তই আমাদিগের উদ্ধৃত বচনে দক্ষিণ ছাড়িবার পরামর্শ দিয়াছে। উত্তরাগত বায়ু কখনই আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও সুখপ্রদ নহে। সেই দিক বেষ্টন করিয়া গৃহ প্রস্তুত করিবার উপদেশ আছে। এই সদুপদেশপূর্ণ বচনটির মান রক্ষা এক্ষণে অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন।

" দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা।
পূর্ব্বদ্বারী তাব প্রজা॥

পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই।
উত্তরদ্বারীর কাছে না যাই॥"

এইরূপ অনেকগুলি চলিত বাক্য আছে, একে একে সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য নীতিগর্ভ বিজ্ঞান-বাক্যের সহিত আমরা তাহা দ্বিতীয় অবসরে পাঠকবৃন্দের গোচর করিতে যত্নবান হইব। মূল কথা, আমাদিগের বাসগৃহগুলি যতদূর সম্ভব, সুপ্রশস্ত, বায়ু সঞ্চালনের উপযুক্ত পথগুলি সমসূত্রে সুবিস্তৃত, এবং উপযুক্তরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ও শ্রেয়স্কর।

কল্কি পুরাণ।

প্রথম অধ্যায়।

নমো গণেশায়।

সেন্দ্রা দেবগণা মুনীশ্বরজনা লোকাঃ সপালাঃ সদা
স্বং স্বং কর্ম্ম সুসিদ্ধয়ে প্রতিদিনং ভক্ত্যা ভজন্ত্যুত্তমাঃ।
তং বিঘ্নেশমনন্তমচ্যুতমজং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাশ্রয়ং
বন্দে বৈদিক তান্ত্রিকাদিবিবিধৈঃ শাস্ত্রৈঃ পুরোবন্দিতং॥

নারায়ণ, নর ও নরোত্তম এবং সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিতে হয়।

ধরাপীড়ক ধরাপতিগণ যাঁহার ভীষণ ভুজঙ্গকবল-সদৃশ করকবলে কবলিত হইয়া ভস্মাবশেষ ও তীক্ষ্ণধার করবাল দ্বারা বিদলিত হইয়াছেন, যিনি নিরন্তর অশ্বারোহণে গমন করিয়া থাকেন, যিনি সত্যাদি চারি যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতেই যাঁহার প্রবৃত্তি, দ্বিজকুলসম্ভূত কল্কিনামধারী পরমাত্মাস্বরূপ সেই ভগবান্ হরি সকলকে রক্ষা করুন।

নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি মহর্ষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ লোমহর্ষণতনয়! আপনি ত্রিকালজ্ঞ, নিখিল পুরাণও আপনার অবিদিত নাই, অতএব জগৎপ্রভু জগদীশ্বর হরি কে? কোথায় জন্মিয়াছিলেন? এবং কি নিমিত্তই বা নিত্য ধর্ম্মের বিনাশ সাধন করেন? এই সমস্ত ভগবদ্বিষয়িণী কথা আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। লোমহর্ষণপুত্র মহর্ষিগণের এই কথা শ্রবণ মাত্র জগৎপতি হরিকে স্মরণ করিয়া হর্ষপুলকিত গাত্রে কহিতে লাগিলেন।

সূত কহিলেন, আমি সেই অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করাতে প্রজাপতি তাঁহাকে ঐ আখ্যান বলিয়াছিলেন। তৎপরে নারদ অমিততেজা মহামুনি ব্যাসের নিকট উহা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ব্যাসদেব ব্রহ্মবাদী ধীমান্ নিজপুত্র শুকদেবের নিকট ব্যক্ত করেন। শুকদেবও পরম বৈষ্ণব অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিতের সভায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সপ্ত দিবসে তাঁহার ঐ আখ্যান সমাপ্ত হইল এবং নরপতি পরীক্ষিতও প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা পরীক্ষিতের পরলোকের পর পুণ্যাশ্রমে মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁহাদের নিকট পুনরায় ঐ আখ্যান কীর্ত্তন করেন।

হে মহর্ষিগণ! আমি সেই পুণ্যাশ্রমে শুকদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছি, সেই ভগবদ্বিষয়ক অতি পবিত্র শুভকর আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া অবিচ্ছেদে শ্রবণ করুন। কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠগমনের পর যেরূপে কলি প্রাদুর্ভূত হন, আমি শুকদেবের বচনানুসারে তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

প্রলয়ের পর জগৎস্রষ্টা সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আপন পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘোরদর্শন কৃষ্ণকায় পাতকের সৃষ্টি করেন। ঐ পাতক অধর্ম্ম নামেই বিখ্যাত। উহার বংশ কীর্ত্তন, শ্রবণ অথবা স্মরণ করিলেও লোক সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। রমণীয়রূপা মার্জ্জারনয়না মিথ্যা উহার প্রিয়তমা ভার্য্যা, এবং মহাতেজস্বী কোপনস্বভাব দম্ভ উহার পুত্র। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়ার গর্ভে লোভনামে এক পুত্র ও নিকৃতিনাম্নী এক কন্যা উৎপাদন করে। লোভও আপন ভগিনীর গর্ভে ক্রোধ নামক এক পুত্র এবং হিংসা নাম্নী এক কন্যা উৎপাদন করে। ঐ লোভপুত্র ক্রোধই স্বভগিনী হিংসার গর্ভে কলিকে উৎপাদন করিয়াছেন। ঐ কলি নিরন্তর বাম হস্তে উপস্থ ধারণ করিয়া থাকে, তৈলসিক্ত অঞ্জনের ন্যায় উহার বর্ণ, কাকের সদৃশ উদর, করাল বদন, জিহ্বা লোল, ফলত উহাকে দেখিতে অতি ভীষণাকার। উহার গাত্র হইতে সর্ব্বদাই পূতিগন্ধ বহির্গত হইতেছে, এবং দ্যূত, মদ্য, স্ত্রী ও সুবর্ণই উহার আশ্রয়। ঐ কলি আপন ভগিনী দুরুক্তির গর্ভে ভয়নামক পুত্র ও মৃত্যুনাম্নী কন্যা উৎপাদন করে। উহাদের উভয়ের সমাগমে নিরয় নামে এক পুত্র ও যাতনা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হয়। নিরয় নিজ ভগিনী যাতনার গর্ভে বহু সঙ্খ্যক পুত্র উৎপাদন করে। এই রূপে কলি বংশে অসংখ্য ধর্ম্মনিন্দক জন্মিয়াছিল। উহারা সকলেই যজ্ঞ

অধ্যয়ন, দান, বেদ ও তন্ত্রের বিনাশক। আধি, ব্যাধি, জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক ও ভয়ই উহাদের আশ্রয়। কলিরাজের অনুচরেরা লোকবিনাশমানসে সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, সুতরাং লোকসকল ভ্রষ্টাচার, কামুক ও ক্ষণস্থায়ী। কলির প্রারম্ভে লোকসকল দাম্ভিক, দুরাচার ও পিতামাতার দ্বেষ্টা। ব্রাহ্মণেরা অতি দীন, বেদহীন, শূদ্রসেবায় তৎপর, কুতর্কনিপুণ, ধর্ম্মবিক্রয়ী, নীচপ্রকৃতি, বেদবিক্রয়ী, রসবিক্রয়ী, মাংসবিক্রয়ী, ক্রূর, শিশ্নোদরপরায়ণ, পরদার-নিরত, মত্ত, বর্ণসঙ্করকারী, হ্রস্বাকার, পাপপরায়ণ, শঠ ও মঠনিবাসী। এই সময়ে লোকের আয়ু ষোড়শ বৎসর মাত্র। শ্যালকই উহাদের পরম বন্ধু। সকলেই কুসংসর্গ রত, কলহকুশল এবং কেশ ও বেশবিন্যাসে তৎপর। কলিতে ধনিগণই কুলীন, বার্দ্ধুষিক (সুদখোর) বিপ্রগণই পূজ্য, সন্ন্যাসীগণ গৃহাসক্ত এবং গৃহস্থ সকলে অবিবেকী। ধর্ম্মধ্বজিগণ (ভণ্ড সন্ন্যাসীরা) গুরুনিন্দারত ও সাধুবঞ্চক; এবং শূদ্রেরা প্রতিগ্রহকারী ও পরস্ব হরণে তৎপর। কলিযুগে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর স্বীকারের নাম বিবাহ। এই কালে শঠের সহিত বন্ধুত্ব, প্রতিদানে বদান্যতা, শক্তির অভাব হইলেই ক্ষমা, ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইলেই বিরাগ, পাণ্ডিত্য প্রকাশের সময় বাচালতা, যশের নিমিত্ত ধর্ম্মসেবন এবং ধনাঢ্য হইলেই সৎ ও ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত। তীর্থসকল দূরগত ও জলসংস্থিত। যাহার গলদেশে সূত্র, সেই ব্রাহ্মণ এবং যাহার হস্তে দণ্ড, সেই দণ্ডী। শস্যসকল নদীতীরে রোপিত ও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্ত্রীগণ নিজ নিজ পতির প্রতি বিরত হইয়া ভ্রষ্টালাপেই সন্তুষ্ট। বিপ্রগণ পরান্নলোলুপ এবং চণ্ডালের গৃহেও যাগাদি করিতে উদ্যত। সকল কামিনীই স্বেচ্ছাচারিণী,

সুতরাং কাহাকেও বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মেঘ সকল অনিয়মে বারি বর্ষণ করে, সুতরাং মেদিনী অল্প শস্য-শালিনী। নরপতিগণ প্রজাপীড়ক। সুতরাং প্রজাগণ করপীড়ায় নিপীড়িত হইয়া ক্ষুব্ধ মনে স্কন্ধে ভার ও পুত্রের হস্ত ধারণপূর্ব্বক গিরিদুর্গ ও নিবিড় বন আশ্রয় করে। তথায় তাহাদিগকে মধু, মাংস ও ফল মূল দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতে হয়। লোক মাত্রেই কৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে। কলির প্রথম পাদে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় পাদে কেহ কৃষ্ণের নাম গ্রহণও করে না। তৃতীয় পাদে ঘোর বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয়; এবং চতুর্থপাদে একবারে একবর্ণ হইয়া সকলেই কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত ও স্বাধ্যায়, স্বধা স্বাহা, বৌষট ও ওঁকার বর্জ্জিত হয়। দেবগণের আর আহার হয় না। অনন্তর সুরগণ অতি দীনা ক্ষীণা ধরিত্রীকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। তাঁহারা তথায় গমন করিয়া দেখেন, ব্রহ্ম লোক বেদ ধ্বনিতে নিনাদিত, যজ্ঞধূমে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত। তথায় সুবর্ণ বেদির যূপোদ্যানের মধ্যস্থলে ফল পুষ্প-পরিবেষ্টিত দক্ষিণাবর্ত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। সরোবর সকল যেন হংস-সারসের কলরবদ্বারা অতিথিগণকে আহ্বান করিতেছে। লতা সকল ক্ষণে ক্ষণে বায়ুভরে ঈষৎ অবনত হইয়া যেন প্রণাম করিতেছে এবং কুসুমস্থিত অলিকুল যেন অতিথিগণকে আহ্বান, তাঁহাদের সৎকার, এবং তাঁহাদের সহিত মধুরালাপ করিতেছে।

পরম দুঃখিত দেবগণ নিজ নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিবার নিমিত্ত অনুমতিক্রমে ব্রহ্মার সদনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ত্রিভুবনজনকব্রহ্মা এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট আছেন এবং সনক, সনন্দ

সনাতন এবং সিদ্ধগণ তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। দেবগণ তথায় গমন করিয়াই অবনত মস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন।

প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

লাইকর্‌গস্‌।

ইনি কে?—ইতিহাসজ্ঞদিগের নিকট সে পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই; যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জ্ঞাত হউন, ইনি ইউরোপখণ্ডান্তর্গত গ্রীশ দেশের রাজধানী স্পার্টা নগরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক। গ্রীশ যেমন প্রাচীন দেশ, লাইকরগস্‌ও তাহার উপযুক্ত মাননীয় ব্যবস্থাদাতা। সাধারণ-তন্ত্র বিপ্লবকালে দেশের রাণীর বীভৎস অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া লাইকর্‌গস্‌ তাহার প্রশমন-চেষ্টায় কেরাইলেয়স নামে হিন্দোল-দোলিত একটী শিশু রাজকুমারকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা স্থির করেন। এমন স্থলে সচরাচর যেরূপ সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভব, রাণী সেইরূপ কুমন্ত্রণা করিয়া লাইকরগস্‌কে নষ্ট করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। চতুরতা ও ধূর্ত্ততায় ঐ রাজ্যের ঈশ্বরী অতিশয় ভাগ্যবতী ছিলেন, সুতরাং চক্রও শীঘ্র সৃজিত হইল। আপনার মতাবলম্বী জনকতক মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঘোষণা করেন যে, লাইকর্‌গস্‌ আমার বিরুদ্ধে ও রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, সেই অপরাধে যে দণ্ড হওয়া উচিত, সেই দণ্ড তাহার অবিলম্বে করা কর্ত্তব্য। লাইকর্‌গস্‌ তাহা শুনিলেন, কিন্তু সেই বিপদচক্র ভেদ করিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হয় নাই, বরং এক প্রকার শাপে বর হইয়াছিল।

সুসংস্কৃত রাজনীতিতে স্বদেশের শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করা তাঁহার চির অভিলষিত, সুতরাং এই সুযোগে সেটী সিদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠিল। পৃথিবীর নানাদেশের রাজশাসন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ না করিলে একটী সুসংস্কৃত রাজনীতি প্রস্তুত করা যায় না। সেই জন্য তিনি বিপদ-ব্যপদেশে গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন।

ভ্রমণকারী লাইকর্গসের প্রথম প্রবাসস্থান কিরীট দ্বীপ। সেই দ্বীপে মাইনস্ নামে এক জন মহামান্য রাজব্যবহারাজীব ছিলেন। ট্রোজান যুদ্ধের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতীয়মান হয়। নৈপুণ্যগুণে তাঁহার একটী গৌরবসূচক নাম হইয়াছিল, সেই নামটী ব্যবস্থা-মিনস্। লাইকর্গস্ তাঁহার কার্য্যের সহিত মিলন করিয়া একে একে তাঁহার প্রণীত সমস্ত ব্যবহার-শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব অবগত হন, এবং রাজ্যব্যাপী চলিত প্রথা দর্শন করিয়া রীতিনীতির সারভূত ভাব গ্রহণ করেন। শেষে মিলাইয়া দেখেন, তাঁহার নিজের মনোগত ভাব যেরূপ, কিরীট দ্বীপের প্রচলিত ব্যবস্থাগুলিও অবিকল সেইরূপ। মাইনস্ কেবল সামান্য ব্যবস্থাপক মাত্র নহেন, তিনি একজন মহা পরাক্রান্ত রাজপুত্র। রাজপুত্র স্বয়ং ব্যবস্থা প্রণেতা, এবং স্বয়ংই সেই ব্যবস্থার অনুগামী। ইহাই লাইকর্গসের অধিক আনন্দের কারণ। মাইনসের আইন-গুলি যেমন মনোরঞ্জন, তেমনই উপকারক। সেই রাজা জীবনাবধি প্রজার উপকার ভিন্ন স্মরণযোগ্য একটীও অপকার করেন নাই, ভূপতির সহিত প্রজার যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ, রাজা মাইনস্ তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনি বলিতেন, কাহার এমন অসীম ক্ষমতা আছে, জগদীশ্বর জগতে কাহাকেই বা তেম-

প্রসাদ-দান করিয়াছেন যে, লোকের উপকার করিয়া আশা পরিপূর্ণ করিবে ? যে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে, তাহা যদি সাধারণের উপকারে নিয়োজন না করি, তবে জীবন বৃথা। কেবল এই একটী বাক্যেই মাইনসের প্রজারঞ্জন গুণের পূর্ণ পরিচয় হইবে।

লাইকর্‌গস্‌ ঐ বর্ণিত গুণেই দিন দিন ভক্তিমান্‌ হইতে লাগিলেন। কিছু দিন সেই দ্বীপে থাকিয়া এসিয়া খণ্ডে আগমন করিতে বাসনা হইল, তথা হইতে যাত্রা করিলেন।

মদালসা।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

পূর্ব্বকালে শত্রুজিৎ নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক মহীপাল ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই নানাবিধযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন। সুররাজ ইন্দ্র-তাঁহার যজ্ঞীয় সোমরস লাভে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কালক্রমে ঐ নরপতির একটী পুত্র জন্মে। রাজকুমার রূপে অশ্বিনীকুমারের ন্যায়, প্রজ্ঞায় সুরগুরুর ন্যায় ও বিক্রমে পুরন্দরের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার ভুজবীর্য্য দর্শনে বিপক্ষগণ সতত অবনত মস্তকে কালাতিপাত করিত। রাজ তনয় আপন অনুরূপ রাজপুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া কখন কাব্যালাপ, কখন সঙ্গীত, কখন নাট্যাভি-

নয় দর্শন, কখন অক্ষ বিনোদ, কখন শাস্ত্র চিন্তা, কখন শস্ত্র প্রয়োগ, কখন বা সংগ্রামোপযোগী অশ্ব, গজ ও রথারোহণ প্রভৃতি কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেন। তিনি কি দিবস কি রজনী সর্ব্বদাই প্রমোদিত থাকিতেন। ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানগণ নিয়তই তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইত।

কিছু দিন পরে অশ্বতর নামক নাগের তরুণবয়স্ক প্রিয়দর্শন দুইটী পুত্র, ব্রাহ্মণ কুমারের বেশ ধারণ করিয়া নাগলোক হইতে রাজকুমারের নিকট আগমন করেন। রাজপুত্র ঐ দুইটী নাগ পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহিত একত্র স্নান একত্র গন্ধমাল্যানুলেপন ধারণ পূর্ব্বক প্রীতমনে অবস্থান করিতেন। রাজকুমার দিবসে নাগকুমার দিগের সহিত হাস্য কৌতুকে কালাতিপাত করিতেন। তিনি তাহাদিগের অদর্শনে স্নান, ভোজন, মধুপান প্রভৃতি কোন কর্ম্মই করিতেন না। তাঁহারাও অবাধে রজনীকাল নাগলোকে যাপন করিয়া অনুরাগ বশতঃ প্রত্যহ প্রাতঃকালে রাজকুমারের নিকট হৃষ্টমনে উপস্থিত হইতেন।

একদা নাগরাজ অশ্বতর সন্তান দ্বয়কে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! মর্ত্যলোকের প্রতি তোমাদিগের এরূপ গাঢ়তর প্রীতি ও অনুরাগ দেখিতেছি কেন? কিনিমিত্তই বা দিবসে তোমাদিগকে দেখিতে পাই না? পুত্রেরা পিতার উক্তরূপ বাক্য শ্রবণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তাত! যে কারণে মর্ত্ত্যলোকের প্রতি আমরা অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছি, সবিস্তরে তাহা নিবেদন করিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

মর্ত্ত্যলোকে শত্রুজিৎ নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা আছেন।

তাঁহার একটী মাত্র পুত্র। ঐ পুত্রের নাম ঋতধ্বজ। তিনি অতি শৌর্য্যশালী, বিদ্বান, সত্যবাদী ও বিনয়ালঙ্কৃত। সেই রাজপুত্র বিনয়াদি নানাগুণে আমাদিগের মন হরণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার প্রণয়পাশে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছি যে, তাঁহার বিরহে এই পাতালতল শীতল বলিয়া আমাদিগের কোন ক্রমেই অনুভূত হয় না। তাঁহার সংসর্গে সমস্ত দিবস বিমল আনন্দ উপভোগ করি।

নাগরাজ পুত্রদ্বয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন। বৎস! তোমরা উভয়েই হিতাহিত বিবেচনায সমর্থ, তোমরা যখন তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছ, তখন সেই পুত্রের পিতাই ধন্য। কেহ বিদ্বান্ কিন্তু অসচ্চরিত্র, কেহবা মূর্খ হইয়াও সচ্চরিত্র; এরূপ পুত্র এই সংসারে বিস্তর আছে। কিন্তু যে পুত্র বিদ্বান অথচ সুশীল, তিনিই ধন্য ও সাধু বলিয়া গণনীয়। মিত্রগণ যাহার মিত্রগুণ ও অমিত্রেরা যাহার পরাক্রম কীর্ত্তন করে তাহার পিতাই যথার্থ পুত্রবান। ও হে বৎসগণ! তোমরা কি সেই পরমোপকারী বন্ধুর সন্তোষের নিমিত্ত কোনরূপ উপকার করিয়াছ? অথবা কোন উপকার করিবার অভিলাষ করিয়াছিলে? যে ব্যক্তি বন্ধুর কার্য্যসাধনে দুর্ব্বল হয় না, তাহারই জীবন সার্থক। অতএব আমি তোমাদিগকে অনুমতি করিতেছি। আমার ভবনে যে সমস্ত সুবর্ণাদি রত্ন, উৎকৃষ্ট যান, অত্যুত্তম আসন ও অন্যান্য যা কিছু মহামূল্য বস্তু আছে, তোমরা তাহা মিত্রের প্রীতির নিমিত্ত নিঃশঙ্ক মনে অর্পণ করিতে পার। যে পুরুষ উপকারী মিত্রের প্রত্যুপকারে বিমুখ হইয়া আপনাকে জীবিত মনে করে সেই পুরুষাধমের জীবনে ধিক্। যে মহাত্মা সুহৃদ্বর্গের উপকার ও শত্রুগণের অপকার করিতে সমর্থ, প্রাজ্ঞেরা সর্ব্বদাই তাঁহার উন্নতি কামনা করেন।

অনন্তর পুত্রেরা কহিলেন, পিত! আপনি যাহা কহিলেন, সকলই সত্য, কিন্তু সেই নৃপকুমার সকল বিষয়েই কৃতকৃত্য, তাঁহার কোন রূপ অপ্রতুল নাই। তাঁহার ভবনে যে সকল যান, আসন, ভূষণ, বসন ও ধন রত্ন বিদ্যমান আছে, তাহা আমাদিগের পাতালপুরে নাই। আর তাঁহার বিজ্ঞানের কথা কি কহিব, তিনি প্রাজ্ঞগণেরও সংশয় ছেদ করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার উপকার করিবার সূত্র কিছুই লক্ষিত হয় না, কেবল একটি মাত্র অসদ্ভাব, কিন্তু তাহা দৈব ভিন্ন আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ কহিলেন, বৎস! তোমাদের মিত্রকার্য্য সাধ্য বা অসাধ্যই হউক, তথাপি আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি। আমি জানি, অধ্যবসায়শীল পণ্ডিতগণের কিছুই অসাধ্য নাই। দৃঢ়ব্রত পুরুষেরা কি দেবত্ব কি দেবরাজত্ব কি দেবপূজ্যত্ব কি অপর অভীষ্ট বস্তু সকলই লাভ করিতে পারেন। উদ্যমশীল জিতেন্দ্রি[illegible] লোকের কি ইহলোকে কি পরলোকে কিছুই অবিজ্ঞাত, অগম[illegible] অপ্রাপ্য নাই। দেখ, পিপীলিকাগণও যোজন সহস্র অতি[illegible]ক্রম করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু নিরুদ্যম খগরাজ এক পদও গমন করিতে পারে না। উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া যে লোকে গমন করিয়াছিলেন, সেই ধ্রুবলোক কোথায়, আর এই ভূমণ্ডল [illegible] হে পুত্র! তোমাদিগের পরম মিত্র সেই নৃপকুমারের কোন্ বিষয়ের অসদ্ভাব, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তোমরা যাহাতে মিত্র ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পার, আমি তৎসাধনে সাধ্যমত যত্ন করিব। পুত্রেরা কহিলেন, তাত! সেই মহানুভব রাজকুমারের কৌমার কালে যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি তাহা স্বয়ং আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে

আমরা আপনার নিকট তাহা যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

একদা গালব নামে কোন মহর্ষি বিশ্বজিৎ নরপতির সমীপে এক দিব্য তুরঙ্গমের সহিত উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! কোন দুরাচার দৈত্যাধম গজ ও সিংহ প্রভৃতি নানা বনচর জন্তুর রূপ ধারণ পূর্ব্বক আমার আশ্রমে সমাগত হইয়া অকারণে যজ্ঞানুষ্ঠানের ঘাত করে। আমি সমাধিযুক্ত হইয়া মৌনব্রত ধারণ করিয়া কি। সহসা ঐ পাপাত্মা আসিয়া যাহাতে আমার মন বিচ- হয়, এইরূপ উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। এক দিন নয়, দুরাত্মা নিয়তই ঐরূপ ব্যবহার করে। হে পার্থিব! ানলে ঐ পাপমতি দুষ্ট দৈত্যকে সদ্য ভস্মসাৎ ন্তু ক্লেশার্জ্জিত তপোব্যয়ের ভয়ে তাদৃশ কার্য্য না করি না। একদা আমি সেই দৈত্য কর্ত্তৃক প্রপীড়িত ও ক্লেশিত হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম, অমনি অম্বরতল হইতে এই তুরঙ্গটী আমার সম্মুখে পতিত হইল। তদ্দর্শনে আমি বিস্ময়াবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা যে অশরীরিণী বাণী আমার শ্রবণ গোচর হইল, তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ-করুন্।

হে নরনাথ! তখন সেই আকাশভবা সরস্বতী আমাকে কহিলেন, মহর্ষে! এই যে অশ্বটী দেখিতেছ, উহাকে সামান্য ঘোটক মনে করিওনা, এই তুরঙ্গ সমস্ত ভূমিচক্র বেষ্টন করিলেও পরিশ্রান্ত হয় না। কি পাতালতল, কি অম্বরপথ, কি দুর্গম গিরি, কি জলরাশি সর্ব্বত্র ইহার গতি অবাহত! এই ঘোটক অর্কের ন্যায় অবিশ্রামে

সমস্ত ভুবন ভ্রমণ করিতে পারিবে বলিয়া, সংসারে কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত হইবে। যে দানবাধম অহর্নিশ তোমাকে অত্যন্ত ক্লেশিত করে, শত্রুজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজ এই অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়া জগতীতলে অতুল কীর্ত্তিলাভ করিবে।

হে নরনাথ! আমি সেই দৈববানী শুনিয়া আশ্বস্তমনে তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি সেই তপোবিঘ্নকারী দানব যাহাতে নিরস্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। শাস্ত্রানুস নৃপতিরাও যজ্ঞ কর্ম্মের অংশভাগী হইয়া থাকেন, সুতরাং এবি তোমার মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই অশ্বরত্ন তোম অর্পণ করিলাম। ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত তুমি নিজ পুত্রকে কর।

তখন মহারাজ শত্রুজিৎ মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন। বৎস! এই হয়রত্নে আরোহণ করিয়া যজ্ঞবিঘ্ন গালবাশ্রমে প্রস্থান কর। রাজকুমার পিতার আদেশে তৎক্ষণাৎ অশ্বারূঢ় হইয়া মহাত্মা গালবের সহিত শুভক্ষণে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মুনিবর রাজপুত্রের সহিত হৃষ্টমনে নিজ আশ্রমে উপনীত হইলেন। রাজকুমার সেই রমণীয় আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মবাদী মহর্ষিদিগের বিঘ্নশান্তি করিতে লাগিলেন। দুরাচার দানবাধম, কুবলয়াশ্ব যে গালবাশ্রমে অবস্থান করিতেছে, তাহা মদ-ভরে অবগত হইতে পারে নাই। একারণ একদা সে শূকররূপ ধারণ পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শনার্থ সেই আশ্রমপদে উপস্থিত হইল। মহর্ষি তৎকালে সন্ধ্যার উপাসনায় তৎপর ছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর শূকর-রূপধারী দৈত্যের দর্শনে মুনিশিষ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। নৃপকুমার তাহা শ্রবণমাত্র কুবলয়াশ্বে আরোহণ করিয়া

শর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক বরাহের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং চারুচিত্র শোভিত বিচিত্র কার্ম্মুকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার সুতীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিয়া লক্ষ্য শূকরের প্রতি সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বরাহরূপী-দৈত্য রাজকুমারের শরে আবিদ্ধ হইয়া আত্মত্রাণের নিমিত্ত প্রাণ ভয়ে গিরি-পাদপ-সঙ্কুল অটবী মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। বিচিত্র বেগবান্ অশ্বও রাজপুত্র কর্ত্তৃক বেগে চালিত হইয়া তাহার অনু-ধাবন করিতে লাগিল। এইরূপে অশ্বারোহী নৃপকুমার শূকরের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া সহস্র সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন, পথমধ্যে ধরণীতলে এক সুবিস্তীর্ণ গহ্বর ছিল তিনি তাহাতে অশ্বের সহিত নিপতিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি সেই অন্ধতমসাবৃত গহ্বরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, সুতরাং শূকররূপী দৈত্যও তাঁহার নয়নপথের বহির্ভূত হইয়া পড়িল। ক্রমে পাতাল তল নৃপকুমারের নেত্রপথে প্রকাশিত হইল।

তখন যুবরাজ ঋতধ্বজ দুরাচার দৈত্যের বিনাশে হতাশ হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত হইলেন; ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, অগত্যা কুবলয়াশ্বের বেগ মন্দীভূত করিয়া পাতাল তলের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে যাইতেছেন, ইত্যবসরে পুরন্দর পুর সদৃশ, শত শত সৌবর্ণ প্রাসাদ শোভিত, প্রাকারবেষ্টিত এক অপূর্ব্ব পুরী তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। সহসা তদ্দর্শনে তাঁহার মনে বিস্ময় রসের আবির্ভাব হইল। তিনি স্বভাবত নির্ভীক ছিলেন, সুতরাং নির্ভয় মনে সেই স্বর্ণময় ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, জন মানব তাঁহার দর্শনগোচর হইল না। পরে নৃপনন্দন সেই ভব-

নের সকল দিক ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটী রূপ-যৌবন-সম্পন্না পরম রমণীয়াকৃতি কৃশাঙ্গী রমণী এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার মূর্ত্তি দর্শনে বোধ হইল, যেন তিনি সাতিশয় ত্বরান্বিতা ও অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তা। তখন রাজপুত্র কৌতূহলাক্রান্ত মনে সেই যোষিৎ সন্নিধানে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তন্বঙ্গি! তুমি কে? একাকিনী এস্থানে অবস্থান করিতেছ কেন? কেইবা তোমায় এখানে পাঠাইয়াছে? তখন সেই লাবণ্যময়ী কামিনী রাজকুমারের বাক্যে কোন রূপ প্রত্যুত্তর না করিয়া, অন্যদিকে দৃষ্টি সঞ্চার পূর্ব্বক সেই বিচিত্র প্রাসাদে অধিরোহণ করিলেন, তদ্দর্শনে যুবরাজ নিঃশঙ্ক চিত্তে এক স্থানে অশ্ব বন্ধন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

তদনন্তর রাজকুমার ঋতধ্বজ সেই ভবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন। স্বর্ণময় প্রশস্ত পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে কন্দর্পের রতির ন্যায় এক পরম সুন্দরী কামিনী সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রানন দেখিলে পূর্ণেন্দু বলিয়া দর্শকের মনে ভ্রমের আবির্ভাব হয়। ভ্রূযুগল মনোহর। অলকাবলী মেঘের ন্যায় শ্যাম সুচিক্কণ ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। নয়নযুগল নীলোৎপল দলের ন্যায় শোভান্বিত, উজ্জ্বল ও সরল কটাক্ষ সম্পন্ন। অধরোষ্ঠ ঈষৎ আলোহিত অথচ সুঘটিত। দশন পংক্তি কুন্দ কলিকার ন্যায় ধবল। তাঁহার শ্রোণিদেশ ও পয়োধর যুগল যেমন পীন, কটিভাগ তেমনি সূক্ষ্ম। ঊরু যুগলের উপমা নাই। যুবরাজ তন্বী শ্যামা চারুসর্ব্বাঙ্গী অনঙ্গের অঙ্গলতিকার ন্যায় সেই লাবণ্যময়ী তরুণী কামিনীরে অবলোকন করিয়া রসাতলের অধিদেবতা বলিয়া অবধারণ করিলেন।

পূর্ণ শশী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাগ্‌দান।

" অর্থোহি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতোঽস্মি সদ্যোবিষদান্তরাত্মা
চিরস্য নিক্ষেপমিবার্পয়িত্বা॥"

কালিদাস।

বাঙ্গালা ১০৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এক জন যুবা হিন্দুস্থানী একাকী বিষণ্ন বদনে অশ্বারোহণে দাক্ষিণাত্যের আরণ্য পথে গমন করিতেছেন। তাঁহার পরিচ্ছদ বস্ত্রগুলি স্থানে স্থানে বিশ্লিষ্ট, স্তরে স্তরে আর্দ্র। অশ্বটীও অতিশয় পরিশ্রান্ত, সিক্ত কলেবর। সময় নিশা, কিন্তু অধিক রাত্রি হয় নাই, চারি ছয় দণ্ড মাত্র।—প্রকৃতি প্রশান্ত,—পশুপক্ষী নিঃশব্দ,—বৃক্ষপত্র সঞ্চালনের শব্দ মাত্রও নাই,—তলভূমি বারিসিক্ত,—স্থানে স্থানে কর্দম,—স্থানে স্থানে পুঞ্জীকৃত ভগ্ন তরু পথ অবরোধ করিয়া আছে, কোন কোন স্থানে মৃত পশুপক্ষী ভূলুণ্ঠিত। অশ্বারোহী অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইতেছেন না,—এক এক বার ভগ্ন তরুস্কন্ধে অশ্বসহ আহত হইয়া পশ্চাদ্গামী হইতেছেন, গাত্রাবরণ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, কপোলে, ললাটে রক্ত পড়িতেছে;—ভগ্ন বৃক্ষশাখে পাদস্খলন

ঘোটক সেই তরুমূলজাত তৃণাঙ্কুর ভক্ষণ করিতে লাগিল, তিনি গুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, যোগীবর একখানি আসন দেখাইয়া দিলেন, পথিক উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার মনে ভাবান্তর উদয় হইল।—কেন হইল, তিনিই বলিতে পারেন। তপস্বী তাঁহাকে কিছু অন্যমনস্ক দর্শন করিলেন, কিন্তু অতিথি সৎকারের অগ্রে কোন বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসু হওয়া আতিথ্য ধর্ম্মের বিরোধী, এই নিমিত্ত কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। আশ্রমলব্ধ, তৎকালসুলভ যথাভোজ্য সংগ্রহ করিয়া উপযোগ করিতে দিলেন, পথিক আহার করিয়া সুস্থ হইলেন। গৃহে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অতিথির সেবা হইয়াছে, ব্রহ্মচারী তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, মনোভাব প্রকাশ করিবার এই উপযুক্ত অবসর।—অবসর বুঝিয়া তাপসবর অতিথিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস!——"—সম্বোধন সময়েই সম্বোধিতের বিমর্ষ বদনে তাঁহার প্রশস্ত, সুবিস্তার জ্যোতির্ম্ময় নয়ন নিক্ষিপ্ত হইল; তিনি শিহরিলেন। সবিস্ময়ে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবরাজ! তুমি এ অবস্থায় এ বিজন প্রদেশে একাকী ভ্রমণ করিতেছ কেন?"

রাজপুত্র শিহরিয়া উঠিলেন;—সম্বোধন শ্রবণ করিয়া তপস্বীর মুখপানে বিস্ফারিত কৌতূহলী নয়ন প্রক্ষেপ করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহাভাগ! আপনি কে?"

"আমি যে হই, পরে জানিবে। এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর কর। তুমি এই রাত্রে এ বেশে এ প্রদেশে একাকী কেন?" ত্রস্তভাবে ত্রস্ত স্বরে তপস্বীর এই সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এই দূরবর্ত্তী রাজ্যের গিরিগুহাবাসী সন্ন্যাসী আমারে কিরূপে চিনিলেন, কিরূপে পরিচয় জ্ঞাত হইয়া আমারে যুবরাজ-শব্দে সম্বোধন করিলেন, আমি রাজপুত্র, কিরূপে ইনি জানিলেন, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। বোধ হয়, ইনি ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ হইবেন। যাহা হউক, যখন আমি অতিথি, আর ইনিও অকপট অতিথিনিষ্ঠ, তখন কখনই আমার নির্ব্বন্ধে সত্য তত্ত্ব অপ্রকাশ রাখিবেন না। পরিচয় দিব না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ঘটনাগুলি বিজ্ঞাপন করি। এই রূপ সংকল্প সুস্থির করিয়া কহিলেন,

"মুনিসত্তম! আমি আপনারে চিনিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আপনি যোগবলে আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনারে নমস্কার করি। সেতুবন্ধ রামেশ্বর মহা তীর্থ, লোকমুখে আর শাস্ত্রপাঠে এইটী পরিজ্ঞাত হইয়া বসন্তকাল সমাগমের পূর্ব্বেই আমি অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সেই তীর্থ দর্শনাশয়ে যাত্রা করি। আপনার আশ্রমের অদূরে উপস্থিত হইয়া অদ্য মহা বিপদে পতিত হই। অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হয়। আমার 'লোকজন সেই দুর্যোগে কে কোথায় গেল, কিছুই জানি না, আমি একাকী আর আমার ঐ অশ্ব বহু কষ্ট ভোগ করিয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আর আপনার অমায়িক মহাপুরুষ ভাব দর্শন করিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছি,—আপনার শ্রীপাদপদ্ম এ জন্মে আর বিস্মৃত হইব না। এখন অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কে? কোন্ মহাযোগী বংশ আপনার উদ্ভবে সমলঙ্কৃত হইয়াছে?"

তপস্বী হাস্য মুখে কহিলেন, "রাজকুমার! আমি যোগীও নই, দৈবজ্ঞও নই, তোমার পিতা মহারাজ আদিত্য সিংহের চিরচিহ্নিত কিঙ্কর।"

রাজপুত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন। স্থির দৃষ্টিতে তপস্বীর প্রভাময় মুখপানে চাহিয়া স্মরণ করিতে লাগিলেন, কখনও সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন কিনা? নির্নিমেষ নয়নে অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, অনেক ভাবিলেন, মনে হইল না, চিনিতে পারিলেন না। কহিলেন, "সত্যব্রত! আপনি অসত্য বাক্যে আমারে বঞ্চনা করিবেন, এটী কল্পনা করিলেও পাপ হয়, আপনি তপস্বী, আপনারে নমস্কার, আপনি আমারে অপরাধী করিবেন না, মিনতি করি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কে? আর সত্যই যদি আমার ভাগ্যবান পিতা আপনার তুল্য মহাপুরুষের প্রসাদ লাভে গৌরবান্বিত ছিলেন, তবে কি অপরাধে তাঁহারে সে অনুগ্রহে বঞ্চিত করিয়া সংসারত্যাগী উদাসীন হইয়াছেন? আর একটী নিবেদন, ক্ষমা করিবেন, আপনার নাম কি?"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার সেই হাস্যে তিনটী ভাব প্রকাশ হইল। এক ভাবে কুমারের সরলতাপূর্ণ আগ্রহে পরিতুষ্টি; এক ভাবে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ়; আর এক ভাবে বর্ত্তমান সন্ন্যাস আশ্রমের কারণ চিন্তা।—হাস্য করিয়াই একটী পরিতাপবাহী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কহিলেন, "রাজপুত্র! আমার পরিচয় পাইয়া তুমি এখন সুখী হইবে না, বরং তাহা বিপরীত ভাবের উত্তেজক হইবে। এখন আমি তোমাকে পরিচয় দিব না। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, যাহা আমি বলিয়াছি, তাহা ব্যতীত আর কেহই আমি নই। যে গিরিগুহায় আমায় এখন দেখিতেছ, এখানে আমার নাম সদাশিব ব্রহ্মচারী।"

কুমার কিছু বুঝিতে পারিলেন না।—ক্ষুণ্ণ মনে সাত পাঁচ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই চিন্তার অবসরে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন।

"রাজকুমার! তোমার পূজ্যপাদ পিতার সমস্ত কুশল ত?—জম্বুরাজ্যে এখন ত কোনও উৎপাত নাই?"

অনুকূল উত্তর দিয়া রাজপুত্র কহিলেন, "রাজ্যে প্রতিগমন করিয়া আপনার অনুগ্রহের কথা পিতাকে জানাইব, আপনি পরিচয় দিলেন না, পিতা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তখন আমি কি বলিব? আর কি কথা বলিলেই বা আমার অন্তর্ব্বদ্ধ কৃতজ্ঞতা সুস্পষ্ট প্রকাশ হইবে?"

"আমি স্বয়ং রাজধানীতে গিয়াই সকল কথা নিবেদন করিব। সেই সময় তুমিও আমার স্নেহের পরিচয় পাইবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া উদাসীন যেন উদাসমনে কি পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিলেন; কিছু ক্ষণ মৌন থাকিয়া সপরিতাপে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুত্র! বিজয়পুর রাজ্যের কিছু সংবাদ রাখ?"

রাজপুত্র চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার পর মৌন ভঙ্গ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন, "পররাজ্য-লোলুপ ধূর্ত্ত আরঙ্গজীব সেই মিত্ররাজ্য গ্রাস করিয়াছে!"

ব্রহ্মচারী শুনিয়া ললাটে হস্ত প্রদান করিলেন; অহি-গর্জ্জনের ন্যায় একটী প্রবল সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইল। কপোল প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা গড়াইল। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিতস্বরে কহিলেন, "আহা! মহারাজ মহাসঙ্কটে পড়িয়া মহা দুঃখেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! এক সময়ে দুই দিক দিয়া দুই কাল ভুজঙ্গ তাঁরে বেষ্টন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। এক দিকে আরঙ্গজীব, অপর দিকে শিবজী। আহা!- সময় যখন বিগুণ হয়, তখন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও বিপক্ষতা করে! মহারাষ্ট্রপতি শিবজী হিন্দু-জাতির পরম বন্ধু, হিন্দুবৈরী আরঙ্গজীবের নির্যাতনার্থী, কিন্তু

এমনি দুর্ভাগ্য, বিজয়পুরের অদৃষ্টে সেই মহামনা মহারাষ্ট্রীয় শিব-জীও • বৈরী হইলেন।" বলিতে বলিতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তরীয় বসনে নেত্র মার্জ্জন করিলেন, কিন্তু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, অতীত শোকবৃত্তান্ত স্মরণে আর বহুযত্ন-রক্ষিত বিজয়পুর রাজ্য যবন-রাহু-গ্রস্ত শ্রবণে তাঁহার স্নেহকাতর হৃদয় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া কণ্ঠ-রোধ করিল।

রাজকুমারের চক্ষেও জল আসিল, তিনি চঞ্চল ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে গুহাশিখরের ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অন্তর্দগ্ধকর দীর্ঘশ্বাস চঞ্চল বায়ুসম প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজপুত্র কাঁদি-লেন! এই বিভ্রম সময়ে সহসা নূতন ভাবের আবির্ভাব! অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব নবীন দৃশ্য! রাজকুমার যখন ঊর্দ্ধ-নয়নে এদিক ওদিক দেখিতেছিলেন, সেই অবসরে দৈবাৎ একটী পার্শ্বস্থ গুহাবিবরে তাঁহার চক্ষু পড়িল। দেখিলেন, শতদল পদ্মের ন্যায় শোভাময় একখানি বদন! কমনীয় কামিনীর সুকোমল বদন! সেই নিষ্কলঙ্ক অমল বদনকমল ভিন্ন কমলাঙ্গীর আর কোনও অঙ্গ আশুদর্শনকারীর দর্শনপথের অতিথি হইল না।—সেই নিরমল কমলে উজ্জ্বল, নীল, আকুঞ্চিত অলকাবলী যেন মধুলুব্ধ মধুপাবলীর ন্যায় সুশোভিত। ভ্রমরেরা যেন সেই প্রফুল্ল মুখপঙ্কজে মনের আবেশে মধুপান করিতেছে! উড়িতেছে না, নড়িতেছে না, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে না,---স্থির, অচঞ্চল, অটল। অপূর্ব্ব শোভা!

রাজপুত্র এই শোভা দেখিলেন। নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইল, প্রস্ফুটিত হেমপদ্ম সঙ্গতি মাত্রেই মুদিত হইল, দর্শকের নয়নকে নৈরাশ্য নীরে ভাসাইয়া পদ্মটী সহসা অন্ধকার-নীরে ডুবিল।

বভ্রুবাহনের প্রতি উলূপী।

বিদারি ধরণী বক্ষ, উঠি আচম্বিতে।
চপলা চপল বেগে, কাঁপিতে কাঁপিতে॥
কহিলা বীরেন্দ্রসুতে সরোষ নয়নে।
এ কি বৎস! কোথা যাও বিষণ্ণ বদনে?
ক্ষত্রবংশ চূড়া তুমি, চন্দ্রবংশ মণি।
অসাহস দেখি তোমা ফাটিল অবনী।
পুরন্দর সুত সুত পুরন্দর সম।
কাপুরুষ হেরি হৃদি বিদরিছে মম॥
যে কথা কহিলা পার্থ ভৎর্সিয়া তোমারে।
শুনেছি সে সব আমি, ভাসি অশ্রুধারে॥
জুড়িয়া যুগল পাণি, করিলে বিনয়,
শ্রবণে দিলে না ঠাঁই, বীর ধনঞ্জয়॥
কেন দিবে? জাতিধর্ম্ম ভুলে কি ফাল্গুনী?
অজিত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, শৌর্য্য গুণে গুণী॥
জানি আমি ক্রোধে যবে ইন্দ্রের তনয়।
চরাচর স্বর্গ মর্ত্ত্য ভয়ে কম্প হয়॥
কাহার নিস্তার নাই, ক্ষত্রিয়ের রোষে।
বিনয়ে কি বাধ্য হয়, তোষে পরিতোষে?

পিতা বলি সম্বোধিলে জুড়ি দুই হাত।
রোষিয়া কুবাক্য বাণ করিল আঘাত॥
ধর্ম্ম বাক্য পালিয়াছে, ধর্ম্মের গৌরবে।
তুমি কেন ক্ষমা কর গর্ব্বিত কৌরবে?
দেখিলে শুনিলে কাণে, মানিল না স্তব।
সিংহনাদে পূরি বিশ্ব, করে ভীষ্ম রব॥
রণ যাচে ধনঞ্জয়, দেহ তারে রণ।
পণ কর পিতা পুত্রে জীবন মরণ॥
জয়ী হয়ে যদি তুমি ফিরে এস ঘরে।
কোলে লয়ে তোরে আমি চুম্বিব আদরে॥
রণ ভূমে হয় যদি শরীর পতন।
ভাবিব তখন আমি স্বার্থক জীবন॥
ভাবিবেন চিত্রাঙ্গদা, বীর পুত্রবতী।
বীর পুত্র প্রসূ আমি ভাবিবেন সতী॥
যাও বাছা! যুঝ গিয়া বিপুল বিক্রমে।
জননীর আশীর্ব্বাদ, শঙ্কা নাই যমে॥
যেমন করিল গর্ব্ব পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তেমনি হইবে খর্ব্ব হইলে সমর॥
পিতা তব মহারথী বিখ্যাত জগতে।
প্রতিযোগী নাহি তার শুনি ত্রিজগতে॥
শুনি বটে মানি আমি পার্থ মহাবীর।
ভীম রণে বর্ষে ভূমে বিপক্ষ রুধির॥

ক্ষমা, ধৈর্য্য, দয়া, ধর্ম্ম বীরতার সহ।
একত্রেতে বাস করে, রণে অহরহ॥
পাসরিছে পুত্রস্নেহ, যুদ্ধ অনুরোধে।
মাতিয়াছে বীর মদে কার সাধ্য রোধে॥
পারিবে না অনুনয়ে তুষিতে তাহায়।
যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, শোভে যা তোমায়॥
ছেড়না যজ্ঞের ঘোড়া, ছেড়না সংগ্রাম।
ধন্য হবে জন্মভূমে আজি তব নাম॥
ধন্য হবে চিত্রাঙ্গদা, ধন্য হব আমি;
অবশ্য তোমার রণে, হারিবেন স্বামী॥
ধন্য হবে নাগকুল, জনক আমার।
গন্ধর্ব্ব মানিবে ধন্য বিক্রমে তোমার॥
কি ভয় সমরে তব, অমর কুমার।
ত্রিপুর বিজয়ী পিতা, কি ভয় তোমার?
বীরেন্দ্র কেশরী সম বিক্রম অতুল।
মহাশূলী মহাদেব, নহে সমতুল॥
কেশরী পিতার তুমি কিশোর তনয়।
যুঝিতে কেশরী সনে, কিসে এত ভয়?
পর বর্ম্ম, লহ চর্ম্ম, ধর ভীষ্ম অসি।
দেখাও বীরের কার্য্য বীরক্ষেত্রে পশি॥
কেন সহ তিরস্কার পুরস্কার নাশি।
দেখাও পুত্রের কার্য্য প্রতাপ প্রকাশি॥

জানি আমি পূর্ব্বাপর সংযোগ বিয়োগ।
ফলিবে ফলের ভোগে স্বীয় কর্ম্ম ভোগ ॥
কাপুরুষ হয়োনাকো নিন্দা হবে লোকে।
ডরিওনা, ডরিওনা গলিওনা শোকে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়ী জনক তোমার।
সেই দাপে করিছে কি এত অহঙ্কার ?
করেছে কি শূর-কার্য্য কুরুক্ষেত্র রণে ?
সে শূরত্ব পাপাচার ভাবিছে কি মনে ?
পরম ধার্ম্মিক ভীষ্ম পিতামহ যার।
দয়া ধর্ম্মে রণ ধর্ম্মে শান্তির আধার ॥
শিখণ্ডী দেখায়ে তারে অস্ত্রহীন করি।
করাইল শরশয্যা ধর্ম্ম পরিহরি ॥
বিনা ধর্ম্মে ধর্ম্ম হানি করিল পাণ্ডব।
দাঁড়াইয়ে ধর্ম্মরাজ দেখিলেন সব ॥
কোন্ ধর্ম্মে ভীষ্ম বধ নাহি যায় জানা।
ক্ষত্র ধর্ম্মে সে অধর্ম্ম বীরশাস্ত্রে মানা ॥
প্রবঞ্চনা করি দ্রোণে বধিল দুর্ম্মতি।
দ্রোণ জয়ী কুরুক্ষেত্রে ধৃষ্টদ্যুম্ন রথী !
মিথ্যা কথা কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্রোণ বধে মহাধন্বী পার্থ মহাবীর।
অধর্ম্মে বিজয়ী রণ ধর্ম্ম অনুচর।
গুরুবধে করিয়াছে পাপ গুরুতর ॥

এই ধর্ম্মে হয় যদি ধার্ম্মিক অর্জ্জুন।
বৃথা তবে ক্ষত্র ধর্ম্ম, বৃথা ক্ষত্রিগুণ॥
গ্রাসিলা ধরণী যবে কর্ণ রথচক্র।
মায়াবী শ্রীহরি তথা প্রকাশি কুচক্র॥
আদেশিলা কিরীটিরে বধিতে তখন।
জোড় করে স্তুতি করে রাধার নন্দন॥
যাচিলা ক্ষমিতে ক্ষণ চক্র উদ্ধারিতে।
সহিল না শুনিল না অক্ষি পালটিতে॥
কুচক্রে বধিল তারে, নির্জ্জীবের প্রায়।
এই কি বীরের ধর্ম্ম ? বীরত্ব কোথায় ?
অন্যায় অধর্ম্মযুদ্ধে বধি তিন বীরে।
ফিরি গেলা সিংহনাদে, বিশ্রাম শিবিরে॥
বিঘোষিল রণজয় পাণ্ডুদল বলে।
ভাসিল কৌরব সেনা শোকনেত্র জলে॥
এমন অধর্ম্মে যারা জিনিয়াছে রণ।
পরম পাষণ্ড তারা অধম দুর্জ্জন॥
পিতা বলে ভয় কর, ভক্তি কর যারে।
কাপুরুষ বলে আমি ঘৃণা করি তারে॥
দয়া ধর্ম্ম স্নেহ ভক্তি ছাড় বাছাধন।
আক্রোশে যে যাচে রণ দেহ তারে রণ॥
শূরত্ব প্রকাশ কর সম্মুখ সংগ্রামে।
রণশায়ী ক্ষত্রিপুত্র পশে স্বর্গধামে॥

পিতা ভ্রাতা উপরোধে নাহি অবসর।
প্রকাশিয়ে ভুজবীর্য্য লক্ষ্য কর শর॥
ওই দেখ, কপিধ্বজে গর্জ্জিছে অর্জ্জুন।
ত্বরা কর ত্বরা কর পুর ধনুর্গুণ॥
অধর্ম্ম-বিজয়ী পিতা ভুলে যাও মায়া।
ততক্ষণ যুদ্ধ কর যতক্ষণ কায়া॥
জনক জনজ ভাব ভুল ক্ষণ কাল।
নিরখ নিরখ পিতা মূর্ত্তিমান কাল॥
যে তোমারে রণে ডাকে ক্ষমা কেন তারে।
বীরধর্ম্ম তারে বলি যারে যেবা মারে॥
তোমারে মারিতে যার মহা আকিঞ্চন।
হুঙ্কারিয়া করিতেছে গাণ্ডীব গর্জ্জন॥
টঙ্কারি কোদণ্ড ভীম ধাইছে সমরে।
কাঁপাইছে বসুন্ধরা দম্ভে পদ ভরে॥
তারে তুমি ক্ষমিবারে ইচ্ছা কর মনে।
বীরের স্বধর্ম্ম নয় হাসে শত্রুগণে॥
অগ্রসর হও পুত্র! ধর ধনুর্ব্বাণ।
যুদ্ধ কর যুদ্ধ কর যায় যাবে প্রাণ॥
চন্দ্রবংশ বংশধর ডরেনা সমরে।
সমুখে পাতিয়া ঢাল রণানন্দে মরে॥
ঢাল যদি ফিরে আসে ফেলিয়া তোমায়।
ক্ষত্রিকুলে অবলারা অপকীর্ত্তি গায়॥

ঢালের উপরে যদি দেখে তব শব।
প্রকাশে পুরন্ধ্রীবালা মহা মহোৎসব ॥
জান যদি, জান তবে ক্ষম কেন আর ?
অস্ত্রধারী হও, রিপু করহ সংহার ॥
জান তুমি ভৃগুরাম বীরকুলমণি।
তিন সপ্তে নিঃক্ষত্রিয়া করিলা অবনী ॥
তুমি আজি ভুজবীর্য্যে প্রকাশি প্রতাপ।
নিরর্জ্জুন করি ধরা ঘুচাও সন্তাপ ॥
ধররে ভুজগ শিশু ধর ধর ফণা।
লুকায়ে নিহারি আমি তব বীরপণা ॥

রাস।

আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে অই।
ষোড়শী রূপসী যতেক গোপিনী,
অবলা সরলা কুলের কামিনী,
তাদের সহিতে রসিক রাজ,
খেলিছেন খেলা খাইয়ে লাজ,
অপরের পাপ, নিজের বেলায়,
আর্ কিছু নয় লীলা খেলা বই।

আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

কত কত রামা গাইছে গান,
কেহবা তাহাতে ধরিছে তান,
মোহিনীর গানে মোহিত করে,
শেতার বেতার মধুর স্বরে,
রাগভরে যত গোপের বালায়,
তালে তালে নাচে তাথৈ তাথই।
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই॥

ঘুনু ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্গুর বোলে,
রুনু ঝুনু রুনু নূপুর রোলে,
এ ওর হাতেতে ধরিয়া কশি,
গোল ভাবে যত গোপরূপসী,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচিয়ে যায়,
মথুরায় যারা বেচিত দই,
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

গোপিনীর মাঝে গোপ কুমার,
বামেতে কিশোরী দাঁড়ায়ে তাঁর,

আকাশেতে তারা দলের মাজে,
শশি বামে যথা রোহিনী সাজে,
দুজনে বেড়িয়ে গোপিনী যায়,
আহা মরি কিবা শোভা লো সই,
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

এলায়ে পড়েছে চিকণ কেশ,
নাহিক বুকেতে বসন লেস,
স্বেদ জলে গলে সিন্দুর অঞ্জন,
সমল করিছে বিমল বদন,
দৃক্‌পাত তবু নাহিক তায়,
মাতিয়ে নাচিছে কোরে হৈ হই,
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

নয়নের কোনে হেরি রাধায়,
যতই মুচ্‌কে হাসে শাম রায়,
ততই নূতন নূতন বিলাশ,
বিলাসিনী গণে করে বিকাশ,

দেখিয়ে মনেতে হেন সাধ যায়,
মোরাও আমোদে আমোদিনী হৈ,
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

মাঝে মাঝে ঐ মদন মোহন,
মোহন বাঁশীতে মিশায়ে বদন,
সুমধুর স্বরে করিছে গান,
শুনিয়ে কার্না যুড়ায় প্রাণ,
হরি ভাবে যদি ভাবিস্ তায়,
তবে সবে আমি বলি পৈ পই,
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

কিশোর নাচিছে কিশোরী নাচিছে,
গোপিনীরা কুল ভয় না বাচিছে,
হরষে সরস সকলের মন,
কেন বা বিরসে মোরা কয়্ জন,
কিশের সরম ভয় বা কায়,
মেয়ে বটি তবু চোর ত নই,

আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

যায় যাগ্ মান হোগ্ বা মরণ,
হেরিব হরির কমল চরণ,
মিশিব যতেক বামার দলে,
হাসিব, নাশিব মনের মলে,
হরি পেলে, কুলে কিবা এসে যায়,
কারে কিবা ডর মাভৈ মাভই,
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

বনফুল মালা বনমালি গলে,
মধুকরগণ আসি দলে দলে,
গুণ গুণ রবে বসিছে তায়,
হাসিমুখে শশি মুখী তাড়ায়,
এশোভায় লোভায়েছে আমায়,
আমিত ঘরেতে আর না রই,
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

মনে করি হরি চাবনা আর,
হেরিয়ে আপনি নহি আমার,
তোরাও যদিলো থাকিস্ গুমরে,
ফুরাইলে সবে মরিবি গুমরে,
এখন হারাবি অবহেলায়,
তখন বলিবি কই গো কই,
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

কাল বলি যারে করিছ হেলা,
ওই কাল ভব নদীর ভেলা,
কাল পেলে কালে থাকেনা ভয়,
কালর কাছেতে কাল সভয়,
কত শত লোকে কালর কৃপায়,
হয়েছে জগতে ত্রিলোক জই,
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পসেছে ওই।

চল চল সখি সকলে মেলি,
সখি ভাবে সবে করিগে কেলি,

শামের পরশে অশেষ সুখ,
পাইবি, যাইবে জনমদুখ,
ঐ রাঙ্গা পদ পাবার আশায়,
ভুলিয়াছে কুল রাধা রসমই,
আয় আয় সবে দেখিবি আয়,
রাসেতে রসিয়া পশেছে ওই।

পদার্থ বিজ্ঞান কি?

ইংরাজীতে যাহাকে ফিজিক্স বলে, তাহার প্রকৃত নাম প্রাকৃতিক দর্শন অথবা পদার্থ বিজ্ঞান। ইহার দ্বারা স্বভাবের কার্য্য বৈচিত্র্য এবং স্বাভাবিক যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। প্রকৃতির অলৌকিক ক্রিয়া, ক্রিয়ার নিদান, ফলাফল এবং প্রত্যেক পদার্থের গুণ, গতি, ও পরিবর্ত্তন প্রভৃতির জ্ঞান এই বিজ্ঞানের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। আমাদিগের দেশে যাঁহারা পদার্থ বিদ্যার আলোচনা করিয়া রাসায়নিক সূত্রে বিশেষ বিশেষ বস্তুর রূপবিভাগ করিতেন, তাঁহারা কতই যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা চিন্তা করিয়া কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। কি শৈল কানন, কি জলনিধিগর্ভ, কি গিরি শৃঙ্গ, কি পর্ব্বতদুহিতা প্রবাহিণী স্রোতস্বতী, কি ধাতুগর্ভ খনি কি গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডিত গগনতল,

যেখানে যে বস্তু যে ভাবে থাকে, তাহার গতিবিগতিই বা কি রূপ, বিজ্ঞানবিদেরা বিজ্ঞানদর্পণে তাহার সমুজ্জ্বল চিত্র দর্শন করিতে পান। কোন্ বস্তুর কি ক্রিয়া, কোন্ বস্তুর কি ধর্ম্ম, এবং কোন্ বস্তুর সহিত কোন্ বস্তুর কতদূর মিলন, তাহা নিরূপণ করিয়া কত অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য তাঁহারা সাধন করিতেছেন, দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অধুনা ইউরোপখণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা যেরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া করিতেছেন, তাহা দর্শন করিয়া আবিষ্কর্ত্তা-দিগকে অনেকে দেবতা মনে করেন। বাস্তবিক বিজ্ঞানশক্তি ঐশী শক্তিরই অনুগত। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিবার জন্য আপাতত আমরা দুটী অতুল পদার্থের নাম করিতেছি।—প্রথম, তড়িৎ,—(Electricity) এবং দ্বিতীয়, চুম্বক।—(Magnet) শেষোক্ত পদার্থটীর ধর্ম্ম নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল।

চুম্বক ধর্ম্ম।

রাসায়নিক পদার্থ বিজ্ঞানের এই তত্ত্বটী অতি উপাদেয়। কোন কোন লৌহময় অপরিষ্কৃত ধাতুর এই প্রকার গুণ আছে যে, উহারা লৌহ, নিকেল্ এবং কোবল্ট্ ধাতুকে আকর্ষণ করিতে পারে। এই লৌহময় ধাতু এক সময়ে লিডিয়া নামক প্রদেশের অন্তঃপাতী ম্যাগ্-নিসিয়া নামক নগরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। এই জন্য ঐ ধাতুর আকর্ষণ শক্তিকে ইংরাজী ভাষায় ম্যাগ্নাটিজম্ কহে। ম্যাগ-

নাটিজমের তড়িতের ন্যায় দুটী শক্তি আছে। আকর্ষণ শক্তি এবং প্রতিসারণ শক্তি। কিন্তু তড়িৎ যেমন সকল পদার্থে অবস্থিতি করে, ম্যাগ্‌নাটিজ্‌ম সেরূপ সকল পদার্থে অবস্থিতি করে না। কেবল কতক গুলি দ্রব্যে, বিশেষতঃ লৌহে এবং ইস্পাতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুইডেন্‌ দেশের খনি হইতে চুম্বক পাথর নামে যে এক প্রকার অপরিষ্কৃত লৌহ পাওয়া যায়, তাহাতেই চুম্বকের শক্তি প্রথমে প্রকাশ হয়, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, কেবল চুম্বক পাথরই লৌহকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম, কিন্তু এক্ষণে সাব্যস্ত হইয়াছে, চুম্বক পাথরে লৌহ বা ইস্পাত ঘর্ষণ করিলে ঐ দুই ধাতুও স্বাভাবিক চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়, ইহাকেই কৃত্রিম চুম্বক কহে।

যদি একটী কৃত্রিম চুম্বকের মধ্য স্থানে সূতা বাঁধিয়া উহাকে এই প্রকারে ঝুলাইয়া রাখা হয় যে, উহা সকল দিকে অনায়াসে ঘুরিতে পারে, তবে দেখিতে পাইবে, চুম্বকের এক প্রান্ত সর্ব্বদা উত্তর দিকে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণ দিকে থাকিবে। চুম্বককে ঝুলাইয়া রাখিলে উহা এই প্রকারে নিয়তই থাকিবে। আর অঙ্গুলীদ্বারা উহার উত্তর প্রান্ত দক্ষিণ দিকে বা দক্ষিণ প্রান্ত উত্তর দিকে ঘুরাইয়া দিয়া অঙ্গুলী অপসারিত করিলেই চুম্বক পুনর্ব্বার যথাস্থানে স্থাপিত হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বের মত উত্তর এবং দক্ষিণ দিক নির্দ্দেশ করিবে, চুম্বকের এই বিশেষ গুণকে কেন্দ্রাভিগমনশীলতা বলে। চম্বকের যে প্রান্ত উত্তর দিক দর্শায়, তাহাকে উত্তর কেন্দ্র, এবং যে প্রান্ত দক্ষিণ দিক দর্শায়, তাহাকে দক্ষিণ কেন্দ্র কহে। চুম্বক সর্ব্বদা ঠিক উত্তর দিক নির্দ্দেশ করে না। কোন কারণ বশত উহা পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়া থাকে। চুম্বক ধর্ম্ম বিশিষ্ট একটী লৌহ

শলাকা যখন উত্তর এবং দক্ষিণ দিক দর্শায়, তখন ঐ শলাকা ঠিক ভূসমান্তরালে থাকে না। উহার উত্তর প্রান্ত দক্ষিণ প্রান্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নামিয়া পড়ে। অর্থাৎ বোধ হয় যেন উহার উত্তর প্রান্ত দক্ষিণ প্রান্ত অপেক্ষা কিছু ভারী, কিন্তু বাস্তবিক উহাদের ভারের কোন বিভিন্নতা নাই, কেবল পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রের সহিত উক্ত শলাকার উত্তর প্রান্তের অধিক নৈকট্য প্রযুক্ত উহার উত্তর প্রান্ত কিঞ্চিৎ অবনত হয়।

যদি চুম্বক ধর্ম্মপ্রাপ্ত দুই লৌহ দণ্ড পরস্পর সমীপে আনীত হয়, তবে একটী দণ্ডের উত্তর প্রান্ত ও অপর দণ্ডের দক্ষিণ প্রান্ত পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এবং একটী দণ্ডের উত্তর প্রান্ত অন্য দণ্ডের উত্তর প্রান্তকে ও একটী দণ্ডের দক্ষিণ প্রান্ত অপর দণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তকে প্রতিসারিত করে। চুম্বকধর্ম্মের এই গুণ থাকাতে উহা তড়িতের সহিত ঐক্য হয়। চুম্বক-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত লৌহদণ্ডের কেবল দুই প্রান্তভাগেই কি আকর্ষণ শক্তি ও কেন্দ্রাভিগমনশীলতা আছে?—আপাততঃ ইহাই প্রথমে বোধ হয়, কারণ ঐ দণ্ডের মধ্যস্থান অন্য একটী চুম্বককে আকর্ষণ বা প্রতিসারণ করিতে পারে না। কেবল দুই প্রান্তভাগেই আকর্ষণ বা প্রতিসারণ শক্তি প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবিক আকর্ষণ শক্তি এই প্রকারে সীমাবদ্ধ নহে, ঐ দণ্ডের সমস্ত অংশেই আকর্ষণ শক্তি আছে, কেবল উভয় প্রান্তেই লক্ষিত হয়। এই বিষয়টী সপ্রমাণ করিতে হইলে ঐ চুম্বকধর্ম্মবিশিষ্ট লৌহ-দণ্ডকে দুই অংশে ভগ্ন কর, তাহাতে যে দুই নূতন প্রান্ত পাইবে, সেই দুই প্রান্তেও আকর্ষণ শক্তি ও কেন্দ্রাভিগমনশীলতা বিদ্যমান দেখিবে,—একটী প্রান্ত দক্ষিণ কেন্দ্রের ও অপর প্রান্ত উত্তর কেন্দ্রের গুণ প্রদর্শন করে।

আসঙ্গ-লিপ্সা।

সৃষ্টির প্রথম হইতেই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে কেহ কখন নির্জ্জন প্রদেশে ইচ্ছাপূর্ব্বক একাকী স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছেন বা করিতেছেন, ইহা আজ পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয় নাই। দলবদ্ধ হইয়া বাস করা আমাদিগের একটী স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। আর এই সুমহৎ রীতি যে, অতি মহৎ অভিপ্রায়ে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য না করিলে কখনই আমরা স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি না। এমন কি, সময়ে সময়ে আমরা অতি নীচ শ্রেণীস্থ অকৃতবিদ্য লোকের নিকট হইতেও বহুবিধ সাহায্য প্রাপ্ত হই। এরূপ সম্বন্ধ সত্ত্বেও যে আমাদিগের অনৈক্যভাব বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, ইহা অতি অমঙ্গলের লক্ষণ। দেখা যাইতেছে, আমাদিগের সমাজমধ্যে সকলেরই রুচি পৃথক্ পৃথক্! সেই রুচিভেদ-নিবন্ধনই সমাজ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অশুভকর অনৈক্যকে প্রবল করিয়া তুলিতেছে, সুতরাং হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতি ভীষণ ভীষণ বৃত্তি সকল ভীষণ আকার ধারণপূর্ব্বক সমাজগত সুখকে উন্মূলিত করিবার নিমিত্ত উদ্যত হই-

তেছে। অনৈক্যের দোষে কোন সম্প্রদায় কত শত কুক-র্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও স্বীয় সম্প্রদায়মধ্যে বিশেষ যশো-লাভ করিতেছেন, এবং অসদনুষ্ঠানের সংস্থাপক হইয়াও মহাগর্ব্ব প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু কোন কোন মহাত্মা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠানস্থলেও হাস্যাস্পদ ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তাঁহাদিগের অভিলষিত সদনুষ্ঠানকে কতশত লোকে অসদনুষ্ঠান বলিয়া কত প্রকার পরিহাস করিতেছেন। বস্তুত ঐক্যের অভাবে যে আমাদিগের সমাজের কত প্রকার দুর্দ্দশা, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রায় আট শত বৎসর অতীত হইল, মহা-রাজ বল্লালসেন এতদ্দেশে কৌলীন্যপ্রথা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে কিছু মন্দ অভিপ্রায়ে এই প্রথা সংস্থা-পিত করিয়াছিলেন, তাহা কোন মতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তিনি যখন কুলীনের সৃষ্টি করেন, তখন তাহার উপযুক্ত লক্ষণও সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা নবলক্ষণ শব্দে সকলেরই বিদিত। এক্ষণে সে আচার নাই, সে বিনয় নাই, সে বিদ্যা নাই, তাদৃশ প্রতিষ্ঠা নাই, সেরূপ নিষ্ঠা নাই, দান নাই, ধরিতে গেলে কিছুই নাই, কেবল নিরর্থক কুলীন নাম ও শূন্যগর্ভ কৌলীন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই কুলীনদিগের অভিমান, দম্ভ ও কলহ-প্রিয়তা এত দূর প্রবল যে, যত কিছু কদাচার-বিজ্ঞাপক শব্দ অভিধানে পাওয়া যায়, তাহাও ঐ মাননীয় শ্রেণীর নিত্য পালনীয় বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। এই

সকল নিদারুণ যন্ত্রণা অহরহ ভোগ করিয়া এক সম্প্রদায় অধুনা কৌলীন্যের প্রতিকূলে সসজ্জ হইয়াছেন। কৌলীন্য-রীতি এককালে দেশত্যাগিনী হয়, তাঁহাদিগের এটী ঐকান্তিক ইচ্ছা। কুলীনের সন্তানেরাও (যাঁহারা বিদ্যার চর্চ্চায় মার্জ্জিতবুদ্ধি ও সংস্কৃত মন হইয়াছেন, তাঁহারা) ঐ সম্প্রদায়ের অনন্তর্গত নহেন। এটীও অনৈক্যের উজ্জ্বল সাক্ষী। কৌলীন্যের উচ্ছেদ সাধনে যাঁহারা উদ্যোগী, তাঁহারা আমাদিগের সমাজের কল্যাণ কামনা করিতেছেন কি না, সে বিচার অদ্য করিবার অবসর অল্প। তবে কথা এই যে, কৌলীন্য উঠিয়া যায়, আমাদিগের সে ইচ্ছা নহে। আধুনিক কুলীন নামে পরিচিত পুরুষদিগের অবলম্বিত কুনীতিগুলি উঠিয়া যায়, এইটীই বাঞ্ছনীয়। কারণ পৃথিবীর চারি খণ্ডে যখন এক এক শ্রেণী সম্ভ্রান্ত লোক সম্ভ্রমের উপাধিতে কুলীন নামে বাচ্য, তখন আমাদিগের দেশ সে সম্ভ্রমে কিজন্য বঞ্চিত থাকিবে, তাহার কোনো বিশিষ্ট হেতু বিদ্যমান নাই। আগামী সংখ্যাতে আমরা বিশেষ করিয়া এই অংশের বিচার করিব। অদ্য যে শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে, তাহারই অনুসরণ করি।

সমাজ একটী বৃক্ষ,—সামাজিক লোকের তাহারা শাখা-পল্লব, ঐক্য সেই বৃক্ষের মূল। বড় দুঃখের কথা, আমাদিগের সমাজদ্রুমের মূল শিথিল! যে যে অবস্থায় সেই শিথিলতা জানা যায়, তাহা বাতাস নামে অভিহিত;—ঝড় নহে। উপরিভাগে যে কয়েকটী বাতাসের বিশেষ লক্ষণ দেখানো

গেল, তাহার এক একটী আঘাতেই শাখাপত্র সঞ্চালিত হয়, গাছটা কাঁপিতে থাকে! কেন কাঁপে, তাহা বলা হইয়াছে। ইহার উপর ঝড় আসিলে শীঘ্রই সমূলে পতন হইবার ভয়!——লক্ষণ দেখিয়া সে বিপদও বড় দূরবর্ত্তী বোধ হয় না। এখন জিজ্ঞাসা এই হইতেছে, চির-ঐক্য-বিরাজিত আর্য্যভূমিতে ঐক্যের এত অভাব হইল কেন?——কেন হইল, বিধাতাই বলিতে পারেন;—এ সকল তাঁহারই বিড়ম্বনা। লোকে বলে, নিয়ত একত্র বাস করিলেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে,—ঘনিষ্ঠতার পরম পূজ্য ফল ঐক্য। কেবল লোকে বলে এমন নয়, নিরপেক্ষ যুক্তিও এই মহার্থ বাক্যে সায় দেয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা সর্ব্বাপেক্ষা আসঙ্গলিপ্সার অধিক গৌরব করিয়াও মহামূল্য ঐক্যরত্ন হারাইতেছি!—বলিলে বোধ হয় গর্ব্ব হইবে না, পৃথিবীর সমস্ত জাতি অপেক্ষা হিন্দুরা একত্র বাস অধিকতর প্রিয়তম জ্ঞান করেন। বহু পরিবারে এক ভদ্রাসনে বাস, বহুজন পালন, বহুতর প্রতিবাসীর সহিত সমাজবন্ধন, এই সকল বিষয়ে আর্য্যজাতির তুল্য উদার গুণ অপর কোনো জাতিরই প্রায় দেখা যায় না। নিকট সম্পর্ক, দূর সম্পর্ক, অসম্পর্কীয়, যে কেহ হউক, আর্য্য পরিবারে আশ্রয়লাভে কেহই বঞ্চিত হয় না। এইরূপ একত্র বাস কেহ কেহ দূষণীয় বলেন, যাঁহারা স্ত্রী ভিন্ন অপরকে বড় একটা চিনেন না, তাঁহারা আর্য্যদিগকে অলস ও পরপ্রত্যাশী বলিয়া উপহাস করেন। ফলে যাহাই হউক, বহু গোষ্ঠি ও বহু প্রতিবাসীর

মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকা আমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভ্যাস। ইহার সম্মুখেও আমরা ঐক্যরত্ন বিসর্জ্জন দিতেছি, ইহা কি সামান্য পরিতাপ ও সামান্য বিড়ম্বনা ?

আসঙ্গলিপ্সা যতদূর থাকিতে হয়, তাহা আছে, বৃত্তির ন্যায় তাহার কার্য্যও এই কার্য্যক্ষেত্রে আশাধিক পরিমাণে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, সকলই আছে, কিন্তু তাহার যে মধুময় ফল, সেটী নাই। ঐক্য আমাদিগকে কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, এমন একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। আমরা অদৃষ্টভক্ত,—সকল বিষয়ই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করি। কন্দর্পকে লৌকিক শাস্ত্রে ও লিপিশাস্ত্রে অনঙ্গ বলে, সেই দৃষ্টান্তেই অদৃষ্টকে যথার্থ অদৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস হয়। এখন আর একটী প্রশ্ন, ঐক্য কি আমাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছে ?—সাক্ষীরা বলে, হাঁ, চিরদিনের জন্যই ;—কিন্তু আমরা বলি,—না,—চিরদিনের জন্য নয়। অবশ্য ভবিষ্য-জননী আমাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইতে পারেন। ভবিষ্যৎ বন্ধ্যা নহেন, তাঁহার গর্ভে পুনরায় অদৃষ্ট ঐক্যের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব। আর্য্যসমাজ হইতে একতা বল এত দূরে গিয়াছে যে, আমার সহোদর ভ্রাতাকে যদি একজন বিদেশী বিধর্ম্মী লোক পাদুকা প্রহার করে, আমি নিকটে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিব, নতুবা পলায়ন করিব ! আমার পার্শ্বের লোকেরা হাস্য করিবে, করতালি দিবে, প্রহারকারীকে একটী কথাও কহিবে না, বরং কেমন কৌশলে

প্রহার করিল,তাহারই প্রশংসা করিবে ! কলিকাতা হেয়ার স্কুল ও মেডিকেল্ কালেজের দাঙ্গা তাহার নূতন প্রমাণ। আর অন্য কল্পে আপনি এক জন অপরাধী যবনকে একটী রূঢ় কথা বলুন, বিংশতিজন ঐস্লাম আপনারে যার পর নাই অপমান করিবে। রাজধানীর বক্ষের উপর মুসলমান গাড়োয়ানাদিগের পঞ্চাহিক ধর্ম্মঘট গত মাসে তাহার উত্তম সাক্ষ্য দিয়াছে। উৎকলী লোকদিগেরও ঐক্য শ্লাঘনীয়। মানুষ অন্তরে থাকুন, পশুপক্ষীদিগের ঐক্যও অতি চমৎকার। বানবশাবককে ও একটী বায়সকে যাঁহারা নিহত করিয়াছেন, কি নিহত হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার প্রমাণ দিবেন। মহিষের ঐক্য জগদ্বিখ্যাত।— অন্যান্য পশুপক্ষীর জাতিমিলন অনেকেই অবগত আছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতার দুর্গচত্বরে (গড়ের মাঠে) কোন্ ব্যক্তি একটী হাড়গিলা পক্ষী মারিয়াছিল, এই শোকে নগরের সমস্ত হাড়গিলা তিন দিবস অনাহারে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের ছাদে সুবিচার প্রার্থনায় হত্যা দিয়াছিল ! প্রবাদ আছে,তদবধি কলিকাতা মধ্যে হাড়গিলা বধ নিষেধ করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর নগরমধ্যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন ! এই সকল দৃষ্টান্ত স্মরণ হইলে আপনা আপনি এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমরা কি তবে এখন পশুপক্ষী অপেক্ষাও অপকৃষ্ট ?—আগামী বারে এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিব।

কল্কিপুরাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার বচনানুসারে তাঁহার সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক কলির দোষে ধর্ম্মের যেরূপ হানি হইতেছিল, তাহা সমস্ত কহিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দুঃখিত দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া তোমাদিগের অভীপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিব। এই কথা বলিয়া দেবগণ পরিবৃত ব্রহ্মা গোলোক বিহারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করিলেন, এবং তাঁহার স্তব করিয়া দেবগণের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীকনয়ন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে কহিলেন, হে বিভো! আমি তোমার নিদেশানুসারে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতি নাম্নী কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। হে দেব! আমি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত মিলিত হইয়া কলিক্ষয় করিব, বান্ধব দেবগণ অংশরূপে অবতীর্ণ হইবেন। আর আমার এই কমলনয়না প্রিয়তমা লক্ষ্মী সিংহলদেশে নরপতি বৃহদ্রথের পত্নী কৌমুদীর গর্ভে পদ্মানাম ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিবেন। অংশাবতরণনিরত দেবগণ! তোমরা ভূমণ্ডলে গমন কর, আমি মেরু ও দেবাপি নামক রাজদ্বয়কে পৃথিবী-রাজ্যে স্থাপিত করিব।

হে বিভো! ক্রূর কলিকে বিনাশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সত্যযুগ ও পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়া আমি আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিব।

দেবগণ-পরিবৃত ভগবান কমলযোনি ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় নিকেতনে গমন করিলেন, এবং দেবগণও স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। হে বিপ্রর্ষে! এ দিকে জন্মগ্রহণোদ্যত পরাত্মা বিষ্ণুও নিজ মহিমা প্রভাবে শম্ভল গ্রামে প্রবেশ করিলেন। যাঁহার শ্রীপাদপঙ্কজ গ্রহ নক্ষত্র ও রাশিগণ নিয়ত সেবা করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুময় গর্ভ বিষ্ণুযশা সুমতিতে সংস্থাপিত করিলেন।

জগৎপতি বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলে সরিৎ, সমুদ্র, গিরি, স্থাণু, জঙ্গম প্রভৃতি লোক সকল, ঋষি ও দেবগণ হর্ষান্বিত হইলেন, ফলত তৎকালে সকল প্রাণীগণেরই বিবিধ প্রকার আনন্দ জন্মিল। পিতৃগণ পরমাহ্লাদে নৃত্য ও দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া যশোগান করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ বাদ্য ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ভগবান্ মাধব বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা মাতা হৃষ্ট মানসে পুত্রকে অবলোকন করিলেন। মহাষষ্ঠী ধাত্রীমাতার কার্য্য সমাধান করিলেন, অম্বিকা দেবী নাভিচ্ছেদন করিলেন, ভগবতী ভাগীরথী উদক দ্বারা ক্লেদ মোচন করিতে লাগিলেন, এবং সাবিত্রী দেবী গৃহমার্জ্জনে উদ্যত হইলেন। সেই অনন্ত বিষ্ণুকে ভগবতী বসুমতী সুধাসম দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার জন্মদিনে মাতৃকাগণ মাঙ্গল্যবচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

তখন কমলযোনি ভগবান বিষ্ণুর জন্ম অবধারণ পূর্ব্বক আশুগামী শিষ্য অনিলকে কহিলেন, তুমি সূতিকাগারে গমন করিয়া ভগবান নারায়ণকে প্রবোধিত কর, এবং বল যে, হে নাথ! আপনার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেবগণেরও সুদুর্লভ, অতএব আপনি ঈদৃশ রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনুষ্যের ন্যায় রূপধারণ করুন্! পিতামহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুশীতল সুরভি পবন তাঁহার বচনানুসারে

ত্বরায় তথায় গমনপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। পুণ্ডরীকনয়ন ভগবান বিষ্ণু সেই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ হইলেন। তাঁহার মাতাপিতা তদ্দর্শনে মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর মায়াপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ আবার ভ্রম-সংস্কারের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। তৎকালে জীবগণ পাপ তাপ বিহীন হইয়া শম্ভল গ্রামে বহুবিধ মঙ্গলাচরণ ও উৎসবে নিমগ্ন হইল। সুমতি জগৎপতি জয়শীল বিষ্ণুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া সফলমনোরথ হইলেন, এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া এক শত গো প্রদান করিলেন। কল্যাণবর্দ্ধনোৎসুক বিষ্ণুযশা বিশুদ্ধান্তঃকরণে সাম, ঋক্, ও যজুর্ব্বেদী বিপ্রশ্রেষ্ঠগণের সহিত হরির নামকরণে নিযুক্ত হইলেন। সেই সময়ে রাম, কৃপ, ব্যাস, দ্রৌণী প্রভৃতি মুনিগণ ও অপরাপর লোক সকল বালকভাবাপন্ন হরিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। দ্বিজবর বিষ্ণুযশা সূর্য্যসন্নিভ রামাদি মুনিচতুষ্টয়কে সমাগত অবলোকন করিয়া পরম পুলকিতমনে তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। মনোহর আসনে সুখাসীন মুনীশ্বরগণ যথোপচারে পূজিত হইয়া অঙ্কগত হরিকে দর্শন করিলেন, এবং সেই নররূপধারী বালক বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, পাপ কলিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই বলিয়া তাঁহারা ভগবানের কল্কি নামে নামকরণ করিয়া সংস্কার সমাপনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে যথাস্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর ভগবান কংসারি সুমতিকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় অল্পকালমধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বীর্য্যবান্ কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্রক, কল্কির জ্যেষ্ঠত্রয় পিতামাতার

অত্যন্ত প্রিয় ও গুরুবিপ্রগণের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মতৎপর সাধুগণ ভগবান্ কল্কির অংশে পূর্ব্বেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গার্গ্য, ভর্গ্য, ও বিশালাদি জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলেন। বিশালযূপ নরপতিকর্ত্তৃক পরিপালিত সন্তাপ-শূন্য ব্রাহ্মণগণ ভগবান কল্কিকে অবলোকন করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। বিষ্ণুযশা সর্ব্বগুণাকর ধীর পঠনাদৃত কমললোচন পুত্র কল্কিকে কহিলেন, তাত! অগ্রে তোমারে অনুত্তম যজ্ঞসূত্রসম্পন্ন ব্রহ্মসংস্কার ও সাবিত্রী পাঠ করাইব, পরে তুমি বেদ পাঠ করিবে।

কল্কি কহিলেন, পিতঃ! বেদ কি, সাবিত্রীই বা কি, এবং কি প্রকার সূত্রে সংস্কৃত হইয়া লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত হয়, সেই যথার্থ তত্ত্ব আমাকে বলুন্।

পিতা কহিলেন, বৎস! ভগবান্ হরির বাক্যই বেদ, এবং সাবিত্রী সেই বেদের মাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে। আর ত্রিরাবৃত্ত ত্রিগুণ সূত্রদ্বারাই ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ-গণ দশ যজ্ঞ সংস্কৃত ও ব্রহ্মবাদী, সেই ব্রাহ্মণগণেই ত্রিলোকপোষক বেদ সংস্থাপিত আছে। ভক্তগণ বেদতন্ত্র বিধানানুসারে যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দানাদি, তপ, স্বাধ্যায় ও সংযমদ্বারা ভক্তিসহকারে হরিকে প্রীত করিয়া থাকে। সেই জন্য শুভ দিনে ব্রাহ্মণ ও বান্ধব-গণের সহিত উপনয়ন সংস্কার দ্বারা তোমাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

পুত্র কহিলেন, পিতঃ! ব্রাহ্মণেতে যে দশ সংস্কার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই দশ সংস্কার কি? এবং কি কারণেই বা ব্রাহ্মণগণ বিধানানুসারে বিষ্ণুরে পূজা করিয়া থাকে?

পিতা কহিলেন, বৎস ! ব্রাহ্মণ হইতে ব্রহ্মতেজসমুৎপন্ন, গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত, সন্ধ্যাত্রয়সম্পন্ন, সাবিত্রী-পূজা ও জপপরায়ণ, তপস্বী, সত্যবাদী, ধীর, ধর্ম্মবৎসল, সদানন্দময় ব্রাহ্মণ ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া এই সংসারকে পরিত্রাণ করেন।

পুত্র কহিলেন, তাত ! যে দ্বিজ সমস্ত জগৎকে রক্ষা করিতেছেন এবং ভগবান্ হরিকে প্রীত করিয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন ?

পিতা কহিলেন, হে পুত্র! সেই সকল ধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ দ্বিজপাতন, ধর্ম্মঘাতক, বলবান্ কলি কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া বর্ষান্তরে গমন করিয়াছেন। অল্পতপা যে সকল ব্রাহ্মণ এই কলিযুগে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা ক্রিয়াবিহীন, অধর্ম্মনিরত ও শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া কালযাপন করিতেছেন। এই কলিযুগে পাপাচারী, দুরাচার, তেজোহীন, শূদ্রসেবক ব্রাহ্মণগণ আর আপনাকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে না।

সাধুনাথ ভগবান কল্কি কলিকুল বিনাশের অভিলাষেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পিতার উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং ব্রাহ্মণ ও বান্ধবগণকর্ত্তৃক উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

লাইকরগস্।

গত মাসে আমরা এই সুপ্রসিদ্ধ রাজব্যবহারিকের একটী গুণের কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্পার্টার রাজা ছিলেন, রাজার সন্তান হয় নাই, তিনি নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে তন্ত্রবাদীরা নৃপসোদর লাইকরগস্‌কেই রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। সেই সময় বিধবা রাজ্ঞী সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিলেন, আমি গর্ভবতী আছি, আমার গর্ভে যে সন্তান হইবে, পুত্রই হউক, কি কন্যাই হউক, এ সিংহাসন তাহারই অধিকার; লাইকরগস্ কেহই নহে। অপর লোককে এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু নির্জ্জনে লাইকরগস্‌কে ডাকিয়া কহিলেন; আমি গর্ভ ধারণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তোমার প্রতি আমি অতিশয় অনুরাগিণী, তুমি আমারে বিবাহ কর, এ গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহারে আমি তৎক্ষণাৎ নিধন করিব, তুমি নিষ্কণ্টক রাজ্যেশ্বর হইবে, আমি পট্টমহিষী হইব। লাইকরগস্ বিস্ময়ের সহিত, ঘৃণার সহিত, লজ্জার সহিত এই লোমহর্ষণ বীভৎস অঙ্গীকার শ্রবণ করিলেন, কিন্তু মনে মনে কি থাকিল, তাহা রাণীকে জানাইলেন না, হত গজ বাক্যের ন্যায় সেই বাক্য স্বীকার করিয়া রাখিলেন। সময়ে বিধবা রাণী একটী পুত্র প্রসব করিলেন, পুত্রের নাম ক্যারাইলেয়স্। ইহার অর্থ প্রজানন্দ। পাপমতি ধূর্ত্তা রাণীর দুরাশা নিরাশ করিয়া সদাশয় লাইকরগস্ সেই শিশুকেই স্পার্টার রাজা করিলেন, আপনি কেবল কার্য্যনির্ব্বাহক রক্ষকমাত্র থাকিলেন। এই সূত্র হইতেই ষড়্‌যন্ত্রের ব্যপদেশ, এই সূত্র হইতেই লাইকরগসের ঐচ্ছিক নির্ব্বাসন! সামান্য নিঃস্বার্থপরতা

এমন উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারে না। যাহার প্রাপ্য রাজ্য, তাহাকে দিয়া, রাজরাণীর প্রণয় অঙ্গীকার তুচ্ছ করিয়া, রাজ্যের ভোগাশা অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রের দেশত্যাগী হওয়া অসাধারণ মহত্ত্ব সন্দেহ নাই। এই কারণেই আমরা বলি, সাধু লাইকরগস্; এই কারণেই পূর্ণশশী ইহাঁরে এত আদর করেন।

কিরীটদ্বীপ হইতে বিদায় হইয়া মহাত্মা লাইকরগস্ আসিয়া খণ্ডে আগমন করেন। এখানে তাঁহার একটী অপূর্ব্ব পদার্থ লাভ হয়। মহাকবি হোমরের বিরচিত সমস্ত কাব্য গ্রন্থ তিনি এই দেশে প্রাপ্ত হন্। ইতিহাস লেখকেরা এইরূপ সম্ভাবিত সিদ্ধান্ত করেন যে, আইওনীয় দ্বীপ হোমরের জন্মস্থান; পিলোপনিসস্ বিজয়ী ডোরিক জাতি এই দ্বীপে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারেন নাই। পুস্তক প্রচার হইলেও দুষ্প্রাপ্য অথবা তাচ্ছীল্য মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে সেই মহদুপকারে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। লাইকর্গস্ সর্ব্ব প্রথমে সেই অমূল্য রত্ন স্পার্টাকে দান করেন্। কথিত আছে, হোমরের বর্ণিত সামাজিক অবস্থা অবলম্বন করিয়াই লাইকর্গস্ প্রণীত ব্যবহারশাস্ত্রের প্রথম সৃষ্টি।

আসিয়া খণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া এই জগদ্বিখ্যাত ব্যবহারাজীব রাজকুমার প্রাচীন সভ্যতাবিরাজিত মিসরদেশে উপনীত হন। তথাকার আচারব্যবহার পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া জন্মভূমিতে প্রতিগমন করেন। ব্যবস্থাগুলি প্রণয়ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবেই রাখিয়াছিলেন, সহসা জনসমাজে প্রচার করিতে সাহস হন নাই। আমাদিগের দেশের লোকেরা যেমন সকল কর্ম্ম দেবদেবীর উপর নির্ভর করে; পুরাতন গ্রীসদেশের ব্যবহারও অবিকল এইরূপ ছিল। লাইকর্গস একদিন ডেল্ফী দেবীর অধিষ্ঠানমন্দিরে

প্রবেশ করিয়া ভক্তিভাবে মনোগত অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করেন। অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রত্যাদেশ করিলেন, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

এটী ঐতিহাসিক প্রবাদ। দৈববাণীতে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাই লাইকর্‌গসের সাহস। যাঁহাকে আমরা মহাদেব বলি, গ্রীকেরা বোধ হয় তাঁহাকে আপলো বলিতেন, তিনি ডোরিকদিগের কুলদেবতা। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে লাইকর্‌গসের ব্যবস্থাগুলি সৃজিত হয়। এখন আমরা যেরূপ লিপিবদ্ধ আইন দর্শন করিতেছি, গ্রীসে তখন তাহা ছিল না, সুতরাং ব্যবস্থাকর্ত্তা স্বয়ং শাসক ও শাসিতবর্গকে আপনার ব্যবস্থা সময়ে সময়ে শুনাইতেন। খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারকেরা যেমন বহু জনতা অথবা পর্ব্বস্থলে আপনাদিগের বিশ্বাসমত ধর্ম্মমত ঘোষণা করেন, প্রজাহিতৈষী লাইকর্‌গসকেও সে কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যখন তিনি দেখিলেন, সর্ব্ব সাধারণে তাঁহার ব্যবস্থামত কার্য্য করিতে অনুরাগী হইল, গুণাগুণ ফলাফল বুঝিতে পারিল, তদ্দ্বারা দেশের ও সমাজের হিত সাধিত হইতে লাগিল, তখন তিনি সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া এক প্রকার যতিব্রতাচারী তপস্বী হইলেন। যে সকল ভক্ষ্য ভক্ষণে দেহের পুষ্টি হয়, সুসাধ্য প্রযত্নে সে সকল পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিলেন, নির্জ্জন বাস আশ্রয় করিলেন, লোকালয়ে গতিবিধি রহিত করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে শরীর অজরায় জরাগ্রস্ত এবং অযত্নে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া আসিল। এইরূপ আত্ম সংযম যোগে তাঁহার আত্মা অল্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ করিয়া গেল! পাশ্চাত্য ইতিহাসে এই একটী মাত্র ইচ্ছামৃত্যু। রামায়ণ মহাভারতে ইচ্ছামৃত্যুর নিদর্শন পাঠ করিয়া খৃষ্টভক্ত ইউরোপ এখন হাস্য করেন, কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে যাঁহারা লাইকর্‌গসের

নিষ্কলঙ্ক জীবনী অভিনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষীয় কবিগণকে উপহাস করিতে অবশ্যই লজ্জিত হন। স্থানাভাব এবারে আমাদিগকে অধিক আড়ম্বর প্রদর্শনে নিষেধ করিতেছে। সুবিখ্যাত সোলন যখন পূর্ণশশীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবেন, কালান্তক কৃতান্তকিঙ্কর ড্রেকো যখন বালিকা পূর্ণশশীরে আলোহিত নয়নে দর্শন করিবেন, সেই সময় আমরা ত্রিগুণাত্মক, ত্রিদেবাত্মক, ত্রিকালাত্মক বিশ্বকর্ত্তার প্রসাদে এই তিনটী একত্র করিয়া তুলনা করিব।

অশ্লীলতা কি?

আমরা শুনিয়াছি, এই কলিকাতা নগরে একটী পাপনিবারিণী সভা হইয়াছে। শুনিয়া অতি আহ্লাদ জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সভার সভ্য মহাশয়েরা কি কি পাপ নিবারণ করিবেন, সেটী বিশেষ করিয়া শুনা হয় নাই। কলিকাতা সহর একটী মহামহিম রঙ্গস্থল বিশেষ;—অনেকে ইহাকে নবরঙ্গক্ষেত্র বলেন! পাপ পুণ্য উভয়ই এখানে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিরাজিত। সাধারণ কথায় এই রাজ-ধানীর অপর নাম আজব সহর। পাপনিবারিণী সভা হইয়াছে, ইংরাজটোলায় অধিবেশন হইতেছে, বড় বড় ইংরাজ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সেই সভার সভ্য হইয়াছেন, কি কি পাপ তাঁহারা নষ্ট করিতে চান, জনরবের সহস্র রসনা তাহা সহস্র প্রকার করিয়া একবার ব্যাখ্যা করিয়া দিল।—কেহ কেহ কহিল, দুর্ভিক্ষ একটী পাপ, দেশের দরিদ্র ভ্রাতারা দুঃখে কষ্ট পাইবে, পাপ-নিবা-রিণী সভা হয় ত সেই পাপ-রাক্ষসকে দূর করিবেন, সভ্যেরা চির-জীবী হউন! কেহ কেহ কহিল, দস্যু, তস্কর, ব্যাভিচারী, লম্পট,

মদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী, জালকারী, বিশ্বাসঘাতক, হত্যাকারী, এবং প্রবঞ্চক প্রভৃতি পাতকী ও মহাপাতকীদিগকে সভা হয় ত দমন করিবেন, সভা চিরজীবিনী হউন! কেহ কেহ কহিল, তারকেশ্বরের মহন্তের ন্যায় ভ্রষ্টাচারী মঠধারীরা গৃহস্থের জাতি কুল নষ্ট করিতেছে, সভা হয় ত সেই মহাপাপ দূর করিয়া আমাদিগের তীর্থধামগুলিকে নিষ্কলঙ্ক করিবেন! সভার মঙ্গল হউক! অন্য পক্ষে অন্য অন্য লোকের অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত। বাস্তবিক এই প্রসঙ্গে সহস্র রসনাবতী জনশ্রুতি হিন্দুস্থানের রাজধানীতে লক্ষ রসনাবতী!

অবশেষে আমরা শুনিলাম, লোকে যাহা যাহা কহিতেছে, তাহা কিছুই নহে, সভা আমাদিগের জননী মাতৃ ভাষার গর্ব্ভ হইতে অশ্লীলতারূপ পাপ সন্ততিকে আর প্রসূত হইতে দিবেন না। এটীও অতি উত্তম সঙ্কল্প। কিন্তু কথা হইতেছে, অশ্লীলতা কি?—শব্দ না বস্তু?—যে বস্তু দেখিলে বা যে শব্দ শুনিলে আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়েরই ঘৃণা জন্মে,অথচ লোকের নিকট ব্যক্ত করিয়া বলা যায় না, অভিধানে তাহার নাম অশ্লীল। ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের সৃষ্টি হইয়া অবধি ব্রিটিস দণ্ডবিধির প্রসাদে সাধারণ মুদ্রাযন্ত্রে ও সাধারণ গ্রন্থাবাসে আমরা তাহার বিরল প্রচার দর্শন করিতেছি। অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে, সভা তাহা দূর করুন! নতুবা নূতন চেষ্টা হাস্যকর। মাঠে গরু চরে, তাহার বস্ত্র নাই, ইহা কি অশ্লীল?—যদি হয়, সভা তবে গরুকে অথবা যাহার গরু, তাহাকে ধরিয়া পুলিসে দিবেন? বেওয়ারিস উলঙ্গ কুকুর সরকারী রাস্তায় ছুটিয়া বেড়ায়, অশ্লীল বলিয়া সভা তাহাদিগকে ধরিয়া পুলিসে দিতে পারিবেন কিনা? বারান্তরে আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিব, অশ্লীলতা কি?

মদালসা।

তখন সেই পর্য্যঙ্ক-নিষণ্ণা বালাও রাজকুমারকে সহসা ভবন-মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্ময়রসের বশীভূত হইলেন। তিনি একবার মাত্র নৃপনন্দনের পরম রমণীয় মুর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন। তাঁহার নয়নযুগল ও মন পুনর্ব্বার সেই মনোরম-রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র ও উৎসুক হইতে লাগিল, কিন্তু লজ্জা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উহাদিগকে পরাভূত করিল। তাঁহার নয়নাবরণ কুলবতী-সুলভ লজ্জার ভারে এরূপ আক্রান্ত হইয়াছিল যে, তিনি তাহা সঞ্চালিত করিয়া পুনর্ব্বার নৃপ-কুমারের সুকুমার রূপলাবণ্য দর্শনদ্বারা তৃষাতুর নেত্রযুগলকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না। প্রথম দর্শনে রাজকুমারের যে আশ্চর্য্য দর্শন তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়াছিল, তিনি মনে মনে তাহারই পর্য্যালোচনা ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজকুমারের যেরূপ রূপ, তাহা দেখিলে কে না তাহার পক্ষপাতী হয়? তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপ পরম সুন্দর। ললাটদেশ সুপ্রশস্ত ও নেত্রদ্বয় আকর্ণবিস্তৃত ও উজ্জ্বল; দেখিলেই তাঁহাকে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া দর্শকের প্রীতি জন্মে। নাসিকা সুশ্রীও সরল। অত্যন্ত উন্নতও নয়, অধিক নিম্নও নয়। তাহার নিম্নদেশে ও আলো-হিত সুচারু অধরোষ্ঠের উপরিভাগে নবীন সুক্ষ্ম অসিত বর্ণ সুন্দর গোঁফ অধিক শোভা বিস্তার করিতেছে। উরস্থল বিশাল, স্কন্ধদেশ উন্নত, বাহুযুগল সুপ্রশস্ত ও কটিদেশ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ। ঐ সকল স্থান রাজকুমারের বীরভাব সুস্পষ্ট প্রকটিত করিতেছে। সামান্যত কহিতে হইলে এইমাত্র বলিতে হয়, তাঁহার গঠন ও অঙ্গসৌষ্ঠব

যার পর নাই মনোহর। সেই মূর্ত্তিতে তেজস্বিতা ও মাধুর্য্য এই দুই গুণই নিয়ত বিরাজিত। সারল্য যদি একটী স্নেহময় দ্রব্য হয়, তবে তাহা তাঁহার মুখমণ্ডলেই রহিয়াছে বলিলে হয়। একাকিনী তন্বী বালা রাজনন্দনের এইরূপ অনুপম রূপ দর্শনে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, নির্জ্জন ভবনমধ্যে এই যে দিব্য মূর্ত্তি মনোহর পুরুষ সহসা উপস্থিত হইলেন, ইনি কে? ইনি কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি উরগ, কি বিদ্যাধর, অথবা কোন মহা পুণ্যাত্মা নর! কিম্বা ইনি স্বয়ং পার্ব্বতীকুমার অথবা রতিপতি! যাহাই হউক, ইনি আগন্তুক, আমার অধিষ্ঠানভূত ভবনে উপনীত হইয়াছেন, অভ্যর্থনা না করিলে বিরক্ত হইতে পারেন, কি করিয়াই বা লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক ইহাঁর সম্মান রক্ষা করি। সেই হরিণ-নয়না মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া অধোমুখে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চ আসন হইতে অবতরণ করিলেন। নৃপনন্দনের প্রথম দর্শনেই তিনি বিস্ময়, লজ্জা ও দৈন্যের বশতাপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে যেমন সেই আস্তরণহীন ভূমিতলে উপবিষ্ট হইলেন, অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

রাজকুমারও সেই দিব্যরূপসম্পন্ন রমণীরত্ন দর্শনে মদনবাণে আহত হইয়াছিলেন। এখন সহসা সেই কোমলাঙ্গীর এইরূপ অভাবিত ভাবান্তর দেখিয়া 'ভয় নাই, 'ভয় নাই, বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজকুমার সেই পুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে যে রমণীরে অবলোকন করিয়াছিলেন, তিনি কুমারের ঐ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রমণীয় করে তালবৃন্ত ধারণপূর্ব্বক ব্যাকুলভাবে মূর্চ্ছিতা কুমারীরে বীজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বিহ্বলা কৃশাঙ্গীর মূর্চ্ছাভঙ্গ

হইল। রাজকুমার মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, লজ্জাকুলা কুমারী সমাগত সখীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া অবনতমুখে গোপন-ভাবে অতি মৃদুস্বরে মোহ বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলেন। তখন সখী রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! যে কারণে আমার প্রিয়সখীর মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহা ইনি আমার নিকটে যথাযথ ব্যক্ত করিয়াছেন। লজ্জার অনুরোধে স্বয়ং আপনাকে কহিতে পারেন নাই। এখন আমি আপনার নিকট অবিকল বর্ণন, করিতেছি, শ্রবণ করুন্।

গন্ধর্ব্বলোকে বিশ্বাবসু নামে অতি প্রসিদ্ধ এক গন্ধর্ব্বরাজ বসতি করেন। এই বামনয়না তাঁহারই তনয়া, নাম মদালসা। একদা এই প্রিয়সখী নিজ পিতার রমণীয় উদ্যানে আমার সহিত বিহার করিতেছিলেন, বজ্রকেতু নামক দানবের পুত্র পাতালকেতু তমোময়ী মায়া বিস্তার পূর্ব্বক উদ্যানগতা একাকিনী গন্ধর্ব্বনন্দিনী মদালসাকে অপহরণ করিয়া এই পাতালপুরস্থিত ভবনে আনয়ন করিয়াছে। সেই দুরাচার দানবাধমের এই সংকল্প যে, আগামী ত্রয়োদশীর দিবসে ইঁহার পাণি পীড়ন করিবে। হে মহাত্মন্! আপনিই বিচার করিয়া দেখুন, সেই দুরাত্মা হিংসাকারী দানব কি এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীর পাণিগ্রহণে অধিকারী হইতে পারে? সুপক্ক সুমধুর রসাল ফল বায়সে ভক্ষণ করিলে, কাহার না শোক উপস্থিত হয়? অপকৃষ্ট নীচ জাতি কখন কি ঋষিপাঠ্য বেদশ্রুতি পাঠে অধিকারী হইতে পারে? এই কৃশাঙ্গী সেই দুষ্ট দুরাচার দৈত্যের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়াছিলেন। সুরভি সদয় হইয়া ইহাঁকে কহেন, অয়ি চারুশীলে! কেন তুমি আত্মহত্যা-পাপে সাহস করিতেছ? আমি তোমার মনোগত ভাব অবগত হইয়াছি।

আর তোমার প্রাণ পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই। তুমি দানবাধম পাতালকেতুর পরিগৃহীত হইবে না। মর্ত্য লোকে এক পরম সুন্দর বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই দুরাচার দৈত্যের প্রাণ বিনাশ করিয়া তোমাকে বিবাহ করিবেন। তখন এই প্রিয়সখী সুরভি দেবীর আশ্বাস বচনে বিশ্বস্ত হইয়া মরণ-ব্যবসায় হইতে নিরস্ত হইলেন, এবং তদবধি এই ভবনের অভ্যন্তরভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমি ইহাঁর সহচরী, আমার নাম কুণ্ডলা। বিন্ধ্যবান নামক গন্ধর্ব্ব আমার পিতা ও পুষ্করমালী আমার পরিণেতা। দুর্ভাগ্য বশত ভর্ত্তা শুম্ভনামক দানব কর্ত্তৃক নিহত হইলে, আমি পতিশোকে কাতর ও যতব্রত হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছিলাম। পরলোকে দিব্য গতি লাভ হয়, ইহাই আমার তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য। অনন্তর আমি এই প্রিয়সখীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলাম, সেই অপহর্ত্তা দানবাধম পাতালকেতু বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক গালব ঋষির আশ্রমে তপোবিঘ্ন করিতে গমন করিয়াছিল। তথায় এক বীরপুরুষ তাহাকে শূলাস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছেন। সেই পুরুষ যে কে, আর তাঁহার নাম ধামই বা কি, আমি তাহা কিছুই জানি না। হে পুরুষবর! ইনি আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ প্রিয়সখী, আমাদিগের শরীরমাত্র ভিন্ন, হৃদয় প্রেমবন্ধনে নিরন্তর নিবদ্ধ আছে, হৃদয়গত ভাব একই জানিবেন। আমি এই প্রিয়সখীর বিরহে অধীর হইয়া নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছি। পরিশেষে ত্বরান্বিত হইয়া এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক প্রাণাধিকা প্রিয়সখীর দর্শনলাভে চরিতার্থ হইয়াছি।

হে মহামতে! আপনি প্রিয়সখীর ও আমার বৃত্তান্ত শুনিলেন, এক্ষণে কি কারণে ভবদীয় দর্শনে সখী আমার মূর্চ্ছাপন্না হইলেন, তাহা বলিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আপনি সহসা প্রিয়

সখীর নয়নপথের অতিথি হইলে ভবদীয় দেবোপম অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন মনোরম মূর্ত্তি দর্শনে ও সুধাসোদর মধুর বাক্য শ্রবণে সখীর মন আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছে, এবং সেই দুষ্ট পাতালকেতু বাণবিদ্ধ হইয়াছে, ইহা ইনি আমার মুখে শ্রবণ করিয়াছেন। আর সুরভির বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে, তাহাও ইনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। এরূপ স্থলে প্রিয়সখী মদালসা যে আপনার করে প্রাণ মন যৌবন সমর্পণ পূর্ব্বক জন্মসাফল্য লাভ করিবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অনিষ্ট জনের সহিত চিরবাসজনিত যন্ত্রণা দুঃখ যে ইহাঁকে চিরদিন ভোগ করিতে হইবে, তাহা ইনি মনে মনে চিন্তা করিয়া যার পর নাই কাতর ভাবাপন্ন হইয়াছেন। যাবজ্জীবন আমারে যার পর নাই দুঃখ ভোগ করিয়া দুঃখিনীর ন্যায় অত্যন্ত অসুখে কালযাপন করিতে হইবে, এই ভাবিয়া কোমলহৃদয়া প্রিয়সখী মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন। এই ইহাঁর মোহের কারণ। এক্ষণে যদি আমার সখী মদালসা অনুরূপ অভীষ্ট বর লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত মনে তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি। নতুবা আমারও নির্ব্বৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই। মদালসা আমার জীবনস্বরূপ, আমি উহাকে দুঃখিনী বা কাতরা দেখিয়া কদাচ নিশ্চিন্তভাবে মনোগত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। হে মহাভাগ! আমাদিগের বৃত্তান্ত সকলই কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? কি নিমিত্ত এস্থানে সমাগত হইয়াছেন? এ স্থানে মনুষ্য জাতির আগমনের সম্ভাবনা নাই। আপনি দেব, কি দৈত্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর অথবা কি পন্নগ, তাহা যথাযথ বর্ণন করিয়া, আমাদিগের ঔৎসুক্য নিবারণ করুন।

তখন রাজপুত্র কুণ্ডলার সুমধুর বচনজাত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অয়ি নির্ম্মলমতে! তুমি আমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। আমি শত্রুজিৎ রাজার পুত্র, আমার নাম ঋতধ্বজ, পিতা আমারে মুনিগণের রক্ষা কার্য্যের নিমিত্ত গালবাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি সেই ধর্ম্মাচারী ঋষিদিগের রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। ইত্যবসরে এক শূকররূপধারী দৈত্য তথায় উপস্থিত হইল। তখন আমি অশ্বারোহণপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্রাকার শর তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। সে বাণবিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। আমি বেগে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। যাইতে যাইতে সহসা এক অন্ধতমসাবৃত গহ্বরমধ্যে অশ্বের সহিত পতিত হইলাম। আমি সেই বিবরাভ্যন্তরে নিবিড় অন্ধকারে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া একটা আলোকময় প্রদেশ প্রাপ্ত হইলাম। তৎপরে এই দিব্য ভবন আমার নয়নগোচর হইল। আমি কৌতুকাক্রান্ত হৃদয়ে এই ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া প্রাসাদে অধিরোহণ করিলে। আমিও অশ্বটীকে বন্ধন করিয়া পাদচারে তোমার অনুগামী হইলাম, এবং এই মনোহর বিচিত্র সুবর্ণময় গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমার প্রিয়সখীর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া নয়নদ্বয় চরিতার্থ করিলাম। অয়ি ভামিনি! আমি তোমাদিগের সমক্ষে এই সত্য পরিচয় দিলাম, আমাকে দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি পন্নগ বলিয়া শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা আমাদিগের পূজ্যপক্ষ। সত্য সত্যই কহিতেছি, আমি মর্ত্ত্যলোকবাসী মনুষ্য।

তখন মদালসা রাজকুমারের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, এবং লজ্জাজড়নয়নে কুণ্ডলার মুখপানে পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু লজ্জায় তাঁহার বচনস্ফুরণ হইল না। স্বেদজলে কোমল কলেবর অভিষিক্ত ও হৃদয় অলক্ষিতরূপে কম্পিত হইতে লাগিল।

কুণ্ডলা প্রিয়সখী মদালসার মনোগত ভাব অবগত হইয়া প্রফুল্লমনে পুনর্ব্বার রাজকুমারকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি যে স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, তাহাতে আমাদিগের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আপনার বচনজাত সুরভি বাক্যের অনুরূপই হইয়াছে। অতএব বুঝিলাম, এত দিনের পর বুঝি বিধাতা প্রিয়সখীর দুঃখের অবসান করিলেন। সমধিক কান্তি যেমন চন্দ্রমাকেই আশ্রয় করে, প্রভা যেমন দিনমণির অনুগমন করে, ভূতি যেমন পুণ্যশীল ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হয়, ধৃতি যেমন ধীরজনের অনুগামিনী হয় ও ক্ষান্তি যেমন উত্তম পুরুষের আশ্রয় লইয়া থাকে, সেইরূপ আমার প্রিয়সখী আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, ইহাঁর হৃদয় কদাচ অন্যত্র স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারিবে না। আর ভগবতী ধেনুকুল-প্রসূতি সুরভি দেবী যাহা কহিয়াছেন, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। এক্ষণে মদালসা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্যা ও সৌভাগ্যশালিনী হইলেন। অতএব হে বীর! বিধাতা অনুকূল হইয়া যে কার্য্যের সংঘটন করিয়া দিলেন, আপনি এখন তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আমার প্রাণাধিকা প্রিয়সখীর মনোরথ পূর্ণ করুন্।

রাজকুমার কুণ্ডলার বাক্য শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া কহিলেন, অয়ি সুধীরে! তুমি আমায় যে কথা কহিলে, তাহা শুনিয়া আমি আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মানিলাম। কিন্তু আমি স্বয়ং পরবান, তোমাদিগের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি, অতএব

যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে তোমরাই মনোযোগ কর। আমি এখন তোমার প্রিয়সখীর অধীন হইয়া পড়িয়াছি। কখনই তোমাদিগের আদেশের অন্যথা করিব না।

তাপসী কুণ্ডলা রাজকুমারের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কুল-গুরু তুম্বুরু ঋষিকে স্মরণ করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি মদালসার প্রতি সাতিশয় স্নেহের ও কুণ্ডলার গৌরবের অনুরোধে সমিৎকুশ গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সমীপে উপনীত হইলেন। কহিলেন, কুণ্ডলে! কি নিমিত্ত আমারে স্মরণ করিয়াছ, বল। আমি তোমা-দিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া আবার শীঘ্রই স্বকার্য্য সাধনার্থ প্রস্থান করিব। কুণ্ডলা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, আপনি সকলই জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণে বৈবাহিক বিধানের অনুষ্ঠান করিয়া মদালসাকে সৎপাত্রের হস্তগতা করুন্।

মন্ত্রবিৎ মহর্ষি কুণ্ডলার বাক্য শুনিয়া যথাবিধি বৈবাহিক হোম ও বিবাহকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মুখখানি সরিয়া গেল;—আর দেখা গেল না!—কুমার পূর্ব্বভাব ভুলিয়া গেলেন।—যোগীর মুখে বিজয়পুরের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণে যে পরিতাপ উদয় হইয়াছিল,—সে ভাব অন্তরে গেল,—অকস্মাৎ প্রেমভাবের উদয়!—ভাবিলেন, এ কি দেখিলাম!—স্বপ্ন?—না,—স্বপ্ন কেন?—স্পষ্ট দেখিলাম, রমণী-বদন!— অনাঘ্রাত সৌগন্ধযুক্ত সুস্নিগ্ধ পদ্মপুষ্প!—স্বপ্ন কেন?—যথার্থ রমণী-রত্ন।—সে কি?—তপস্বীর আশ্রমে রমণী?—সংসার-বাসনাবিরাগী সন্ন্যাসীর গিরিগুহায় যুবতী রমণী?—ইহাই বা কিরূপে সম্ভবে?—তবে কি কোনো দেবতা আমাব দুঃসময় দেখিয়া মায়া দেখাইয়া গেলেন?—না,—তাহাই বা হইবে কেন?—দর্শন মাত্রেই ত সে মহারত্ন হারাইলাম না।—চারি চক্ষে দেখা হইল,—তাহার চক্ষু আমার মনের অজ্ঞাতে আমার চক্ষের সহিত কথা কহিল, কথা কহিয়াই অমনি চলিয়া গেল! আমি নিশ্চয় প্রতারিত হইয়াছি!—এই ব্রহ্মচারী নিঃসন্দেহই মায়াবী! ইনি আমারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই এই রজনীতে এই প্রকার মহামায়া বিস্তার করিয়াছেন! ইহাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করি, উত্তর পাইব না, কোনো কথার প্রকৃত উত্তরই ইনি আমারে দেন না। আমি হতবুদ্ধি হইলাম! বামাবদন আমারে মায়ামগ্ন করিয়াই অদৃশ্য হইল!

কুমারকে বিমনস্ক দর্শন করিয়া ব্রহ্মচারী যেন কি ভাবিলেন;—ভাবিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, রাজকুমার! আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমার পিতার মিত্ররাজ্য বিজয়পুরের শোচনীয় পরিণাম তোমার হৃদয়কে নিদারুণ ব্যথা দিতেছে, অতীত দুঃখবৃত্তান্ত আলোচনা-কালে বর্ত্তমানের ন্যায় অনুভূত হইয়া, স্নেহকোমল হৃদয়কে এই প্রকার বিচঞ্চল করে, সেটী আমি জানি। এ প্রসঙ্গ ত্যাগ কর, শান্তি

রসাস্পদ আশ্রমের উপযুক্ত এ প্রসঙ্গ নয়, এ প্রসঙ্গ ত্যাগ কর ;—তুমিও কর, আমিও করি, ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে, সমস্ত দিবস পরিশ্রান্ত আছ, বিশ্রামের অবসর আগত, এই অবসরে আমার একটী প্রার্থনা।

রাজপুত্র চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রার্থনা ? অকিঞ্চনের নিকটে মহাপুরুষের প্রার্থনা ? আমার পক্ষে সেটী অনুগ্রহ,—অনুমতি করুন্।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, আমি যখন সংসারী ছিলাম, সেই সময় আমি একটী কন্যা পাই, তখন তোমার বয়স পাঁচ বৎসর, তোমার পিতা আমারে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন, সেই ভরসায় আমি তাঁহাকে বলি, আপনার পুত্রের সহিত এই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। তিনি প্রতিশ্রুত হন, তুমি সে প্রতিজ্ঞা জান না, কিন্তু আমি ভুলি নাই। সময় বিপর্য্যয়ে আমি সংসারত্যাগী হইয়াছি, কন্যাটী আমার সঙ্গেই আছে। তাহার জননী নাই, মহামায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া উদাসীন আশ্রমেও সেই কন্যাটী লইয়া আমি উদাসীন আশ্রমী। তুমি তাহার পাণিগ্রহণ কর।

রাজকুমারের মন চঞ্চল হইল। কিঞ্চিৎ অগ্রে যে জগৎমোহন বদন নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহা মনে পড়িল। বহু কষ্টে চিত্তবেগ সংযত করিয়া কহিলেন, নরদেব ! কেমন আজ্ঞা করিতেছেন ? আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ক্ষত্রিয়পূজ্য ব্রাহ্মণ। হীনবর্ণ হইয়া দ্বিজকন্যাকে কিরূপে পরিগ্রহ করিব ? ব্রাহ্মণের অবমাননা হইবে, বংশমর্য্যাদা সুপ্ত-সম্ভ্রম হইবে, আমারও অধর্ম্ম হইবে, চন্দ্রবংশেও কলঙ্করেখা পড়িবে।

সদাশিবের চক্ষু বিস্ফারিত হইল,—বিস্ফারিত নেত্রে ক্রোধোজ্জ্বল

লোহিত রেখা দৃষ্ট হইতে লাগিল, কহিলেন, চন্দ্রবংশে কলঙ্ক? বংশমর্য্যাদার হানি? রাজকুমার! কারে তুমি এ কথা বুঝাইতেছ? রাজপুত্রেরা যবনের শ্বশুর হইয়াছেন জান? ক্ষত্রিয় রাজারা ঐশ্বর্য্য-লোভে অন্ধ হইয়া যখন যবনে কন্যা ভগিনী সম্প্রদান করিতে অকুণ্ঠিত হইয়াছেন; তখন শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ স্বইচ্ছায় তোমারে কন্যা দান করিতে যত্নবান্, কি বলিয়া তুমি অগ্রাহ্য কর? মোগল সম্রাটেরা বিষধর রজঃপূতগণকে বিষহীন ভূমিলতার ন্যায় নিঃসার করিয়াছে। তুমি তাহা বোধ হয় বিশেষ অবগত নও, সেই জন্যই আমার বাগ্‌দান ও তোমার পিতার প্রতিশ্রুতির প্রতি অবহেলা করিতেছ। সেনাপতি মানসিংহ জাঁহাগীরের সভায় যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমার জানা নাই। তোমার পিতার সহিত জম্বুরাজধানীতে যখন আমার সাক্ষাৎ হইবে, তখন জানিবে, ক্ষত্রবংশে যবনবংশে আজকাল কত দূর নিকট সম্বন্ধ, আর তুমি কোন্ ব্রহ্মবংশে দার পরিগ্রহ করিয়া বংশ কলঙ্কিত করিলে, সেটীও জানিবে।

ব্রহ্মচারীর কৃত্রিম কোপ যুবরাজ বুঝিতে পারিলেন না। গুহা-বিবরের বিদ্যুৎপ্রতিম মুখখানি অন্তরে জাগিতেছিল। কতক শঙ্কায়, কতক অনুরাগে, বিপ্রকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন। সম্মত হইয়া কহিলেন, এক্ষণে নহে, আমি তীর্থযাত্রা করিতেছি। অনুচরেরা কে কোথায় গেল, কিছুই জানিলাম না। প্রাতঃকালেই আমারে তাহাদিগের অন্বেষণে যাত্রা করিতে হইবে, প্রত্যাগমন কালে এ পথে আসিব কি না, তাহারও স্থিরতা নাই। আশা কহিয়া দিতেছে, রামেশ্বর দর্শন করিয়া সাগরসঙ্গমে যাইব, তথা হইতে উড়িষ্যা ধামে মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিব, এ পথে আসা

হইবে না। কিছু দিন পাটনায় অবস্থিতির প্রয়োজন আছে। সেই সময় আমার অনুচরেরা আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইবে, আপনি তাহাদের সমভিব্যাহারে কন্যাকে পাঠাইয়া দিবেন। হয়, সেই স্থানে অথবা পিতৃরাজপাটে আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিব।

সদাশিব হাস্য করিয়া কহিলেন, যুবরাজ! তোমার অঙ্গীকারে আমি পরম আপ্যায়িত হইলাম।

নিশ্চিত উক্তির নিশ্চয়তা স্থিরতর হইবার অগ্রে দ্বিযাম রজনী স্বভাব-ঘটিকায় বিঘোষিত হইল। প্রতিশ্রুত প্রতিশ্রুতি নিশাগর্ভে শায়িত হইল। রজঃপুত রাজপুত্র কম্বলশয্যায় শয়ন করিয়া নিশা-যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে গত নিশার অঙ্গীকার দৃঢ় বদ্ধ করিয়া ঘোটকারোহণে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন, যখন যাত্রা করেন, তখন তপস্বীকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন। যে স্থান হইয়া আমি যাইতেছি, এটী কোন্ স্থান? সদাশিব উত্তর করিলেন, পরম পবিত্র ব্রহ্মর্ষি-পরিসেবিত নীলাদ্রি। এই পর্ব্বত সর্ব্ব সাধারণে নীলগিরি নামে প্রসিদ্ধ।

যুবরাজ ব্রহ্মচারীরে অভিবাদন করিয়া ঘোটকারোহণে যাত্রা করিলেন। সঙ্গী লোকেরা কে কোথায় আছে, কিছুই জানা নাই, অথচ তাহাদিগকে দেখিতে পাইব, এই প্রত্যাশায় অবিশ্রান্ত অশ্ব-চালন করিতে লাগিলেন। সুদূর বর্ত্মে অনুযাত্র লোকেদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঝড়বৃষ্টিতে যাহার পক্ষে যখন যে ঘটনা হইয়াছিল, বলিলেন, শুনিলেন। অনুযাত্রেরা যুবরাজকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া প্রফুল্লচিত্ত হইল। সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন, কি ঘটনা হইয়া-ছিল, সকলে শুনিল। তাহাদিগের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অবিচ্ছেদে

বর্ণন করিল। যুবরাজ একান্ত মনে সমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রবোধিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলে কামিনী।

"তুই বুঝি হবি মম, পিঞ্জরের পাখী
স্থলোচনা?——————"

এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। যুবরাজ পাটনায় উপনীত হইলেন। পাঠক মহাশয়! এই রাজপুত্রের বিশেষ পরিচয় জানিতে চান? সে পরিচয় আজ আমি আপনারে বলিব। ইনি কাশ্মীরপতি মহাবাহু আদিত্য সিংহের একমাত্র পুত্র। নাম শশীন্দ্র সিংহ। গড়ন নাতি দীর্ঘ; বর্ণ তপ্তকাঞ্চন সদৃশ;—হস্তপদ মোলায়েম; বক্ষস্থল বিশাল;—বিশাল অথচ স্থুল; বাহুযুগল পীবর;—গণ্ডস্থল পূরস্ত;—চক্ষু সুপ্রশস্ত, উজ্জ্বল; কেশ দীর্ঘ,—গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিত; ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; বয়স অনুমান দ্বাবিংশতি বৎসর।

শশীন্দ্র সিংহ পাটনায় আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। নীলগিরি মনে পড়িল;—গুহাবিবরের ক্ষণপ্রভ পদ্মটী মনে পড়িল। মনে মনে জাগিতেই ছিল, অনুরাগে নূতন হইয়া উদিত হইল।—তপস্বীর কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেটীও স্মরণ হইল। এত দিন সহচরবর্গের নিকটে এই গূঢ় কথা অপ্রকাশ রাখিয়াছিলেন, আজ এক জন বিশ্বাসভাজন বয়স্যের কাছে সেটী ভাঙ্গিলেন।—ভাঙ্গিলেন বটে, কিন্তু বিবর-সরসীর সেই অমল কমলটী তাঁহার মানস-

সরোবরের পদ্মিনী কি না, সে সংশয় দূর করিতে পারিলেন না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া গিরিবাসীর বাগ্‌দত্তা কন্যাকে আনয়ন করিতে লোক পাঠাইলেন। কহিয়া দিলেন, ব্রহ্মচারীকে আমার প্রণাম জানাইবে, অঙ্গীকার পালন করিব বলিবে, আর তিনি যে একটী কুমারী দিবেন, সঙ্গে করিয়া আনিবে। কোথায় আনিবে, সে কথাও বলিয়া দিই।—পাটনায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে না। কিছু দিন প্রয়াগ বাস বাসনা আছে; শীঘ্র যদি ফিরিতে পার, তথায় সাক্ষাৎ হইবে, বিলম্ব হইলে একেবারে রাজধানীতেই চলিয়া যাইও। আরও একটী কথা। আমার সহোদরার প্রিয় গায়িকা পত্রিকারে এখানে আমি আনাইব, আমি এখানে না থাকিলেও পত্রিকা থাকিবে। তোমরা আসিয়া পৌঁছিলে তারে এখানে দেখিতে পাইবে। তপস্বী-কন্যা তোমাদের সহিত কথা কহিবেন না, পত্রিকার সঙ্গে আলাপ করিবেন; আলাপ করিয়া সুখীও হইবেন। আমি বলিতে পারি, পত্রিকা তাঁর চিত্ত বিনোদন করিতে পারিবে।

অনুচরেরা তপস্বী-কন্যাকে আনিবার নিমিত্ত নীলগিরি অভিমুখে যাত্রা করিল। রাজকুমার পাটনা হইতে শিবির উঠাইলেন। কোথায় গেলেন, কোথায় যাবেন, কাহাকেও বলিয়া গেলেন না। কেবল এই একমাত্র ইঙ্গিত থাকিল, কিছুদিন প্রয়াগে থাকিবেন, সেখানে যদি সাক্ষাৎ না হয়, জম্বুরাজধানীতে মিলন হইবে। তাঁহার মনে কি ছিল, আমরা জানিতাম না, সুতরাং পাঠক মহাশয়কে জানাইতেও পারিলাম না। মহারাষ্ট্রপতি শিবজী যে দিন ফুলের ঝুড়ির উপর বসিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন, তাহার পরদিনে কুমার শশীন্দ্র সিংহ দিল্লীনগরে প্রবিষ্ট হন, শিবজীকে তিনি মান্য করিতেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রপতির কিঙ্করেরা সেই গুপ্ত বৃত্তান্ত যুবরাজকে জানাইল

না। শিবজী পলায়ন করিয়াছেন, আরঙ্গজীব তাহা জানিতেও পারেন নাই। তাঁহার পারিষদেরা একেবারে দুটী সংবাদ দিল। কাশ্মীরপতির পুত্র রাজধানীতে প্রবিষ্ট, আর মহারাষ্ট্রীয় শিবজী সহসা অনুদ্দিষ্ট। মোগল সম্রাট্ শশীন্দ্রকে উদাসমনে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু শিবজীর পলায়নে তাঁহার চিত্তের অস্থৈর্য্য গোপন থাকিল না। মনের প্রকৃতি যখন যে ভাবে থাকে, তখন যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই সেই ভাব বিজ্ঞাপন করে। বাদসাহ অস্থির চিত্তে শশীন্দ্র সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুশল? শিবজী কোথায়? রাজপুত্র বিস্ময়ান্বিত হইলেন। শিবজীকে তিনি নামে শুনিয়া ছিলেন, চক্ষে কখনো দেখেন নাই, সম্রাটের প্রশ্নে কি উত্তর দিবেন, নতমুখে অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আরঙ্গজীবের মহা ক্রোধ হইল। কহিলেন, তোমার পিতা যদি আমার মিত্র না হইতেন, তাহা হইলে তুমি এখনি জানিতে পারিতে, বাবরের বংশের সন্তানেরা এমন অবস্থায় আগন্তুকের প্রতি কিরূপ আচরণ করেন! তুমি আমার চিরশত্রু শিবজীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছ, বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড হওয়া ন্যায্য, কিন্তু মিত্রপুত্র বলিয়া ক্ষমা করিলাম। যদি ইচ্ছা হয়, অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান কর। দিল্লীতে থাকিবার উপযুক্ত পাত্র তুমি নও। রাজপুত্র করযোড়ে উত্তর করিলেন, জাঁহাপনা! এ অধীন কোন তত্ত্ব পরিজ্ঞাত নহে। শিবজী আমার পিতার মিত্র বটেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখি নাই। তিনিও আমারে চেনেন না। মহারাষ্ট্রের অধিরাজ সিংহের সহিত শত্রুতা করিতেছেন, তাহা আমি জানিও না। তিন বৎসর আমি দেশেও ছিলাম না। অজ্ঞাতে যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা করি।

যুবরাজের সমস্ত সানুনয় বাক্য বিফল হইল। আরঙ্গজীব

তাঁহাকে অবিলম্বে নগর বহিষ্করণের আজ্ঞা দিলেন। কাশ্মীর যদিও দিল্লীর অনধীন, তথাপি রাজপুত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া বাদসাহের হুকুম মান্য করিলেন। যেখানে তাঁহার যাইবার ইচ্ছা ছিল, সেইখানে চলিয়া গেলেন। কোথায় যাইবার ইচ্ছা, তাহা আমরা বলিব না।

ছয় মাস অতিক্রান্ত হইল। পাটনাতে একটী শিবির আছে। দুই চারি জন পার্শ্বচর ভিন্ন অপর কেহই তথায় নাই। একটী ম্লানমুখী কন্যা সেই শিবিরের অধিষ্ঠাত্রী। কেহ তাঁহার কথা শুনিতে পায় না। কে তিনি, পরিচয়ও জানিতে পারে না। লোক নিকটে আসিলে লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী থাকেন; হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বঙ্গীয় অবরোধবাসিনী কোনো পুরস্ত্রী। কিন্তু তাহা তিনি নন, পূর্ব্বের কথিত রাজকুমার শশীন্দ্রের নিয়োজিত সঙ্গীতজ্ঞ নায়িকা, সেই পত্রিকা। যদি গায়িকা, তবে অবগুণ্ঠন কেন?—কে জানে?—তাহার মনের ভাব কে বলিতে পারে? যদি রাজপুত্র পাটনায় থাকিতেন, জিজ্ঞাসা করিতাম, এখন সে উপায়ও নাই। আরঙ্গজীবের অপমানে তিনি যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহই জানে না। অবগুণ্ঠনবতী রমণী একাকিনীই, সেই শিবিরের রক্ষয়িত্রী কর্ত্রী। যখন তিনি কথা কন্, তখন কিঙ্কর কিঙ্করীরা আগন্তুক বিবেচনায় রাজকুমারের সময়োচিত আজ্ঞা প্রতিপালন করে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার একটীও লোক শিবিরে নাই। আমাদিগের পূর্ব্ব ইঙ্গিত অনুসারে পাঠক মহাশয় বুঝিবেন, এই অবগুণ্ঠনবতীর নাম পাত্রিকা।

আর এক মাস অতীত হইয়া গেল, অনুচরেরা ফিরিয়া আসিল না। পত্রিকা উদ্বিগ্নমনা হইলেন। এক জন কিঙ্করীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কত দিন? সে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, কি কত দিন দেবি! পত্রিকা কহিলেন, রাজপুত্র যা বলিয়াছিলেন, সে কত দিন?

কুরু-সভায় কৃষ্ণার অপমান দর্শনে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

কাল দ্যূতে পরাজিত পাণ্ডুকুলপতি
যুধিষ্ঠির ;—শকুনির পাপচক্র শশ ;—
নিষ্ঠুর দাম্ভিক ব্যাধ সুযোধন করে
বিদ্ধবপু ধর্ম্মরাজ বসি হেঁটমুখে
সভা মাঝে ; চারি ভাই ঘেরি চারি দিকে।
পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন দস্যু কৌরব অঙ্গার,
হাসি মুখে আদেশিলা পাপী দুঃশাসনে,
আনিতে দ্রুপদসুতা সভা মধ্যখানে
কেশে ধরি ! পাপাচার ব্যাঘ্ররূপী কুরু
দুঃশাসন, দ্রুতবেগে পশি অন্তঃপুরে—
আনিলা কৃষ্ণারে দুষ্ট, আকর্ষিয়া চুলে,
সহসা বিদ্যুৎবেগে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে !
আকুল কুন্তলা বালা এক বস্ত্র পরা—
রজস্বলা, নম্রমুখী, লজ্জা ক্রোধ বশে,
কহিলা করুণস্বরে সভারে সম্ভাষি
আপন বারতা যত। না দিলা উত্তর
কোনো রাজা, কোনো সভ্য, নীরবিলা সতী !
পাপমতি কুরুরাজ দেখাইলা উরু !
রুষি রোষে, তাপে, মানে, লজ্জায় পৌরুষে,

কহিলা বীরেন্দ্র ভীম, সম্বোধি সভারে—
সম্বোধিয়া ধর্ম্মরাজে কর্কশ বচনে।
শুন সবে মম বাক্য, শুন মম পণ,
শুন ভীষ্ম পিতামহ! শুন দ্রোণ গুরু—
তুমি ধৃতরাষ্ট্র শুন কুরুবংশ নাথ!
তুমি কর্ণ শুন, তুমি আচার্য্য কুমার
অশ্বত্থামা!—সভ্যগণ! যাঁহারা এখানে
বসিয়া হেরিলে সব, সকল শুনিলে!
করিল যা পাপ কুরু, যা কহিলা কাঁদি,
সনাথা পাণ্ডবপ্রিয়া অনাথা পাঞ্চালী।
না দিলে উত্তর কেহ, রহিলে নীরবে
স্তম্ভ সম; ভাবিলে না ধর্ম্ম পরিণাম;—
শুন কহি, এই বাহু শোধিবে এ ধার!
শুন তুমি ধর্ম্মরাজ! কটাক্ষে এখনো—
দেহ অনুমতি যদি, নিহারিবে সবে,
বিনাশি এ কুরুবংশ অক্ষি পালটিতে।
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি রাজা, মজালে সবায়,
মজালে বংশের মান, মজালে সংসার,
মজাইলে ধর্ম্ম হেতু কুলবতী কুল,
এই কি ধর্ম্মের তব ধর্ম্ম উপদেশ?
এই কি তোমার ধর্ম্ম পন্থা ধর্ম্মরাজ?
রজস্বলা পতিপ্রাণা পাণ্ডুকুল বধূ,
স্পর্শিল পাতকী নষ্ট, আকর্ষিয়া কেশে,

বিবস্ত্রা করিল তারে কুরুকুলাধম
দুঃশাসন, দুর্য্যোধন দেখাইল উরু ;
সহিলে এ সব তুমি বসিয়ে সভায়,
এই কি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, পাণ্ডুকুলপতি ?
ক্ষত্রি তুমি ? ধিক্ তব এমন দুর্ম্মতি ?
কার পত্নী দ্রৌপদীরে হারো তুমি পণে ?
পঞ্চস্বামী বিলাসিনী জান না পাঞ্চালী ?
কাপুরুষ সম তুমি দেখাইছ সবে,
ইচ্ছা করে ভস্ম করি, দু বাহু তোমার !
যে বাহু ক্ষত্রিয় বাহু, তেজস্বী স্বভাব,
ধিক্ ধর্ম্ম ! ধিক্ তব, বীর্য্যহীন বাহু !
শিশুকাল হতে ধূর্ত্ত মহা মায়াজাল
বিস্তারিয়া, সাধিয়াছে নানা অমঙ্গল
পাণ্ডবের ! কিন্তু দেব ! দেব অনুগ্রহে,
পারেনি ছিঁড়িতে দুষ্ট কৌন্তেয় কুন্তল !
মনে আছে, ভুলি নাই জতুগৃহ দাহ,
ভুলি নাই সিন্ধু নীরে বাঁধি হস্তপদ—
দিয়াছিল ফেলি মোরে, হলাহল পানে
অচেতন করি, রণক্রীড়া শিক্ষাতরে
নিয়োজিত যবে দ্রোণ ক্ষত্রকুল গুরু
ভারদ্বাজ, সেই কালে বৈর নির্যাতনে—
পেতেছিল রাহুচক্র বধিতে কৌশলে
মো সবায় ! গুরু কৃপা বিভু কৃপাবলে !—

বাহুবলে জিনিয়াছি, পারেনি সাধিতে
কাল বাঞ্ছা, কৃতান্তের প্রেরিত কিঙ্কর
ধার্ত্তরাষ্ট্র, কুরুবংশ কলঙ্ক বর্ব্বর।
ভুলি নাই পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর কালে,
অপমানে ভীম-রোষে মত্ত অহি সম,
আকিঞ্চন করেছিল লক্ষ রাজা বেড়ি,
করিতে পাণ্ডবশূন্য পৃথ্বী জননীরে
রণভূমে! ভুজবলে জিনিলা ফাল্গুনী।
ভুলি নাই পাশ ক্রীড়া যে চক্রে সৃজিত
শকুনির, পাপমতি কৌরব মাতুল—
সৃজিল মায়ার পাশা পাপ অস্থিময়
সভা মাঝে, হাতে হাতে করি কিস্তিমাত,
জিনিল তোমারে রাজা, জিনিল দুর্ম্মতি—
পাণ্ডুরাজ রাজ্য ধন পঞ্চ সহোদরে,—
অবশেষে দ্যূতপণে জিনিল দ্রৌপদী!
দেখিলাম, সহিলাম, সব তুচ্ছ করি,—
তুচ্ছ করে যথা বনে ক্ষুধার্ত্ত কেশরী
ক্ষুদ্র জীব প্রজাপতি উড়েপড়ে মুখে।
ভুলি নাই ধর্ম্মরাজ! তবু ভুলিয়াছি
পাপিষ্ঠের পাপাচার, ধর্ম্ম অনুরোধে
তব! কিন্তু দেব! আজি ভুলিলে কি সব?
কারে তুমি ক্ষমা কর? ক্ষত্রকুল নাথ!
দেবেন্দ্র সদৃশ তব চারি অনুচর,

ইঙ্গিতে জিনিতে পারে ইহ বিশ্বধাম ;
কারে তুমি ভয় কর এ মরতভূমে ?
তুচ্ছ মর্ত্ত্য, তৃণ সম মানে স্বর্গপুর—
ধনঞ্জয় সহকারী বীর বৃকোদর !
ইঙ্গিতে অনুজ্ঞা চাহে, দেহ অনুমতি
ধর্ম্মপুত্র ! দেখি আজি কত বা পৌরুষ
ধরে রাজা দুর্য্যোধন, কুরুকুল পাপ,
কত বীর্য্য ধরে তার পূজ্য সহচর
কর্ণ, ক্রূর, সূতপুত্র, দুষ্টবুদ্ধিদাতা !
কত বল ধরে দুষ্ট পাপিষ্ঠ মাতুল
শকুনি ; এখনি আমি দেখাই সবারে !
কি বলিব নিরুত্তর আজি সভাস্থলে
সত্যব্রত গঙ্গাপুত্র, যাঁহার প্রসাদ
জন্মাবধি ভিক্ষা করি রেখেছি জীবন !
কি বলিব নিরুত্তর আজি দ্রোণ গুরু,
যাঁহার কৃপায় বিশ্ববিজয়ী পাণ্ডব।
কি বলিব বাক্ শূন্য মহা পুণ্যবান
বিদুর, যাঁহারে মোরা মনে পূজাকরি,
নিত্য নিত্য যাঁর মূর্ত্তি অন্তরে ধেয়াই,
মন পটে আঁকি যাঁরে হেরি অহরহ,
ধর্ম্মের আধার বলি জ্ঞান ছিল যাঁয়,
ভাগ্যদোষে তিনিও কি জিহ্বাশূন্য মূক !
আহা ! ভীষ্ম পিতামহ ! সত্যব্রতাচারী.

পিতার সুখের সেতু ধর্ম্ম নিকেতন,
আকুমার ব্রহ্মচারী, সর্ব্বসুখত্যাগী—
পৃথ্বী সুখে বিসর্জ্জিয়ে পিতৃকুলহিতে
সঁপিয়াছ যে জীবন, সঁপিয়াছ হিয়া,
সে হিয়া কোথায় আজি পাঞ্চালী বিভ্রমে ?
কর জোড়ে নতি করি তব শ্রীচরণে,
দেহ অনুমতি দেব ! দেখ পরাক্রম
পাণ্ডবের ; ছিন্ন ভিন্ন করি রাহুচক্র,—
গদাঘাতে চূর্ণ করি কুরু পাপবপু।
কথা কও জ্যেষ্ঠ তাত ! কুরুকুল নাথ !
এ সঙ্কটে আজি তব মৌন ব্রত কেন ?
তব পুর-কুলবধূ উলঙ্গিনী বেশে,—
এসেছে সভার মাঝে অনাথিনী প্রায় !
অনাথিনী কাঙ্গালিনী ভিখারিণী সম—
কাঁদিতেছে উভরায়ে সম্ভাষিয়ে সবে,
কেন তুমি নীরবিলে না দেহ উত্তর ?
কে হরিল তব বাণী ও বীরেন্দ্র মুখে ?
যে মুখে হইতেছিল "কিং জিত" আরব ?
আর নয় কুরুনাথ ! বুঝিলাম সব—
তোমাদের মনে যাহা ছিল আর আছে,—
হইল সফল এবে তবে আর কেন ?
দেখাইব ভুজ বীর্য্য উপেক্ষিয়ে ক্ষমা।
কর্ণ কি রোধিতে পারে এ স্রোতের ধার ?

(স্রোতোমুখী স্রোতস্বতী সিন্ধুনীরে মিলে,
সিন্ধু কি কখনো যায় মিলিতে নদীতে ?)
পাণ্ডবেরা মিলিবে কি পাপ কুরুদলে ?
শুন পুনঃ ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
বলি আজি, ক্ষমি তব ধর্ম্ম অনুরোধে,
পূর্ব্ব অপরাধ যত করিল কৌরব ।—
কিন্তু পারিব না রাজা ভুলিতে কখন—
পাঞ্চালীর অপমান কুরুসভাস্থলে !
এক বস্ত্রা, রজস্বলা, রাজকুলবালা,
কেশে ধরি আকর্ষিল, পাপিষ্ঠ পামর
দুঃশাসন, পারিব না ভুলিতে এ তাপ !
সাক্ষী হও চন্দ্র সূর্য্য ! গ্রহ তারাগণ !
সাক্ষী হও ধৃতরাষ্ট্র ! ভীষ্ম পিতামহ !
সাক্ষী হও গুরু দ্রোণ ! রাজা দুর্য্যোধন !
সাক্ষী হও বসুমতি ! অতল পাতাল !
সাক্ষী হও সভাজন ! যাঁরা যাঁরা আছ—
এ পাপ কৌরব সভা অধিষ্ঠান করি,
সাক্ষী হও, আজি আমি ত্যজি ধনুর্ব্বাণ,
দ্রৌপদীর কেশসম মুক্ত হস্ত হয়ে—
পশিব কাননপথে যত দিনে পারি,
ভুলিব না এ বেদনা, পাঞ্চালীর বেণী
আলুলিল যার হস্তে, কৌরব সমরে,—
বিদারিব বক্ষ তার, ধর্ম্ম সাক্ষী পণ—

করিব রুধির পান সেই বক্ষ চিরি,
পালিব সমর স্থলে এ প্রতিজ্ঞা মম !
পাইবে পাপের ফল পাপী দুঃশাসন,
বাঁধিব কৃষ্ণার যবে আকুল কুন্তল !
ঘোষিবে সংহার বেণী,—সংহারী সংহার !
পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন আজি দেখালে যে উরু,
সেই উরু ভগ্ন করি গদার প্রহারে,
শোধিব লজ্জার ঋণ, বীর্য্যে বীর্য্যে যবে—
দেখা হবে রণভূমে দুর্য্যোধন সনে !
ধর্ম্ম হেতু ক্ষমিলাম সব ! ধর্ম্ম সেতু
রোধুক অধর্ম্ম স্রোত, দেখুক কৌরব,
বনবাসে লুকাইব, সত্য প্রপালনে,—
অবশ্য হইবে কালে পাণ্ডব উদয় ।
সে দিন কি দিন হবে পারি না বলিতে,—
হয় যদি হবে মম প্রতিজ্ঞা পালন ।
কোন কথা ভুলিব না সব রবে মনে !
এই হস্ত রণক্ষেত্রে লবে প্রতিশোধ !
শোধিব মানের ধার কাঁদিব নীরবে,
করিব ধর্ম্মের পূজা মাগি লব বর,
সিদ্ধ যেন হয় ব্রত দ্বাদশ বৎসরে !
যোগীবেশে ভ্রমি বনে কাটাইব কাল,—
গোঁয়াইব ছদ্মবেশে অজ্ঞাত বৎসর !
যদি কিছু শুভ থাকে বিধাতার মনে,

গাইবে ভারত লোকে পাণ্ডব উদ্ধার!
সেই দিনে, যদি হয়, বিধাতার মনে
থাকে যদি, সিদ্ধ হবে, পশিব আবার
এ সুখ হস্তিনাপুরে রাজসিংহবেশে,
পাণ্ডুরাজ সিংহাসনে পাতিব আসন,
জয়িব কৌরব সেনা দুই ভাই মিলি,
দেখিব কেমন রাজা রাজা দুর্য্যোধন!
এ সকল অপমান জাগিতেছে মনে—
জেগে রবে যত দিন রহিবে জীবন,
অরির পাতন কিম্বা শরীর পতন।
ঘটে যদি সেই দিনে হবে পরিচয়,
নতুবা বিদায় এই জনমের শোধ!
এস তবে ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্ম সঙ্গে করি,—
সঙ্গে করি অনাথিনী পঞ্চাল কুমারী,
মনে করি পাপাচার আজন্ম নিগ্রহ,
যাই চল ধর্ম্ম হেতু ধর্ম্ম নিকেতনে!
ফিরে যদি আসি পুনঃ দেখিব আবার
পিতার অর্জ্জিত রাজ্য পূজ্য রাজপাট।
শোধিব অরির ঋণ ভুজবীর্য্যবলে,
দেখিব কেমনে রাজ্য করে দুর্য্যোধন!
প্রার্থনা থাকুন সুখে আর্য্য কুরু নাথ
জ্যেষ্ঠ তাত অন্ধরাজ, পূজ্য ভীষ্মদেব,
কুশলে থাকুন্ রাজ্যে জননী গান্ধারী,

যতিব্রত ধর্ম্মাচারী কুলেন্দ্র বিদুর।
বেঁচে যদি আসি ফিরে দেখিব আবার
সকলের পাদ পদ্ম,—বন্দিব চরণ
নতশিরে;—থাকে যদি বিধাতার মনে।
আর কেন ধর্ম্মরাজ ! হলো লীলা খেলা,
ফুরাইল কিছু দিন শকুনির মায়া !
যাই চল পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সংহতি,
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু তীর্থ বনবাসে

চম্বক ধর্ম্ম।

(রাসায়নিক পদার্থ বিজ্ঞান।)

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, চুম্বকে লৌহ বা ইস্পাত ঘর্ষণ করিলে উহারা চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। ঘর্ষণ দ্বারাই যে কেবল কৃত্রিম চুম্বক পাওয়া যায়, তাহাও নহে। একটী কৃত্রিম চুম্বক স্বাভাবিক চুম্বকের ন্যায় অন্য পদার্থে ঘর্ষিত না হইয়াও সংস্পর্শমাত্র তাহাকে চুম্বক-ধর্ম্ম প্রদান করে। যদি একটী ক্ষুদ্র ইস্পাত শলাকা কিছুকাল একটী কৃত্রিম চুম্বককে স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ শলাকা চিরস্থায়ী চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু লৌহশলাকা যদি ঐ রূপে স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষণস্থায়ী চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। লৌহ শীঘ্র চুম্বক-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আবার পরিত্যাগ করে। ইস্পাত বিলম্বে

চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং বহু দিন থাকে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, চুম্বকধর্ম্মপ্রাপ্ত ইস্পাত যখন অন্য পদার্থে কিয়দংশ চুম্বকত্ব প্রদান করে, তখন তাহার ধর্ম্ম হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হয়। স্বাভাবিক চুম্বকেরও এই ধর্ম্ম। এই হেতু চুম্বকধর্ম্মের সহিত তাঁড়তের কোন সাদৃশ্য নাই।

পৃথিবী প্রচুর পরিমাণে চুম্বকধর্ম্ম প্রদান করিতে পারে। একটী লৌহ-শলাকাকে নিমগ্ন অবস্থায় রাখিয়া বলপূর্ব্বক উহাতে আঘাত করিলে ঐ শলাকার অবনত প্রান্ত উত্তর কেন্দ্রাভিমুখে ও উন্নত প্রান্ত দক্ষিণ কেন্দ্রাভিমুখে লক্ষিত হইবে। যতক্ষণ ঐ শলাকা এই অবস্থায় থাকিবে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব দৃষ্ট হইবে। পৃথিবীর চুম্বকত্বের দ্বারাও ইস্পাত চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।

. চুম্বকধর্ম্ম প্রদত্তক সকল পদার্থ অপেক্ষা তড়িৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তড়িৎ যে কেবল লৌহে ও ইস্পাতে চুম্বকত্বই প্রদান করে, এরূপ নহে, উহা চুম্বকধর্ম্মপ্রাপ্ত লৌহ অথবা ইস্পাতে আর একটী নূতন ধর্ম্ম প্রদান করে। গাল্‌বনিক্ ব্যাটারি হইতে তার দ্বারা যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ নির্গত হয়, সেই তারের নিকটে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত একটী সূচী আনিলে সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহদ্বারা সূচীর কেন্দ্রাভিগমনশীলতা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সূচী ঐ তারের উপর তের্চ্ছাভাবে থাকে। সূচীর নিকটে বৈদ্যুতিক স্রোত আসিবার অগ্রে উহা উত্তর এবং দক্ষিণ দিক্ নিরূপণ করিত, কিন্তু উহার সমীপে তড়িৎপ্রবাহ আনীত হইলে উহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ দেখায়। বৈদ্যুতিক স্রোত রহিত করিলে ঐ সূচী পুনর্ব্বার আপন স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। বৈদ্যুতিক স্রোতপ্রভাবে সূচী এই প্রকারে এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে আন্দোলিতহইয়া থাকে। এই আন্দোলনদ্বারাই ইলেকট্রিক

টেলিগ্রাফের মধ্য দিয়া এক দেশ হইতে দেশান্তরে নিমেষমধ্যে বিবিধ বার্ত্তা বাহিত হইতেছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চুম্বকের এক প্রান্ত সর্ব্বদা উত্তর দিক্ ও অপর প্রান্ত দক্ষিণ দিক্ প্রদর্শন করে। এই অসাধারণ গুণ থাকাতে চুম্বকের দ্বারা নাবিকদিগের দিগ্নিরূপণ যন্ত্র (ম্যারিনার্স কম্পাস) নির্ম্মিত হয়। কম্পাস যন্ত্র আর কিছুই নহে, কেবল চুম্বকত্ব প্রাপ্ত ইস্পাতের একটী সূচীমাত্র। উহার মধ্যস্থান সম পরিমাণে শায়িত ভাবে একটী আলের উপর রাখিতে হয়, এমনি ভাবে রাখা উচিত যে, উহা আলের উপর সকল দিকে ঘূরিতে পারে। তাহা হইলেই উহার এক প্রান্ত নিয়ত উত্তর দিক্ নির্দ্দেশ করিবে। চুম্বকের নিম্ন-ভাগে একখানি তাস আছে, সেই তাসে ৪টী প্রধান দিক্ ও অপরা-পর উপদিক্ অঙ্কিত আছে, ঐ অঙ্কিত তাসদ্বারা দিগ্নির্ণয় হয়। চুম্বক এবং ঐ তাস একটী পিত্তলের কৌটার মধ্যে স্থাপিত, এবং সেই কৌটার উপর একখানি কাচের ঢাকনি আছে। ইহাই নৌযাত্রিক-দিগের দিগ্নির্ণয় যন্ত্র।—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গুই ডি প্রভিন্স নামক একজন ফরাসী কবি নাবিক বিদ্যায় কম্পাসের ব্যবহার প্রথম উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রবাদ আছে, ইহার বহুকাল পূর্ব্বে চীনদেশের নাবিকেরা এই যন্ত্রের ব্যবহার জানিত।

জগদীশ্বরের মহিমা বিজ্ঞানশাস্ত্রেই প্রতিভাত হয়। ঈশ্বরকে কেহ কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই, করিবেও না, চুম্বকধর্ম্ম ও বিদ্যুতে তাঁহার প্রাকৃতিক অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সমস্তের পরিচয় হইতেছে। যখন আমরা যে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা করি, তখনি অন্তরাত্মা অতুল আনন্দে ও বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হয়।

রাক্ষসী !

হায় ! কি রাক্ষসী ! দেখিয়া শুনিয়া আত্মা পুরুষ যে শুষ্ক হইয়া গেল ! পুরাকালে এ দেশে কখন কেহ এরূপ ভীষণমূর্ত্তি দেখে নাই। উহার কার্য্য সকল দর্শন করিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয় এবং উন্নতির বিষয়ে আর আশা থাকে না। আমাদিগের ভারত-ভূমি যদিও রাক্ষসীর বাসভূমি বটে, কিন্তু ঐরূপ রাক্ষসী কেহ কখনও দেখিতে পাইতেন না। ঐ রাক্ষসী সমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়াছে। উহার মূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ মধুর বটে, কিন্তু স্বভাব অত্যন্ত ক্রূর। আমাদিগের দেশীয় রাক্ষসী ইতর সমাজেই বিচরণ করিত, ভদ্রসমাজে প্রায় যাইত না। তবে ভক্তিভাবে আহূত হইলে কখন কখন নিশাভাগে ভদ্রনামধারী লোকদিগের আলয়ে অধিষ্ঠিত হইত। উহার গাত্রগন্ধ, আচরণ ও নীচজন সহবাস দেখিয়া কি ধনী কি দরিদ্র কি মধ্যবিত্ত সর্ব্ববিধ ভদ্রলোকেই প্রায় উহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিত। এই রাক্ষসী যদিও বহু লোককে শ্রীভ্রষ্ট ও অনেককে শাসিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিক লোকের জীবন নাশ করিতে পারে নাই। রাক্ষসীর ভয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বকালে রাজারাই তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেন। দণ্ড ভয়ে উচ্চজাতীয় ব্যক্তিরা উহার ত্রিসীমা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে সাহসী হইতেন না। সুতরাং সাধারণের চক্ষে উহা নিতান্ত কুৎ-সিত, অপকৃষ্ট ও ঘৃণিত বলিয়া পরিগণিত হইত। ইত্যাদি নানা কারণ বশতঃ পূর্ব্বে অস্মদ্দেশবাসিনী রাক্ষসী আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। এখন রাজার আদরিণী হইয়া

বিদেশিনী ভগিনীর সহায়তায় সেই রাক্ষসী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলবতী হইয়াছে। ফলতঃ উভয়ের যোগে আমাদিগের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ছারক্ষার হইবার উপক্রম হইতেছে। ঐ সর্ব্বনাশী নিশাচরী (নিশাচরীই বা কি রূপে বলি, যখন দিবানিশিই উহার সঞ্চরণ দেখিতেছি) যাহার বাস্তু ভূমিতে অধিষ্ঠান করে, একবারে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে। পরিশেষে তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেও ক্রটি করে না।

এক্ষণে ঐ বিদেশিনী নিশাচরী আমাদিগের সর্ব্ব আপদের মূল বলিতে হইবে। ইহার যে কত বীভৎস কার্য্য, তাহা কাহার সাধ্য বর্ণন করে? তবে আমি কিঞ্চিৎ কহিতেছি, ঐ বিদেশিনী রাক্ষসী এদেশে আসিয়া এখন বিলক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, অনেক সহায় সম্পত্তি পাইয়াছে, অনেক রাজা ও বিপুল বিত্তশালী মহামান্য ব্যক্তিগণের ভবনে ও উহার গতিবিধি হইয়াছে। ঐ মায়াবিনীর কুহকে পতিত হইয়া বহুতর লোকেই উহার শিষ্য হইয়াছে। উহার এমনি অদ্ভুত প্রভাব যে, কত শত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণেও উহার দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে জন্মের মত আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, এক দিকে পিতামাতা ভাইবন্ধু পুত্রকলত্র প্রভৃতি সর্ব্বস্ব, ও অপর দিকে ঐ কুহকিনীরে রাখিয়া যদি তুলামাণে ওজন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় যে ঐ মায়াবিনীর ভারই তাহাদিগের অপেক্ষা গুরুতর হইয়া উঠে। আহা! যাহারা ঐ কুহকিনীর মায়ায় মজিয়াছে, তাহারা কি শোচনীয়! তাহাদিগকে দেখিলে কি দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তিদিগের মনে খেদ উপস্থিত হয় না? তাহারা না করে সমাজের ভয়, না মানে গুরুজনের অনুরোধ, না রাখে স্নেহাস্পদ অপত্যগণের স্নিগ্ধ সম্বন্ধ, কেবল অহোরাত্রই ঐ সর্ব্বসংহারিণী নিশাচরীর অনু-

সরণ করে। তাহারা স্বীয় অভীষ্ট দেবতা রাক্ষসীর সেবা না হইলে যত কাতর ভাবাপন্ন হইবে, শিশু পুত্র ও পতিপরায়ণা পত্নী আহারাভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছে দেখিলেও তাহাদিগের মন তত কাতর হইবে না। ঐ বিবিধ রোগকরী সর্ব্বস্বহরী নিশাচরীর সেবা করিয়া যখন সেবকেরা মান, যশ, ধন সম্পত্তি, শীলতা, দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণ বিসর্জ্জন করেন, দীনভাবে দ্বারে দ্বারে যাচকব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাহাদের চিত্ত মধ্যে চেতনাদেবীর আবির্ভাব হয়। তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, কিরূপ রাক্ষসীর সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখন তাহাদের এমন সামর্থ্য থাকে না যে, আর সেই দুরাচারিণীর সম্বন্ধ বন্ধন পরিত্যাগ করে।

আর ঐ ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর ত্রিসীমায় যাইব না, ও কখনও উহার সেবকেরও সংসর্গ করিব না, এইরূপ নানামত শপথ পূর্ব্বক তাহারা মনে মনে কত প্রতিজ্ঞা করে, কত আত্ম ভৎর্সনা করে, কতই অনুতাপ করে, রোগের যন্ত্রণায় কতই আপনাকে তিরস্কার করে এবং যার পর নাই, আত্মগ্লানিও অনুভব করিতে থাকে, কিন্তু আবার পরক্ষণেই সেই পাপকারিণী রাক্ষসীর মূর্ত্তি মনোমধ্যে উদিত হইলেই অমনি সস্পৃহলোচনে ও ব্যাকুলান্তঃকরণে সেই উপাস্য রাক্ষসীর সেবার নিমিত্ত তাহার অন্বেষণ করিতে থাকে। রাক্ষসীর স্বভাব এরূপ নহে যে, মনে করিলেই সে স্বয়ং নিকটে আসিবে। অর্থ বিনা সে দেখা দেয় না। কিন্তু উক্ত রূপ সেবকের যেরূপ দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, সে আর অর্থ কোথায় পাইবে? তখন বুদ্ধিস্থা রাক্ষসী ইঙ্গিত করিয়া এক ভয়ানক দৈত্যকে দেখাইয়া দেয় ও কহে, ওরে কি ভাবিতেছিস্, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সেবক হইয়া থাকিস্,

তবে ঐ দৈত্যরাজের সহিত প্রণয় কর, তাহা হইলেই আমাকে লাভ কবিতে পারিবি।

যদিও ঐ রাক্ষসী প্রদর্শিত দৈত্য অতীব দুরাচার ও ভীষণ মুর্ত্তি, উহাকে দেখিলে হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে, ও সজ্জনেরা উহার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না, তথাপি সেই রাক্ষসীদাস ইঙ্গিত মাত্রেই ঐ নীচতর জঘন্য দৈত্যের শরণাপন্ন হয়েন। ঐ দৈত্যের নাম চৌর্য্য। চৌর্য্যের অপ্রশস্তপথে দণ্ডায়মান হইয়া সেবকেরা কত নিগ্রহ, কত শাস্তি, কত যন্ত্রণা ও কত শত তিরস্কার ভোগ করিবেন, তথাপি রাক্ষসীর সেবা পরিহার করিবেন না।

ঐ অদ্ভুত রাক্ষসীর যে কত অদ্ভুত কার্য্য আছে, তাহার বিষয়ে অধিক আর কি কহিব। হত্যা, আত্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা, পরনারী স্পর্শ, চৌর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় কুৎসিত মহাপাপজনন কার্য্য আছে, উহার সেবকদিগকে নিয়তই ঐ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তবে ঐ রাক্ষসীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

আমি যে রাক্ষসীর কথা কীর্ত্তন করিলাম, বোধ হয়, অনেকেই উহাকে জানেন। ইহার এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবে মানব জাতিও প্রথম সংশ্রবে দানবত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে বানরত্ব লাভ করে। সেবকেরা স্বয়ং পশুত্ব লাভ করিয়া অন্যকে পশু বলিয়া থাকে। ইহাই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! অথবা রাক্ষসীমায়ায় তাহারা পশুভাব প্রাপ্ত হইয়া জগৎ পশুময় দেখে! অন্যথা নির্লজ্জ হইয়া পশুবৎ ব্যবহারে কিরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারে? আহা! রাক্ষসীশিষ্যের কি দুর্ভাগ্য! কিছুতেই তাহাদিগের চৈতন্যোদয় হয় না; দুরবস্থার একশেষ, যন্ত্রণার একশেষ ও অপমানের একশেষ হয়, তথাপি পাপীয়সীর আরাধনা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

আসঙ্গলিপ্সা।

গত মাসে আমাদের যে প্রতিজ্ঞা ছিল, অদ্য তাহা সফল হইবে। রাজা বল্লাল সেন কুলীনের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রাহ্মণকুল পত্তনের মূল তাঁহার পিতা আদিসুর। রাজা আদিসুর খৃষ্টীয় এক হাজার তেষট্টি অব্দে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে যজ্ঞক্রিয়া ব্যপদেশে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। সেই ব্রাহ্মণেরা পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত হন। তাঁহাদিগের বংশাবলী ক্রমশ বিস্তৃত হইলে আদিসুরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পৌরাণিক পুত্র বল্লাল সেন সেনবংশীয় বঙ্গীয় রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি বিপ্রবংশীয় উত্তর পুরুষগণকে কৌলীন্য পদবীতে স্থাপন করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া পরম ধার্ম্মিকদিগকে কুলীন করিলেন। কুলীনেরা কি কি নীতি অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে ধর্ম্ম-নীতির গৌরব রক্ষা করিবেন, তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কুলীনেরা যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিবেন, যাঁহারা কুলীন নহেন, তাঁহারা ভগিনী ও দুহিতা বিক্রয় করিবেন, এ ইচ্ছা তাঁহার মনে একটী দিনও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যদি স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব তত্ত্ব অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইবে, দেশের রাজাই কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ব্রহ্মানন্দের ন্যায় অথবা কোনো স্বনামবিখ্যাত স্বতঃসিদ্ধ মহাপুরুষের দ্বারা

কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইংরাজ রাজাবা সেই প্রথার উন্মূলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া আমাদিগের দেশের কতিপয় যুবকেরাও কুলীনের নামে খড়্গহস্ত হইয়াছেন। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহারা অন্যায় আচরণ করিতেছেন না, এইটি প্রতীয়মান হয়। কি বৃদ্ধ, কি যুবা, যাঁহারা এখন সমাজ সংস্কারের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত, খৃষ্টান রাজার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্তই হউক অথবা আমাদিগের সমাজের কল্যাণের নিমিত্তই হউক, যে প্রকার সংস্কার তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। রাজা বল্লাল সেন দুই মাসের বালিকার সহিত অশীতি বর্ষীয় বরের বিবাহ দিতে বলেন নাই, একপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্কা কুমারীর সহিত তুলসী বা বট অশ্বত্থ বৃক্ষের বিবাহ দিতে বলেন নাই, একজন পুরুষকে শতাধিক কুলকামিনীর পাণিগ্রহণ করিতে বলেন নাই, যাঁহারা কুলীন নহেন, তাঁহাদিগকে শুক্র বিক্রয় করিতে বলেন নাই, সুনীতিজ্ঞ রাজার যাহা কিছু বলা উচিত, স্বরাজ্যে কৌলীন্য স্থাপন করিয়া তাহাই তিনি বলিয়াছিলেন, কুলীনদিগেব মুখ উজ্জ্বল করিয়া দেশের গৌরব প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এখন এ দেশে ইংরাজ রাজা, তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কুলীনদিগের আধুনিক ভ্রষ্টাচার দর্শন করিয়া মৃত বল্লাল সেনকে সটে পটে ধরিয়াছেন, আচারভ্রষ্ট কুলীনদিগের যত কিছু কপটতা ও ভণ্ডতা, তৎসমস্তই বল্লাল সেনের স্কন্ধে নিপতিত

হইতেছে ! যদি কেহ দুহিতা বিক্রয় করে, বল্লাল সেনের দোষ, যদি কেহ সাত শত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করে, বল্লাল সেনের দোষ, যদি কোন গৃহস্থ ৬০ বৎসরের অনূঢ়া কন্যা গৃহে রাখে, তবে তাহা বল্লাল সেনের দোষ, যদি কেহ ৫০।৬০ অথবা ৭০টী কুলবালার অনূঢ়া নাম ঘুচাইয়া এক দিনে বিধবা করে, তবে তাহা বল্লাল সেনের দোষ ! অনৈক্যসেবিত আমাদিগের হতভাগ্য দেশের অনুকরণ-প্রিয় মহাবীরেরা করতালি দিয়া প্রতিধ্বনি করিবেন, প্রতিধ্বনি করিতেছেন, প্রতিধ্বনি করেন, তবে তাহা বল্লাল সেনের দোষ ! আমরা বলি, তাহা নহে। আমা-দেরই দোষ। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, ক্রীতবিবাহ ও কন্যা বিক্রয়, কৌলীন্য প্রথার অমৃতময় ফলের পরিবর্ত্তে বিষময় ফল। একতা যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, অথবা যাইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদিগের এই দশা ঘটা বিচিত্র নহে।

দেশে কুলীন থাকেন, দেশের সৌভাগ্য। আমরা এখন যে দেশের অনুকরণ করি, সেই ক্ষুদ্রতম ইউরোপখণ্ডে পীয়র, ব্যারণ, ডিউক ও লার্ড প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক মান্য উপাধি আছে, সেই উপাধির প্রিয়পাত্র যাঁহারা, তাহারা কুলীন পদবীতে গণনীয়, সেই পদবী যাঁহাদিগের আছে, তাঁহারা কুলীন। ইউরোপীয় কুলীনদিগের সহিত বঙ্গদেশের কুলীনের সাদৃশ্য এখন কিছুই নাই, কিন্তু সেন রাজার সংস্থাপিত কৌলীন্য অধিক অসাদৃশ্য রাখিয়া যায় নাই।

বাঙ্গালী কুলীন যদি ষোড়শ বর্ষ বয়সে অনূঢ় থাকে, তাহা হইলে সে বংশে কলঙ্ক হয়! একজন ইংরাজ পীয়র ৪০ বৎসর বয়সে বিবাহ করিলে মর্য্যাদার বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালী স্বকৃতভঙ্গ কুলীন যদি দুটী বিবাহ করিয়া আর বিবাহ করিতে অনুরাগী না হয়, তবে তাহার সমাজ তাহাকে এখন কাপুরুষ বলিয়া ধিক্কার দেন, কিন্তু একজন ইংরাজ কুলীন যদি একটী বিবাহ করিয়া আর একটী সুন্দরী কামিনীর অনুরাগ বিনিময়, প্রার্থনা (কোর্টসিপ্) করেন, তাহা হইলে রাজবিচারে তাঁহার দণ্ড হয়, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইংরাজেরাও রাজার দ্বারা কুলীন, বাঙ্গালীরাও রাজার দ্বারা কুলীন; তবে প্রভেদ এই যে, সে দেশে ঐক্য বিরাজমান, এ দেশে ঐক্য নাই। এখানে এখন যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহা করিতে পারে, ইংলণ্ডে কেহ তাহা পারে না। কি রাজকীয়, কি সামাজিক, কি ধর্ম্ম বিষয়, সকল বিষয়েই ইংলণ্ডের লোকেরা এক পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধীন। এখানকার লোকেরা স্বেচ্ছাচার নামক এক মহাসভার অধীন। এক প্রবল দৃষ্টান্ত বিধবা বিবাহ। এই প্রথা ভাল কি মন্দ, সে বিচার সকলের মনে নাই, কেহ স্মৃতি দেখাইয়া পোষকতা করেন, কেহ বা স্মৃতি দেখাইয়া প্রতিবাদ করেন, কেহ বিধবা বিবাহ করিতেছেন, আবার গোময় ভক্ষণে শুদ্ধ হইতেছেন, কেহ বিধবা বিবাহ করিতেছেন, সমাজচ্যুত হইয়া আছেন! মধ্য চক্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রসংশাভাজন ও নিন্দাভাজন।

লোকে কথায় বলে, শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা অবশ্য পালন করিব, কিন্তু শাস্ত্রে কি আছে, জিজ্ঞাসা করিলে সকলে উত্তর দিতে পারেন না। ঐক্য অভাবের এটি উজ্জ্বলতর সাক্ষী। এ দেশে আজ কাল ব্রাহ্মনামে একটি নূতন সম্প্রদায় হইয়াছে, সেই সম্প্রদায় এই রাজধানী মধ্যেই তিন দলে বিভক্ত। ইহার মধ্যে কেহ কেহ অসবর্ণ বিবাহের একান্ত পক্ষ-পাতী। ব্রাহ্মণের কন্যা সূত্রধরে, তন্তুবায়ের কন্যা ব্রাহ্মণে অথবা যদি অধিক উন্নতি আবশ্যক হয়, ভট্টাচার্য্যের কন্যাও যবনে পড়ে, উন্নতিশীলদিগের ইহা আন্তরিক অভিলাষ। সমাজ যখন ছারখার হয়, তখন এই দশাই ঘটিয়া থাকে। ঐক্য যেখানে স্বেচ্ছাচারের কারাগারে বন্দী, সেখানে যে কি হইতে পারে না, তাহা আমরা ব্যাখ্যা করিয়া দিতে অসমর্থ।

অনৈক্য আমাদিগকে এক অপদার্থ জাতিমধ্যে গণনীয় করিয়া দিতেছে। গত মাসে পশুপক্ষীর, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আমরা যে তিনটী কথা কহিয়াছিলাম, তাহার একটী এই, কপোতী কপোতকে পরিত্যাগ করে না, হংসী হংসকে ত্যাগ করিয়া যায় না, কুরঙ্গ কুরঙ্গিণীর অনুধাবন করে, বায়সবিয়োগী বায়সেরা একস্থানে দলবদ্ধ হইয়া রোদন করে, বানর-বিয়োগে বানর বানরীরা সহজে লক্ষ্য স্থল পরিত্যাগ করিতে চাহে না, কিন্তু আমরা শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য। জগৎপিতা আমাদিগকে সর্ব্ব জীবের উপর আধিপত্য করিতে সৃজন করিয়াছেন, অথচ আমরা অনা-

য়াসে আজন্মপরিচিত জননীসমাজকে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে নিষ্ঠুরের ন্যায় পরিত্যাগ করিতেছি! আসঙ্গলিপ্সা বলবতী হইলেও আমরা তাহার সুধাময় ফলে চিরবঞ্চিত! বারান্তরে পুনরায় ইহার অপর পরিচ্ছেদ স্পর্শ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কল্কিপুরাণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, মহাত্মা কল্কি যখন গুরুকুলে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন, সেই সময়ে মহেন্দ্রপর্ব্বত নিবাসী মহাত্মা জমদগ্নিতনয় রাম তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণতনয়! আমি মহাত্মা ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি জমদগ্নির পুত্র, বেদবেদাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞ, ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সুনিপুণ; আমি পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত এই মহেন্দ্রপর্ব্বতে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমিই তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিব, তুমি আমাকেই ধর্ম্মানুসারে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর, এবং এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় বেদ ও অন্যান্য উত্তমোত্তম শাস্ত্র পাঠ কর।

ভগবান্ কল্কি জমদগ্নিনন্দন রামের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন, এবং অগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বেদ অধ্যয়ন করিলেন। তিনি পরশুরামের নিকট সাঙ্গবেদ, চতুঃষষ্টিকলা ও ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি যথানিয়মে শিক্ষা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেব! আপনি যে দক্ষিণা পাইয়া সন্তোষলাভ করিবেন, ও যাহা দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এক্ষণে আপনি আমার নিকট হইতে সেই দক্ষিণা প্রার্থনা করুন্।

রাম কহিলেন, হে সর্ব্বাত্মন্! তুমি কলিনিগ্রহের নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে শম্ভল গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি আমার নিকট হইতে বিদ্যা অভ্যাস, ভগবান মহাদেবের নিকট হইতে অস্ত্র ও বেদময় শুক লাভ করিয়া ও সিংহল দেশে পদ্মাকে বিবাহ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে। পরে তুমি দিগ্বিজয়ে ধর্ম্ম পরিশূন্য কলিপ্রিয় বৌদ্ধনরপতিগণকে নিগ্রহ করিয়া দেবাপি ও মরুকে পৃথিবী রাজ্যে সংস্থাপিত করিবে। সেই সৎকার্য্য দ্বারা আমি যারপর নাই পরিতুষ্ট হইব, এবং ইহাই আমার যথেষ্ট দক্ষিণা। এই কার্য্য সংসাধিত হইলেই আমি নিয়মানুসারে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিব। মহাভাগ কল্কি মুনিবর রামের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভগবান্ মহেশ্বরকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন, এবং বিধানানুসারে সেই হৃদয়স্থিত মঙ্গলময় শান্তমূর্ত্তি মহেশ্বরকে পূজা ও মনে মনে ধ্যান করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে গৌরীবল্লভ! তুমি বিশ্বনাথ, শরণ্য, ভূতগণের আশ্রয়, বাসুকী তোমার কণ্ঠভূষণ, তুমি ত্রিনেত্র, পঞ্চবদন, আদিদেব ও পুরাণ, তুমি আনন্দ সন্দোহদাতা, আমি তোমারে বন্দনা করি। তুমি যোগের অধীশ্বর, কাম্য কর্ম্মের বিনাশক ও করাল, তুমি সকলের ঈশ্বর, গঙ্গার সংসর্গে তোমার মস্তক

সিক্ত রহিয়াছে, তুমি জটাজূটধারী মহাকাল ও চন্দ্রকপাল, আমি তোমারে নমস্কার করি। তুমি শ্মশানবাসী, ভূত ও বেতালগণ তোমার সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকে, তোমার হস্তে খড়্গ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাইতেছে, প্রলয়কালে লোক সমুদায় তোমার ক্রোধাগ্নিতে উদ্ভূত ও অস্তমিত হইবে। তুমি ভূতগণের আদি, তুমিই পঞ্চভূত দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক, তুমি জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে রত হও, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিশ্ব সংসারের রক্ষণের নিমিত্ত সর্ব্ববিজয়ী বিষ্ণু-রূপ ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মের সেতুর স্বরূপ সাধুগণকে পালন করিতেছ। তুমি শব্দাদি রূপে গুণাত্মা হইয়া ব্রহ্মাভিমানে পূর্ণ রহিয়াছ, হে পরমেশ্বর! আমি তোমারে নমস্কার করি। হে দেব! তোমার আজ্ঞায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, দিবাকর উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করিতেছেন ও নিশানাথ গ্রহ ও তারকাগণের সহিত গগনে সমুদিত হইতেছেন, অতএব আমি আপনার শরণাপন্ন হই-লাম। তোমার আজ্ঞায় বিশ্বপালিনী ধরণী সকলকে ধারণ করিতে-ছেন, দেবগণ নিয়মানুসারে বারি বর্ষণ করিতেছেন, কাল সময় বিভাগ করিয়া দিতেছেন ও মেরুগণ ভুবন মধ্যে অবস্থান করিতেছে, অতএব হে বিশ্বরূপ! ঈশান! আমি তোমারে নমস্কার করি।

সর্ব্বাত্ম দর্শন ভগবান মহাদেব কল্কির এইরূপ স্তব শ্রবণে প্রিয়-তমা পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, প্রীতি পূর্ব্বক কর দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন্! তুমি কি বর প্রার্থনা কর, তাহা বল! তোমার প্রণীত এই স্তোত্র, এই ভূমণ্ডলে যে সকল ব্যক্তি পাঠ করিবে, ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদিগের সকল কার্য্যই সিদ্ধ

হইবে। তৎকৃত এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম ও ভোগাভিলাষী ভোগ্য বস্তু লাভ করিতে পারিবে। হে মহাভাগ! পক্ষীরাজ গরুড়ের অংশসম্ভূত, কামচারী, বহুরূপী এই হয় রত্ন ও এই সর্ব্বজ্ঞ শুকপক্ষী আমি তোমারে প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। ইহার প্রভাবে মানবগণ তোমারে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, অস্ত্র শস্ত্র নিপুণ, সর্ব্ববেদ পারদর্শী ও সর্ব্বভূত বিজয়ী বলিয়া জানিবে। আর তুমি গুরু ভারাক্রান্তা ধরিত্রীর ভারাবতরণের নিমিত্ত রত্নময় মুষ্টি-শোভিত মহাপ্রভাবশালী এই করাল করবাল গ্রহণ কর।

কল্কি দেবদেব মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, এবং বেগগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শম্ভল গ্রামে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণকে বিধানানুসারে প্রণাম করিয়া জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন। পরম তেজস্বী মহাত্মা কল্কি হৃষ্টান্তঃকরণে জ্ঞাতিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেব-দেব মহাদেব হইতে বরলাভ ও সমস্ত মঙ্গলজনক বাক্য বলিলেন। গার্গ্য ভাগ্য বিশাল প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গ তাঁহার সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। শম্ভলগ্রামবাসীগণ সকলেই ঐ বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিল। নরপতি বিশাখযূপ লোক মুখে ঐ কথা শুনিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, ভগবান হরি কলি-নিগ্রহের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তৎকালে তিনি দেখিলেন, নিজ মাহিষ্মতী নগরীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই হরিভক্তি পরায়ণ হইয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রতাচরণে নিযুক্ত হইয়াছেন। কমলাপতি ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাবে সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়াছে দেখিয়া, নরপতিও ধর্ম্ম কর্ম্মে একান্ত অনু-

রক্ত হইলেন, এবং বিশুদ্ধমনে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। লোভ মিথ্যা প্রভৃতি কলিবংশীয়গণ অধার্ম্মিকবংশীয়গণকেও স্বধর্ম্মে একান্ত নিবিষ্ট দেখিয়া দুঃখিত মনে সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন ভগবান্ কল্কি উৎকৃষ্ট বর্ম্ম, বিমল প্রভা সম্পন্ন খড়্গ ও শর শরাসন ধারণপূর্ব্বক দ্রুতগামী জয়শীল অশ্বে আরোহণ করিয়া নগর হইতে বিনির্গত হইলেন। সজ্জন প্রিয় মহীপতি বিশাখযূপ শম্ভলগ্রামে ভগবান্ হরি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, উচ্চৈঃশ্রবারূঢ় দেবগণ পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, তারকাগণ পরিবৃত শশধরের ন্যায়, ভগবান্ কল্কি, কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্র ও গার্গ্য ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। মহীপতি বিশাখযূপ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন, এবং অবনত শিরে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

ভগবান কল্কি নরপতি বিশাখযূপের সহিত কিছু দিন একত্রে বাস করিলেন ও তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের আশ্রমধর্ম্ম সকল কহিতে লাগিলেন, দেখ! আমার অংশ সম্ভূত ধর্ম্মাত্মাগণ কাল সহকারে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে আমার প্রভাবে সকলে একত্রে মিলিত হইয়াছে। তুমি এক্ষণে সমাহিত চিত্তে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার অর্চ্চনা কর। আমিই উৎকৃষ্ট লোক ও আমিই সনাতন ধর্ম্ম। কাল, ভাব ও সংস্কার ইহারা আমার কর্ম্মেরই অনুগামী হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে আমি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশসম্ভূত মহীপতি দেবাপি ও মরুকে রাজ্য-

শাসনে নিযুক্ত করিয়া সত্যযুগসংস্থাপন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিব।

মহীপতি বিশাখযূপ মহাত্মা কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক অভিলষিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কলিকুলনাশন ভগবান কল্কি মহীপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিষদ্গণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত মধুর বাক্যে পবিত্র ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

অশ্লীলতা কি ?

এক ব্যক্তি আপন উদ্যান-প্রাঙ্গনে একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, শিকড় ধরিতেছে কি না, প্রত্যহ এক একবার সেই চারা উৎপাটন করিয়া তাহা পরীক্ষা করিত। সূর্য্য, পবন, ও শিশির সেই তরুশিশুকে সজীব রাখিতে পারে নাই, এ কথা আর বলিতে হইবে না। কলিকাতার পাপনিবারিণী সভা সেইরূপ রহস্য আরম্ভ করিয়াছেন। সভা শিশুতরু, অথচ প্রতিদিন সেই উদ্যানের মালীরা একটী একটী বৃক্ষের শিকড় হইতেছে কি না, তুলিয়া দেখিতেছেন। চুঁচুঁড়ার ডাক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের যন্ত্রে একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল,—কি পুস্তক, তাহা সাধারণে দর্শন করেন নাই, কিন্তু পাপনিবারিণী সভা তাহা পাঠ করিয়া অশ্লীল বুঝিয়াছিলেন,—বুঝিয়াই যদু বাবুকে পুলিসে দিবার চেষ্টা পাইয়া—

যদুনাথ ৮০০ পুস্তক দগ্ধ করিয়া অবশিষ্ট দুই শত অধিকারে নাই বলিয়া দোষ ক্ষালন করাতে সভ্য পুরুষেরা ক্ষান্ত হইয়াছেন। আমরা এই কথা কল্য শুনিয়াছি, কিন্তু পাপনিবারিণী সভা সত্য সত্য এ পাপ ক্ষমা করিয়াছেন কি না, তাহা শুনি নাই। তাঁহারা যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা উত্তম, অশ্লীলতার সহিত সভার আর সাক্ষাৎ না হয়, তাহাও ইচ্ছা, কিন্তু কোন্‌গুলি রসায়নশাস্ত্রমতে প্রকৃত অশ্লীল, তাহা এখনো বুঝিতে অবশিষ্ট আছে। সেই জন্য দুইবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, অশ্লীলতা কি ?

যে শব্দ শুনিলে হঠাৎ অশ্লীল বলিয়া মনে হয়, সেটি অশ্লীল না হইলেও হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার কালিদাসের কুমারসম্ভবের রতিবিলাপে স্তন শব্দ কাটিয়া বক্ষ করিয়াছিলেন। সেই দিন অবশ্য তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল, স্তন কথাটি অশ্লীল। কিন্তু আমরা বোধ করি, স্থানবিশেষে ও অর্থবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অর্থ হয়। নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে যেটিতে ঘৃণা হয়, পবিত্র বালকবালিকা সম্বন্ধে সেটিতে স্নেহ হয়। "স্তন মর্দ্দন চুম্বন কুঞ্জ কেলী" জয়দেবের এই কবিতা আর "শিশু মুখে স্তন দিলে চুষে খায় ক্ষীর।" এই দুটিই এক শব্দ, কিন্তু দুটিকেই অশ্লীল ভাবিয়া জয়দেবের নায়ককে ও স্তন্যপায়ী শিশুকে এক দিনে যদি পাপনিবারিণী সভা পুলিসে দিতে পারেন, তবে তাঁহাদিগের উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা হয়। তথাচ বোধ হয়, ততদূর ঊর্দ্ধে উঠিতে সভার প্রবৃত্তি হইবে না। কারণ যাঁহারা সভা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত, মার্জ্জিতচিত্ত এবং অমল নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্র, তাঁহারা রসায়নশাস্ত্রের রূপভাগ কাহাকে বলে, আমাদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন। যে শব্দ অর্দ্ধেক শুনিলে এক অর্থ, পূর্ণ শুনিলে

অন্য অর্থ, তাহা অশ্লীল হইতে পারে না। যেমন ভগবান ও ভগবতী। এই দুই চারিটি কথা নিতান্ত অশ্লীল বলিয়া কখনই ত্যাগ করা যায় না। অনুষ্ঠিত সভার কোন মহাত্মা সভ্য হঠাৎ তাহা বলিতে পারেন না। যদি ইহা সিদ্ধ হইল, তবে আমরা কেন না বলিব, অশ্লীলতা কি? অধর চুম্বন, শুনিতে অশ্লীল, কিন্তু যখন আমরা কোন কবির বিরচিত—

"সূর্য্য বংশ চূড়ামণি, রঘুনরবর।
তনয়ে লইলা কোলে চুম্বিয়া অধর ॥"

এই দুই চরণ উচ্চারণ করিব, তখনও কি অশ্লীলতার আভাস আসিবে? শব্দকার ও কাব্যকারদিগের মহিমা অনন্ত। শব্দবিজ্ঞানের কৌশলও অতি চমৎকার। এক একটি শব্দের অর্থ নানা প্রকার, যদি অভিধান মান্য না কর, ব্যবহার মান্য করিব না, বলিতে পার না। যে রস যাঁহার সুপরিজ্ঞাত, সেই রস তাঁহার পক্ষে আন্তরিক আনন্দপ্রদ হয়। আর যে অরসিক তাহা বুঝিতে পারে না, সেই ব্যক্তি তাহাকে অশ্লীল বলিয়া চীৎকার করে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ নিউটন মহাকবি সেক্সপিয়রের সমস্ত কাব্যভাণ্ডার পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা কি জ্ঞান লাভ হয়?

দার্শনিকদিগের মুখে এ প্রশ্ন শুনিতে অতি মিষ্ট। কিন্তু কবিরা তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে পারেন না। কারণ কবির হৃদয়ে স্বয়ং বাক্য স্বরূপিণী বাক্‌বাণী বিরাজ করেন। কল্পনাদেবী আকাশে আকাশে খেলা করেন। দেবতারাও নিশা, নিদ্রা ও স্বপ্নকে সঙ্গে করিয়া সূর্য্যপ্রতিম শুভ্র তেজে কবির হৃদ্‌পদ্ম ফুটাইয়া দেন। সে কল্পনার সহিত অশ্লীলতার কুটুম্বিতা হইতে পারে না। কেন পারে না? অতি অল্প দিনের কথায় আমরা তাহা বুঝাইয়া দিতে

পারি। কতিপয় নববঙ্গ-যুবক গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতাকে অশ্লীল বলেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে তাহা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সুকবি সুন্দর রাজা বীরসিংহ সমক্ষে যে পঞ্চাশটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দরের হউক; ভারতের হউক, অথবা সত্য সত্য কোন অজ্ঞাত নাম চোর কবিরই বিরচিত হউক, তাহাতে মহিমা আছে। চোরপঞ্চাশৎ অশ্লীল, অশ্লীলতা নিবারিণী সভা তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা একটু মনোযোগ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন, তাঁহারা ঐ মতে ধূয়া ধরিতে লজ্জিত হন। বিদ্যা-সুন্দরেই তাহার ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যা দর্শন করিয়া বিদ্যা-পক্ষ ও কালীপক্ষ যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা যদি বলেন, চোর পঞ্চাশৎ অশ্লীল, তবে আমরা দুঃসাহসে বলিব, তাঁহাদিগেরই দুঃসাহস।

সকলেই স্বীকার করিতেছেন, বঙ্গদর্শন নামক মাসিক পত্র বঙ্গ-দেশের মধ্যে যুক্তিপথে শ্রেষ্ঠ। আমরাও ইহা স্বীকার করি, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক, বঙ্গদর্শন ভারত-চন্দ্র রায়ের শত্রু। বঙ্গদর্শন সম্পাদক, স্বভাবে উচ্চ, শিক্ষায় উচ্চ, সংস্কারে উচ্চ, এবং বহুদর্শনেও উচ্চ। বড় দুঃখের বিষয়, উচ্চতার সহিত সংস্কারের সম্বন্ধ যেন কিছু কাছাকাছি। এই পৌষ মাসেই তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গালিরা অশ্লীলতা প্রিয় জাতি। প্রাচীন কবি-ওয়ালাদিগের গীত ও পাঁচালী তাহার প্রমাণ। এতদ্দেশীয় ইতর স্ত্রীলোকেরা যে সকল বুলি বলিয়া কলহ করে, তাহাও আমাদিগের জাতীয় অপবাদের সমুজ্জ্বল প্রমাণ। একে একে আমরা সকল কথা-তেই সায় দিতে পারিতাম, কিন্তু বাবু বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের স্বদেশকে বিস্মৃত হইয়াছেন কি না, এই আকস্মিক চিন্তাতে কিছু পশ্চাদ্গামী

হইতেছি। এ দেশের পাঁচালী ওয়ালারা শেষ রাত্রে খেঁউড় গীত গায়। দাশুরায়ের পাঁচালীর শেষ খণ্ডেও মধ্যে মধ্যে অনুচ্চারণীয় খেঁউড় ছিল। ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন জারী হইয়া অবধি বট-তলার স্বরস্বতী দণ্ডভয়ে তাহার প্রতি বাম হইয়াছেন। বাবু বঙ্কিম-চন্দ্র তাহাও অবগত আছেন বোধ হয়, কিন্তু তিনি যে প্রাচীন কবি-ওয়ালাদিগকে অশ্লীলতার উদ্দীপক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেটি তাঁহার তুল্য গুণজ্ঞ, রসজ্ঞ লোকের উপযুক্ত হয় নাই। আমাদিগের দেশে একশত বৎসরের মধ্যে যতগুলি কবি জন্মগ্রহণ করিয়া পরলো-কের অতিথি হইয়াছেন, ভারতচন্দ্র ব্যতীত অপরাপর কবি অপেক্ষা হরুঠাকুর ও রামবসু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবি। সখীসম্বাদ বিরহ ও ঠাক্রুণ বিষয় কবিওয়ালাদিগের গরিমা। এ পর্য্যন্ত কোন কবি সে গরিমার অংশী হইতে পারেন নাই, ইহা আমরা অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি। যে পাপনিবারিণী সভা ভক্তিতত্ত্ব ও পবিত্র তত্ত্বের উপাসক, সে সভা যদি কায়মনে চেষ্টা করেন, তথাচ পরলোকগত কবিওয়ালা-দিগের সঙ্গী হইতে পারেন না। তবে একটি আপত্তি খেঁউড়। সে আনন্দ যখন ছিল, তখন ছিল, এক্ষণ আর তাহা নাই। কবির খেঁউড় ও পাঁচালীর খেঁউড় বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে বলিলে আমরা বড় মিথ্যাবাদী হইব না। বঙ্গদর্শন সম্পাদক অতি অমায়িক লোক। তিনি কবি, সুতরাং আদিরসের বন্ধু। দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শেষকালে একটি ঠোকর দিয়াছেন। মালী, তুমি বাগান পরিষ্কার কর, কিন্তু দেখিও, যেন, কন্টকবৃক্ষ ও বিষবৃক্ষ ছেদন করিতে গিয়া সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ ও মিষ্ট ফলপ্রদ রসাল বৃক্ষ স্পর্শ না কর। তিনিও যাহা বলিয়াছেন, আমরাও তাহাই বলিতেছি। সাহিত্যসংসারে ও সাহিত্যভাণ্ডারে কবিতা একটি পরম সুন্দরী নায়িকা। যদি আমরা

তাহাকে উপযুক্ত অলঙ্কার দিতে পারি, অতি অপূর্ব্ব শোভা হয়। যে যে উপাদানে সেই অলঙ্কার, তাহা মানুষে নির্ম্মাণ করিতে পারে না। আকাশনন্দিনী কল্পনা সুনিপুণা স্বর্ণকারের স্ত্রীর প্রতিনিধি হন। পাপনিবারিণী সভা যদি কিছু মনোযোগ দিয়া শুনেন, বুঝিতে পারিবেন, কবিতার প্রথম রসের নামই আদিরস। সেই রসকে যদি তোমরা দরিদ্র বোধ কর, তথাপি তাহার অনেক অলঙ্কার। একটি শব্দ স্থান ভ্রষ্ট হইলে অনেক দোষ পড়ে। সেই জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অশ্লীলতা কি? মহারাষ্ট্রীয় রমণীরা এবং শ্রীবৃন্দাবনের আহিরিণীরা উলঙ্গ হইয়া স্নান করে। অশ্লীল বলিয়া সে প্রথা তাহাদিগের নহে, দেশের রীতি ও জাতির ব্যবহার। যাঁহারা পাপনিবারিণী সভার সভ্য, তাঁহারা কি সেই সকল অবলাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া পুলিসে দিতে পারেন? যদি না পারেন, তবে আমরা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিব, অশ্লীলতা কি? এতদ্দেশে যাঁহারা এখন জীবিত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পাঁচ সাত জন উচ্ছিষ্ট কবি। কোন্ অলঙ্কারে কে পুলিসে যাইবেন, সমাজের বন্ধু নামধারী বীরপুরুষেরা তরবারি দেখাইয়া তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অশ্লীলতা কি? অধিক শঙ্কাতুর রামায়ণ ও মহাভারত ব্যবসায়ী বটতলা। কারণ বাল্মীকি লম্পট ছিলেন, বেদব্যাস জারজ। রাজা দশরথ দশ সহস্র মহিষীর পতি, লঙ্কেশ্বর পরনারী চোর, বেদব্যাস ভ্রাতৃবধূ অভিগামী, পাণ্ডবেরা দেবতার ঔরসপুত্র। যদি আমরা রামায়ণ ও মহাভারত রাখি, পাপনিবারিণী সভার অনুগ্রহে আমাদিগকে পুলিসে যাইতে হইবে কি না? যদি যাইতে না হয়, তবে আমরা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিব, অশ্লীলতা কি?

মদালসা।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

তখন কুণ্ডলা চিরবাঞ্ছিত পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইল দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিলেন, অয়ি প্রিয়সখি মদালসে! এতদিনের পর আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল, তুমি যে সৎপাত্রে বিন্যস্তা হইলে, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম। কাহার মনে ছিল যে, বিধাতা এরূপ সংঘটন করিবেন। এখন তুমি রাজকুমারের অঙ্ক-লক্ষ্মী হইয়া মনের সুখে কালযাপন কর। তুমি যেরূপ রূপশালিনী ও যে প্রকার তোমার সুশীলতা, তদনুরূপ পাত্রেরই হস্তগতা হইয়াছ। আজ স্বর্ণলতা মহামূল্য মণি সংযোগে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তোমা-দিগের এই সংযোগে কে না প্রীত ও হর্ষিত হইবে? রাজহংসীরে মানস বিলাসিনী দেখিলে কাহার না প্রীতির উদয় হয়? চন্দ্রগতা লক্ষ্মীর ন্যায় তুমি এখন নরচন্দ্র রাজকুমারের সন্নিধানে সমধিক শোভাশালিনী হও। তোমাদিগের দাম্পত্যস্নেহ যেন বন্ধুজনের আনন্দকর হয়। সখি! আর অধিক কি কহিব, আমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বৈধব্যোচিত নিজকর্ত্তব্য সাধনে চলিলাম। তুমি আমারে প্রশস্ত মনে বিদায় দাও। অতঃপর আমি নিরতমানসে দুস্তর তপস্যা করিব। নানা তীর্থসলিলে বিধূতপাপা হইব। ঈদৃশ অব-স্থায় আর সন্তুষ্ট থাকিব না। যাহার নিমিত্ত এতকাল অপেক্ষা করিয়াছিলাম, দৈব এখন তাহা সুসম্পন্ন করিলেন। সখি! আবার বলিতেছি, আমায় বিদায় দাও। স্নেহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করিবার সময়ে মনে একরূপ ত্বরা হইয়া থাকে, তাহা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সাতিশয় বলবতী হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এই প্রকৃত অবসর, এই সময়ে একবার বল, আমি তোমাকে ভুলিয়া গন্তব্য দেশে প্রস্থান

করিব। এই কথা বলিতে বলিতে কুণ্ডলার হৃদয়নিহিত স্নেহ-সাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। প্রেমভরে প্রিয়সখীরে আলিঙ্গন করিলেন, নেত্র-নীলোৎপল হইতে বাষ্পবারি অলক্ষিতভাবে বিগলিত হইতে লাগিল। তখন বুদ্ধিমতী কুণ্ডলা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রাজকুমারের প্রতি নেত্রপাত করিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন, নৃপকুমার! অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও নানাশাস্ত্র বিশারদ, ভবাদৃশ সুধীর জনের প্রতি পণ্ডিতেরাও উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। আমি নারী ও অল্পবুদ্ধি, আপনাকে উপদেশ বাক্য বলিতে হইলে, আমার অত্যন্ত চাপল্য প্রকাশ হয়। আপনার বিনয় গুণ, মধুর সম্ভাষণ ও উদারভাব আমাকে বিশ্বস্ত ও সাহসী করিয়া তুলিয়াছে; আর প্রিয় সখীর প্রবলস্নেহ আমারে অধিকতর মুখরা করিতেছে, এই কারণেই আমি স্ত্রীজাতির অননুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। অতএব আপনাকে যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা উপদেশ মনে করিবেন না, বিদিত বিষয়ের উদ্বোধক বলিয়া ভাবিবেন। এই বলিয়া কুণ্ডলা সবিনয় বচনে পুনর্ব্বার কহিলেন, যুবরাজ! শাস্ত্রকারেরা কহেন, ভর্ত্তৃ-সহায়িনী ভার্য্যাই গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধনের মূল। ভার্য্যা ও ভর্ত্তা পরস্পর বশবর্ত্তী হইলে অনায়াসেই ত্রিবর্গ সিদ্ধি হইতে পারে। আর ভর্ত্তা সর্ব্বদাই পতিরতা পত্নীকে ভরণ পোষণ করিবেন, ইহাই শাস্ত্রবিদ্‌গণের অভিপ্রায়। সহধর্ম্মিণী বিনা ভর্ত্তা ধর্ম্মই হউক, অর্থই হউক অথবা কামই হউক, কিছুই লাভ করিতে সমর্থ নহেন। পত্নীও পতির অভাবে ধর্ম্মাদি লাভ করিতে পারেন না। যখন যাগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তখন ভার্য্যার প্রয়োজন হইয়া থাকে, কেন না, সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই শাস্ত্রসম্মত কার্য্য। স্বামী অর্থ আহরণ করেন

বটে, কিন্তু গৃহে সুশীলা ভার্য্যা না থাকিলে তাহা যথাবিধানে রক্ষিত ও সঞ্চিত হইতে পারে না, অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। আর পতিপরায়ণা পত্নীর বিরহে গৃহপতিদিগের অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনাই নাই। বৃদ্ধ পিতা মাতার পূজা, অতিথিগণের সৎকার ও ভৃত্যবর্গের পরিরক্ষণ প্রভৃতি সকল কার্য্য পুরুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর দেখুন, সন্ততি না থাকিলে পিতৃ ঋণ হইতে মুক্তিলাভ হয় না। সেই সন্তান ভার্য্যা হইতেই প্রাপ্ত হইতে হয়। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে পত্নীর সদ্ভাব নিতান্ত আবশ্যক। আপনি যথাবিধি প্রিয়সখী মদালসার পাণিগ্রহণ করিলেন, ইনি এখন আপনার ধর্ম্ম-পত্নী হইলেন। সর্ব্বথা ধর্ম্মদৃষ্টি ও স্নেহদৃষ্টিতে ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। কন্যা সৎপাত্রে অর্পিত হইলে কখনই বন্ধুজনের শোচনীয়া হয় না। প্রিয়সখী যখন আপনার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন, তখন যে কোনরূপে ক্লেশভাগিনী হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। তবে যে এ সকল কথা আপনার সমক্ষে কহিতেছি, ইহা কেবল স্নেহ-ধর্ম্ম ও অবলাজাতি-সুলভ চাঞ্চল্যের কার্য্য জানিবেন। যাহা হউক, আমি আপনার করে ধরিয়া বিনয়পূর্ব্বক যাচ্ঞা করিতেছি, আপনি প্রিয়সখীর প্রতি কিঞ্চিৎ স্নেহ রাখিবেন ও ইহাঁর প্রতি দয়া করিবেন। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তোমাদিগের দাম্পত্য সম্বন্ধ উভয়েরই পরম সুখের কারণ হয়। আর অধিক কি কহিব, যুবরাজ! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি নিজ কার্য্য সাধনে চলিলাম। আপনি এখন প্রভূত ধন, সৎপুত্র ও দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিয়া ইহাঁর সহিত দিন দিন বর্দ্ধমান ও পরম সুখী হউন। এই বলিয়া কুণ্ডলা প্রিয়সখী মদালসার সহিত আলিঙ্গন ও রাজকুমারকে নমস্কার করিয়া অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন।

তখন সেই দম্পতী কুণ্ডলার প্রস্থানে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাজকুমার কুণ্ডলার গমনে প্রণয়িনী মদালসাকে ক্ষুণ্ণমনা দেখিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আর প্রিয়সখীরে চিন্তা করিয়া কেন এত কাতরা হইতেছ? সংসারের গতিই এইরূপ, যেখানে প্রণয়, সেই-খানেই বিচ্ছেদ, যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিয়োগ। আমাদিগের এই জগতের সহিত যত সম্বন্ধ আছে, তাহার কোনটীই নিত্য সম্বন্ধ নহে। জন্য বস্তুর সহিত জন্য বস্তুর যে সম্বন্ধ, তাহা কোন না কোন দিন অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। স্নিগ্ধ জনের বিরহে কাতরতার উদয় হয় বটে, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অপর প্রিয় বস্তু লাভে উহা আবার বিস্মৃত হইতে পারা যায়। সকলেই একটী প্রিয় পদার্থে বঞ্চিত হইয়া, সেই সময় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অপর প্রিয় বস্তু সঙ্গমে সহজেই সেই কাতর ভাবের অপনয়ন করে। তুমি প্রাণসমা প্রিয়তমা সখীর নিমিত্ত এখন যেরূপ কাতর ভাবাপন্না হইতেছ, বোধ হয় অন্য প্রিয় বস্তু পাইয়া আবার তাদৃশ প্রণয়াস্পদ সখীরেও ভুলিয়া যাইবে। যদি জগতের সম্বন্ধই অনিত্য ও সংসারের গতিই এইরূপ হইল, তবে অপ্রিয় সংঘটনে অধিক কাতর হইয়া আত্মাকে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি? অল্পবুদ্ধি জনেরাই প্রিয়বস্তু বিরহে অধিতর কাতর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব প্রিয়ে! আর সখীবিরহে ক্ষুণ্ণমনা হইও না, এস এখন স্বদেশে গমন করিবার উদ্যোগ করা যাউক। এই নির্ব্বান্ধব দেশে অবস্থান করিবার আর প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া প্রিয়তমার হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বস্থানে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগি-লেন। মদালসাও প্রিয়তমের প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত ও নবানুরাগ-

ভাজনের সংসর্গ লাভে চরিতার্থ হইয়া প্রিয়-সখীর বিরহজনিত চিত্ত-ক্ষোভ সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! তুমি যে সকল উপদেশ বাক্য কহিলে, তাহাতেই আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে চল স্বদেশে গমন করি, আর ক্ষণকালের নিমিত্তও এ স্থানে থাকিতে সাহস হয় না। এ অতি ভীষণ দেশ, এখানে দুরাচার দৈত্যগণ অবস্থান করে, কোন্ দিন কি বিপত্তি উপস্থিত হইবে, বলিতে পারি না। অতএব সত্বরেই প্রস্থান করা বিধেয়।

রাজকুমার প্রণয়িনীর বাক্য শ্রবণে তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং সেই মহামূল্য মনোজব তুরঙ্গমের সমীপে গমন করিয়া প্রিয়তমারে তৎপৃষ্ঠদেশে আরোপিত করিলেন। তৎপরে আপনিও তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া ঐ অশ্বের পৃষ্ঠোপরি উঠিলেন। অশ্ব বায়ুবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দৈত্যেরা এইরূপে চীৎকার করিয়া উঠিল, রে কাপুরুষ দৈত্যগণ! তোমাদিগকে ধিক্! তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, আমাদিগের অধীশ্বর পাতালকেতু স্বর্গলোক হইতে যে কন্যারত্ন আনয়নপূর্ব্বক বিবাহ করিবেন বলিয়া স্বর্ণময় রাজভবনে রাখিয়াছিলেন, ঐ দেখ, একজন অশ্বারোহী বীরপুরুষ আসিয়া তাহারে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে! ঐ অত্যুচ্চ ঘোষণা পাতালকেতুর কর্ণগোচর হইবামাত্র সে নিজ দলবল সমভিব্যাহারে যুদ্ধসজ্জায় বহির্গত হইল। রাজকুমার যে পথে অশ্বচালনা করিয়াছেন, তাহারাও সেই পথে পবনবেগে ধাবমান হইল, এবং "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ" বলিয়া উচ্চরবে রাজকুমারের প্রতি নানাবিধ কটূক্তি করিতে লাগিল। তৎশ্রবণে বীরবর ঋতধ্বজ ক্রোধাকুল হইয়া অশ্ব ফিরাইলেন। দুর্দ্দান্ত দানবগণ সম্মুখীন হইয়া পরিঘ, গদা, শূল, নিস্ত্রিংশ প্রভৃতি নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ

অস্ত্রজাত তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বীর্য্যবান রাজকুমারও তূণীর হইতে শর সকল বহিস্কৃত করিয়া শরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে শত্রুনিক্ষিপ্ত শস্ত্রজাল ছেদন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে রাজকুমারের সহিত দনুজগণের ঘোরতর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পৃষ্ঠদেশবর্ত্তিনী মদালসা তদ্দর্শনে ভয়চকিত মনে কহিলেন, নাথ! এ আবার কি বিপত্তি হইল! সহস্র সহস্র ঘোররূপী দুর্দ্দান্ত দৈত্য তোমারে আক্রমণ করিয়াছে। এখন কি রূপে তুমি পরিত্রাণ পাইবে? দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। সাহসী বীরপ্রবর ঋতধ্বজ প্রিয়তমাকে ভীত দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি প্রিয়তমে! তুমি আমার পশ্চাৎবর্ত্তিনী থাকিয়া অবলোকন কর। দ্রৌপদীস্বয়ম্বরকালে একাকী অর্জ্জুন যেমন লক্ষ লক্ষ বীরবর যোদ্ধৃগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজ আমিও ঐ দুরাচার দানবদিগের প্রাণসংহার করিব, তুমি নির্ভয়মনে অবলোকন কর। সিংহের সহিত সম্মুখ সমরে মেষগণ কি কখন সমর্থ হইতে পারে? এই বলিয়া নৃপকুমার শরজালে দৈত্যদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন। পাতালভূমি দৈত্যরুধিরে অভিষিক্ত এবং ছিন্নমুণ্ড ও ছিন্ন-কলেবরে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তখন তিনি তূণীর হইতে ত্বাষ্ট্র অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক দৈত্যদিগের প্রতি চালিত করিলেন। কাপিল তেজঃ যেমন ষষ্টিসহস্র সগর-তনয়কে ভস্মসাৎ করিয়াছিল, সেইরূপ ঐ ঋতধ্বজ প্রহিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সুশাণিত দিব্য অস্ত্র পাতালকেতুর সহিত সমস্ত দানবকুলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

তখন অকুতোভয় রাজকুমার হাস্য করিয়া অশ্বচালনপূর্ব্বক প্রিয়তমা মদালসার সহিত সমরসংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বেগবান কুবলয়াশ্ব পূর্ব্ব পরিচিত পথে অতি-

বেগে ধাবমান হইয়া দেখিতে দেখিতে পাতালতল অতিক্রম পূর্ব্বক ধরণীতলে উপনীত হইল। তদনন্তর রাজকুমার পিতৃভবন-দ্বারে উপস্থিত হইয়া অগ্রে স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, পরে শশিমুখী মদালসাকে ধারণপূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইলেন। রাজকুমার নিজ ভবনে উপনীত হইলেন দেখিয়া, রাজপুরীর যাবতীয় লোক আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল। পুরমধ্যে শঙ্খ, মুরজ, বেণু, বীণা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। তখন নৃপনন্দন স্বীয় প্রিয়তমার সহিত রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন। নবোঢ়া মদালসাও লজ্জাবনত বদনে শ্বশুরচরণে প্রণত হইলেন। পরে যুবরাজ গালবাশ্রমে শূকররূপী দৈত্যের প্রতি শরক্ষেপ হইতে পাতালে গমন, মদালসার সহিত পরিণয় ও দৈত্যকুল বিনাশ পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত বিস্তার ক্রমে বর্ণন করিলেন। মহারাজ শত্রুজিৎ পুত্রমুখে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং প্রেমভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বধূবরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

নব বধূর সহিত সমাগত পুত্রকে দেখিয়া ঋতধ্বজ-জননীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অন্যান্য পুরনারী ও পতিপুত্রবতী পুরস্ত্রীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিয়া পুত্র পুত্রবধূকে ঘরে লইলেন। অসামান্য রূপলাবণ্যবতী মদালসার দেহপ্রভায় রাজভবন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যাবতীয় রমণীগণ মদালসার সৌন্দর্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার রূপ ও মনোহর কান্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ শত্রুজিৎ আত্মজমুখে তাঁহার চরিত সকল শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি কুমার ঋতধ্বজকে স্বসন্নিধানে বসাইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি

অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার সৎ পুত্র, তুমি ধর্ম্মাচারী ঋষিদিগকে দৈত্যভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার পিতৃপুরুষগণ যে সুমহৎ যশঃ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বীয় পরাক্রম-দ্বারা বহুলীকৃত ও বিস্তারিত করিয়াছ। যে পুত্র পূর্ব্ব পুরুষদিগের সঞ্চিত ধন, মান, কীর্ত্তি ও বীর্য্য পরিবর্দ্ধিত করেন, শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট পুত্র ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ কহিয়া থাকেন। আর যাঁহারা পূর্ব্বোপার্জ্জিত ঐ সমস্ত রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহারা মধ্যম পুত্র বলিয়া আখ্যাত হয়েন, এবং যে সকল পুত্র ঐ সকল বিনষ্ট করেন, তাঁহারা অধম পদবাচ্য। অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণদিগের পরিত্রাণ, পাতালতলে গমন ও তত্রত্য দৈত্যকুল ধ্বংস করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তুমি পূর্ব্বপুরুষ হইতে অধিক যশস্বী ও উৎকৃষ্ট। তোমারে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি অসাধারণ ধীশক্তি, প্রভূত পরাক্রম ও দানশীলতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের আধার, অতএব তোমাকে পাইয়া আমি শ্লাঘ্যতা লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি শৌর্য্য বীর্য্য দ্বারা খ্যাতি-লাভ করিতে না পারে, তাহার জন্মই বৃথা। তুমি আমার বীরপুত্র, তোমার দ্বারা আমিও এই লোকে বিশ্রুত হইলাম। অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ধনী, মান্য, সুখী ও ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া নবোঢ়া গন্ধর্ব্বতনয়ার সহিত সুখে কাল যাপন কর। কদাচ যেন তোমাকে সেই গন্ধর্ব্বতনয়াবিয়োজিত হইয়া কালক্ষয় করিতে না হয়। রাজা শত্রুজিৎ এইরূপে বহুবিধ প্রিয়বাক্য বলিয়া প্রেমালিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক প্রিয়তম পুত্রকে অন্তঃপুর গমনার্থ বিদায় করিলেন। রাজকুমারও পিতৃদেবের নিকট বিদায় পাইয়া অন্তঃপুরমধ্যে নবপ্রণয়িনীর সহবাস সুখে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি কোন

অনুচরী মুখপানে চাহিয়া রহিল, কিছু উত্তর করিতে পারিল না। রাজকুমার কি কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে তাহা জানিতও না। স্বধু সে কেন, সহচরীরা কেহই জানিত না। রক্ষক, পার্শ্বচর, অনুচর, যাহারা শিবিরের তত্ত্বাবধান আর রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা জানিত, কিন্তু তাহাদিগের সহিত এ লজ্জাবতীর সাক্ষাৎ নাই। কিঙ্করীরা রাজপুত্রের নিদেশ অবগত ছিল না কেন?—কারণ আছে। রাজকুমার যখন শিবিরে ছিলেন, তখন একজনও স্ত্রীলোক সঙ্গে ছিল না, সুতরাং পরিচারিকা ছিল না। পত্রিকা আসিবে, এই নিমিত্ত উহারা নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে; কাজেই পত্রিকার প্রশ্নে উত্তর করিতে পারিল না। পত্রিকার বদন একবার বিষণ্ণ, একবার প্রসন্ন, একবার অন্যমনস্ক, আবার তখনি উজ্জ্বল হইল। মৃদু নতমুখে ঈষৎ হাসি আসিল। এত ঘন ঘন কেন এ ভাবান্তর?—কে বলিবে?

একজন সহচরী কিছু অধিক চতুরা ছিল, সে কাঁচু মাচু মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেবি! রাজপুত্র কে?—আপনি গন্ধর্ব্বকুমারী, আমরা আপনারেই চিনি,—আপনার লোকেরাই আমাদের এখানে আনিয়াছে,—রাজকুমার কে?—আর তিনি আপনারে কি কথাই বা বলিয়া গিয়াছেন? পাঠক মহাশয় এখন বুঝিলেন, আমাদের পত্রিকা এই সহচরীদের নিকটে গন্ধর্ব্বকন্যা নামে পরিচিতা।

"রাজকুমার কে?"—সহচরীর এই প্রশ্নে পত্রিকা মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন;—কহিলেন, কাশ্মীরের যুবরাজ;—মহারাজ আদিত্য সিংহের পুত্র;—নাম শশীন্দ্রশেখর। তিনিই আমারে এখানে রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।—বলিয়া গিয়াছেন, প্রয়াগ

তীর্থে চলিলাম, গিয়াছেন কি না, বিশেষ জানি না। আমি সেই রাজপুত্রের সহোদরা রাজকন্যার গায়িকা।

সহচরী যেন কি স্মরণ করিয়া কহিল, হাঁ দেবি, আমার মনে হইতেছে, ঐ নামে একজন রাজপুত্র এখানে কিছু দিন ছিলেন বটে। তিনি আপনাকে কি কথা বলিয়া গিয়াছেন?

পত্রি।—এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, নীলগিরি হইতে একটী তপস্বীকন্যা এখানে আসিবেন, আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে যাইব। যত দিন তিনি না আসেন, তত দিন পাটনায় এই শিবির থাকিবে। অনেক দিন এখানে আছি, মন চঞ্চল হইয়াছে, আর থাকিতে প্রাণ চায় না। যখন আমি প্রথমে এখানে আসি, তখন তোমরা কেহই ছিলে না, কেবল রাজপুত্রের ৪।৫ জন পার্শ্বচর ছিল, তাহারা পাহারায় থাকিত, আমি বন্দিনীর ন্যায় একাকিনী একটী বস্ত্রগৃহে বাস করিতাম। তদবধিই মন চঞ্চল আছে, সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, সে আর কত দিন?

সহ।—হাঁ, দেবি! এখন বুঝিলাম, কিন্তু তপস্বী-কন্যা?—তপস্বী-কন্যা লইয়া রাজপুত্র কি করিবেন?

পত্রি।—সখি! আমারও মন ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে।—শুনিয়াছি, রাজকুমার সেই কুমারীকে বিবাহ করিবেন।

সহ।—বলেন কি দেবি! ক্ষত্রিয় রাজকুমার তপস্বীকন্যাকে বিবাহ করিবেন?—তপস্বীরা ব্রহ্মযোগী ব্রাহ্মণ।

পত্রি।—তাও জানি, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা।

সহ।—কি এমন প্রতিজ্ঞা দেবি?

পত্রি।—এই প্রতিজ্ঞা, তপস্বীর কন্যাকে রাজপুত্র বিবাহ করিবেন। রাজকুমার যখন তীর্থ যাত্রা করেন, সেই সময় সদাশিব নামে

এক ব্রহ্মচারীর কাছে এইরূপ অঙ্গীকার আছে। আর আমি এটীও শুনিয়াছি, সেই মুনিকন্যা যখন এখা——

কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় একজন খোজা আসিয়া সংবাদ দিল, অনুচরেরা ফিরিয়াছে, শিবিকা আসিয়াছে।

পত্রিকা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সহচরীরাও দাঁড়াইল। কাপড়ের কানাত ঘেরা একটি মূর্ত্তি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দুটি সহচরী আর পত্রিকা ভিন্ন সে গৃহে আর কেহই ছিল না। কানাত মোচন হইল। একটি পরম সুন্দরি রমণী বাহির হইলেন। সঙ্গে একজন শ্মশ্রুধারী ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীর বর্ণ দুধে আলতা গোলা, হস্ত পদ শীর্ণ, মস্তকের কেশ রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু শুভ্রবর্ণ, বক্ষস্থলের লোমাবলী, চক্ষের পাতা ও ভ্রূযুগল শুভ্র বর্ণ, কর্ণবিবর শুভ্র লোমে আচ্ছাদিত, গড়ন নাতি দীর্ঘ, নাতি হ্রস্ব। বয়স অনুমান ৬০ কি ৬৫ বৎসর।

সমাগত কামিনীর আকার মধ্যবিধ, রং চম্পক বর্ণে ঈষৎ গোলাপীর আভা, শরীর নিতান্ত স্থূল নয়, কৃশও নয়, আমাদিগের দেশে যে রকম হইলে, সুন্দরী রমণীকে সুন্দর মানায়, এ সুন্দরী সেইরূপ সুন্দরী। বক্ষস্থল যৎকিঞ্চিৎ স্থূল, সেই স্থূলতায় কোমলতা মাখা, যাঁহারা শতদল পদ্মে মনোযোগ দিয়া নবীন কোরক দর্শন করিয়াছেন, ভাবনা করুন, সেইরূপ প্রতিমা। বাহু, জঙ্ঘা, উরু, করপল্লব নিটোল ও কোমল। বদনমণ্ডল প্রস্ফুটিত শতদল; অক্ষিপল্লব আর দুটি ভ্রূরেখা যেন সেই শতদলে মধুলোভা ভ্রমর। কাণ দুটি ছোট ছোট, গণ্ডদেশ প্রফুল্ল, খগপক্ষী আর বিম্বফল যদি আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে না করে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, এই নরসুন্দরীর নাসিকা আর ওষ্ঠাধর খগচঞ্চু ও বিম্বফলের দর্পচূর্ণকারী।

নিখুঁত। পদচুম্বিত গাঢ় কৃষ্ণ চিকুর, যেন শারদীয় নবীন কাদম্বিনী। নেত্রপুট ঈষৎ রক্তছটা-লাঞ্ছিত উজ্জ্বল ভ্রমরবর্ণ, পরিমাণে আয়ত। গণ্ডের একটু উপরে, কর্ণের একটু পার্শ্বে, ললাটের একটু নীচে, কুঞ্চিত কুঞ্চিত অলকামালা। আমি যদি এই খানে কবি হইতাম, তাহা হইলে কল্পনা সতীর অনুগ্রহে বলিতে পারিতাম, সুরভি কমলের পরিমলে মুগ্ধ হইয়া তিন চারি শারি মধুকর ধারে ধারে উড়িতেছে। পটাবাসে অল্প অল্প বাতাসে, অলকাদাম অল্প অল্প উড়িতেছিল। কপালে স্বেদবিন্দু যেন ছোট ছোট মুক্তামালার ন্যায় বালিকাদের সিঁতির প্রতিনিধি হইয়াছে। অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই। দুই হাতে দুগাছি মৃণালের বালা, গলায় একছড়া কুন্দপুষ্পের হার, পরিধান গেরুয়া বসন, তথাপি সেই রূপে দশ দিক্ প্রভাময়। এম্নি রূপে গৃহস্থের ঘর আলো করে। যে রূপে নির্লগিরিবাসী সন্ন্যাসীর কুটীর আলো করিত, সেই রূপে এখন পাটনার শিবির আলো করিতেছে। বয়স পঞ্চদশ বৎসরের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, কি করিতে যায়।

"গিরিগুহা বাসী মুনিকন্যার কি এত রূপ!"—সহচরীরা এই ভাবিয়া, যেন ছবির ন্যায় স্থির ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পটবাস বাসিনী পত্রিকা সেই রূপ দেখিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কলেবর শিহরিয়া উঠিল, প্রফুল্ল মুখখানি কিছু মলিন হইল,—স্ত্রীলোকে অন্যমনস্ক হইয়া যখন কিছু ভাবে, তখন তাহার চক্ষু, তাহার অধর, আর তাহার লাবণ্য, যেমন মলিন দেখায়, তেমনি মলিন। স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া স্ত্রীলোকের শরীর লোমাঞ্চ কেন? বদন বিষণ্ণই বা কেন? অন্তরে অন্তরে অন্যমনস্কই বা কেন? এই তিন প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি না; পত্রিকা যদি সরল হইয়া বলেন, তাহা হইলেই সন্দেহ ভঞ্জন হয়।

সকলেই উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী ভিন্ন, শিবিরে এখন পুরুষ সঞ্চার নাই। তবে, এ কথাও বলিতে হইবে না, পত্রিকা আর মুনিকন্যা, ইহাঁদের উভয়ের মুখেও অবগুণ্ঠন নাই। দুটী নায়িকারই ঘোম্‌টা খোলা। উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিলেন। আনন্দ, বিস্ময়, সংশয় একত্র হইল। নূতন দর্শনে, পুনঃ পুনঃ বিসদৃশ ভাব কেন, সময়ে জানিবেন, এখন নহে।

তপস্বীকন্যা যখন শিবিরে আইসেন, তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত। শীতকালের রাত্রি, অধিক কথোপকথন হইল না, সংক্ষেপে আগন্তুক পরিচয়ে মিলন হইল মাত্র। আহারাদি সমাপনান্তে সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম করিতে গেলেন। যখন শয়ন করিতে যান, সেই সময় আগন্তুক ব্রহ্মচারী পত্রিকার দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া মুখ বিকট করিলেন। কেন করিলেন, তিনিই ইহার উত্তর দিবেন। আমরা তপস্বীকন্যাকে শতদল কমল বলিয়াছি। আর পত্রিকাকে বিদেশিনী কামিনী বলিয়াছি। পাঠক মহাশয়! আভাসে বুঝিবেন, এই রাত্রে শুভ সংযোগ "কমলে কামিনী।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আলাপ।

" সরল অন্তরে বল, কারে তুমি ভাল বাসো।
সুধাইলে সুধামুখি! মুচকি মুচকি হাসো।"

নিধু বাবু।

তিন দিন অতীত হইয়া গেল। দেখাদেখি হয়, কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু কেহ কাহারও পরিপয় প্রাপ্ত হন না। চতুর্থ দিবসের সন্ধ্যা-কালে, পত্রিকা দেবী হাসিতে হাসিতে গিরিকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয় সখি! সত্য করিয়া বল, তুমি কে?

তপস্বীকন্যা কহিলেন, আমি তোমার প্রিয় সখী হইবার যোগ্য নহি। দেখিতেছি, তুমি রাজকন্যা, আমি বনবাসী ঋষিকন্যা, তুমি আমার পরিচর জিজ্ঞাসা করিতেছ, কিন্তু আমার পরিচয় আমি জানি,না। কে আমার পিতা, তাহাও আমি জানি না। সদাশিব ব্রহ্মচারীকে আমি পিতা বলিয়া জানি, কিন্তু আমি তাঁহার কন্যা কি না, সেটি ঠিক জানি না।

পত্রিকা হাসিয়া উঠিলেন,—কহিলেন, ঋষি কুমারি! তোমার উপযুক্ত কথাই এই বটে! আমি শুনিয়াছি, কাশ্মীর রাজ্যের রাজকুমার শশীন্দ্রশেখর, যিনি এই শিবিরের অধিস্বামী, তিনি তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে, তোমার পিতার গিরিগুহায় অতিথি হইয়াছিলেন। মুনিবর কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন, রাজকুমার অঙ্গীকার করেন, তুমিই সেই অঙ্গীকৃতা কন্যা। রাজপুত্র যখন পাটনা হইতে প্রয়াগ যান, সেই সময়ে আমারে বলিয়া গিয়াছেন, তুমি আসিলে দুটি

একটি সঙ্গীত করিয়া, আমি যেন তোমার মনোরঞ্জন করি। শুনিয়া বড় লজ্জা হইয়াছিল। আমি রাজনন্দিনীর গায়িকা বটে, কিন্তু মুনি-কন্যারা সে রকম সঙ্গীতে সন্তুষ্ট কি না, তাহাই ভাবিয়া লজ্জা। আচ্ছা প্রিয় সখি! তুমি তোমার আপনার পরিচয় আপনি জান না, কে তোমার পিতা. তাহাও জান না, যাঁহাকে পিতা বল, তিনিও যথার্থ জনক কি না, তাহাতেও তোমার সন্দেহ। এগুলি কি আমার সঙ্গে পরিহাস? রাজপুত্র এখানে নাই, তোমার আদর করিবার জন্য তিনি আমায় এখানে রাখিয়া গিয়াছেন। পরিহাস করিও না, যাহাতে তোমার মনের পরিতৃপ্তি হয়, তাহা আমি করিব।

মুনিকন্যা হাসিয়া কহিলেন, তপস্বিনীদের পরিহাস অভিসাপ। রাজপুত্র যাহা তোমায় বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমার প্রিয়।

পত্রিকা।—সঙ্গীত করিতে বলিয়াছেন।

মুনিকন্যা।—তাহাই উত্তম।

পত্রিকা।—তবে বল দেখি, তোমার নাম কি?

তাপসনন্দিনী ঈষৎ হাসিয়া লজ্জাবনত মুখে কহিলেন, আমি আমার নাম জানি না, আমার ব্রহ্মচারী পিতা সদাশিব বলেন, আমার নাম পূর্ণশশী।

পত্রিকার বদন প্রফুল্ল হইল,—হাস্য মুখে কহিলেন, পূর্ণশশী কি সঙ্গীতের এত অভিলাষ করে?

পূর্ণশশী কহিলেন, যাহাকে প্রিয়সখী বলিলাম, তাহার মুখে যাহা শুনি, তাহাই প্রিয়,—তাহাই ভালবাসি। আমার সঙ্গে নিত্য-কামী নামে যে তপস্বী আছেন, তিনিও সঙ্গীত ভাল বাসেন। পত্রিকা শান্তভাবে কহিলেন,—আর রাজকুমারেরও সেই অনুমতি।

মুনিতনয়া হাস্যমুখে একবার পত্রিকার মুখপানে চাহিলেন,

একবার নতমুখে পৃথিবী নিরীক্ষণ করিলেন। কি বলিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পত্রিকা একবার চাহিয়া দেখিলেন, লজ্জার সঙ্গে হাসি খেলা করিতেছে। কুমারী হাসিতেছে না, কিন্তু তাহার সর্ব্বশরীর হাসিতেছে। চক্ষু হাসিতেছে, ওষ্ঠ হাসিতেছে, বক্ষ হাসিতেছে, গণ্ডস্থল ফুল্ল কমলিনীর ন্যায় হাস্য করিতেছে। এই ভাব দর্শন করিয়া তিনি কহিলেন, বুঝিলাম, সঙ্গীত তোমার প্রিয় বস্তু। বীণা লও, আমি সঙ্গীত করিব।

পূর্ণশশী বীণা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, পত্রিকা বীণাস্বরে গীত ধরিলেন।

প্রণয় ভিক্ষা।

(গীত।)

দহিলে দহিলে বোলে, ভ্রমে ব্রজে আহিরিণী।
শ্যাম প্রেম পিপাসিনী, রাধা প্রেম ভিখারিণী।
গলি গলি খুজই, নাচোত তাথই,
বৃন্দাবনচন্দ্র প্রেম, প্রেম সুখ বিহারিণী।
যমুনা পুলীনে, শ্যামরূপ নিহারি,
অহি শ্যাম অহি শ্যাম, বিরহ উচারি,
ধাইলা মত্ত মধুকরী প্রায়ঃ—
নূপুর বাজিছে,ভ্রমর রাজিছে, মত্ত রাধিকা, বিলাসিনী।
যাইমু না যমুনা, রাজকর দিমুনা,
হৈমুনা, ঘোষ দাস দাসীঃ—
যমুনা তীরে, নয়ন নীরে, হব আজু, প্রেম বিহারিণী।

টাকা।

কেবা আমি, কার আমি, কোথা আমি থাকি ?
কেন আমি হয়ে আছি, রজতের চাকি ?
সোণাও কখনো হই, বেড়ে উঠে দর।
রাণীর মুকুট, মাথা, বুকের উপর ॥
এত বড় চিজ আমি, এত সমাদর।
সকলেই পূজা করে, বিশ্ব চরাচর ॥
চাঁদের আকার মম, চাঁদের বদন।
রূপচাদ নাম তাই, ঘোষে ত্রিভুবন ॥
কিন্তু আমি চাঁদ নই, রবি তুল্য হই।
চাঁদেতে কলঙ্ক থাকে, আমাতে তা কই ?
মিছে লোকে দোষ দিয়ে, চাঁদ বোলে ডাকে।
চাঁদের কলঙ্ক কভু, সূর্য্যেতে কি থাকে ?
অকলঙ্ক পূজ্য বস্তু, আমি প্রভাকর।
যার ঘরে থাকি, তার, ঘর প্রভা-কর ॥
এত গুণ ধরি, তবু, দুষী করে লোকে।
নষ্ট লোকে দুষ্ট বলে, দহি মহা শোকে ॥
তাই আমি মনে মনে, করিয়াছি পণ।
মান বাঁচাইয়া নাম, করিব ধারণ ॥
যারে তারে দিব নাকো, লইতে শরণ।
যে আমারে মানে, তারে করিব বরণ ॥

কার ঘরে যাবনা, বা, কার ঘরে রব।
একে একে আজি সব, ভেঙে চূরে কব॥

হে কৃপণ ধনি! তুমি, ছাড় মম আশ।
আর আমি তব গৃহে, করিব না বাস॥
চেনো তুমি আমা ধনে, ভাল বাসো বটে।
কিন্তু তব হাতে মম, আরাম না ঘটে॥
আপনি না খাও পেটে, নাহি দাও খেতে।
ছেলে মেয়ে ভয় পায়, তব পাশে যেতে॥
অতিথিরা ঘৃণা করে, যেতে তব দ্বারে।
আমারি মায়ায় তুমি, ভাঁড়াও সবারে॥
এমনি বঞ্চক তুমি, নারকী চণ্ডাল!
আত্মারে বঞ্চনা কর, পাপিষ্ঠ শৃগাল!!
চাবী দিয়ে রাখো মোরে, লোহার পিঞ্জরে।
যবনের শব সম, শোয়াও কবরে॥
মাটী খুঁড়ে পুঁতে ফেলো, যক্ষ দুরাচার।
ভাল বাসি বোলে বুঝি, এত অহঙ্কার?
মাটীর ঢিলের মত, মর্য্যাদা আমার!
তাই আমি তব গৃহ, করি পরিহার॥

মহাজন! তব পদে, করি নমস্কার!
আমারে বিদায় কর, মাগি পরিহার॥

মহাজন নাম ধর, মহাজন নও !
নামে হেমলতা, কাজে মহীলতা হও ॥
দুর্ব্বল খাতক পেলে, দুনো সুদ ধরো ।
সুদে সুদে ঋণীদের, সর্ব্বনাশ করো ॥
সাধু তুমি, তবু তব, আত্মা বলে চোর !
ছাড়ি আমি তব সঙ্গ, ধূর্ত্ত সুদখোর !!

অপব্যয়ি ! আজি আমি, ছাড়িনু তোমায় ।
আর দেখা হইবে না, তোমায় আমায় ॥
দশ গুণ ব্যয় কর, এক গুণ আয় ।
তা আবার আটগুণ, পাপ কর্ম্মে যায় ॥
কারে দিতে কারে দাও, নাহি বিবেচনা ।
মূঢ় তুমি ! আমি তব, সদনে যাবনা ॥
জানি বটে, সাধুপথে, আছে তব মতি ।
অনাথারা বোলে থাকে, অনাথার গতি ॥
তবু তুমি দুষী তাতে, বুঝনা গুজন ।
তোমারে সদয় হতে, মানা করে মন ॥
মনে কিছু করিও না, যাচিনু বিদায় !
বিবেচনা নাই বোলে, ত্যজিনু তোমায় ॥
তথাপি তোমার প্রতি, ঘুচিল না মায়া ।
সময়ে সময়ে তুমি, দেখা পাবে ছায়া ॥

বিধিজীবি ! হও তুমি, সর্ব্ব গুণাকর ।
বিদ্যা বুদ্ধি যশে, মানে মহা ধনুর্দ্ধর ॥

তোমার নীচের চেলা, ফিচেল বক্তার !
জিবখানি ঠিক তার, তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ॥
তোমাদের কাছে আমি, এই ভিক্ষা চাই।
হাসিয়া বিদায় কর, স্থানান্তরে যাই ॥
তোমাদের সনে মম, মিত্রতা রবেনা।
ঘন ঘন দেখা শুনা, ঘটনা হবে না ॥
তোমাদের আচরণ, বুঝিয়াছি সব !
বিধাতা সে বিধি দিতে, নিজে পরাভব ॥
ফরিয়াদী আসামীরা, মন্ত্র নিতে গেলে।
লুফে নিয়ে মুখে ফেলো, অস্থি দাও ফেলে ॥
একে বারে সেরে দাও, বিচারের আশা।
জন্মশোধ হয়ে যায়, ধর্ম্মশালে আসা ॥
সত্য পক্ষ মিথ্যা পক্ষ, করো না বিচার।
যে পারে অধিক দিতে, জয় গাও তার ॥
অপাপীরে দণ্ড দিতে, কত চেষ্টা পাও।
বোকা হুজুরের কাছে, তারি মাথা খাও।
নরহন্তা, দস্যু, ঠক, পরদারা চোর।
যদি কোরে দিতে পারে, তব বাজী ভোর ! !
যদি তারা তব ভুঁড়ি, পূরাইতে পারে।
পেট পূরে পূজা করে, পঞ্চ উপচারে ॥
তা হলে তাদেরো তুমি, মুক্তিদান তরে।
যুদ্ধ কর ধর্ম্মক্ষেত্রে, মহা গর্ব্ব ভরে !!
পদভরে কাঁপে ধরা, ধাত্রী ভয় পান !

শ্রীমুখে করেন যেন, বাণী অধিষ্ঠান !!
এমন পাষণ্ড তুমি, কাণ্ড জ্ঞান নাই।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সমজ্ঞান, মানো না দোহাই !!
তাই বলি এক ঠাঁই, থাকিবনা ভাই !
তোমারে ছাড়িয়ে আমি, স্থানান্তরে যাই !!
তবে যদি নিজে আমি, পড়ি কোনো দায়।
তখনি কেবল দেখা, পাইবে আমায় !!

রে ঘাতুক ! রণবেশি ! পাপিষ্ঠ পামর !
মম লোভে ধরণীরে, রক্তময়ী কর !!
মম লোভে, রাজ্য লোভে, ধরি তরবার !
বরিষ ধরণীতলে, শোণিতের ধার !!
বিধাতার বংশ নাশ, করিস্ বর্ব্বর !
তব অস্ত্রে হতপ্রাণ, লক্ষ লক্ষ নর !!
নরাশী রাক্ষস তুই, দয়া মায়া ছাড়া !
এই পাপে, মহাপাপি ! হবি লক্ষ্মী ছাড়া !!
ছাড়িলাম আমি তোরে, ছাড়িলাম আজি।
রাখ্ তোর পাপ অসি, পাপরক্তে মাজি !!
তোরি পাপে ধরাধামে, কলঙ্ক আমার।
টাকা টাকা কোরে লোকে, করে মহামার !!
আর আমি কলঙ্কের, সাগরে নাব না।
যে পথে চলিবি তুই, সে পথে যাবনা !!

আর আমি তোর পাপ ছায়া মাড়াবনা।
যে পথে বাতাস যাবে, তথা দাঁড়াবনা॥
আজি হতে তোরে আমি, করি পরিহার।
এ জনমে দেখা শুনা, হবেনাকো আর !!

ওহে ধনি ! অভিমানী, নামের কারণ।
তোমারেও আজি আমি, করিনু বর্জ্জন॥
দারিদ্র দয়ার পাত্রে, বঞ্চনা তোমার।
নাম লোভে বড় চাঁদা, মুক্ত যশোদ্বার !!
মোসাহেব, তোষামুদে, বারবিলাসিনী।
তোমার বিলাস বস্তু, দিবস যামিনী॥
তাদের লইয়া থাকো, সই কর চাঁদা।
আমারে বিদায় কর, নাম লোভী দাদা !!
দূরে থেকে তোমাধনে, করি নমস্কার !
এ ভাব যদিন রবে, আসিব না আর !!

সব যদি ছাড়িলাম, কোথা তবে যাব !
কোথা গেলে যথারূপ, সমাদর পাব ?
ধার্ম্মিকের ঘরে যাব, রবে সাধু ভাব।
সাধুর পবিত্র ভাব, হবে আবির্ভাব॥
সেই ভাল, তাই করি, বৃদ্ধি হবে মান।
পূর্ণ শশী কোলে আজি, লভিলাম স্থান॥

পৌষ মাসের কোকিল।

ওই যে পাখীটি সখি ! দেখিছ শাখীতে রে !
চেনো কি উহারে ?
বল দেখি কোন্ দুখে, রহিয়াছে হেঁট মুখে,
কি ভাবিছে মনে মনে, ডাকিছে কি কারে ?
সখি ! চেনো কি উহারে ?

কত যে কি ভাবিতেছে, মানসে মানসে রে !
কে বলিতে পারে ?
ডালে বোসে ভেবে খালি, হয়ে গেছে অঙ্গ কালী,
চক্ষু দুটী রক্ত বর্ণ ঘন অশ্রুধারে !
আহা ! চেনো কি উহারে ?

কোকিল উহার নাম, বসন্তের সখা রে !
মানস মোহন !
বড় কদাকার পাখী, কালো কোরে আছে শাখী,
দেখিলেই হেসে উঠে আমার নয়ন !
সখি ! চেনো কি এখন ?

তুই লো কেমন হাবা, অভাগীর সখী রে !
কথা নাই মুখে !

ডালে বোসে কালো পাখী, দেখিলে না মিলি আঁখি,
ম্লান মুখী হয়ে আছ, কিসের অসুখে ?
সখি ! কোন্ মনোদুখে ?

কারে লো দেখাস্ অভিমান প্রিয় সখীরে !
কিসে অভিমান ?
কাঁদো কাঁদো হাসি মুখ, কিছু যেন নাহি সুখ,
পাখী ম্রিয়মাণ বোলে, তুমি ম্রিয়মাণ ?
সখি ! কেন অভিমান ?

নীরব কুরব পিক, তাই বুঝি ঘৃণা রে !
এ যে পৌষ মাস !
এমাসে কি মধুস্বর, ভেঁজে থাকে পিক বর,
এমাসে কি থাকে তার, মানস উল্লাস ?
সখি ! এ যে পৌষ মাস !

জানো না কি সখি ! তুমি, বিধাতার খেলা রে !
দারুণ বিষাদ !
এমাসে হিমানী বলে, কমলিনী ডোবে জলে,
পাণ্ডু হয় পূর্ণিমার রজতের চাঁদ !
সখি ! এ বড় বিষাদ !

ডাকে না কোকিল পাখী, শীতের প্রতাপে রে !
মনোদুখে রয় !
বাস করি বাঁশ বনে, দিনে দিনে দিন গণে,
ভাবে সুধু, কবে হবে বসন্ত উদয়।
সাধে, মনোদুখে রয় ?

—

(ভাল !) ভাল কি পারেনা বিধি, করিতে ভালোর রে !
ভালই মজায় !
পদ্ম, চন্দ্র, মধুকর, আমাদের পিকবর,
শীতে বিধাতার হাতে নট হয়ে যায় !
বিধি, ভালই মজায় !

—

যা হোক্, রবেনা সখি ! এ দিন কুদিন রে !
শুভ দিন হবে।
হিমঋতু হয়ে ক্ষয়, বসন্ত চন্দ্র উদয়,
হবে পুনঃ সুখী হবে, দ্বিজ রাজ রবে।
পুনঃ, শুভ দিন হবে !

—

ওই যে পাখীটি সখি ! দেখিছ নামিছে রে !
লুটাইতে ভূমি !

চেঁচায়ে দিবাযামিনী, জ্বালাইবে বিরহিণী,
জ্বলিতেছি যথা হেথা, আমি আর তুমি !
সখি ! আমি আর তুমি !!

মকর।

আজি পূর্ণ-মাসী নিশা, হাসে নিশাকর,
হাসি হাসি বলিতেছে, আসিছে মকর।
মকরে প্রখর হন, দেব প্রভাকর,
হিমানিল দূরে যায় বহে প্রভাকর।
বিমল দক্ষিণানিল দিবা শেষে বহে,
বিয়োগিনী বিয়োগীর মন বন দহে।
শাখে বসি কুহুস্বরে ডাকে পিক-বর,
সেই স্বর জ্ঞান হয় যেন খরশর।
আয় আয় পাখী তোরে লুকাইয়া রাখি,
তোরে নিয়ে সুখী হই, মিলিবনা আঁখি।
যদি আমি অনাথিনী বিরহিণী হই,
কারে কব মনোদুখ তোরি কাছে কই।
যে ঋতু দুরন্ত ঋতু হেমন্ত দুর্জ্জয়,
বিরহিণী নাশ করে, হয়ে নিরদয়।

দয়া মায়া নাহি যার কি বলিব তারে,
মিছে আমি হত্যা দিই, ডাকি দেবতারে।
দেবতারা জেগে নাই ঘুমে অচেতন,
কে বুঝিবে অভাগীর বিরহ বেদন ?
পতি মম বেঁচে আছে, লোকে মুখে কয়,
সধবা হইয়ে আছি, ফুটিবার নয়।
ফুটিতে মনের খেদ চক্ষে বহে নীর,
বিধাতা নিদয় বড় ভাগ্যে অধীনীর।
আন্‌চান্‌ করে প্রাণ তবু নাহি যায়,
মরি আমি বিরহিণী হায় হায় হায় !!
বিরহে ঝরিছে মম যুগল নয়ন,
কাল হয়ে এলি কিরে উত্তর অয়ন ?
কোথা মম প্রাণপতি কে বলিয়া দিবে ?
বলিলে কি সে নিঠুর ভবনে আসিবে ?
আসিয়ে কি দিবে মোরে প্রেমরূপ কর,
বলিতে কি পার সখি ! বসন্ত মকর ?
তোমারে মকর আমি বড় ভাল বাসি,
ছেলে বেলা থেকে তোর নাম শুনে হাসি।
হাসাও আমারে আজি ভাসাও হরষে,
মজি যেন তব প্রেমে বরষে বরষে।
আর যেন প্রেম ধারা না বরষে চোকে,
আর যেন ধারা হেরে হাসে নাকো লোকে।

আন রে মকর আন পতিরে আমার,
দাসী হয়ে সেবা করি চরণ তোমার,
ডাকরে কোকিল ডাক পিয় পিয় বোলে,
আয় পাখী সুখী হই আয় করি কোলে।
বসন্ত রাজারে আমি দিব রাজ কর,
যদি আজি দয়া করে সুখের মকর।
ভাগীরথী জলে আজি ডুব দিব গিয়া,
বিরহ তাপিত প্রাণ বিরহিণী হিয়া।
জুড়াইবে গঙ্গাজলে, হব গঙ্গাজল,
মকর, আমার তুমি হবে গঙ্গাজল।
দুই নামে সখী তোরে ডাকিব এখন,
দয়া করে এনে দেও পতি প্রাণ ধন।
না আনিতে পার যদি, কররে নিরাশা,
ভেঙে যাক্ অধীনীর প্রণয়ের বাসা।
ঘুচে যাক্ দিন দিন প্রাণেশের আশা,
ঠাণ্ডা হোক্ অভাগীর প্রেমের পিপাসা।
রাজা নাই কারে আমি দিব রাজ কর,
তোতে মোতে জড় হয়ে মরিব মকর।

রাক্ষসী।

ধন্য রাক্ষসি! তোর যে কি মোহিনী শক্তি, তাহা কে বুঝিতে পারে? তোর প্রাদুর্ভাবে আমাদের দেশ একেবারে ছারক্ষার হইবার উপক্রম হইতেছে। হে ভারতবাসি গণ! তোমাদিগকে বিনীত ভাবে কহিতেছি, যাঁহারা ঐ ভীষণ রাক্ষসীর সহিত পরিচয় করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করুন, যাঁহারা পরিচয় করেন নাই, তাঁহারা যেন উহার নিকটেও না যান। যদি দেশের উন্নতি করিতে চাও, যদি আপনার হিত কামনা কর, যদি সন্তানগণকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সর্ব্বপ্রকারে সেই মৃত্যুরূপিণী গরলকণ্ঠা রাক্ষসীর সংস্রব পরিহার কর। উহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। অনেকে কহেন, অল্প উপচারে রাক্ষসীর পূজা করিলে বিস্তর উপকার হইয়া থাকে; উহা কি সত্য? আমি কহিতেছি, সে কথা কথাই নহে। ঐ মন্ত্রের কুহকে পড়িয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। যে বস্তু স্বয়ং অপবিত্র ও যশ, মান, ধন, প্রাণ সকলই বিনষ্ট করে, তাহার সহিত কি অল্প পরিচয় সুখপ্রদ হইতে পারে? নীচের সংসর্গ ভাল নয়, কিন্তু অল্পকাল সংসর্গ ভাল, ইহা কি কখনো যুক্তিসম্মত হয়? অতএব আমি সকলকেই বিনীতভাবে কহিতেছি, কখনই যেন কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ পাপাচারিণী রাক্ষসীর কুহকে না পড়েন।

রাক্ষসি! তোমাকে আমি এতক্ষণ ইতর সম্বোধনে সম্ভাষণ করিলাম, কিছু মনে করিও না।—তোমার একটী গুণ আছে, তাহার জন্যেই,—এবং কেবল তাহারি জন্যেই আমি তোমারে এ আসরে

আনায়ন করিয়াছি। এই দেশে তোমার জন্ম, যখন তুমি দেশের লোকের হিংসা করিতে না, তখন তোমার এক গৌরব ছিল,—আমাদের অনেক খুড়াকে, অনেক জ্যাঠাকে, অনেক ভ্রাতাকে তুমি ভাল বাসিতে,—অনেক দীর্ঘশ্মশ্রু, মুনি তোমার সহবাস করিয়া সুখী হইয়াছিলেন, অনল্প গণিত স্বভাব-চিত্রকর তোমার প্রসাদে,—তোমার কৃপায়,—তোমার করুণায়, পার্থিব রসজ্ঞবর্গের চিত্তরঞ্জন করিয়া,—সুরসিকা সুরসুন্দরীকে আমোদিনী করিয়া,—চিত্তবিকারীকে তত্ত্ব উপদেশ দান করিয়া,—অরসিক সমাজকে সরস জ্ঞান প্রদান করিয়া,—চির দুঃখীর মানস সরোবরকে আশাকমলে সুশোভিত করিয়া,—মহা তেজস্বী বীরবরকে রাজ্য লক্ষ্মীর ক্রোড়ে ধরণীকুমারীর নূতন বর সাজাইয়া, চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে দিন কি তোমার এখন আছে? তুমি বিদেশিনী ভগিনীকে বড় ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছ। যে হিংসা তুমি আগে আগে জানিতে না, এখন দুই ভগিনীতে মিলিয়া সেই হিংসাকে আদর করিতেছ, যাহাদিগকে আগে আগে আদর করিতে এখন তাহাদিগকে অনাদর করিতেছ, এটী তোমার গুণ নয়।

রাক্ষসি! তুমি মানুষ খাও, এটী আমি জানি; কিন্তু একটী গুণ ছিল, জন্মভূমির সহচর সহচরীকে দয়া করা অভ্যাস ছিল, সে অভ্যাস কোথায় গেল? এ নিষ্ঠুরতা কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ? তোমার বিদেশিনী ভগিনী তোমাকে সভ্রমে খাটো করিতেছে, তাহা তুমি বুঝিতেছ না, এই আপ্‌সোসে আমি তোমাকে ইতর সম্বোধনে ডাকিয়াছিলাম,—তোমার জন্মভূমি পুত্র শোকে ক্রন্দন করিতেছেন, সেই জন্যই আমি তোমারে ইতর সম্ভাষণে ডাকিতেছিলাম, কিছু মনে করিও না। যাহাদিগকে তুমি ভাল বাস,—যাহাদের মাংস

তোমার প্রিয়,—যাহাদের অস্থি তোমার রুচিকর, তাহাদিগকে খাও, আমি নিষেধ করি না, কিন্তু খাই খাই করিয়া রাখিয়া দিও না।—দেখিতেছি, তাহা তুমি রাখিতেছ, কিন্তু কেন?—তুমি ইতর হইয়াছ?—বোধ করি হইয়াছ।—কিন্তু কেন?—ইতরেরা—তোমারে ইতর করিয়াছে?——তুমি উত্তর দিবে না, আমি উত্তর করিতেছি, তাহারাই করুক, অথবা তোমার ভগিনীই করুক, কিম্বা যেই করুক, তুমি ইতর হইয়াছ।—হও, কে নিবারণ করে, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে গুলিকে ইতর করিতেছ কেন?—তুমি রাক্ষসী, স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পারো,—ভক্ষণ করিতেও জানো,—তবে না করিতেছ কেন? রক্ষা করিতেছ কেন?——আজিও কি তোমার সেই পূর্ব্ব মায়া আছে?—আর কেন?—ভদ্র সন্তানের ইতর হওয়ার চেয়ে তোমার জঠরানলে ভস্ম হওয়া ভাল। তুমি রাক্ষসী,—তোমার এত মায়া কেন?—সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছ?—কর, কিন্তু তাহাতে তোমার কি লাভ?—তোমার ভগিনীর লাভ আছে, কারণ তাহার পিতা, বর্ত্তমান। তোমার পিতা নাই। তোমার ভগিনীর পিতা তোমার জ্যাঠা হন,—তিনি মানুষ খান না,—হাড় খান। তাহাতেই তাঁহার লাভ। তোমার ভগিনী অবশ্যই অস্থি সংগ্রহ করিবেন। তোমার তাহাতে কি?—তুমি অল্প দিনের মধ্যে আমাদের জন্মভূমির প্রায় বিংশতি রত্ন বিদেশিনীকে ভক্ষণ করিতে দিয়াছ, তাহাতে তোমার কি লাভ?—তুমি কি এমন ভাবিয়াছ যে, ভগিনীর মনোরঞ্জন করিয়া আবার একদিন এ রাজ্যের রাণী হইবে? তাহা পারিবে না। সে আসা বিসর্জ্জন দাও। তুমি রাক্ষসী, মানুষ খাও,—ভদ্রকে ইতর করিও না,—ইতরকে নরককুণ্ডে ডুবাইয়া রাখিও না,—যদি পারো, খাও, না পারো, ছাড়িয়া দাও।

রাক্ষসি! তুমি এদেশ হইতে বিদায় হও;—যাহা শুনিলে, তাহা কি পারিবে?——যদি না পারো, তবে এদেশ হইতে বিদায় হও। তোমার ভগিনীকে বল, এই ভারত কানন আমাদের পঞ্চবটী, এবনে লক্ষ্মণ আছেন। এক দিন স্থূর্পনখা হইতে হইবে। এই বেলা উভয়েই পলায়ন কর।

স্থানাভাব প্রযুক্ত এবারে ইতিহাস ও বিজ্ঞান রাখিয়া দিতে হইল।

অনুকরণ।

অনুকরণ দ্বারা কেহ কখন প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কোন এক ব্যক্তি অথবা কোন এক জাতি আপন মনোবৃত্তির চালনা, শারীরিক পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে একটী অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাধান্য লাভ করিলে, আমি অথবা আমরাও ঐ রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নত পদবীতে পদার্পণ করিব; যাহারা এই নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে তাহাদিগকে পর্ব্বতারোহণের পরিবর্ত্তে গভীর গহ্বরে অবরোহণ করিতে হয়। আর যাহারা কোন লোকের অথবা কোন জাতির যত্নার্জ্জিত উন্নতি দর্শনে প্রাণ পণে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের অভিপ্রায় প্রথমোক্ত অনুকারীদিগের অপেক্ষা কিয়দংশে অধিক ফলোপধায়ক হয় বটে, কিন্তু তাহাও তাহাদের গৌরবের বিষয় নহে। আরও যাহারা মর্য্যাদা লাঘবের ভয়ে কাহারও অনুকরণে অনিচ্ছুক ও আপন মনোবৃত্তিচালনা বা শারীরিক শ্রম দ্বারা উন্নতি সাধনেও অনুদ্যোগী হইয়া কেবল বর্ত্তমান অবস্থা রক্ষা করিতে তৎপর, তাহাদিগকে, উন্নত হওয়ার পরিবর্ত্তে কখনই অবনত হইতে হয় না। ফলত অনন্তকাল একরূপ অবস্থাতেই অবস্থান করিতে হয়।

আমাদিগের বঙ্গবাসীদিগকে ঐ তিন প্রকার লোকের এক প্রকার বলিয়াও গণনা করা যায় না। অনেকে বলেন,

বাঙ্গালীগণ অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়, কিন্তু আমাদিগের মতে বাঙ্গালীরা একবারেই অনুকরণকারী নহে। অথবা যদিও তাহাদিগকে অনুকারী বলি, তবে প্রকৃতানুকারী না বলিয়া নিষ্ফলানুকারী বলিব। কোন্ কোন্ কার্য্য কি কিরূপে অনুকরণ করিতে হয়, বাঙ্গালীরা তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই মনেমনে বলবতী অনুকরণেচ্ছা আছে বটে, কিন্তু যে সকল কার্য্যের অনুকরণ করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের হিতসাধন করা হয়, অথবা অন্ততঃ আপনিও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারা যায়, সে বিষয়ে মনোনিবেশ করা দূরে থাকুক, দৃষ্টি নিবেশ করিতেও দেখা যায় না। ইহাঁরা প্রকৃত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি পাত না করিয়া, কোন এক উন্নতিশীল জাতির আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি বাহ্যিক আড়ম্বরের অনুকরণ করেন এবং মনে করেন, আমাদের বেশাদি দর্শনেই লোকে আমাদিগকে সুসভ্য ও উন্নতিশীল মনুস্য বলিয়া সমধিক আদর করিবে। কিন্তু ঐ রূপ প্রকৃতির লোক, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় এমন কি, যাঁহাদিগের প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় তাহারা চিরপ্রচলিত ও কুলক্রমাগত বেশভূষা আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে, তাঁহাদেরও নিতান্ত ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠে। বাঙ্গালী-সেবিত বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে পায়জামা প্রভৃতি পরিধান করাই কি আমাদের সুসূক্ষ্ম বুদ্ধি মত্তার পরিচয়? অন্নাদির পরিবর্ত্তে মদ্য মাংসাদি ভক্ষণ করাই কি আমাদের চিরোপার্জ্জিত জ্ঞানের ফল? তৈলের পরিবর্ত্তে সাবানাদি

মর্দ্দন কি আমাদের চতুরতার দৃষ্টান্ত ? হিন্দু সমাজ মধ্যে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করাই কি আমাদের প্রগাঢ় শিক্ষার পরিণাম ? যাঁহারা এতদূর অনুকরণ করিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা স্বভাবজাত স্বর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, কে তাঁহাদিগকে স্বাধীন ইংরাজ জাতির মধ্যে পরিগণিত করে ? প্রত্যুত উপহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে প্রতিদিন কত অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত বিষয় উদ্ভাবিত হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কে তাহার কি অনুসন্ধান লইয়াছেন ? কি কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন ? ইচ্ছা করিলে সকলেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে পারে; তাহাতে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। চিরাগত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, কোন জাতির বাহ্যিক আড়ম্বরের অনুকরণ, কেবল আপন আপন লঘুচিত্ততার পরিচায়ক মাত্র; তাহাতে গৌরবের লেশমাত্র নাই। তবে, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া যদি পরিচ্ছদ ও আহারাদির পরিবর্ত্তন সঙ্গত বোধ হয়, সেরূপ স্থলে অনুকরণ নিতান্ত দোষাবহ নহে। আমাদের দেশে ধুতি চাদরের পরিবর্ত্তে পায়জামাদি পরিধান এবং অন্নাদির পরিবর্ত্তে মদ্য মাংসাদি ভোজনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ড অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ। তথায় সর্ব্বদাই হিমবারণ বস্ত্র সকল ব্যবহার করিতে হয়। আরও ইংরাজগণ আমাদিগের মত অলস ও নিরুদ্যম নহেন ; তাঁহারা এক স্থানে প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় উপবেশন পূর্ব্বক অনর্থক আখ্যায়ি-

কাতে মোহিত না হইয়া সর্ব্বদাই শরীর চালনা করিতে তৎপর। সুতরাং সর্ব্বদাই শাল বনাতাদি জড়াইয়া থাকিলে শরীর চালনার দ্বারা কার্য্য সাধনের অসু-বিধা হয়; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে একবারে অঙ্গলগ্ন পায়জামা প্রভৃতি পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হয় এবং অবশিষ্ট প্রত্যঙ্গে হিম বায়ু স্পর্শ হইবে বলিয়া মোজা, দস্তানা ও টুপি ব্যবহারের প্রথা আছে। হিম প্রধান দেশে মাংসাহার ব্যতিরেকে শরীর রক্ষা হয় না মাংসও অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারা যায় না, সুতরাং তাহাদিগকে মদ্যপানও করিতে হয়। কিন্তু পর্য্যায় ক্রমে ঋতু নির্দ্ধারিত করিলে আমাদের দেশে, পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস মাত্র শীত, তাহাও নিতান্ত কষ্ট কর নহে। ইহাভিন্ন বৎসরের অবশিষ্ট দশ মাসে আরও পাঁচটী ঋতু আছে বটে, কিন্তু বর্ষা ভিন্ন আর সকল ঋতু-রই ফল অতি অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়; ফলত পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস ভিন্ন প্রায় সকল সময়েই গ্রীষ্ম অনু-ভূত হয়। বিশেষত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পরিধেয় অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পর্য্যন্ত কষ্ট কর হইয়া উঠে। এরূপ দেশে ধুতি চাদরের পরিবর্ত্তে পায়জামাদি ব্যবহারের কিছুমাত্র যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। মাংসাহার ও মদ্যপানেরও কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। তবে ঐ রূপ বৃথানুকরণে প্রবৃত্ত হওয়া, নিতান্ত ভ্রান্তির কার্য্য। আমাদের দেশে কত লোক মাংসাহার ও মদ্যপান করিয়া পরিশেষে মদ্য

মাংসের বিষময় পরিণামের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন, তথাপি অনেকে প্রাণান্তকারণ অনুকরণ হইতে নিবৃত্ত হন না, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়? আমরা যতই অনুকরণ করি, আর যতই চিত্তানুবৃত্তির চেষ্টা করি, কেহ আমাদিগকে স্বাধীন, সভ্য, দেশহিতৈষী বা সাহেব বলিয়া কখনই ডাকিবে না।

এই মহানগরীর মধ্যে এরূপ অনেক সভা আছে, যেখানে পায়জামাদি পরিধান না করিলে প্রবেশের অনুমতি নাই। ঐ রূপ স্থলে উহা পরিধানেরও আপত্তি নাই; কিন্তু পায় জামা পরিয়া গৃহমধ্যে পাষাণবৎ বসিয়া থাকা অথবা ঐ রূপ বেশে বায়ু সেবন করিতে যাওয়া নিতান্ত বৃথানুকরণের কার্য্য। অনেকে কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নমস্কারের পরিবর্ত্তে কর মর্দ্দন করিতে ভাল বাসেন এবং করিয়াও থাকেন কিন্তু এরূপ স্থলেও আপন স্বজাতির ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া অন্য জাতির অনুকরণের কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই এক খানি সংস্কৃত পুস্তকে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশেও করমর্দ্দনের প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু বহুদিবস হইল ঐ প্রথা একবারে তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি স্বদেশানুরাগবশতঃ চিরতিরোহিত সেই প্রাচীন প্রথার পুনরুদ্ধরণের নিমিত্ত করমর্দ্দন নিয়ম উত্থাপিত করিয়া থাকেন, তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং তাহা সমধিক শ্লাঘার বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের

অন্যান্য আচার ব্যবহার দর্শনে, তাঁহারা স্বদেশানুরাগ বশত ঐ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা কোন রূপেই বোধ হয় না। যদি তাহা না হইল, তবে বোধ হয়, ঐ রূপ নিরর্থক অনুকরণের উপর দোষারোপ করাও নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ইহা গর্ব্বের সহিত বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুদিগের অনেক ভক্ষ্য বস্তু উইল সনের হোটেলের দ্রব্যজাত অপেক্ষা সুস্বাদু; তথাপি তথাকার (বিস্কিট ও করি) প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া আপন আপন সাহেবত্ব সপ্রমাণ করিবার ফল কি? যদি আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন রূপ সৎপরিণাম না দেখিয়া ঐ রূপ বৃথানুকরণে প্রবৃত্ত হই, তবে পুণ্য ভূমি ভারত ভূমির নিতান্ত দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। ইংরাজ জাতির এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা জাতি মাত্রেরই অনুকরণীয় ও অবশ্য করণীয়, বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিয়া তাহারই অনুকরণ করা উচিত। নতুবা বৃথানুকরণে আপন স্বভাব ও জন্ম ভূমিকে কলঙ্কিত করিয়া লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হইবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।

কল্কিপুরাণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় প্রতাপ সমন্বিত ধর্ম্মাত্মা ভগবান কল্কি সভা মধ্যে নরপতি বিশাখযূপের নিকট ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল ও প্রীতিজনক ধর্ম্মের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

কল্কি কহিলেন, যখন মহাপ্রলয় হইবে তখন ভগবান্ ব্রহ্মাও বিলীন হইবেন, তখন কেবল আমি বিদ্যমান থাকিব ও আমাতেই সমস্ত জগৎ সঙ্গত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে জগতের কিছুই ছিল না আমিই কেবল বিদ্যমান ছিলাম, এই পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থই আমার প্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে। সমুদায় জগৎ যখন নিদ্রিতাবস্থায় কালক্ষেপ করিতেছিল, যখন একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই বর্ত্তমান ছিল না। সেই মহানিশার শেষভাগে সৃষ্টি ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত আমি সহস্র শির, সহস্র লোচন ও সহস্র চরণ সম্পন্ন বিরাট রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম। তৎকালে সেই বিরাট মূর্ত্তি হইতে বেদমুখ মহাপ্রভাবশালী ভগবান ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা নামে বিখ্যাত ঐ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আমার বাক্যরূপ বেদানুসারে, আমার পুরুষোপাধিক অংশ হইতে, মায়া প্রকৃতি দ্বারা আমার কালরূপ

অংশের সংযোগে জীবগণকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রজাপতিগণ, মন্বাদি লোক সকল ও দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁরা আমার অংশসম্ভূত হইলেও সত্ত্ব রজ ও তমোগুণসম্পন্ন মায়া প্রভাবে নানাবিধ উপাধি ধারণ করিলেন। এই কারণেই দেবগণ মন্বাদি লোক সকল ও স্থাবর জঙ্গম সকলেই পৃথক পৃথক উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। যে সমস্ত লোক মায়া প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। তাহারা সকলেই আমার অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে, আবার প্রলয়-কালে আমাতেই বিলীন হইবে। যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও সদনুষ্ঠান সাধন করিয়া আমারে মুক্ত করেন, যাঁহারা এই সংসারে তপ দান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সাধনকালে আমার নাম উচ্চারণ করেন, যাঁহারা নিরন্তর আমার সেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেই ব্রাহ্মণগণই আমার শরীর ও আত্মা স্বরূপ। বেদবক্তা ব্রাহ্মণগণ আমারে যেরূপে ধ্যান করেন ও যত আনন্দিত করেন, দেবগণ বা অন্যান্য লোক আমারে সেরূপ ধ্যান বা প্রীত করিতে পারেন না। যেহেতু বেদই আমার প্রধান অঙ্গ। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেদ প্রকাশিত হইয়াছে। জগতের সমস্ত লোকই বেদ দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত জগতই আমার শরীর, সুতরাং উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণই আমার শরীর রক্ষণের প্রধান সাধন। অতএব আমি এক্ষণে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিতেছি। আর জগতের আশ্রয়ভূত ব্রাহ্মণগণও আমারে জগন্ময় পূর্ণ সনাতন বলিয়া আমার সেবা করিতেছেন।

তখন বিশাখযূপ কহিলেন, প্রভো! ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? আর ব্রাহ্মণগণ আপনার এমন কি করিয়া থাকেন যদ্দারা আপনার অনুগ্রহে তাঁহাদের বাক্য তীক্ষ্ণবাণ স্বরূপ হইয়াছে, এই বিষয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

কল্কি কহিলেন, দেখ, যে পবিত্র বেদে আমারে অব্যক্ত ও সমুদায় ব্যক্ত পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে, সেই বেদ ব্রাহ্মণমুখে বিরাজ করিতেছে ও বহুবিধ ধর্ম্মকর্ম্মে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রাহ্মণদিগের যাহা পবিত্র ধর্ম্ম, তাহাই আমার পক্ষে পরম পবিত্র ভক্তি। আমি সেই পরম পবিত্র ভক্তি দ্বারা পরিতোষিত হইয়া প্রিয়তমা পত্নীর সহিত যুগে যুগে আবির্ভূত হইতেছি। সধবা ব্রাহ্মণকন্যা কর্ত্তৃক ত্রিগুণিত করিয়া নির্ম্মিত সূত্রে ত্রিরাবৃত্ত করিয়া গ্রন্থি প্রদান করিলেই যজ্ঞোপবীত বলিয়া অভিহিত হয়। যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ বেদ ও প্রবর বিধান সমন্বিত গ্রন্থিসম্পন্ন সেই বিশুদ্ধ যজ্ঞোপবীত এরূপে ধারণ করিবে, যেন তাহা গলদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত হয় ও পৃষ্ঠকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। আর সামবেদীদিগেরও এইরূপ বিধি, তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, নাভি অতিক্রম করিয়া লম্বমান হইবে। যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে ধারণ করিলে বলপ্রদ হইয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণগণ মৃত্তিকা, ভস্ম ও চন্দনাদি দ্বারা তিলক ও ললাট হইতে কেশ পর্য্যন্ত কর্ম্মাঙ্গ স্বরূপ উজ্জ্বল ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। অঙ্গুলি পরিমিত তিলক তিন ভাগে বিভক্ত হইলেই ত্রিপুণ্ড্র বলিয়া অভিহিত হয়। সেই ত্রিপুণ্ড্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবাস স্বরূপ। তাহা দর্শন করিলেও পাপ বিনষ্ট হয়। স্বর্গ ব্রাহ্মণগণের হস্তগত, তাঁহাদের বাক্যে বেদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহাদের হস্তে হব্য, গাত্রে ধর্ম্মানুরাগ ও তীর্থ সমুদায় এবং নাভিদেশে ত্রিগুণসম্পন্না প্রকৃতি বিরাজমান রহিয়াছেন। সাবিত্রীই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের হৃদয়ই ব্রহ্মসংজ্ঞা ধারণ করিতেছে, আর তাঁহাদিগের বক্ষে ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠে অধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে। হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণই ভূদেব, বিশেষতঃ তাঁহারাই গার্হস্থ্য

প্রভৃতি চারি আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক মদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, অতএব সদ্ভক্তি দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা ও বন্দনা করা সকলেরই শ্রেয়। ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা বালক, তাঁহারাও জ্ঞান প্রভাবে বৃদ্ধ ও তপঃপ্রভাবে বৃদ্ধ এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাঁহাদিগের বাক্য পালনের নিমিত্তই আমি অবতার হইয়া অবতীর্ণ হইতেছি।

যিনি ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বপাপপ্রনাশন বিশেষত কলি-দোষঘ্ন এই মহাভাগ্যের কথা শ্রবণ করেন, তাঁহার কোন ভয়ই থাকে না। বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ মহীপতি বিশাখযূপ ভগবান কল্কির মুখে কলি-দোষ-বিনাশন বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি গমন করিলে, সুপণ্ডিত শিবপ্রদত্ত শুক সমস্ত দিন ইতস্তত বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে ভগবান কল্কির সমীপে আগমন পূর্ব্বক যথাবিধানে স্তব পাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইল। ভগবান কল্কি তাহাকে স্তব পাঠ করিতে দেখিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, তোমার সমস্ত মঙ্গল? তুমি এক্ষণে কোন্ স্থানে কি আহার করিয়া প্রত্যাগত হইলে?

শুক কহিল, নাথ! আপনি এক্ষণে কৌতূহল সমন্বিত আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি জলনিধি মধ্যস্থিত সিংহল দ্বীপে গমন করিয়াছিলাম। সেই দ্বীপ অতীব মনোহর, এবং ঐ দ্বীপের বৃত্তান্ত অতিশয় চমৎকার জনক। তথায় বৃহদ্রথ নামে এক ভূপতি আছেন, তাঁহার একটী কন্যা আছেন, তাঁহার চরিতামৃত অত্যন্ত মনোহর। তিনি বৃহদ্রথমহিষী কৌমুদীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই কন্যার স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সেই সিংহল দ্বীপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের লোক সকল পরম সুখে অবস্থান করিতেছে। তথায় রমণীয় প্রাসাদ, মনোহর হর্ম্ম্য,

উৎকৃষ্ট গৃহ সকল ও বিচিত্র নগর বিরাজমান রহিয়াছে। কোন স্থানে রত্নময়, কোন স্থানে স্ফটিকময় ভিত্তি সকল শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে দিব্য লতা সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। সুবেশা লক্ষণান্বিতা কামিনীগণ তথায় নিয়তকাল সুখে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে বিচিত্র সরোবর সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। হংস ও সারসগণ তাহার উপকূলসলিলে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে। চতুর্দ্দিকেই সুগন্ধি পদ্ম, লতাজাল, বন ও উপবন সকল শোভা পাইতেছে। ভৃঙ্গগণ পদ্ম, কহ্লার ও কুন্দ পুষ্পে ক্রীড়া করিতেছে। সেই রমণীয় প্রদেশে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বৃহদ্রথ বসতি করিতেছেন। পদ্মাবতী নামে তাঁহার যে কন্যা আছেন, তিনি অতি যশস্বিনী ও ধন্যা, তাঁহার ন্যায় রূপ গুণবতী কন্যা ত্রিভুবনে আর নাই। তাঁহার ন্যায় মনোহর মূর্ত্তি আর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত স্পৃহনীয়। বিধাতা অতি সুকৌশলে তাঁহার নির্ম্মাণ কার্য্য সংসাধন করিয়াছেন। শিব-সেবা-পরায়ণা পার্ব্বতী যেমন কন্যাকালে সকলের পূজনীয়া ও মাননীয়া হইয়াছিলেন, সেইরূপ পদ্মাবতীও বালিকা সখীগণের সহিত জপ ও ধ্যানতৎপর হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

ভগবান পার্ব্বতীবল্লভ যখন জানিলেন যে, সেই বরাননাই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয়তমা লক্ষ্মী, তখন তিনি প্রশান্ত মনে ভগবতী পার্ব্বতীর সহিত তথায় উপনীত হইলেন। পদ্মাবতী বরদানোদ্যত সেই দেবদম্পতীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তখন ভগবান শশাঙ্কশেখর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবতি! কোন নৃপনন্দনই তোমার যোগ্য পাত্র নহে, ভগবান্

নারায়ণই তোমার উপযুক্ত পতি, তিনিই প্রহৃষ্ট মনে তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন। এই ভুবনমণ্ডলে যাহারা তোমারে কামভাবে অবলোকন করিবে, তাহারা যে বয়সে দেখিবে, তৎক্ষণেই সেই বয়সে স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইবে। তোমার পাণিগ্রহণার্থী নারায়ণ ব্যতিরেকে কি দেব, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি নাগ, কি চারণ বা অন্যান্য যে কেহ তোমার সংসর্গ কামনা করিবে, তাহাকে যথাকালে নারীভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে। কমলে! তুমি এক্ষণে তপঃ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর। সুখ সম্ভোগের আয়তন স্বরূপ এই সুকোমল দেহকে আর ক্ষুভিত করিও না। হরিপ্রিয়ে! এক্ষণে যাহাতে তোমার এই শরীর বিমল থাকে, তাহার উপায় কর।

ভগবান মহাদেব পদ্মাদেবীকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন ভগবতী পদ্মাদেবী ভগবান শঙ্করের মুখে আপন অভিলষিত বরের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক প্রফুল্ল মুখে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পিতার ভবনে গমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

শুক কহিলেন, এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল। মহারাজ বৃহদ্রথ পদ্মাবতীকে যৌবনসম্পন্না দেখিয়া বহুবিধ পাপাশঙ্কায় মনে মনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, এবং মহিষী কৌমুদীকে কহিলেন, প্রিয়ে! পদ্মার বিবাহ কাল অতীত হইতেছে, এক্ষণে কোন্ কুলশীল সম্পন্ন রাজকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করিব? মহিষী কহিলেন, নাথ! দেবদেব মহাদেব কহিয়াছেন, যে, ভগবান্ বিষ্ণুই পদ্মাবতীর পতি হইবেন, তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। মহারাজ বৃহদ্রথ প্রণয়িণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সর্ব্বান্তরজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণু কতদিনে পদ্মার পাণিগ্রহণ করিবেন? প্রিয়ে! আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমি ভগবান হরিকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে জামাতৃত্বে বরণ করিব! তবে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ম্বর স্থলে মুনিতনয়া বেদবতীর ন্যায়, সুরাসুরগণের সমুদ্র মন্থন কালে সমুত্থিতা পদ্মার ন্যায় আমার এই পদ্মাকেও স্বয়ম্বর স্থলে গ্রহণ করিবেন। এইরূপ অবধারণ করিয়া মহীপতি বৃহদ্রথ কন্যার স্বয়ম্বরের নিমিত্ত গুণবান, শীলসম্পন্ন, বিদ্বান, ঐশ্বর্য্যশালী, রূপবান, তরুণবয়স্ক নরপতিগণকে বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন, এবং বিশেষ সমালোচন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অবস্থানোপযোগী স্থান সকল নির্দ্ধারিত করিলেন। তৎকালে সিংহলে বহুবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ বিবাহে কৃত-নিশ্চয় হইয়া বিবিধ সুবর্ণ ও রত্নময় অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্য সামন্তগণে পরিবৃত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রাজগণ কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ উৎকৃষ্ট হয়রত্নে

আরোহণ পূর্ব্বক সমাগত হইলেন। তাঁহাদিগের আতপনিবারণক্ষম শ্বেতচ্ছত্র, গ্রীষ্ম নিবারণ চামর সকল শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল রাজনন্দনগণ তৎকালে অস্ত্রশস্ত্র প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া দেবগণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় রুচিরাশ্ব, সুকর্ম্মা, মদিরাক্ষ, দৃঢ়াশুগ, কৃষ্ণসার, পারদ, জীমূত, ক্রূর মর্দ্দন, কাশ, কুশাম্বু, বসুমান, কঙ্ক, ক্রথন, সঞ্জয়, গুরুমিত্র, প্রমাথী, বিজৃম্ভ, সৃঞ্জয়, অক্ষম ও অন্যান্য বহুসংখ্যক মহীপতিগণ আগমন করিলেন। তাঁহারা সভা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাবিধানে সংকৃত হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। বিচিত্র মাল্য ও বিচিত্র বসনধারী, সুখোচিত, বিলাসী, স্পৃহনীয়রূপ, রাজগণ উপবেশন করিলে তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। পরে সিংহলেশ্বর সেই রাজন্যগণকে সুখাসীন অবলোকন করিয়া বরবর্ণিনী, গৌরী, চন্দ্রাননা, শ্যামা, মুক্তাহার বিভূষিতা, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা, রূপ লাবণ্যবতী স্বীয় তনয়াকে বেত্রহস্ত দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে আনয়ন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। কন্যা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। শত সহস্র সখীগণ তাঁহারে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। দাসীগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বন্দীগণ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। হে বিভো! তৎকালে সেই কন্যাকে অবলোকন করিয়া আমি অনুমান করিলাম, সেই কন্যা মূর্ত্তিমতী মোহজননী মায়া, অথবা কন্দর্প-মোহিনী রতিই ভুবনতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেব! আমি ত্রিভুবনের সকল স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু তাদৃশ রূপলাবণ্য কোন স্থানেই দর্শন করি নাই। সেই কন্যা ক্রমে সভামণ্ডপে আসিয়া উপ-

নীত হইলেন। নূপুর ও কিঙ্কিনীর জনমোহন মধুর শব্দে সভা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই মরালগামিনী রাজনন্দিনী করে রত্নমালা গ্রহণ পূর্ব্বক সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সমাগত রাজগণের কুলশীল ও গুণের বিষয় শ্রবণ ও মনোহর কটাক্ষ বিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণশোভন কুণ্ডল দুলিতে লাগিল। তাঁহার চূর্ণ কুন্তল নৃত্য করিতে লাগিল, তাহাতে গণ্ডদেশ অধিকতর সুশোভিত হইল। ঈষৎ হাস্যে তাঁহার বদন কমল বিকসিত হইল, সুতরাং দশনকান্তি দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাঁহার মধ্যদেশ ডমরু সদৃশ, পরিধান অরুণ কৌশেয় বসন ও কণ্ঠস্বর কোকিলের ন্যায় মধুর। দেব! তাঁহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন, তিনি স্বীয় রূপলাবণ্যে ত্রিভুবন ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

তখন রাজন্যগণ সেই মনোমোহিনী কন্যাকে অবলোকন করিয়া কাম-বিমোহিত হইয়া বিভ্রান্তমনে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা কামভাবে সেই কন্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমণীয়রূপা সুমধ্যমা নারীভাব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের সমস্ত অবয়ব রমণীগণের অনুরূপ হইল, নিবিড় নিতম্বে ও স্তনযুগভারে তাঁহাদের শরীর ঈষৎ অবনত হইল। তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল রমণীগণের ন্যায় কমনী হইল,নয়নযুগল বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণকরিল ও বিলাস, হাস্য ও নৃত্য গীতাদি বিষয়েও তাঁহারা রমণীগণের ন্যায় বিলক্ষণ নিপুণ হইলেন। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে রমণীভাবে পরিণত দেখিয়া বিষদান্তঃকরণে পদ্মাদেবীর সহচরী হইলেন। আমি পদ্মাবতীর বিবাহ মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া তত্রত্য এক বট বৃক্ষে বসিয়াছিলাম। রাজগণ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলে দেবী পদ্মা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিমি কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য

আমি ক্ষণকাল তথায় বসিয়াছিলাম। হে জগদীশ্বর কল্কে! এইরূপে মঙ্গলজনক বিবাহ মহোৎসব গত হইলে দেবী কমলা ভগবান ভবানী-পতিরে মনে মনে ধ্যান করিয়া যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহা শুনিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ করুন্।

দেবী পদ্মা রাজগণকে গজাশ্ব রথ বিহীন হইয়া সখীভাব প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া দুঃখিত মনে ভূষণাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলিখন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে মহেশ্বরের বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত হৃদয়বল্লভ হরিকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

মদালসা।

দিন উদ্যানে, কোন দিন পর্ব্বতের অধিত্যকায় মদালসার সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুশীলা পতিপরায়ণা প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণ বন্দনা ও সেবা করিয়া অবশিষ্টকাল স্বামির সহবাসে মনের উল্লাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমশই তাঁহাদিগের প্রণয় ও স্নেহ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অকৃত্রিম প্রেম-রসে উভয়ের মন যারপর নাই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের অকপট স্নেহ এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাঁহারা উভয়েই উভয়কে নয়নের অন্তরাল করিয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারেন না। সুশীলা পতিপরায়ণা মদালসা যেমন পতিপ্রাণা, রাজকুমারও সেইরূপ তদ্গত জীবন। তাঁহাদের উভয়েরই পরস্পরের সুখদুঃখে সমভাব এবং উভয়ের মনোবৃত্তি ও রুচিও অভিন্ন। ফলতঃ তাঁহাদিগের দাম্পত্য প্রণয় অতীব স্পৃহনীয় ও সুখকর হইয়া উঠিল। তাঁহারা দুই জনেই যখন একত্র থাকেন, তখন পরস্পর পরস্পরের মুখচন্দ্র দর্শনে জগৎ বিস্মৃত হইয়া যান। আর যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন, তখন উভয়েই সমস্ত ভুবন তন্ময় দেখেন। আহা! তাঁহাদিগের কি আশ্চর্য্য প্রেম! অতি সৌভাগ্যশালী না হইলে লোকে এরূপ প্রণয়লাভে সমর্থ হয় না। যদি জগতীতলস্থ সমস্ত লোকেই এইরূপ অকৃত্রিম প্রেমরসের আস্বাদন করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই লোকে কাহাকেও দুঃখের মুখ সন্দর্শন করিতে হইত না, সমস্ত ভুবনই সুখময় হইয়া উঠিত। রাজকুমার তাদৃশ স্নেহময়ী প্রণয়িনী সরল মানসা মদালসাকে পাইয়া মনের সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা প্রাতঃকালে মহারাজ শত্রুজিৎ আত্মজ ঋতধ্বজকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে, আমার আদেশে গালবাশ্রমে গমন পূর্ব্বক ঋষিদিগের তপো-বিঘ্নকারী দৈত্যের প্রাণ সংহার করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমারে পুনর্ব্বার অনুমতি করিতেছি, তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুবলয়াশ্বে আরো-হণ কবিয়া সর্ব্বদিক্ পরিভ্রমণ কর। অদ্যাপি বিপ্রদ্বেষী দানব সকল বিদ্যমান আছে। যাহাতে সেই দুরাচারেরা ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায় করিবে। তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, মুনিদিগের ধর্ম্ম রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাতে তাচ্ছীল্য করিলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনমুষ্ঠান জনিত প্রত্যবায় ঘটিতে পারে। আর যে ক্ষত্রিয়সন্তান যুদ্ধকার্য্যে ভীত বা কুণ্ঠিত হয়, সে অতীব কাপুরুষ। আমি তাদৃশ পুরুষকে নীচ ও কুলাঙ্গার বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি। আমি জানি, বীর ক্ষত্রিয় যদি বীর ভাব প্রকাশ করিয়া সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার বংশ উজ্জ্বল হয় ও সে স্বয়ং তৎক্ষণাৎ স্বর্গারোহণ করে। অতএব তুমি আমার বীর পুত্র, বিস্তর পুণ্য করিয়া তোমারে পাইয়াছি, তুমি এখন নিজ বাহুবলে সমস্ত বাধা নিবারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মাচারী মুনিগণকে সুখী করিতে যত্নবান্ হও। তাহা হইলে আমি যারপর নাই আহ্লা-দিত হইব।

পিতৃবৎসল ঋতধ্বজ জনকের আদেশমাত্রে তাঁহার চরণে প্রণি-পাত পূর্ব্বক মনোজব কুবলয়াশ্বে আরোহণ করিয়া গৃহ হইতে

বহির্গত হইলেন এবং সমস্ত দিন ভূবলয় বেষ্টন করিয়া দিবা শেষে স্বীয় ভবনে আগমন পূর্ব্বক পিতৃদেবের চরণ বন্দনা করিলেন। এইরূপে রাজকুমার প্রত্যহ প্রাতঃকালে সমস্ত মেদিনী ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালে প্রণয়িনী মদালসার সহবাসে মনের উল্লাসে অবশিষ্ট-কাল অতিবাহিত করেন। একদা নৃপনন্দন ঋতধ্বজ গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া যমুনাতটে বিচরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একজন পরম তপস্বী ঋষি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রু নাভিদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়াছে। মস্তকে জটাভার, পরিধান রক্তবস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে তীর্থমৃত্তিকা লেপন, বামকরে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে আষাঢ় দণ্ড, এবং কণ্ঠে, করে ও কর্ণে রুদ্রাক্ষমালা শোভা পাইতেছে। তাঁহাকে দেখিলেই সাক্ষাৎ ভগবান্ শূলপাণি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। রাজকুমার দর্শন মাত্র অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কে? কি নিমিত্ত আমার প্রতি সস্পৃহলোচনে দৃষ্টিপাত করিতেছেন? আপনাকে যেন বিবক্ষুর ন্যায় দেখিতেছি। যদি আমাকে কিছু বলিতে বাসনা থাকে, তবে স্বচ্ছন্দমনে বলিতে পারেন। আমি ঋষিদিগের কিঙ্কর, প্রত্যহ ঋষিকার্য্যের নিমিত্ত সমস্ত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকি, অতএব এই আজ্ঞাবহ দাসের প্রতি আদেশ করিতে কিছুমাত্র বাধা নাই। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে এ দাসের প্রতি যেরূপ আদেশ করিবেন, আমি তৎসাধনার্থ প্রাণপণে যত্ন করিব।

তখন মুনিবেশধারী ভণ্ডতপস্বী রাজকুমারের প্রতিজ্ঞা বাক্য শুনিয়া মনে মনে যারপর নাই হর্ষিত হইল, এবং কহিল, বৎস!

আমি তোমার বচন শ্রবণে পরম প্রীত হইলাম। না হইবেই বা কেন, তুমি যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার বাক্যও তদনুরূপ শুনিতেছি। বিপ্রবর্গের উপকার করা তোমার বংশের নিত্য ব্রত, যাহা হউক, অদ্য তোমারে দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর। অগ্রেই তোমার অঙ্গীকার বাক্য শুনিয়া তাহা বলিতে আমি সাহসী হইতেছি। হে রাজপুত্র! এক্ষণে আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমি ত্রিলোকের হিত কামনায় একটী যজ্ঞ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞে ভগবান বরুণদেবের আরাধনা করিতে হইবে। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৈদিক মন্ত্র জপ করিব। অন্তরীক্ষগত বা ভূতলস্থ কোন ব্যক্তি মদনুষ্ঠিত যজ্ঞ দর্শন করিলে আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। একারণ আমি এই যমুনানদীর সলিলাভ্যন্তরে যজ্ঞকার্য্যের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি। কেবল হিরণ্যের অপ্রতুল আছে। অতএব তোমার কণ্ঠস্থিত হিরণ্য ভূষণ আমারে অর্পণ কর, আমি যজ্ঞকর্ম্ম সমাধানান্তে পুনর্ব্বার তোমারে প্রত্যর্পণ করিব। আমি ঐ স্বর্ণভূষণ লইয়া সলিলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে তুমি ঐ যমুনাতীরস্থিত মদীয় আশ্রমে অপেক্ষা করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি, ততক্ষণ তুমি কোন স্থানে যাইও না। কার্য্যসিদ্ধি হইলেই আমি অবিলম্বে তোমার সমীপে আগমন করিব। অতএব তোমার কণ্ঠলগ্ন হেমভূষণ আমারে অত্যল্পকালের নিমিত্ত প্রদান করিয়া বাধিত কর। তাহা হইলে আমি চিরকাল তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

রাজকুমার তপস্বীর কপটজাল বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই মহামূল্য রত্নহার প্রাণপ্রিয়া মদালসা

আমারে প্রদান করিয়াছেন, সেই কারণে আমি পরম সমাদরে ইহা কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, আমার পিতৃভবনে এরূপ হারের অপ্রতুল নাই। আর এই হার অন্যকে অর্পণ করিলে যদি প্রিয়তমা ক্ষুণ্নমনা হন, একারণ আমি ইহা একেবারে স্বত্বত্যাগ পূর্ব্বক মুনিবরের করে প্রদান করিতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মণের উপকারের নিমিত্ত একগাছি রত্ন-মালা প্রদান করিয়া তাহা পুনর্গ্রহণের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব, ইহাও ত অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহাকে এই রত্নহার যে প্রদান করিতে হইবে, তাহাতে ত কোন সংশয়ই নাই, কিন্তু পুনর্গ্রহণ-সংবাদ পিতা শ্রবণ করিলে, তিনি আমারে নিশ্চয়ই নীচ প্রকৃতি বলিয়া জানিবেন; প্রণয়িনীর প্রণয়োপহারের সামগ্রীইবা কিরূপে প্রণয়ানুরোধ পরিত্যাগ করিয়া হস্তান্তর করিব; রাজকুমার এইরূপ বিস্তর চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, এই মহর্ষি তপস্বী, ইনি যজ্ঞ-কর্ম্মের অনুরোধে হিরণ্যহার চাহিতেছেন, কার্য্য সম্পন্ন হইলে ইহাতে ইহাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিবে না, ইনি হার লইয়া কি করিবেন। ইহাঁরা উদাসীন, সামান্য বিষয়ে ইহাঁদিগের কিছুমাত্র আস্থা নাই, অতএব রত্নমালা অর্পণ করিয়া পুনর্গ্রহণার্থ ইহাঁর আদেশানুসারে এই আশ্রমে প্রতীক্ষা করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়া রাজকুমার কণ্ঠদেশ হইতে সেই অপূর্ব্ব রত্নমালা উন্মোচন করিয়া কপট ঋষির করে সমর্পণ করিলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন! আপনি এক্ষণে অভিপ্রেত কার্য্য সাধনার্থ প্রস্থান করুন, আমি এই আশ্রম সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক ভবদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি এস্থানে অবস্থান করিলে আপনার আশ্রমের কোনরূপ পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অব্যাকুল

মনে ইষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হউন। মুনিবেশধারী সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া হৃষ্টমনে সলিলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল।

সরল-হৃদয় সদাশয় রাজকুমার কপট মুনির অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্বে যে পাতালকেতু নামক দানবকে বধ করিয়াছিলেন, ঐ মুনি তাহারই অনুজ ভ্রাতা, উহার নাম তালকেতু-এই দুরাচার পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া বৈর সাধনার্থ এইরূপ মায়া-জাল বিস্তার করিল। রাজকুমারের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে তাহার সাধ্য ছিল না। সুতরাং মায়াবীর মায়াজাল বিস্তার করাই বৈর সাধনের উপায় হইল। অনন্তর সেই দুরাচার মুনিবেশধারী দানব জল নিমগ্ন হইয়া অদৃশ্য ভাবে সন্তরণ পূর্ব্বক রাজকুমারের অগোচরে সলিল হইতে সমুত্থিত হইল এবং পূর্ব্ববৎ মুনিবেশে রাজ-কুমারের ভবনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। ঋষিরূপধারী দৈত্য ক্রমে ক্রমে রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া রাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ভণ্ডতপস্বীর মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, নয়নসজল ও হস্তে সেই নৃপনন্দন প্রদত্ত রত্নহার বিরাজিত ছিল। তত্রত্য রাজপুরুষেরা তাহাকে প্রণাম করিয়া মহারাজ শত্রুজিৎ নরপতি সমীপে লইয়া গেল। রাজা দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া প্রণতি পুরঃসর পবিত্র দর্ভাসনে বসাইলেন। মুনিরূপধারী দৈত্য আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, মহারাজ! এক্ষণে রাজমহিষী ও পুত্রবধূ মদালসাকে একবার আহ্বান করুন, আমি সকলের সমক্ষে একটী কথা বলিব। তিনি তৎশ্রবণে ব্যগ্রমনে অন্তঃপুরবর্ত্তী যোষিৎগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ নৃপসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক মুনিবেশধারী দৈত্যের চরণ বন্দনা করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন কপট মুনি সাশ্রুনয়নে ও দীন বদনে কহিলেন, মহারাজ! বলিব কি, কহিতে হৃদয়

বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি যাহা কহিব, তাহা অতীব শোচনীয়। আমরা ঋষি, মায়া মোহ বিসর্জ্জন দিয়া বৈরাগ্যের পথে নিয়ত বিচরণ করিয়া থাকি, তথাপি বক্তব্য বিষয় মনে করিয়া প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে। বলি বলি, মনে করিতেছি, কিন্তু মুখ হইতে কিছুতেই নির্গত হইতেছে না। যাহা হউক, যখন আমি এই কার্য্য করিব বলিয়া রাজকুমারের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন আমায় অবশ্যই বলিতে হইবে। মুনিবরের বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল, দেহ চৈতন্যশূন্য হইয়া মৃণ্ময় পুত্তলিকার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাজা শত্রুজিৎ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি যাহা বলিবেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন, এরূপ সংশয়িত অবস্থার অপেক্ষা শোকের অবস্থাও ভাল। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না, যাহা বক্তব্য হয়, এখন প্রকাশ করুন। আমি আপনার ভাবভঙ্গী ও করস্থিত রত্নহার দেখিয়াই এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি; এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলুন, শুনিয়া নিশ্চিন্ত হই। এই বলিয়া রাজা তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ভাণকারী দুরাচার দানবাধম যেন নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আর কি কহিব, তোমার বীর পুত্র ঋতধ্বজ কুবলয়াশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক আমার আশ্রম সমীপে ঋষিগণের রক্ষার্থ বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে এক ভয়ঙ্কর বিকট মূর্ত্তি দৈত্য আসিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। রাজকুমার অকুতোভয়ে তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই দৈত্যের সহচরগণ আপনার পুত্রের ভীম শরে একে একে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে সেই দুর্দ্দান্ত দানব সহসা মায়াজাল বিস্তার করিয়া নৃপনন্দ-

নের বক্ষস্থলে শূলাঘাত করিল। তাহাতেই, তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে কুবলয়াশ্ব তাঁহার সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আর্ত্তস্বরে হেষারব করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সেই ঘোররূপী বিজেতা দানব তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন পূর্ব্বক কুবলয়াশ্ব লইয়া প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে আমি সাতিশয় উৎকণ্ঠিত মনে রাজকুমারের সন্নিধানে গমন করিলাম এবং দেখিলাম, তাঁহার চরম কাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অতি কাতরস্বরে কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই রত্নহার প্রিয়তমা মদালসার করে অর্পণ করিয়া কহিবেন, আমি জন্মের মতন বিদায় হইলাম। তাহাতে আমিও তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলাম। পরে তিনি ক্ষণকালমধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিলে আমি শূদ্রতাপসগণ দ্বারা তাঁহার অগ্নিকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। এক্ষণে অনন্তর কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করুন্। মদালসে! এই তোমার প্রিয় বল্লভের কণ্ঠহার, গ্রহণ কর, ইহা তোমার হৃদয়াশ্বসন হইবে, এই বলিয়া মদালসার ক্রোড়ে সেই রত্নহার নিক্ষেপ পূর্ব্বক দুরাত্মা মুনিবেশধারী দানব প্রস্থান করিল।

মহারাজ শত্রুজিৎ ও অবরোধগণ সহসা এই অভাবিত ঘটনা শ্রবণগোচর করিয়া ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন। পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইলে তাঁহারা শিরে করাঘাত করিয়া হাহাকার পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তুমুল ক্রন্দনধ্বনিতে রাজভবন আকুল হইয়া উঠিল। ঋতধ্বজের জননী উন্মাদিনীর ন্যায় মস্তকে কঙ্কণাঘাত করিয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

পূর্ণ শশী।

বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী নিত্যকামী, এই গীত শুনিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভগ্নদন্তে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, কাশ্মীরের রাজকুমার না জানি কি অদ্ভুত পদার্থ, আর সেই রাজ অন্তঃপুরের গায়িকা না জানি কি অপূর্ব্ব মধুমাসের কোকিলা। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট, এই কি তার পরিচয়?

পত্রিকা হাসিয়া কহিলেন, আপনি বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু বোধ করি রসিকতায় বৃদ্ধ নন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকারে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, শত বৎসর সাক্ষাৎ হয় নাই, কৃষ্ণও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি পূর্ণ প্রেমে প্রণয়িনী, গৌরবিনী রাধিকা, প্রেমের বিরহগীত পরিত্যাগ করেন নাই। এক দিন, তত বৃদ্ধ বয়সেও ললিতাকে ডাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন,—

(গীত)

খুঁজিয়া এলেম সখি যমুনার কূলে।
খুঁজিয়া এলেম, কেলি কদম্বের মূলে॥
কোথাও না হেরিলাম, কোথায় কালিয়া শ্যাম,
হায় আমি হারিলাম, লাভে আর মূলে!!
পাতি পাতি করি সখি! দেখি কুঞ্জবন।
কোথাও দাঁড়ায়ে নাই রাধিকা রমণ॥
যেখানে কোরেছি রাস, নব প্রেমে মাতি।
নবনারী কুঞ্জে যথা সাজিয়াছি হাতী॥
সেখানেও শ্যাম নাই, সব অন্ধকার।
বিশ্বময় অন্ধকার, আজি রাধিকার॥

কুহরে পঞ্চমস্বরে, শাখে পিকবর।
শ্রীরাধিকা প্রাণে মরে, কাঁপে কলেবর ॥

বেহাগ্।

ভাবিব না সখি আমি শ্যাম রতন।
কৃষ্ণ বোলে ডাকিব না থাকিতে জীবন ॥
যেমন বিরহ জ্বালা, আমারে দিতেছে কালা,
তেমনি আপনি হবে, প্রেমে জ্বালাতন ॥
খুঁজেছি যমুনা কূলে, দাঁড়ায়ে কদম্ব মূলে,
পাই নাই কালরূপ, রূপ দরশন ;—
তবে কেন বৃথা আর, বলি সই! শ্যাম আমার,
আজি অবধি রাধার, হলো প্রেম উজ্জাপন ॥

ব্রহ্মচারী নিত্যকামী আবার হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে পূর্ণশশীরে কহিলেন, অমন গীত আমি অনেক শুনিয়াছি, তোমরা যদি এখনই আমারে বল, সহস্র সহস্র বাঁধিয়া দিতে পারি। (পত্রিকার দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া) এক দিন ভাই, সে অনেক দিনের কথা, আমাদের একজন নবীনা তপস্বিনী, পলান্ন রন্ধন করিতেছিল, আমি নাকি ব্রহ্মচারী, সে গন্ধ আঘ্রাণ করিব না, সেইজন্য কহিলাম, তুমি দূর হও। (পূর্ণশশীর দিকে ফিরিয়া) দেখ পূর্ণশশি! আমি রন্ধন জানি, প্রচুর রন্ধন জানি, আর স্মৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তার নামও জানি, কিন্তু এই পত্রিকা যে সকল গীত গাইতেছে, তাহাতে আমি অজ্ঞান হইয়াছি। একটি কথার সহিত দুটি কথার মিল নাই, একটি

ভাবের সহিত আর একটি ভাব মেলে না। রাজ রাজেন্দ্রকুমার শশীন্দ্রশেখরের ভগ্নীর কি এমনি গায়িকা সব? বৎসে পূর্ণশশি! তুমি শুন, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমারই অনুগত। পত্রিকা বিশ্বাস রাখিতে জানে না, গুরুদেবের আদেশ, আমি ইহাকে তাড়াইয়া দিব। সরাসর আমি তোমারে কাশ্মীরে লইয়া যাইব। যদি কপালে থাকে, তুমি রাজপুত্রের প্রণয়িনী হইবে। পাটনার শিবিরে অবমানিনী হইবার নিমিত্ত, আমি তোমারে এখানে আনি নাই।

এক জন সহচরী, জোড় হাতে কহিল, ঠাকুর! আপনি ক্ষান্ত হউন।

পত্রিকা একটু একটু হাসিয়া কহিলেন, প্রণয়ের যে সুখ, আর বিচ্ছেদের যে দুঃখ, অভাগা পুরুষ, আর অভাগিনী রমণীরাই তাহা জানে। আপনার তুল্য সাধু পুরুষেরা, সে সুখ দুঃখের অংশভাগী হইতে পারেন না।

তপস্বী নিত্যকামী বাঙ্গলা দেশের টোলের পণ্ডিতাভিমানী ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় কোপনস্বভাব। তিনি ক্রোধে থরহরি কম্পমান হইয়া কহিলেন, দূর হতভাগা মাগী, তুই দূর হ! তুই কাশ্মীরের রাজাদের এক জন দাসী, তুই আমার উপর টেক্কা দিয়া যাবি, আমার কথার উপর কথা পাড়িবি, আমি পবিত্র আশ্রমের আশ্রমী, চুপ করিয়া থাকিব? কখনই হইবে না। আদিরসে আমি পরম পণ্ডিত, কি কৌশলে স্ত্রীলোকের মন ভুলাইতে হয়, গুরুদেবের কৃপায় তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। পূর্ণশশি! তুমি বাছা একটু অন্তর হও, আমি মনের কথা পঞ্চাশ বৎসরের পর, আজ খুলিয়া বলি।

পূর্ণশশী একটু হাসিয়া সরিয়া গেলেন, ব্রহ্মচারী গান ধরিলেন।

(নিত্যকামীর গীত।)

পীলু—জৎ।

প্রেমের পুতলি রাধা নাচিতেছে বিপিনে।
নাচিতেছে, খেলিতেছে, হাসিতেছে, পুলিনে॥
শ্যাম সোহাগী কমলিনী, হেরে আমায় নয়ানে।
মুচ্‌কে হেসে, সরে গেল বসন ঢেকে বয়ানে॥
দেখ্‌বো তারে দেখ্‌বো আবার, ইচ্ছা করে মননে।
রং বিলাসী, গয়লাদাসী, মোজ্‌বে আমার চরণে॥
সুখবিলাসী, পূর্ণশশী, নিদ্রা যাও মা শয়নে।
দেখি আমি ব্রজবাসী, প্রেম বিলাসী নয়নে॥
যা থাকে কপালে আজি, ফলিবে শুভ দিনে।
প্রেমের নিকুঞ্জে আজি, বাজিবে মোহন বীণে॥

পত্রিকা কহিলেন, গোঁসাই ঠাকুর! দিব্য গীত হইয়াছে। আমি যদি পূর্ণশশীর দাসী হইয়া কখনো নীলগিরিতে যাই, তাহা হইলে আর ফিরিয়া আসিব না, আপনার চরণতলে বসিয়া গান বাজনা শিক্ষা করিব। আপনি আমার গুরু হইবেন।

নিত্যকামী হিহি করিয়া হাসিয়া কহিলেন, তুমি আমার চরণ-তলে বসিলে আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব। আমার বিবাহ হয় নাই।

মনের হাসি মনে গোপন করিয়া পত্রিকা কহিলেন, বলিতে সাহস হয় না, আপনি যদি কৃপা করিয়া এ দাসীকে গ্রহণ করেন, তবে এ চরিতার্থ হয়।

ব্রহ্মচারী আর আহ্লাদে 'বসিতে পারিলেন না, যেন ফুলিয়া

ফুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। গদ গদ স্বরে কহিলেন, হাঃ হাঃ হাঃ! সু—সু—সুন্দরি! কিছু মনে করিও না,—মন্দ কথা বলিয়াছি, সে পরিহাস; কিছু মনে করিও না; আমি তোমারে বড় ভাল বাসি। আর একটী গীত শুনিবে?

"শুনিব"—নম্রস্বরে নতমুখে এই কথাটী বলিয়া পত্রিকা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। নিত্যকামী পুনরায় গীত ধরিলেন।

আড়খেম্‌টা।

(মৃদু নৃত্যের সঙ্গে)

হ্যাদে বাহোয়া কি মজার কথা, শুন্‌লে হাসি পায়,
রাজার মেয়ে দাসী হলো, দাসীরা তায় দেখ্‌তে চায়॥
নাইবা হলো রাজার মেয়ে, তবুও ভাল রাণীর চেয়ে,
মেয়ের পানে চেয়ে চেয়ে, পথের লোকের চোক টাটায়॥
বনফল যার ছিল ভাল, রাজভোগে তার কাজ কি বলো,
কোথায় আঁধার কোথায় আলো, রাজার ছেলে লোকহাসায়॥
আমি নবীন ব্রহ্মচারী, এ লোভ কি সাম্‌লাতে পারি,
দেখ্‌বো আজ হারি কি পারি, লোভেই লোভীর কুলমজায়!!

পাঠক মহাশয়! এ গীতের ভাব কিছু বুঝিলেন?—পত্রিকা বুঝিয়াছেন। তাঁহার মুখখানি গম্ভীর হইয়াছে, যেন কি ভাবিতেছেন। যদি ভাব বুঝিয়াছেন, তবে এ ভাবনা কেন?—আর কি কিছু ভাবিতেছেন?—হতেও পারে।—কিন্তু সে কথা এখন জিজ্ঞাসা করিতে নাই;—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরও আসিবে না।—পত্রিকা অতি লজ্জাবতী।

নিত্যকামীর গীত শুনিয়া লোকের হাসি পায়, পত্রিকা হাসি-

লেন না কেন?—রহস্য শ্রবণ করিয়া চিন্তার উদয়ই বা কেন? এ দুটী প্রশ্নেরও এখন উত্তর নাই। সকলি এখন ভবিষ্যতের তমোময় বিবরে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কোথা এলেম?

"আমরা যাব গো সবে করিতে শ্যাম দরশন।
হেরিয়া হইবে মনোবাঞ্ছা পূরণ॥"

নানা আলাপে, নানা গল্পে কিছু দিন অতীত হইয়া গেল। পত্রিকা কোনো দিন সঙ্গীত করেন, কোনো দিন অতি মনোরম উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন,—কোনো দিন বা এক একটী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। নিত্যকামী প্রথম প্রথম পরিহাস করিয়া পত্রিকার সকল কথায় ছল ধরিতেন, এখন সে ভাব নাই।—অনুরাগ জন্মিয়াছে। যতক্ষণ পত্রিকা কথা কন, প্রণয়ী তপস্বী ততক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখ পানে চাহিয়া থাকেন। কাণের কুণ্ডল দুটী দুলিতেছে, অলকাগুচ্ছ কাঁপিতেছে, চক্ষের পলক পড়িতেছে, এই গুলি দেখেন। পত্রিকা মনে মনে হাসেন, আর এক একবার অপাঙ্গে দর্শন করেন। প্রতি দিন সন্ধ্যার পর এই ভাবটী পরম সুন্দর দেখায়।

বসন্তকাল আগত।—পাটনায় আর অবস্থান করিতে পত্রিকার মন চাহিল না। পূর্ণশশীকে কহিলেন, প্রিয়সখি! রাজপুত্র সংবাদ দিবেন বলিয়াছিলেন, মিথ্যা হইল,—তাঁহার নিকট লোক পাঠানো

হইয়াছে, সে লোকও ফিরিল না ;——আমরা যাইতেছি, এই ভাবিয়া রাজকুমার হয় ত নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। আমাদের আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হয় না। প্রয়াগে থাকিবেন কথা ছিল, চল আমরা প্রয়াগেই যাই, সেখানে দেখিতে না পাই, সরাসর রাজধানী চলিয়া যাইব।

পূর্ণশশী সম্মত হইলেন,—নিত্যকামীও সায় দিলেন, পাটনা হইতে শিবির উঠিয়া এলাহাবাদে চলিল। কুমারী আজীবন কখনো নৌকা আরোহণ করেন নাই, নৌকায় যাইতে অভিলাষ জানাইলেন। নিত্যকামী আর পত্রিকা সে বাসনায় বাধা দিলেন না, নৌকাতেই যাত্রা করা স্থির হইল। পটাবাস লইয়া অনুচরেরা স্থলপথে চলিয়া গেল, প্রয়াগের ঘাটে শিবিকা লইয়া প্রতীক্ষা করিবে, সঙ্কেত থাকিল,—পূর্ণশশী জলপথে চলিলেন। তরণী মধ্যেও পত্রিকার উপন্যাস আর নিত্যকামীর রহস্য সম পরিমাণে চলিতে লাগিল। আমি যদি নাটক লিখিতে জানিতাম, তাহা হইলে এই সুরসজ্ঞ নিত্যকামী আমার হস্তে এই ঋতুতে জীবন্ত বিদূষকের ক্রীড়া করিয়া প্রশংসা লাভ করিতেন। ভাগ্যদোষে আমি স্বয়ং সে রসে বঞ্চিত,—নাটকের আস্বাদন বোধের ক্ষমতা আমার নাই।

কত দেশ, কত নগর, কত স্থান আর নদী ও প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে তরুণ আরোহীরা মাঘ মাসের শেষে এলাহাবাদে পৌঁছিলেন। সে স্থানের শোভা আরো রমণীয়। নৌকা যখন প্রয়াগের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম ঘাটে উত্তরিল, তখন গোধূলি।—শিবিকা বাহকেরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত একজন অনুচর তীরে উঠিল। এই অবসরে স্বভাবদর্শন-পিপাসী পূর্ণশশী ধীরে ধীরে ছত্রীর খড়্‌খড়ী খুলিয়া সন্ধ্যাকালের জগচ্ছবি দর্শন

করিতে লাগিলেন। গগনে পূর্ণকলা চন্দ্রমা অল্পে অল্পে বদন বিকাস করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, তারাসহ তারানাথের প্রতিবিম্ব জলে পড়িয়াছে, বোধ হইতেছে, জলতলে যেন একটী গগন জ্বলিতেছে, গঙ্গাযমুনা আহ্লাদে হাসিতেছেন,—সমস্ত প্রকৃতিই এখন প্রয়াগধামে প্রফুল্লমুখী।—পূর্ণশশী এই শোভা দেখিলেন;—আকাশে পূর্ণশশী,—ভাগীরথী অঙ্কে পূর্ণশশী, আর প্রকৃতি দর্পণে পূর্ণশশী দর্শন করিয়া চারুশীলা পূর্ণশশীর প্রেমাঙ্কুরিত পবিত্র হৃদয় পরম পুলকে পরিপূর্ণ হইল;—সহৃদয়া বালিকার সরল হৃদয় পূর্ণানন্দে হাসিল।—হরিণায়ত সজল নেত্রপুটে সেই আনন্দ ক্রীড়া করিতে লাগিল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ থাকিল না।—নীলগিরি মনে পড়িল,—তপোবন মনে পড়িল,—গ্রীবাভঙ্গী করিয়া পত্রিকার মুখের দিকে একবার চাহিলেন,—একবার নিত্যকামীর শ্মশ্রুল বদন নিরীক্ষণ করিলেন। মুখখানি বিষণ্ণ হইল, দুটী পদ্মচক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু নৌকায় পড়িল। নদীর স্রোতের দিকে একবার সজল নেত্রপাত করিলেন, আকাশের দিকে একবার শশীমুখখানি তুলিলেন,—আবার সেই মুখে অপূর্ব্ব হাসি আসিল। মৃদু হাসিয়া মাথা হেঁট করিলেন;—এই ভাবান্তর দেখিয়া পত্রিকা বুঝিতে পারিলেন, লজ্জাশীলা কি ভাবিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ণ! অকস্মাৎ মনে কি কিছু উদয় হইয়াছে?

"কৈ, না, কিছুই ত নয়" এই পর্য্যন্ত বলিয়া লজ্জাশীলা যেন আরো কিছু বলিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ গঙ্গার সিকতাময় পুলিনে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, একটী সুন্দরী কুলবালা একখানি মাটীর বাসনে একটী মৃণ্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া জলে ভাসাইয়া দিল,—প্রদীপ অল্প অল্প বাতাসে ভাসিয়া চলিল।

দূতী কৃষ্ণ সংবাদ।

দূতী—হে রাখাল রাজ! না না, মহারাজ!
চিনিতে কি এবে পার আমায়?
কৃষ্ণ—কে তুমি তোমার বাড়ী কোথায়?
দূতী—বৃন্দেদূতী নাম বাড়ী ব্রজধাম
নিধুবনে আছে যাওয়া আসা।
কৃষ্ণ—এখানে আসার কিরূপ আশা?
দূতী—মনে আশা যাহা পরে বলি তাহা,
চিনেছ কি, আগে বলনা তাই।
কৃষ্ণ—দেখিয়া থাকিব, স্মরণ নাই।
দূতী—বটে বটে হরি চিনিবে কি করি
গিয়েছে, ভুলেছ সে সব কাল।
কৃষ্ণ—কোন্ কালে আমি নহি ভূপাল?
দূতী—হইয়া গোপাল হয়েছ ভূপাল
ভুলিয়া গেছ সে পাঁচন বাড়ী।
কৃষ্ণ—কখন্ ছিলাম কাহার বাড়ী?
দূতী—বলিহারি ধন রাজ পরিজন
ধন হলে মন নূতন হয়।

কৃষ্ণ—আমার ধন ত নূতন নয়।
দূতী—চরায়ে গোপাল গেল চিরকাল
কালিকের কথা স্মরণ নাই।
কৃষ্ণ—কি হয়েছে কাল বলনা তাই।
দূতী—মিছে আর বলা আমরা অবলা
পুরুষের মন বুঝিতে নারি।
কৃষ্ণ—খুলে বল, যদি চিনিতে পারি।
দূতী—মনে আছে সব হয় অনুভব
চিনিতে চাহিলে চিনিতে পারো।
কৃষ্ণ—চেনাতে চাও ত বলনা আরো।
দূতী—তবে হাতে হাতে চেয়ে দেখ হাতে
পাঁচনের দাগ আছে কি নাই।
কৃষ্ণ—কই কিছু নাহি দেখিতে পাই।
দূতী—চেন কি হে শাম সেই ব্রজধাম
যেখানে থাকিয়ে মানুষ হলে?
কৃষ্ণ—কোথা ব্রজধাম জগতী তলে?
দূতী—ভাল, নন্দঘোষে যারে সবে ঘোষে
যাঁর বাধা সদা বহিতে শাম?
কৃষ্ণ—কাণেও কখন শুনিনি নাম।
দূতী—ওহে ও রাজন্! শুনিব এখন
জনকের নাম বল ত শাম।

কৃষ্ণ—বসুদেব মম পিতার নাম।

দূতী—ছিছি ওহে শাম রাম রাম রাম
ও কথাটা বেনে বলো না আর।

কৃষ্ণ—উচিত বলিব শতেক বার।

দূতী—ধনের আশায় জনক ভাঁড়ায়
দেখি নাই কভু শুনিনি কাণে।

কৃষ্ণ—বসুদেব পিতা কেবা না জানে।

দূতী—ভাল তাই হলো এবে বল বল
চিনিতে পার কি মা যশোদায়।

কৃষ্ণ—কেমনে চিনিব তোমার মায়।

দূতী—আপন জননী চেন না আপনি
আমরাই যেন আপন নই।

কৃষ্ণ—আর কে জননী দেবকী বই ?

দূতী—দেখ মনে করে এক দিন করে
বেঁধে ছিল সেই যশোদা রাণী।

কৃষ্ণ—কই, আমি তাত কিছু না জানি।

দূতী—সদা শুনা যায় ত্যজিলে মাতায়
পাতকের তার নাহিক পার।

কৃষ্ণ—যে ত্যজিবে পাপ হইবে তার।

দূতী—ভাল গোপীগণে পড়ে কিহে মনে
যাদের নবনী করিতে চুরি।

কৃষ্ণ—বলিহারি তব বাক্ চাতুরী।
দূতী—করিতে বিহিত নবনী সহিত
ধরিয়া দিয়াছি মা যশোদায়।

কৃষ্ণ—মোর ননী কত কুকুরে খায়।
দূতী—ভাল রাম নাম শুনেছ কি শাম
ভেবেদেখ যদি হয় স্মরণ।

কৃষ্ণ—শুনেছি ত্রেতায় ছিল দুজন।
দূতী—ভেবে নাহি পাই জীবনের ভাই
তাহাকে কেমনে ভুলিয়া গেলে।

কৃষ্ণ—আমিই মায়ের একলা ছেলে।
দূতী—জীবনের ভাই কোথা গেলে পাই
কথায় বলেহে শুনেছি কাণে।

কৃষ্ণ—সাধারণ কথা সকলে জানে।
দূতী—যদি সে বচনে জানিতে হে মনে
তবে কি ভুলিতে পারিতে তারে ?

কৃষ্ণ—কার সহোদর ভুলিব কারে ?
দূতী—ধেনু লয়ে বনে যাহাদের সনে
যাইতে সাজিতে রাখাল রাজ ?

কৃষ্ণ—রাখালি করা কি রাজার কায ?
দূতী—হইয়া রাখাল গেছেচিরকাল
দুদিন রাজা ত হয়েছ শাম।

কৃষ্ণ—চিরকাল মোর শ্রীপতি নাম।
দূতী—কাঁধেতে চড়েছ কাঁধেতে করেছ
এখন এতই গরব হল ?

কৃষ্ণ—আর কিছু যদি থাকে ত বল।
দূতী—বলিব কি ছাই ওহে ও কানাই
কালার নিকটে কালীর নাম।

কৃষ্ণ—আপনার তবু পুরিবে কাম।
দূতী—হয় কিহে মনে নিকুঞ্জকাননে
করিতে যেখানে সদা বিহার ?

কৃষ্ণ—কেবা অধিকারী বলত তার ?
দূতী—মানস মোহন নিকুঞ্জকানন
মালিক তাহার রাই কিশোরী।

কৃষ্ণ—কেবা রাই বল কাহার নারী।
দূতী—বৃকভানুসুতা রূপ গুণ যুতা
লোকে বলে তাঁরে শাম মোহিনী।

কৃষ্ণ—আমার রমণী আমি না চিনি ?
দূতী—মায়েরে যেজন করেনা স্মরণ
প্রেয়সী ভোলাত সহজ তার।

কৃষ্ণ—তার পর বল আছে কি আর।
দূতী—জানিত কি রাই ওহে ও কানাই
অবশেষে তুমি এমন হবে।

কৃষ্ণ—তাহারে বিবাহ করেছি কবে ?

দূতী—গোপনে গোপনে চন্দ্রার ভবনে
এক দিন তুমি যাইলে হরি।

কৃষ্ণ—বল তার পর কি আমি করি।

দূতী—শুনে বিনোদিনী হইয়া কোপিনী
আসিতে তোমায় করে বারণ।

কৃষ্ণ—তার পর বল করি শ্রবণ।

দূতী—দ্বার রোধ করি আমিই হে হরি
দাঁড়ালেম গিয়া কুঞ্জের দ্বারে।

কৃষ্ণ তবে আর কেবা ঢুকিতে পারে ?

দূতী—ভাবিতে ভাবিতে কান্দিতে কান্দিতে
আমার নিকটে আসি দাঁড়াও।

কৃষ্ণ—ভাল, শুনিতেছি বলিয়া যাও।

দূতী—তোমার লাগিয়া বিনয় করিয়া
কতই যে আমি বলি রাধায়।

কৃষ্ণ—কি জবাব তিনি দিলেন তায় ?

দূতী—কিছুনা বলিয়া মানেতে মজিয়
বসিল বদন করিয়া ভার।

কৃষ্ণ—কিসে মান তবে ভাঙ্গিল তাঁর।

দূতী—দেখ মনে করি আপনি হে হরি
কান্দিয়া ধরিলে রাই চরণ।

কৃষ্ণ—নারী পায় ধরে কেমন জন ?
দূতী—আপনি হে হরি   ক্ষম হে কিশোরী
বলিয়া কতই সাধিলে তাঁয়।
কৃষ্ণ—পড়ে ছিল কি না বড়ই দায়।
দূতী—বলিলে আবার   ক্ষম হে এবার
আর কখন না হবে এমন।
কৃষ্ণ—তবু কি তাঁহার হলোনা মন ?
দূতী—না দেখি উপায়   অবশেষে তাঁয়
দাস খত লিখে দিলে হে হরি।
কৃষ্ণ—তবে আসিলাম কেমন করি।
দূতী—আসিব বলিয়া   এলে হে চলিয়া।
ভুলিয়া রহিলে কুবুজা পেয়ে।
কৃষ্ণ—তবে কি এখন যাইব ধেয়ে ?
দূতী—কেন যাবে হরি   কুজি পরি হরি
সোণায় সীসায় মিলিবে কেন ?
কৃষ্ণ—বুঝিনা, কি ভাবে বলিছ হেন।
দূতী—তোমার জীবন   কুবুজা রতন
কুজি বলা বুঝি সয়না প্রাণে ?
কৃষ্ণ—কুবুজা সুন্দরী সবাই জানে।
দূতী—তোমার যে খায়   তোমার সে গায়
সে বলে সুন্দরী আমি ত নয়।

কৃষ্ণ—রতনে রতন সবাই কয়।
দূতী—ঘিয়েতে অরুচি ঘায়েতেই রুচি
মাছির স্বভাব জানে সবাই।

কৃষ্ণ—কি দায়ে পড়েছি একি বালাই।
দূতী—আমারে বালাই বলিবে কানাই
আটক কি আছে বল হে তার।

কৃষ্ণ—কেন কি হয়েছে বল ত আর।
দূতী—মা বাপে যে জন করে না স্মরণ
সেজন সকল করিতে পারে।

কৃষ্ণ—খুন করিয়াছি কখন কারে ?
দূতী—বলালে ত বলি খুলিয়া সকলি
মামারে মারা কি নাহি স্মরণ।

কৃষ্ণ—ভাল চাও থাম, করি বারণ।
দূতী—সোজা পথে যাই কারে বা ডরাই
উচিত বলিতে কাহারে ভয়।

কৃষ্ণ—এখনি দেখাব হয় না হয়।
দূতী—মারিবে ত মার এস যদি পার
এই ত শরীর দিয়েছি পেতে।

কৃষ্ণ—নারী না হইলে দেখিতে পেতে।
দূতী—গেছে খোসামোদ কেঁদে অনুরোধ
এখন দেখিতে পাবনা আর ?

কৃষ্ণ—বাড়ায়োনা মিছে রাগ আমার।
দূতী—যদি বেড়ে যায় ভয়াবনা তায়
কুজির কাছেতে রাগ দেখাও।
কৃষ্ণ—বার বার বলি বাহিরে যাও।
দূতী—এই চলিলাম ত্যজি তবধাম
সুখে থাক লয়ে কুবুজা জায়া।
আমি বলি ছাড় শ্যামের মায়া।

জল।

আমাদের দেশীয় পণ্ডিতবর্গ জল ভৌতিক পদার্থ বলিয়া জানেন; ইউরোপখণ্ডেও পূর্ব্বে এই মত প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ক্যাভেণ্ডিশ নামক একজন ইংরাজ ইহা যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসদ্বয়ের সংযোগে প্রস্তুত হয়, তাহা আবিষ্কার করিয়া ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এই দুই গ্যাস মিশ্রিত করিয়া একটি কাচনির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করত তার সহকারে তন্মধ্যে তড়িৎ প্রেরণ করেন, তাহাতে ঐ পাত্রের গাত্রে জল বিন্দু একত্রিত হয়। জল হইতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস বাহির করিয়াও, ইহা যে এই দুই দ্রব্যের সংযোগে প্রস্তুত হয়, তাহা দেখান যাইতে পারে।

স্বভাবতঃ জল তিন আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কঠিন আকার বরফ, দ্বিতীয় তরল আকার জল এবং তৃতীয় গ্যাসের আকারে বাষ্প। উত্তাপের তারতম্য জন্য এই প্রকার আকারের

বিভিন্নতা হইয়া থাকে। বরফে উত্তাপের ভাগ যত থাকে, জলে তদপেক্ষা অধিক, এবং আরও অধিক উত্তাপ সংযোগে বাষ্প প্রস্তুত হয়। সেন্টিগ্রেড্ তাপমানের ০° ডিগ্রী ও ১০০ ডিগ্রীর মধ্যস্থিত সমস্ত ডিগ্রী সন্তাপে জলের আকার থাকে, কিন্তু ১০০ ডিগ্রীর উপরে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। ০° ডিগ্রীতে জল সংযত হইয়া বরফ আকার ধারণ করে।

সমস্ত পদার্থ শীতলতা সহকারে সঙ্কুচিত হয় এবং উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়, কিন্তু জলের বিষয়ে এ নিয়মের বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়। সকলেই অবগত আছেন যে, বরফ জলে ভাসিয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বে যে নিয়মের বিষয় লেখা হইয়াছে, তদনুসারে ইহা জলমগ্ন হওয়াই উচিত। কিন্তু জলের বিষয়ে এই নিয়ম প্রচলিত হইলে, বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এখানে এই ব্যবস্থার ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। জল ক্রমশ শীতল হইবার কালে ০° ডিগ্রী বা ১।।০ ডিগ্রী উপর পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু তন্নিম্নে ইহার কলেবর প্রসারিত হয়। সুতরাং বরফ আকারে পরিণত হইলে মগ্ন না হইয়া ভাসমানই থাকে। এই বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন এক লৌহ নির্ম্মিত আধারে জল রাখিয়া ইহার মুখ বিলক্ষণ রূপে বন্ধ করিয়া বরফচূর্ণ ও লবণ দ্বারা আবৃত রাখিলে কিছু ক্ষণ পরে অতিশয় উচ্চ শব্দ হইয়া ঐ আধারটি ফাটিয়া যায়। অভ্যন্তরস্থ জল পরীক্ষা করিলে বরফে পরিণত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। জল বিষয়ে এই ব্যত্যয় না হইলে অতি প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। হিম প্রধান দেশে সমুদ্র বা পুষ্করিণীর উপরিস্থিত জল জমিয়া জলমগ্ন হইলে ঐ বরফ আর কখনই দ্রব হইতে পারিত না, যে হেতু সূর্য্যরশ্মি দ্বারা জলরাশি কখনই এমত উত্তপ্ত হইতে

পারে না যে, তদ্দ্বারা নিম্নস্থিত বরফ দ্রব হইতে পারে। অধিকন্তু ক্রমাগত উপরিস্থ জল বরফ হইয়া জলমগ্ন হইলে কাল সহকারে সমস্ত জলরাশিই বরফে পরিণত হইতে পারিত।

জলে যত তাপ সংযোজিত হউক না কেন, সেন্টিগ্রেড্‌তাপমানের ১০০০ ডিগ্রীর উপরে কখনই সন্তাপ বৃদ্ধি হয় না। অবশিষ্টাংশ তাপ কিয়ৎ পরিমাণ জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া উপরে উঠিয়া যায়। বাষ্প স্বভাবতঃ অদৃশ্য বায়ু মধ্যে অবস্থিতি করে এবং ইহার তারতম্য অনুসারে বায়ু অধিক বা অল্প শৈত্য সম্পন্ন হয়। এই শৈত্য নির্ণয় করিবার জন্য পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা একটি যন্ত্র ব্যবহার করেন। ইহার ইংরাজী নাম হাইগ্রোমেটার। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জল অধিক উত্তাপ সহকারে বাষ্পাকার ধারণ করে। সুতরাং কোন জলরাশি শীতল করিতে হইলে উহাতে উত্তাপ না দিয়া বাষ্প নির্গত করিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, যেহেতু নিম্নস্থিত জল ও সংস্পৃষ্ট বায়ু হইতে তাপ লইয়াই উপরিস্থিত জল বাষ্পাকার ধারণ করে। মস্তক উষ্ণ হইলে চিকিৎসকেরা শুদ্ধ জল বা ইহাতে কোন লয়শীল পদার্থ মিশাইয়া মাথায় দিতে পরামর্শ দেন। ইহার কারণ এই যে মস্তকের তাপ লইয়া জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, সুতরাং মস্তকও শীতল হয়। যে বস্তু অল্প উত্তাপ সহকারে বাষ্পাকার ধারণ করে, তাহাকে লয়শীল পদার্থ কহে।

হেমন্তে যে শিশির পতন হয়, এক্ষণে তাহারও কারণ পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। তাপের একটি কার্য্য কোন উত্তপ্ত বস্তু হইতে নির্গত হওয়া। কোন একটি বস্তু অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া স্থানান্তরিত করিলে কিছু ক্ষণ মধ্যে উহা শীতল হইয়া যায়। ঐ বস্তু হইতে তাপ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াই এই ঘটনার কারণ।

শীতকালে দিবা ভাগে সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে, রাত্রিকালে ঐ উত্তাপ পুনরায় উহা হইতে উত্থিত হইলে বৃক্ষপত্র ও তৃণাদি অধিক শীতল হয় ও সংলিপ্ত বায়ুস্থিত বাষ্প হইতে তাপ ঐ সমস্ত পদার্থে পরিচালিত হয়। জল তাপ সংযোগে বাষ্পাকার ধারণ করে, সুতরাং বাষ্প হইতে তাপ অপসৃত হইলেই উহা পুনরায় জলে পরিণত হইয়া তৃণাদিতে একত্রিত হয়। এইরূপ এক জলপূর্ণ পাত্র মধ্যে বরফ নিক্ষেপ করিলে বায়ুস্থিত বাষ্প হইতে তাপ পাত্রে পরিচালিত হয়, সুতরাং ঐ বাষ্প জল হইয়া ঐ পাত্রের বহির্ভাগে একত্রিত হয়।

কোন কোন পদার্থের এক বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যৎকর্তৃক ঐ পদার্থের উপরিভাগের পরমাণুসমূহ অন্তর্ভাগের পরমাণুর তাপের সমাহরণ করত বিশেষতঃ নিকটস্থ উত্তপ্ত বায়ুর তাপ সমাহরণ করত বাষ্প হইবার যোগ্য তাপ সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং বাষ্প হইয়া যায়। জল এই ধর্ম্মাক্রান্ত। সুতরাং সমুদ্র, পুষ্করিণী, নদ ও নদী হইতে স্বভাবত বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুতে মিশ্রিত হয়। কি প্রকারে এই বাষ্প শিশির রূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা লেখা হইয়াছে। এক্ষণে কি প্রকারে এই বাষ্পরাশি বৃষ্টি রূপে পুনরায় পৃথিবীতে নিপতিত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাপ সহকারে সমস্ত পদার্থ প্রসারিত হয় ও তদভাবে সংকুচিত হয়। এস্থলে ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যক যে, পদার্থ মধ্যে তাপ দুই প্রকারে অবস্থিতি করে। কিয়ৎ পরিমাণ গুপ্ত ভাবে থাকে অর্থাৎ তাহা স্পর্শজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারা যায় না ও কিয়ৎ পরিমাণ প্রকাশ্যাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ তাহা স্পর্শজ্ঞান দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়। গ্রীষ্ম সহকারে বায়ু স্ফীত হইলে ইহার প্রকাশ্য উত্তাপ গুপ্তাকার ধারণ

করে এবং প্রকাশ্য উত্তাপের পরিমাণ অল্প হইলে বায়ুস্থিত বাষ্পের উত্তাপও উপরি উক্ত গুপ্তাকারে পরিণত হয়। সুতরাং বাষ্পরাশি জল হইয়া যায় এবং আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরস্পর আকর্ষিত হইয়া বৃহদাকার জলবিন্দু রূপে ভূতলে নিপতিত হয়। পতন সময়ে শীতাধিক্য হইলে ঐ জল ঘন অর্থাৎ দৃঢ় হইয়া শিলাবৃষ্টি হয়। এই শিলা হওনের কারণ বিদ্যুৎ, বিদ্যুতের সহায়তা ভিন্ন শিলা জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।

সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে যে পরিমাণে জল প্রত্যহ বাষ্প হইয়া আকাশে উত্থিত হয়, তাহা মনে করিতে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অনুমিত হইয়াছে, প্রতি বর্ষে দুই শঙ্কু পঞ্চ নিখর্ব্ব দুই খর্ব্ব মণ জল আকাশ হইতে বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীর উপরে নিপতিত হয়। এতদ্ভিন্ন কোটি কোটি মণ জল হিম, শিশির, শিলা ও কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি নানা আকারে আকাশ হইতে পড়িয়া থাকে। এই সমুদায়ের আদি কারণ বাষ্প। প্রথমে ভূমি হইতে আকাশে বাষ্পরূপে জল না উঠিলে ঐ সকলের কিছুমাত্র উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, পৃথিবী হইতে প্রত্যহ এক নিখর্ব্ব মণ, এবং প্রতি ঘণ্টায় একচাল্লিশ কোটি, ছষট্টি লক্ষ, ছষট্টি সহস্র, ছয় শত ছষট্টি মণ জল বাষ্প হইয়া উঠিয়া থাকে। তাহা না হইলে নিয়মিত পরিমাণে বৃষ্টি হইত না। এই বিস্ময়জনক পরিমিত জলের কিয়দংশ প্রাণিদিগের প্রশ্বাস হইতে ও বৃক্ষাদির পত্র হইতে এবং দাহন সময়ে কাষ্ঠাদি হইতে নির্গত হয়, অবশিষ্ট জল রৌদ্র দ্বারা আকর্ষিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে পাঠকবর্গ অবগত হইতে পারিয়াছেন যে, হিম শিশির বর্ষাদি আকাশগত বারি মাত্রের কারণ বাষ্প। এই বাষ্প আবৃত

স্থানাপেক্ষা অনাবৃত স্থানে অধিক অল্পে ও যে জল বাষ্প হইবে, তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু ঐ জলাপেক্ষা উষ্ণ হইলে বাষ্প শীঘ্র উৎপন্ন হয়। গভীর পাত্র অপেক্ষা অগভীর পাত্রে ও বায়ুর সাহায্যে বাষ্প সত্বরে উত্থিত হইতে থাকে। এই অভিপ্রায়ে শীঘ্র দুগ্ধ শীতল করিতে হইলে অগভীর পাত্রে রাখা উচিত। তাহা হইলে দুগ্ধের অধিকাংশ বায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া শীঘ্র শীতল হয়। পীড়াকালে মস্তকে জল দিতে হইলে অধিক স্তর না করিয়া একস্তর মাত্র বস্ত্র সিক্ত করিয়া মস্তকে লাগাইলে শীঘ্র শৈত্য কার্য্য সম্পন্ন হয়।

জল কত উপকারী, তাহা লিখিয়া জানাইবার আবশ্যকতা নাই। ইহা না থাকিলে প্রাণী মাত্রের জীবনরক্ষা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সেই জন্য ইহার অন্য একটি নাম জীবন হইয়াছে।

অভিনব যোগবাশিষ্ঠ।

(১৭৯৫ শক)

মহারাজ দশরথ প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে নিতান্ত অন্যমনস্ক ও সাংসারিক সমস্ত কার্য্যে বিরত দেখিয়া, প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত কুলগুরু বশিষ্ঠকে নিয়োগ করিলেন। মহামতি বশিষ্ঠও রাজ নিয়োগানুসারে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠ উবাচ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! তুমি শিক্ষা, কলাপ ও ব্যাকরণ

প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছ. এবং সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি সমুদায় দর্শনের মধ্যে তোমার কিছুই অবিদিত নাই; সুতরাং ত্বৎসদৃশ লোকের এরূপ চিত্তবিকার নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। অতএব হঠাৎ তোমার এরূপ চিত্তবিকার কেন হইল? তাহা আমার নিকট সবিস্তারে প্রকাশ কর।

রামোবাচ।

রাম কহিলেন, গুরো! এই সংসার আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, এই নিমিত্ত আমি মানস করিয়াছি যে, সংসারে আর এক দণ্ডও থাকিব না। বনে গিয়া একমনে পরমাত্মার ধ্যান করিব।

বশিষ্ঠ উবাচ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যেমন গাভী অগ্নিহোত্রাদির কারণ, সেই রূপ সংসারই জীবের মুক্তিলাভের একমাত্র কারণ। সেই সংসারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী, ইহারাই শুভ সাধনের বিঘ্ন স্বরূপ। যেমন বালুকাময় ভূমিতে শষ্য উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ পিতৃ মাতৃ সংকুল সংসারে সুখের সম্ভাবনা নাই। অতএব যেমন জল অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ থাকে এবং শত্রুভাব অবলম্বন করে, সেইরূপ আপন উৎপত্তির কারণ পিতা মাতা হইতে পৃথক্ থাকা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

রামোবাচ।

রাম কহিলেন, গুরো! তবে এই সংসারের মধ্যে সার পদার্থ কি? সংসারী ব্যক্তি কাহাকেই বা আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে? এবং সর্ব্বদা কাহার সংসর্গে থাকিলে সনাতন সুখলাভে সমর্থ হওয়া যায়? এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার মনোগত অজ্ঞান তিমির দূর করুন।

বশিষ্ঠ উবাচ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! অমৃত যেমন সমুদ্রের সার পদার্থ, সেই রূপ ভার্য্যাই এই অন্ধতমসাবৃত সংসার সমুদ্রের সার পদার্থ। যেমন নৌকা দ্বারা অনায়াসে মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে যাওয়া যায়, সেইরূপ ভার্য্যা হইতেই এই সংসার সাগর পার হইয়া সুরলোক লাভ করা যায়। যেমন কুসুম সহযোগে সামান্য কীটও বিষ্ণু-শিরে আরোহণ করে, সেই রূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই প্রণয়িনীর সংসর্গে বাস করে সে অনায়াসেই মোক্ষধামে গমন করিতে পারে। অতএব কি গৃহে, কি উৎসব স্থানে, কি ব্রহ্ম মন্দিরে, এবং কি আহার কালে, কি শয়ন কালে, কি বায়ু সেবন সময়ে; সর্ব্বত্র সকল সময়েই ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে রাখা কর্ত্তব্য। দীপশিখা ও তেজ যেমন কখনই পৃথক্ হইয়া থাকে না, সেইরূপ পুরুষেরও স্ত্রীবিযুক্ত হইয়া থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যেমন দিবাকর যেখানেই গমন করুন না কেন, সর্ব্বদাই ধরণীর গাত্রে কর প্রদান করিয়া থাকেন, সেই রূপ কামিনী-স্কন্ধে কর প্রদান করিয়া সর্ব্বত্র গমন করা কর্ত্তব্য। যেমন দীপ শিখা অন্ধকার ময় গৃহ উজ্জ্বল করে তখন ঐ গৃহ হইতে অভিলষিত দ্রব্য অনায়াসে বাছিয়া লওয়া যায়, সেইরূপ কমনীয় কামিনী সম্মুখে থাকিলে মানস গৃহ উজ্জ্বল হয় এবং অভিলষিত সনাতন সুখলাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব ভার্য্যাই সুখলাভের একমাত্র কারণ। কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিলে ও সাধ্য মতে তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহার মধ্যে কিছুই দুর্লভ হয় না। অতএব সর্ব্বদা সহধর্ম্মিণীকে সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হওয়াই সৎপুরুষের কার্য্য। হে রাম! তুমিও পিতা মাতা রূপ গৃহজঞ্জালে জলাঞ্জলি দিয়া সনাতন সুখের আধার স্বরূপিণী কামিনীর চিত্তানুবর্ত্তনে তৎপর হও।

বর্ত্তমান অবস্থা।

আমাদিগের বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে আজ কাল অনেকেই এক বাক্যে শ্লাঘা করিয়া বলিতেছেন যে, আমাদিগের দেশের আধুনিকী অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে; বিদ্যার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সকলের বুদ্ধি-বৃত্তিও আলোচিত ও পরিমার্জ্জিত হইতেছে, মানসিক বৃত্তি সকলের পরিচালন দ্বারা অশেষবিধ মঙ্গলজনক কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ও গৌরবেরও বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু আমরা ঐরূপ একবাক্যতায় কখনই সম্পূর্ণ রূপে সায় দিতে পারিতেছি না ও আমাদিগের বর্ত্ত-মান অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া কোনমতেই শ্লাঘা করিতে পারিতেছি না। বরং আমাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি স্মরণ করিয়া নিয়তই শিথিলিত হইতেছি। পূর্ব্বকালে আমাদিগের এই পুণ্য-ভূমিতে যেরূপ বিদ্যার আলোচনা ছিল, এক্ষণে তাহার শতাংশের একাংশও নাই, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে আমা-দিগের দেশে সাধারণের বিদ্যানুশীলনের কোন উপায় ছিল না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই বিদ্যালোচনার রীতি সীমাবদ্ধ ছিল, বৈশ্য প্রভৃতি অপরাপর জাতিরা যাহাও শিক্ষা করিতেন, তাহা বিশেষ ফলোপধায়ক হইত না।

যাহাই হউক, শিক্ষাপ্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট ছিল, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে অন্যান্য ভাষার সমধিক গৌরব ছিল না, কেবল মাত্র সংস্কৃত ভাষাই বিশেষ গৌরবান্বিত ছিল, সকলেই শ্রদ্ধার সহিত সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিতেন; এবং তাহাতে বিশেষ রূপে কৃতকার্য্যও হইতেন। পূর্ব্বে ধনবান্ লোকেরা বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত যত্নবান্ ছিলেন, বিদ্যাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন, তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত নানাবিধ উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন, সুতরাং তাঁহারাও সমধিক উৎসাহের সহিত বিদ্যার আলোচনায় সুখে কালক্ষেপ করিতেন; ধনলালসা তাঁহা-দিগকে সুবিমল বিদ্যার আলোচনার সময়ে বিচলিত করিতে পারিত না। আর শিক্ষার্থীরাও অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইত, অর্থাভাবে তাহা-দিগকে শশব্যস্ত হইতে হইত না, তাঁহারা অভিলাষানুরূপ বিদ্যা অভ্যাসে স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে পারিতেন। তাঁহারা নিয়তই বিদ্যালয়ে বাস করিতেন ও নিয়তই বিদ্যার আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিতেন। "ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ" এই পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ বাক্যের তাঁহারাই যথার্থ গৌরব রক্ষা করিতেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ যেরূপ পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেন, তাহার শতভাগের একভাগ পরিশ্রম করিলে এখনকার ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থী ছাত্রেরা অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজীভাষাবিৎ স্কট ও পোপ

প্রভৃতির ন্যায় দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িতেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, টোলের ছাত্রেরা অতি নির্ব্বোধ ছিল, তাহারা ৫।৭ বৎসর ব্যাপিয়া ব্যাকরণ পাঠ করিত, ইহা কতক অংশে সত্য, কিন্তু ব্যাকরণ যেরূপ জটিল পদার্থ, তাহাতে কিছু অধিক দিন আলোচনা না করিলে আয়ত্ত হয় না। জগতের সমস্ত সাহিত্যের দ্বার ব্যাকরণ ;—বিশেষতঃ সংস্কৃত।—সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ ব্যাকরণ পাঠ না করিলে কোন মতেই সাহিত্যাদির মর্ম্ম সংগ্রহ করা যায় না, সুতরাং চতুষ্পাঠী সমূহে বালকগণ প্রথমতঃ ব্যাকরণ শিক্ষা করিত। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ না থাকিলে কখনই সাহিত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে না, এজন্য পূর্ব্বে ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিতে হইত ; ব্যাকরণ উত্তম রূপে অভ্যস্ত না হইলে অন্যান্য গ্রন্থ শিক্ষা করিবার রীতিই ছিল না। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ একে সুদীর্ঘ, তাহাতে নিতান্ত দুরূহ, সুতরাং তাহা কণ্ঠস্থ ও বিশেষরূপে তাহার ভাব সংগ্রহ করিতে হইলে সকল বুদ্ধিমান ছাত্রকেই ৫। ৭ বৎসর ব্যাপিয়া তাহা শিক্ষা করিতে হয়। পূর্ব্বতন চতুষ্পাঠীর শিক্ষাপ্রণালী এরূপ উৎকৃষ্ট ছিল যে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশের শিক্ষাপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল, সে পক্ষে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; পূর্ব্বে ছাত্রগণ যিনি যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাহাতে সম্পূর্ণ-

রূপে পারদর্শী না হইলে অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই-তেন না। সাহিত্যদর্পণকর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে হাস্যরসের উদাহরণ স্থলে "গুরো-র্গিরঃ পঞ্চ দিনান্যধীত্য বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ। অমী সমাঘ্রায়চ তর্ক বাদান্ সমাগতাঃ কুক্কুট মিশ্র পাদাঃ॥" এই স্বকৃত কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখনকার বিদ্যা-লোচনার রীতিনীতি পর্য্যালোচনা করিতে হইলেই আমা-দিগের উল্লিখিত কবিতাটী স্মরণ হয়, কিন্তু কেন হয়, তাহা বলিতে পারি না। বাস্তবিক সেটী এখন সার্থক হই-তেছে। দুর্ভাগ্য, আমাদিগের আর্য্য ভাষা এক্ষণে অভি-মানে পশ্চিমগামিনী হইয়াছে। অধ্যাপক মোক্ষমূলার যেরূপ গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, আমাদিগের ন্যায়রত্ন, বিদ্যারত্ন ও তর্কবাগীশ মহাশয়েরা তাহা ভূতকালের স্রোতে বিসর্জ্জন করিয়াছেন! এক্ষণে পাশ্চাত্য রাজভাষা আমা-দিগের দেশে প্রবল; সেই প্রবলতা এখনকার সংস্কারে জ্ঞানকরী ও অর্থকরী।

সকল শ্রেণীর লোকেই বিদ্যার অনুশীলন করিতেছেন, কিন্তু প্রণালী দেখিয়া সংশয় হয়। এ প্রণালীতে কেহ যথার্থ বিদ্বান্ বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবেন, সে আশা আমাদিগের অতি অল্প আছে। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারি যে, মধ্যে মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে আমাদিগের বিদ্যানুশীলনের যেরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া-ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রণালীতে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইত, এখন তাহার আর কিছুই নাই। কেবল বাহ্যাড়ম্বর, প্রশংসাপত্রের হুড়াহুড়ি, আর পল্লবগ্রাহিতা গুণের দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদিগের দুরদৃষ্ট ক্রমে বিদ্যা এক্ষণে সামান্য অর্থকরী আখ্যা ধারণ করিয়াছেন। এক্ষণে অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যা শিক্ষার পরিণাম;—লোকের সুখে ও স্বার্থে বাধা দিতে আমরা অস্ত্রধারণ করিব না, তবে যে আমরা বিদ্যা শিক্ষার অন্যান্য সুখময় ফলে বঞ্চিত হইয়া একমাত্র অর্থাগমরূপ ফলের অভিলাষে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি, ইহা অতিশয় আক্ষেপ! আমাদিগের দেশে এক্ষণে অধিকাংশ লোকেই অর্থলালসায় বিদ্যা শিক্ষা করেন, অর্থাগম না হইলে যাঁহাদিগের কোন মতেই জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নাই, তাঁহারাই যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা অভ্যাস করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের সে বিদ্যা যৎকিঞ্চিৎ ফলোপধায়িকা হয়। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহাদিগের পুস্তকের বিদ্যা পুস্তকেই থাকে। এখনকার যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী, তাহাতে বিদ্যালয় হইতে যথার্থরূপে সুশিক্ষিত হইয়া কজন ছাত্র বাহির হন্? অর্থাভিলাষী শিষ্যেরা এত শশব্যস্ত থাকেন যে, মানসম্ভ্রমে ভ্রূক্ষেপ থাকে না; পাপীয়সী অর্থাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য করিয়া ফেলে। যাঁহারা স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিলাষী হন্, তাঁহাদিগের আবার অর্থলালসা এত অধিক যে, তাঁহারা অর্থ সম্বন্ধ হীন বাক্যকে নিরর্থক বলিয়া থাকেন। ফলত

আমাদিগের অর্থলালসা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাতে আমাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ও গৌরব সকলই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। স্বার্থপরায়ণতা দিন দিন এত বর্দ্ধিত হইতেছে যে, আর কোন ক্রমেই আমাদিগের মঙ্গলের আশা নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি সাধনের প্রধান সাধনভূত একতা, গৌরব, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত হইতেছে। আমাদিগের দেশের পূর্ব্বকালের কোন বিষয়েরই সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত অবগত হইবার কোন উপায় নাই। তথাচ মহাভারত ও রামায়ণাদিতে পূর্ব্বকালের যেরূপ রীতি নীতি আচার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কখনই ইদানীন্তন সময়ে আমাদিগের জাতীয় গৌরবের উন্নতি হইয়াছে স্বীকার করিতে পারি না। পূর্ব্বকালে সকলেই এক একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য লইয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। যাঁহার যেরূপ বৃত্তি, তিনি তদনুরূপ সম্মান লাভ করিয়া সুখী থাকিতেন, এক্ষণে কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় নাই। যিনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি তাহাই করিতেছেন। অর্থ অর্থ করিয়া প্রায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত, তবে যাঁহাদিগের অর্থ আছে, তাঁহাদিগের প্রতিই সকলের দৃষ্টি। যে সকল হিতৈষী ধনবান স্বদেশের হিতে দৃঢ়ব্রত, তাঁহারা অবশ্য সাধুবাদের পাত্র, তাঁহাদিগের দ্বারা হিতানুশীলন, বিদ্যানুশীলন সম্ভবমত হইতেছে, জন্মভূমি সুখী হইতেছেন, যাঁহাদিগের

ধন আছে, মন নাই, তাঁহারা মাতৃভূমির পুত্র হইয়াও জন্মভূমির শত্রু, সুতরাং আভিধানিক শব্দে তাঁহারা বঙ্গীয় সমাজের বৈরী। তাঁহারা আপনাদিগের সুখে নিয়ত প্রমত্ত, স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিমুহূর্ত্তে সচেষ্ট,দেশের হিতাহিতে সততই নিষ্ঠুর ও নিশ্চেষ্ট। পূর্ব্বকালে ধনপতিদিগের প্রায় অধিকাংশ লোকেই সুবিদ্বান্, বুদ্ধিসম্পন্ন ও সদাচার-পরায়ণ ছিলেন। অতি পূর্ব্বকালের রাজগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করিলে এমন বোধ হয় না যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ মূর্খ বা অনভিজ্ঞ ছিলেন। এমন কি, তখন মূর্খ পুত্রেরা সম্পূর্ণরূপে বিষয়াধিকারী হইতেও পারিত না। কিন্তু এক্ষণে অনেক ধনীসন্তান নিয়মিত রূপে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন না, অথবা করেন না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা ভোগাভিলাষে আসক্ত হইয়া আপন আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে কলুষিত করিয়া ফেলেন। তাঁহারা মনে করিলে আজন্মকাল বিদ্যার বিমল রসাস্বাদন করিতে পারেন, মনে করিলে অনায়াসেই স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তি পরি-মার্জ্জিত করিতে পারেন, মনে করিলে দেশের সভ্যতা-শ্রীতে গৌরবেরও বৃদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা এত অলস ও বিলাসানুরক্ত যে, সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যেও আলস্য ত্যাগ করিয়া সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সময় পান না। যদি কিছু সময় হয়, পরের কুৎসা, দলা-দলীর ঘোঁট, দুর্ব্বলকে জব্দ করিবার ফিকির, এবং কুৎ-সিত আমোদ করিতেই তাহা ফুরাইয়া যায়। নিত্য সেব-

নীয় বিলাসে যাঁহাদিগের আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না, তাঁহারা বৎসরান্তর বারোয়ারি পূজার আমোদে উন্মত্ত হন। এ প্রকার শ্রেণীর দ্বারা হতভাগ্য বঙ্গসমাজ কি কল্যাণ প্রত্যাশা করিতে পারেন? পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, যে সকল সুশীল সুধীর ধনীসন্তান বিদ্যার আদর ও স্বদেশের আদর করিতে যত্নবান্, তাঁহারা সমাজের সহস্র সাধুবাদের পাত্র। তদিতর দল তদিতর প্রশংসার অংশী। মাসান্তরে আমরা আরও কতকগুলি শোচনীয় অবস্থা উদ্ধার করিব।

কল্কিপুরাণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শুক কহিলেন, ভগবন্! অনন্তর সখীজন-পরিবৃতা বিস্মিত-বদনা দেবী পদ্মা নিজ পতি হরিকে চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখবর্ত্তিনী বিমলা নাম্নী সখীকে কহিলেন, বিমলে! বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে এই লিখিয়াছেন যে, আমার দর্শন মাত্রেই পুরুষগণ রমণীভাব প্রাপ্ত হইবে! হায়! আমি অতি হতভাগিনী, আমি অতি পাপিনী, আমি যে এতকাল দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিলাম, ঊষর ক্ষেত্রে প্রক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় সে সকলই বিফল হইল। ত্রিভুবনের অধিপতি লক্ষ্মীপতি ভগবান হরি কি আমার প্রতি অভিলাষী হইবেন? দেখ, যদি দেবদেব শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হয়, জগৎপতি বিষ্ণু যদি আমারে স্মরণ না করেন, তাহা হইলে আমি হরি চিন্তা করিয়া

এ দেহ অনলে নিক্ষেপ করিব। দীনা মানুষী আমিই বা কোথায়, আর সেই ভগবান জনার্দনই বা কোথায়? আমি বিধাতা কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলাম, তাহা না হইলে শশাঙ্কশেখর আমারে বঞ্চনা করিলেন কেন? ঈদৃশ অবস্থায় আমার ন্যায় কোন্ রমণী বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে? দেব! আমি যশস্বিনী পদ্মার এইরূপ শোকসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার সমীপে আগমন করিলাম।

তখন ভগবান কল্কি শুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, এবং কহিলেন, শুক! তুমি প্রিয়া পদ্মাকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার তথায় গমন কর। হে প্রিয় শুক! তুমি আমার সংবাদ লইয়া পদ্মার নিকটে গমন পূর্ব্বক আমার রূপগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া পুনর্ব্বার এখানে আগমন করিও। দেবী পদ্মা আমার প্রণয়িনী ও আমি তাঁহার পতি, ইহা বিধিলিপি; তবে আমাদিগের সংযোগ সাধনে তুমি মধ্যস্থাবলম্বন করিবে। হে শুক! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও কালধর্ম্মজ্ঞ; তুমি অমৃতময় বাক্যে প্রণয়িনী পদ্মাকে আশ্বাসিত করিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।

সর্ব্বজ্ঞ শুক মহাত্মা কল্কির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া সত্বরে সিংহলাভিমুখে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তথায় উপস্থিত হইয়া বীজপূর ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক কন্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য এক নাগকেশর বৃক্ষের উপরি ভাগে উপবেশন করিলেন। পরে রূপযৌবন-শালিনী পদ্মা দেবীকে অবলোকন করিয়া মানুষ-স্বরে কহিলেন, বর-বর্ণিনি! আপনার কুশল ত? আপনার মুখমণ্ডল বিকসিত পদ্মের ন্যায়, নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা সম্পন্ন, আপনার গাত্রে পদ্মের ন্যায়

গন্ধ, আপনার কর যুগল পদ্ম সদৃশ, এবং হস্তে পদ্ম শোভা পাইতেছে, সুতরাং আপনাকে অবলোকন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, আপনি দ্বিতীয়া কমলা দেবী। হে জগন্মোহিনি! বোধ করি, সর্ব্ব স্রষ্টা ভগবান পিতামহ ত্রিভুবনের রূপলাবণ্য সম্পত্তি একত্রিত করিয়া আপনার নির্ম্মাণ সাধন করিয়াছেন।

পদ্মমালা-বিভূষিতা দেবী পদ্মা শুকের এইরূপ অত্যদ্ভুত সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আপনি কে? কোন স্থান হইতে আগমন করিলেন? আপনি দেব কি দানব? আমার প্রতি দয়াবান হইয়া শুকরূপ ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন?

শুক কহিলেন, দেবি! আমি সর্ব্বজ্ঞ, কামচারী ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ, আমি দেব, গন্ধর্ব্ব ও ভূপতিগণের সভায় অত্যন্ত সমাদর পাইয়া থাকি। হে মনস্বিনি! আমি স্বেচ্ছানুসারে গগনে বিচরণ করিয়া থাকি, আজ আপনারে দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত প্রশস্ত, তথাচ দেখিতেছি, আপনি আজ ভোগাভিলাষ সমস্ত পরিহার করিয়া অতি দুঃখিত মনে কালযাপন করিতেছেন; আপনি হাস্য পরিহাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, সখীগণের সহিত আর আমোদ প্রমোদ করিতেছেন না, অঙ্গশোভা আভরণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনার এইরূপ ভাব দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইতেছে; অতএব ইহার বিশেষ কারণ জানিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। এ নিমিত্ত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনার কণ্ঠস্বর এরূপ মধুর ও কোমল যে, কোকিলের কলকূজনও ইহার নিকট তিরস্কৃত হয়। আপনার দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বাগ্র বিনির্গত অক্ষর পংক্তি যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার জীবন সার্থক,

তাঁহার তপস্যার কথা আর কি বলিব ? ভামিনি ! আপনার নিকট শিরীষ কুসুমের কোমলতা, আর নিশানাথের কান্তিও অতি তুচ্ছ। পণ্ডিতগণ দুর্লভ অমৃত ও ব্রহ্মানন্দকে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থমধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনার তাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না। যিনি আপনার বাহুলতা দ্বারা সমালিঙ্গিত হইয়া আপনার মুখসুধা পান করিতে পারিবেন, তাঁহার আর সুখসাধন জপ, তপ, ও দানাদি শুভফলের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিবে না। হে বৃহদ্রথ-নন্দিনি ! যাঁহারা আপনার এই তিলক-সুশোভিত, অলকাবলী-মণ্ডিত, চঞ্চল কুণ্ডল-বিরাজিত, চঞ্চল দৃষ্টি সমন্বিত, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অব-লোকন করিবেন, তাঁহাদিগের আর এই ধরাধামে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। অয়ি ভামিনি ! যে জন্য আপনার ঈদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করুন্। আপনার কোন শারীরিক পীড়া নাই, তথাচ আপনি তপঃপ্রপীড়িতার ন্যায় অত্যন্ত কৃশ হইয়াছেন। ভস্মাচ্ছন্ন স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় আপনার এই দেহ নিতান্ত মলিন হইয়াছে।

তখন পদ্মা কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ শুক ! হরি যাহার প্রতি প্রতি-কুল, তাহার রূপেরই বা প্রয়োজন কি ? আর ধনেইবা প্রয়োজন কি ? কুলেরই বা আবশ্যক কি ? আর বংশমর্য্যাদারই বা গৌরব কি ? তাহার পক্ষে সকলই বিফল। হে শুক ! আমার বৃত্তান্ত যদি তোমার অবিদিত থাকে, তাহা হইলে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আমি বাল্য, পৌগণ্ড, ও কৈশোর অবস্থাতে দেবদেব ভবানী-পতির আরাধনা করিয়াছিলাম; তাহাতে তিনি ভগবতীর সহিত আবির্ভূত হইয়া পরম পরিতোষের সহিত কহিলেন, পদ্মে ! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি তৎকালে লজ্জায় অধোমুখী

হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম, তদ্দর্শনে তিনি কহিলেন, পদ্মে! ভগবান নারায়ণ তোমার পতি হইবেন। কি দেব, কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, অন্য যে কেহ তোমার প্রতি কামভাবে কটাক্ষপাত করিবে, তাহারা সেই ক্ষণেই নারীভাব প্রাপ্ত হইবে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে শুক! ভগবান্ শশাঙ্কশেখর এইরূপ বর প্রদান করিয়া বিষ্ণু পূজার পদ্ধতি যথা বিধানে বলিয়া দিলেন। আমি তাহাও বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এই যে আমার সখীগণকে অবলোকন করিতেছ, ইহাঁরা পূর্ব্বে নরপতি ছিলেন। ধর্ম্মাত্মা পিতা আমাকে যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিতে দেখিয়া স্বয়ম্বর স্থলে ইহাঁদিগকে আময়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁরাও বিবাহে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুলকিত মনে স্বয়ম্বর সভায় সমাগত হইয়াছিলেন; ইহাঁরা সকলেই যুবা, রূপবান্, গুণবান্ ও ধনবান্ ছিলেন। আমি যখন করে রত্নমালা ধারণ পূর্ব্বক স্বয়ম্বরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলাম, তখন ইহাঁরা আমারে অবলোকন করিয়া কামবিমোহিত ও পতিত হইলেন। ক্ষণকালপরে সম্ভ্রান্তচিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে, স্ব স্ব দেহে স্ত্রীচিহ্ন সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তখন ইহাঁরা শত্রুগণের ভয়ে ও বন্ধুবান্ধবগণের লজ্জায় অত্যন্ত ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমারই অনুগামী হইলেন। ইহাঁরা সর্ব্বগুণান্বিত; এক্ষণে আমার সহচরী হইয়াছেন, এবং আমার সহিত ভগবান্ নারায়ণের পূজা, ধ্যান ও তপস্যা করিতেছেন।

বেদবেদাঙ্গ পারগ শুক পদ্মার এই শ্রবণসুখকর, স্বাভিলষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন, এবং সমুচিত বাক্যে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনার প্রস্তাব করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

পিপীলিকা।

অনভিজ্ঞতা বশত আমরা ইতর প্রাণীদিগকে একান্ত অশ্রদ্ধা করি। অনেকেরই মনে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, আহার, বিহার, নিদ্রা, ভয় ও রোষ ভিন্ন যেন তাহারা আর কিছুই অবগত নহে। অধিকাংশ লোকেই মনে করেন, সংস্কার বশতই ইহারা সকল কার্য্য করে। ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া উহারা কর্ম্ম করিতে অক্ষম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যদিও আকারাদিতে বিস্তর বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাদিগের অনেকের অনেক বিষয়ে মনুষ্য জাতির ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। অদ্য আমরা পিপীলিকার দ্বারা তাহা কথঞ্চিৎ সপ্রমাণ করিব।

আমেরিকায় টেক্সাস্ নামক প্রদেশে এক প্রকার পিঙ্গলবর্ণ পিপীলিকা আছে, তাহাদের সংস্কার অতি অপূর্ব্ব। ডাক্তার লিনসিকম ১২ বৎসর কাল বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহারা বাসগৃহোপযোগী স্থান নির্ণয় করিয়া প্রথমতঃ গর্ত্ত কাটে, এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি প্রাচীর স্বরূপ মৃত্তিকার ঢিবি রাখিয়া দেয়। স্থান নিম্ন হইলে সর্ব্ব প্রথম ১ হাত উর্দ্ধ একটী উচ্চ ঢিবি করিয়া উহার চূড়ার সন্নিহিত স্থল হইতে সুড়ঙ্গ করে। সেই সুড়ঙ্গ দ্বারের চতুষ্পার্শ্বে ২। ৩ হাত জমি সমতল ও পরিষ্কার করিয়া রাখে, তথায় কোন প্রকার তৃণাদি জন্মিতে দেয় না। পরে যথা সময়ে এক প্রকার ঘাসের বীজ আনিয়া বপন করে। তথায় অপর কোন তৃণ অঙ্কুরিত হইলেই তাহা কাটিয়া ফেলে। সেই সকল ঘাসের

ফুল হইয়া সময়ে সুপক্ক হইলে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহা লইয়া গৃহজাত করে এবং মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মতে উহার খোসা বা তুষ-গুলি বহির্গত করিয়া রাখে। অধিক বর্ষা হইলে ইহাদিগের আবাস সহ খাদ্যও আর্দ্র হয়; যে দিন আকাশ নির্ম্মল থাকে,সেই দিন শস্য গুলি বাহিরে আনিয়া শুষ্ক করে এবং অপরাহ্নে অঙ্কুরিত বীজগুলি পরিত্যাগ করিয়া অপর সমস্ত গুদামে লইয়া যায়। কোন কোন প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত এই বৃত্তান্তের সত্যতার প্রতি সংশয় প্রকাশ করাতে পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, আমার বাগানের মধ্যে ইহাদিগের পূর্ব্ব রূপ আবাস আছে এবং ১২ বৎসর কাল নিয়-তই আমি উহাদিগের অধ্যবসায় ও যত্ন প্রত্যক্ষ করিতেছি।

অপর এক জাতি পিপীলিকা সিকি আধুলির আকারের গোল গোল পাতা মুখে করিয়া শারিবন্দী হইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে স্ব স্ব আবাসে লইয়া যায়। বাসস্থানগুলি বল্মীকের ন্যায় ঊর্দ্ধে ১ বা ১॥০ হাত এবং উহার ব্যাস ২৫। ৩০ হাত। অপর একদল কর্দম প্রস্তুত করত পাতা সহ সংলগ্ন করিয়া ভিতরে লাগায় এবং তাদ্দ্বারা স্ব স্ব গৃহে ধূলি পতন হইতে দেয় না। মনুষ্যের ন্যায় ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী শ্রমজীবী, এক শ্রেণী যোদ্ধা, আর এক শ্রেণী ওমরা। শেষোক্ত দুই দল কেবল বসিয়া খায়। প্রথমের স্কন্ধে সকল পরিশ্রমের ভার। গঠন ও চেহারায় ইহাদিগের পরস্পরের বৈলক্ষণ্য জানা যায়। মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার দিবসে ওমরারা সস্ত্রীক হইয়া বাহিরে আসিয়া আমোদ কৌতুক করে। ইহাদিগের মধ্যে আবার দুই সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, একের মস্তকোপরি স্বচ্ছ মুকুটের ন্যায় চূড়া এবং অপরের লালাটে এক একটি অতিরিক্ত চক্ষু। এই উভয় দল রাজকার্য্য সকল সমাধা করে। ইহাদিগের প্রথম শ্রেণী নীতিজ্ঞ

এবং শেষোক্তেরা যাজক বা শিক্ষক অনুভব করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। ইহারা আক্রান্ত হইলেও আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করে না।

ইহাদিগের অপর শ্রেণী ক্ষত্রিয় রীতির অনুকরণ করে। তাহারা কেবল স্বদেশ ও দেশবাসীগণের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত। ইহাদিগের সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করে এবং ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনে সকলেই অনিচ্ছুক। সকলেই ইচ্ছা মতে ভাণ্ডারস্থিত বস্তু ভক্ষণ করিতে পারে। কেহ তাহাতে প্রতিবাদী হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর পিপীলিকারা বৈশ্যদিগের ন্যায় সমস্ত কায়িক শ্রমের কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ অট্টালিকা নির্ম্মাণ বা মেরামত, অন্যে উহাদিগের নিমিত্ত আহার আনয়ন, কেহ বা গো সেবায়, কেহবা খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কেহই নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকে না।

ইহাদিগের গো সেবার কথা বিস্তারিত রূপে লেখা আবশ্যক। আকাইড নামক উকুনের ন্যায় এক প্রকার কীট আছে। উহারা গাছের পাতায় থাকে এবং তাহাই উহাদিগের খাদ্য। উহাদিগের পশ্চাৎ ভাগে দুটী চুঙ্গীর ন্যায় অঙ্গ আছে, উহা চুষিলে সুমধুর রস নির্গত হয়। পিপীলিকারা উহা অতি উপাদেয় বলিয়া গণনা করে। সেই নিমিত্ত ঐ পিপীলিকারা ঐরূপ বহুসংখ্যক কীটকে গরুর ন্যায় পালন করে। আপনাদিগের আবাস মধ্যে উহাদিগের বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, মধ্যে মধ্যে বাহিরে লইয়া চরায়, আহারের নিমিত্ত প্রত্যহ পত্রাদি আনিয়া দেয় এবং যথাকালে মুখ দ্বারা দোহন করে।

ইহাদিগের গ্রাম বা নগর মধ্যে শত শত লম্বা লম্বা দালান, বৈঠক-খানা, শয়নাগার, ভাণ্ডার, বারাণ্ডা, সিঁড়ি, গোশালা ও রাজমার্গ

প্রভৃতি দেখা যায়। কতকগুলি গৃহে কেবলমাত্র শিশুরা প্রতি-পালিত হয়; কতকগুলি দিবা রাত্রি ঐ কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকে। ইহারা প্রত্যহ ডিম বা ফুটা বাচ্ছা সকলকে আতপতাপে তাপিত করে,আবার সন্ধ্যা হইতে না হইতেই নির্দ্দিষ্ট গৃহে ফিরাইয়া আনে।

আফ্রিকাখণ্ডে ইসাইটন নামক এক জাতি পিপীলিকা বাস করে। সংগ্রাম করাই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য। ক্ষুদ্রকায়েরা সকলেই সামান্য লড়াক বা সিপাহি এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার-বিশিষ্টেরা কাপ্তেন বা সৈন্যাধ্যক্ষ। ইহাদিগের এক একটীর অধীনে প্রায় ৩০টী করিয়া থাকে, যুদ্ধ যাত্রাকালে কলিকাতার সমারোহের জাঁকাল বিবাহের ন্যায় অধ্যক্ষেরা দৌড়াদৌড়ি করত সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে, কখন বা কোন উচ্চ ঢিবির উপর উঠিয়া অপর সকলকে পথ প্রদর্শন করে। ইহারা বাক্য বা শব্দ প্রয়োগে অক্ষম যথার্থ বটে, কিন্তু অন্যের অঙ্গ স্পর্শ বা আপন শরীরের সঞ্চালন দ্বারা স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে বিলক্ষণ পটু। ইহারা লক্ষ লক্ষ প্রাণী একত্রিত হইয়া ২।৩ রসী (২০০ হাত) বিস্তৃত হইয়া গমন করে এবং বর্গির হাঙ্গামার ন্যায় পথস্থিত জীবের ভয়ের আর সীমা থাকে না। দঙ্গলমধ্যে পক্ষী, বানর, শূকর প্রভৃতি পড়িলে তাহার আর নিস্তার নাই। দংশনে দংশনে সকলেই বিনষ্ট হয়। দৈবাধীন মনুষ্য ইহা-দিগের মধ্যস্থিত হইলেও সহস্র সহস্র পিপীলিকা পা দিয়া উঠিয়া সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ফেলে; তৎকালে বেগে দৌড়নই রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। নতুবা নিশ্চয়ই মৃত্যু। ভয় যে কি পদার্থ, তাহা ইহারা জানে না। অগ্নি জীবমাত্রেরই ত্রাসের পদার্থ। অগ্নি দেখিয়া ব্যাঘ্র, ভল্লূক, সিংহ ও হস্তী পর্য্যন্ত পলায়ন করে, কিন্তু ইহারা অকুতোভয়ে জ্বলন্ত কাষ্ঠকে কামড়াইয়া সেই মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ হয়।

মদালসা।

পতিপ্রাণা কোমল হৃদয়া মদালসা সহসা প্রিয়তমের অচিন্তনীয় মরণসংবাদ শুনিবামাত্র যে বিচেতনা হইয়াছিলেন, পুনর্ব্বার আর তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না, তাঁহার হৃদয় পতিশোকে এরূপ প্রবল রূপে আক্রান্ত হইয়াছিল যে, তিনি আর তাহা হইতে উদ্ধার পাইলেন না ; শোকের পরাকাষ্ঠা তাঁহাকেও পতির পথে প্রেরণ করিল।

মত্ত ব্যক্তি যেমন মদভরে ঢলিয়া পড়ে, সেইরূপে পতিগতপ্রাণা মদালসাও সকলের অজ্ঞাতসারে ভূতলশায়িনী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাজধানী হাহাকার ও অত্যুচ্চ ক্রন্দনশব্দে পরিপূর্ণ হইল। পরে রাজা ও রাজমহিষীগণ প্রাণসম প্রিয়তম পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। আহা ! তাঁহাদিগের তৎকালিক শোক, বিলাপ ও করুণ বাক্যের কথা কি কহিব, শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়। ঋতধ্বজ-জননী শোকভরে গদগদস্বরে বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা বৎস ঋতধ্বজ ! তোমার মনে কি এই ছিল ! তুমি কি দোষে আমারে দুঃখিনী করিয়া অসময়ে পরিত্যাগ করিয়া গেলে ! তুমি আমার জ্ঞানবান্ পুত্র, তবে কেন অজ্ঞানের ন্যায় জননীরে দুঃখসাগরে ভাসাইলে ! আমি তোমার সেই মুখচন্দ্র দর্শন না করিয়া কতক্ষণ জীবন ধারণ করিব ! আমিও অচিরাৎ তোমার পথে গমন করিব, সন্দেহ নাই। রে ক্রূর প্রাণ ! কেন বিলম্ব করিতেছিস্ ? বৎস ঋতধ্বজ আমার এতক্ষণ কতদূর গমন করিয়াছে, তোরে তো যাইতেই হইবে, তবে কেন বৃথা কাল বিলম্ব করিতেছিস্ ? রে হতবিধে ! তোর মনে কি এই ছিল ! আমি জ্ঞাতসারে তো কখন কোন পাপাচরণ করি নাই ! এত কাল আমি যে পতি শুশ্রূষা করিলাম, তাহা কি

নিষ্ফল! ধর্ম্মের কি এই পুরস্কার! রে মৃত্যু! তুই কি অবিমৃষ্যকারী, তোর কি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নাই! হায়! আমার কি হইল! এই অন্ধকারময় ভবনে আর কি করিয়া অবস্থান করিব! জীবনের প্রয়োজন পর্য্যবসান হইয়াছে! রে কাল! এখন আমায় লইয়া দুঃখের অবসান কর! হা বৎস ঋতধ্বজ! তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, তুমি কাঙ্গালের ধন, তোমা বিনা আমি কি করিয়া এই দেহ ভার বহন করিব! বাছা! একবার দেখা দাও, একবার আমায় মা বলিয়া ডাকিয়া যাও! তোমায় না দেখিয়া আমার প্রাণ যে কিরূপ করিতেছে, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ না! জানিলে, অবশ্যই আসিয়া দেখা দিতে! হায়! আমি অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও কাঙ্গালিনী হইলাম! হা দগ্ধবিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল? রাজমহিষী এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া নিঃশব্দে কিয়ৎকাল ধরাতলে পতিত হইয়া রহিলেন।

রাজা শত্রুজিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সমস্ত রমণীগণ শোকভরে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কেহ রোদন করিতেছে, কেহ রাজকুমারের গুণরাশির উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতেছে, কেহবা বিচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে, কেহ কেহ মস্তকে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতেছে। পরিচারিকা সকল সজল নয়নে হাহাকার করিয়া উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করিতেছে। ভৃত্যবর্গ ও রক্ষিগণ রোদন করিতে করিতে আপন আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিতেছে। চতুর্দ্দিকেই শোকের চিহ্ন, সকলেই যারপর নাই কাতর, কেহই প্রকৃতিস্থ নহে। রাজা কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন, হাহাকার শব্দে, আর্ত্তনাদে, নারীদিগের ক্রন্দনস্বরে ও বিলাপবাক্যে, চিত্রশালিকাস্থিত পশুপক্ষিগণের চীৎকারে, মাতঙ্গদিগের বৃংহণে

এবং অশ্বগণের হেষারবে নগরীর সর্ব্বদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পুরপথবাহী পথিক সকল হায় হায় করিতেছে ও এক এক বার তাঁহার ভাগ্যের নিন্দাকীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতেছে। তিনি চারিদিকে প্রভূত শোকের চিহ্ন সকল দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং আর তাহাতে অভিভূত হইলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল, প্রাকৃত লোকের ন্যায় তিনি শোকমোহে কাতর হইতেন না। ক্ষত্রজাতিসুলভ স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতাগুণে তাঁহার মন নিয়ত ভূষিত, সুতরাং ঈদৃশ শোকমোহের কারণ ঘটিলেও তিনি অধিকতর কাতর ভাবাপন্ন হইলেন না। পরে তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মৃতপতিতা মদালসার প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, পুত্রবধূও প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া পতি সন্নিধানে গমন করিয়াছেন। তখন মহারাজ শত্রুজিৎ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে মনে মনে পতিব্রতা মদালসার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর মহারাজ শত্রুজিৎ মৃতপতিতা মদালসাকে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষত্রজাতি সুলভ বীরোচিত ওজস্বিতা ক্রমে ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিল। পুত্রবিয়োগ-জনিত শোকভার একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সাহস, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা তাঁহার বিষণ্নভাব অপনোদন করিয়া মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তখন তিনি সর্ব্বজনকে সম্বোধন করিয়া স্বচ্ছন্দ মনে কহিলেন, হে অন্তঃপুরচারিণীগণ! হে অমাত্য ভৃত্যবর্গ! তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শোকের বিষয় উপস্থিত হইলে সকলেই শোকাকুল হইয়া থাকে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ বটে, কিন্তু আমার পুত্রের মরণে আমার ও তোমাদিগের কোনরূপ শোকতাপের কারণ দেখিতেছি না। প্রথমতঃ সম্ব-

ন্ধের অনিত্যতার বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে কাহারও একান্ত শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ আমার পুত্র ঋতধ্বজ আমারই আদেশানুসারে পরোপকারব্রত পালনার্থ সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়সন্তান যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করে। মর্ত্যলোকের দুঃখমিশ্রিত সুখ অপেক্ষা বিমল স্বর্গসুখ শতগুণে প্রশস্য ও বাঞ্ছনীয়। আর এই যে মানুষদেহ দেখিতেছ, ইহা নিশ্চিত নশ্বর, অদ্যই হউক, কল্যই হউক, আর সহস্র বর্ষ পরেই হউক, ইহা পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই লোকান্তরে যাইতে হইবে। এই জগৎ পান্থশালা, আমরা পথিকভাবে এখানে আগমন করিয়াছি। বহুদিন পূর্ব্বে যাঁহারা এই পথিক-ভবনে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও বিদ্যমান নাই। সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছেন। আর যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে উপস্থিত আছেন, তাঁহারাও নিশ্চিত যাইবেন এবং পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারাও থাকিবেন না। অতএব এরূপ স্থলে আমার পুত্র ক্ষত্রকুলে জন্মিয়া যে রণকর্ম্মে পরাঙ্মুখ না হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তাঁহার সহিত যে পুত্রত্ব বা বন্ধুভাব সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিত না, তবে সেই ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধের নিমিত্ত বৃথা শোকাকুল হওয়া মূর্খতার কার্য্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যদি সেই ঋতধ্বজ ভীরুভাব বশত সংগ্রামে ভঙ্গ দিয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিতেন, তাহা হইলে বরং শোচনীয় হইতেন, সন্দেহ নাই। আত্মীয় জনের অপেক্ষাকৃত সম্পদ লাভ হইলে প্রকৃত বন্ধুদিগের শোকগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা কি? প্রত্যুত সন্তোষ লাভই হইয়া থাকে। যদি আমরা রাজকুমারের প্রকৃত বন্ধু হই, তবে তাঁহার তাদৃশ মরণে

কোন ক্রমেই শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হয় না। তিনি মুনিবর্গের উপকারার্থে রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অধিকতর সম্পদ লাভ হইয়াছে, সুতরাং তাদৃশ প্রিয় জনের স্বর্গীয় সম্পদ লাভে আমাদিগের প্রীত হওয়াই উচিত। আমি সেই স্বর্গগত ঋতধ্বজকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও শ্লাঘনীয় হইলাম। আর রাজমহিষী যে তাদৃশ সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত ইহাঁকেও ধন্যবাদ। আর দেখ, ঐ আমার পতিপ্রাণা পুত্রবধূ মদালসা ভর্ত্তৃমরণ শ্রবণ মাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিতা রহিয়াছেন। ইহাঁরও জীবন বিসর্জ্জন কদাচ আমাদিগের শোচনীয় নহে, কারণ পতিব্রতা রমণী-গণের পতিই দেবতা, পতির জীবনে তাঁহাদিগের জীবন ও পতির মরণে তাঁহাদিগের মরণ। যে নারী পতিবিয়োগিনী হইয়া দেহভার বহন করেন, তিনিই দয়ালু লোকদিগের শোচনীয়া হয়েন। অতএব এই ভাবিনী পতিমরণ শ্রবণগোচর করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কলে-বর পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। ইনিও একজন প্রকৃত পতিপরায়ণা সতী, ইহাঁর জন্ম গ্রহণে উভয় কুল পবিত্র হইয়াছে। ইহাঁকে স্নুষা রূপে প্রাপ্ত হইয়া আমিও ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি। আর এই নারী যে ভর্ত্তৃ বিয়োগ দুঃখ ক্ষণকালের নিমিত্তও অনুভব করিলেন না, ইহাও অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। সর্ব্ব সুখদাতা ভর্ত্তাকে সামান্য মানুষ বলিয়া যে নারী মনে করে, সে নিতান্ত নীচপ্রকৃতি। মদালসা স্বীয় স্বামীকে উভয় লোকের সুখদাতা ও দেবতা বলিয়া মানিতেন, তাই তাঁহার বিয়োগবার্ত্তা শ্রবণে অবলীলাক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। অতএব এই ঘটনায় কি পুত্র ঋতধ্বজ, কি পুত্রবধূ মদালসা, কি তাঁহার জননী,

কি আমি, কেহই শোচনীয় নহে। ঋতধ্বজ ব্রাহ্মণদিগের উপকারার্থ ও মদালসা অসামান্য পাতিব্রত্য প্রদর্শনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যারপর নাই কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। উভয়েরই কার্য্যে অসাধারণ শৌর্য্য ও বংশগৌরব প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আর বৃথা শোকভার বহনের প্রয়োজন নাই, এস, এখন আমরা অনন্তর কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করি।

তখন নাগপুত্রেরা কহিলেন, পিতঃ! আমাদিগের প্রিয় বয়স্য ঋতধ্বজের শৌর্য্যসম্পন্ন পিতার ওজস্বিতা ও ক্ষত্রিয় তেজের বিষয় শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে প্রিয়পুত্র বিয়োগে সখার মনস্বিনী জননী যাহা কহিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বীরপ্রসবিনী ঋতধ্বজ-জননী সামান্যা নারীর ন্যায় ভীতস্বভাবা নহেন, তাঁহারও চিত্ত সাতিশয় প্রশস্ত, অলৌকিক ধৈর্য্যশালী বীরপুরুষের ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ় এবং স্বীয় স্বামীর ন্যায় গাম্ভীর্য্য যুক্ত ও অটল ভাবাপন্ন। প্রিয়তম পুত্রের মরণসংবাদ শ্রবণমাত্র প্রথম ক্ষণে তাঁহার মনে শোকাবেগ অত্যন্ত বলবান হওয়াতে ক্ষণকালের নিমিত্ত কাতর ভাবাপন্না হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বামী সন্নিধানে অম্লান বদনে কহিলেন, নাথ! আমার পুত্র মুনিগণের পরিত্রাণার্থ রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া এখন আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সংগ্রামে নিহত হওয়া কখনই শোকাবহ নহে। যে পুত্র ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, সেই বন্ধুগণের শোচনীয় হয় এবং তাহারই জননীর পুত্র প্রসব করা নিষ্ফল হইয়া থাকে। আমি যে ঋতধ্বজকে জঠরে ধারণ করিয়া গর্ভধারণক্লেশ সহ্য করিয়াছিলাম, তাহা আজ সার্থক হইয়াছে। যে ব্যক্তি অর্থী,

মিত্রবর্গ ও শত্রুদিগের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়, তাহার পিতাকে পুত্রবান্ ও মাতাকে কখনই বীরসূ বলা যাইতে পারে না। পুত্র সংগ্রামে অরিবিজয়ী হউন বা নিহতই হউন, উভয়ই তুল্য, তাহাতে ক্ষত্রিয়া জননীর মনে কখনই কষ্ট বোধ হয় না, তিনি অনায়াসেই গর্ভধারণ ক্লেশ বিস্মৃত হইতে পারেন। অতএব মহারাজ! প্রিয় পুত্র বিনাশে আমাকে সামান্যা নারীর ন্যায় শোকাতুরা ভাবিবেন না। আর ইহাও আমি নিশ্চয় জানি, এ সংসারে কোন সম্বন্ধই আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধ নহে। যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিয়োগ, আমাদিগেরও এই জগতের সহিত যে সম্বন্ধ আছে, তাহাও বিস্তর দিন থাকিবে না, অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। এরূপ স্থলে রাজকুমার যে রোগভোগে ক্লিষ্ট না হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত পথে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের পক্ষে অক্ষোভের কারণ হইয়াছে। আর মনস্বিনী মদালসা পতির নিধনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র যে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাও একটী সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে। পতি প্রাণা মদালসা পতিব্রতা রমণীর অনুরূপ কার্য্যই করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ আচরণে এই বংশ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। রাজকুমার যে অনুরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আমি পতিপরায়ণা মদালসারে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।

তখন মহারাজ শত্রুজিৎ বীরাঙ্গনা রাজমহিষীর উক্তরূপ বাক্য শুনিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন, প্রফুল্লমনে তাঁহারে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার স্ত্রীজাতি সুদুর্লভ শৌর্য্য ও দৃঢ়তা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমিই যথার্থ বীরাঙ্গনা ও বীরপ্রসবিত্রী, তোমায় পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমিও ধন্য হইলাম, আমার বংশও উজ্জ্বল হইল। এস, এখন অনন্তর কর্ত্তব্য

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাউক। এই বলিয়া তিনি বন্ধুবর্গকে সঙ্গে লইয়া মদালসার মৃতদেহ গ্রহণপূর্ব্বক অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সকল সমাধান করিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র ও পুত্রপত্নীর উদককার্য্য সম্পাদন করিয়া রাজভবনে প্রত্যাগত হইলেন। নগরবাসী ও জনপদবাসী অন্যান্য লোক সকল পতিপ্রাণা মদালসার তাদৃশ অদ্ভুত মরণ বৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া বিস্মিত মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

এ দিকে তালকেতু স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া হৃষ্ট মনে যমুনাপুলিনে উপনীত হইল এবং সলিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক যে স্থানে পূর্ব্বে নিমজ্জিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে উত্থিত হইয়া আর্দ্র বসনে রাজকুমারের সমীপদেশে উপস্থিত হইয়া কহিল, রাজকুমার! এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন কর, আমি তোমার প্রসাদে কৃতকার্য্য হইয়াছি। তুমি স্থির ভাবে এতাবৎকাল এই স্থানে অবস্থান করিলে আমি ভগবান্ বরুণ দেবের উদ্দেশে সলিলমধ্যে বারুণ যজ্ঞ সমাধান পূর্ব্বক আমার চিরাভিলষিত কার্য্য সাধন করিয়াছি। আমার তপঃপ্রভাবে ভবদ্দত্ত রত্নমালা তোমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে। রাজভবনে গমন করিলেই দেখিতে পাইবে। এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বরে ভবনাভিমুখে প্রস্থান কর। সরলমতি রাজকুমার কপট মুনির বচন শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া তাহার চরণ বন্দনা করিয়া সেই দ্রুতগামী কুবলয়াশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অশ্ব বায়ুবেগে ধাবমান হইল। যাইতে যাইতে তাঁহার বামাক্ষি স্পন্দিত হইল। চতুর্দ্দিকে দিবসে অশিবসূচক শিবারব শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। সব্য বাহু নিরন্তর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। দিক্চক্র তাঁহার চক্ষে যেন শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল।

কন্যাটী তীরে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকিল। পূর্ণশশী কিছু বুঝিতে পারিলেন না, পত্রিকাকে দেখাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্রিকা কহিলেন, এ দেখিতেছ, একটী, কিন্তু আর অর্দ্ধদণ্ড এখানে থাকিলে দেখিবে, শত শত কুলকন্যা ঐরূপে প্রদীপ ভাসাইবে। যাহাদের পতিপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়েরা নদীপথে বা সমুদ্রপথে দূরদেশে গিয়াছে, তাহারা প্রদীপ ভাসাইয়া শুভাশুভ পরীক্ষা করে। যদি প্রদীপ ডুবিয়া যায়, কিম্বা তৈল থাকিতে নিবিয়া যায়, তবে অশুভ, আর যদি জ্বলিতে জ্বলিতে দৃষ্টিপথের অন্তরে ভাসিয়া চলে, তাহা হইলে শুভ লক্ষণ। এক এক দিন সন্ধ্যাকালে এই গঙ্গাযমুনা যেন নক্ষত্রনদী রূপ ধারণ করেন।

পূর্ণ শশীর কৌতুহল আরো বৃদ্ধি হইল, সেই হিন্দুবালার প্রদীপ কেমন করিয়া কতদূর ভাসিয়া যায়, সানুরাগ দর্শনে এক দৃষ্টে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রদীপটী নয়নপথ অতিক্রম করিয়া গেল। যতক্ষণ নেত্রগোচর থাকিল, ততক্ষণ দেখিলেন, সেই দীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে গেল,—নিবিল না।—দেখিয়া ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যের অস্থায়ী জীবন এই ক্ষুদ্র প্রদীপ অপেক্ষা যশস্বী নহে!—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

শিবিকা আসিয়াছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত যে অনুচর তীরে উঠিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাহকেরা কেহ আইসে নাই। পত্রিকা কহিলেন, না আসাই সম্ভব। নৌকায় আমাদের গহিরি হইয়াছে, কোন্ তারিখে ঠিক আসিয়া পৌঁছিব, সেটী তাহারা কিরূপে জানিবে?—তুমি ঠিকা পাল্কী ভাড়া করিয়া আনো। কিঙ্কর সেই আদেশ পালন করিল।

শিবিকা আরোহণ করিয়া যাত্রীরা ক্রমে ক্রমে শিবির অভিমুখে গমন করিলেন। একটী মনোহর উদ্যানে শিবির স্থাপন করা হইয়াছিল, দণ্ডেকের মধ্যে তাঁহারা তথায় পোঁছিলেন। রাত্রি হইয়াছিল, তথাচ চন্দ্রালোকে সে উদ্যানের শোভা অপ্রকাশ ছিল না। চারি দিকে উচ্চ উচ্চ তরু, শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, মধ্যস্থল অনাবৃত, নবনব তৃণরাজীতে সুশোভিত, সেই সমতল ক্ষেত্রোপরি রাজকুমারের আজ্ঞাবহ কিঙ্করেরা পটাবাস স্থাপন করিয়াছে। চারিধারে নানাজাতি পুষ্পবন, মাঝে মাঝে লতাকুঞ্জ, বাসন্তী মৃদু বায়ুহিল্লোলে নবদলপূর্ণ পাদপেরা অল্প অল্প সঞ্চালিত হইতেছিল, কৌতুকী পবনদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষে নৃত্য করিয়া সায়ং প্রস্ফুটিত কুসুমদলের সুগন্ধ হরণ করিতেছিলেন, বিমল পরিমলে চতুর্দ্দিক প্রমোদিত। বায়ু সুখস্পর্শ, পুষ্পগন্ধ তৃপ্তিকর, আর উপবনের পুষ্পময়ী শোভা পরম রমণীয়। কোনো ফুল শ্বেত, কোনটী ঈষৎরক্তবর্ণ, কোনটী গোলাপী, কোনো কোনটী হরিৎ, পীত, ধূমল, এবং এক একটী বিবিধ বর্ণে মিশ্রিত রঞ্জিত। বিশ্ববিধাতা কত কৌশল একত্র করিয়া কুঞ্জশোভা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? আমি পূর্ণশশীর সঙ্গে এই উদ্যানে আসিযাছি, শোভা দর্শন করিয়া নয়ন মন প্রফুল্ল হইতেছে। পত্রিকা, পূর্ণশশী, নিত্যকামী, একে একে শিবিকা হইতে নামিয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, প্রকৃতির শোভা দেখিয়া, আর সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল স্পর্শ করিয়া, ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। পত্রিকা কহিলেন, আহা! কুঞ্জবিধাতার কি সুন্দর বিবেচনা! আমরা এত দূর উত্তরে উপনীত হইয়াছি, তবু মলয়মারুতকে আমাদিগকে শীতল করিবার জন্য এই কুঞ্জে পাঠাইয়াছেন।

পূর্ণশশী হাসিয়া কহিলেন, বিশ্ববিধাতাকে তুমি কুঞ্জবিধাতা

বলিলে কেন? তোমাদের এখানে কুঞ্জ আছে বলিয়া মলয় মারুত এত দূর আসিতেছে না, আমি এত দিন মলয়ার নিকটে ছিলাম, তাই আমারি মায়ায় দক্ষিণানিল আমারে দেখিতে আসিতেছেন।

পত্রিকা একটু হাসিয়া বলিলেন, হইতেও পারে, কিন্তু প্রতিবৎসর তুমি ত এ অঞ্চলে থাকো না, প্রতি বৎসর বসন্ত উদয়ে মলয়ানিল উদয় হয় কেন?

পূর্ণ।—তবে, কেন হয় বল দেখি?

পত্রি।—তুমি বল দেখি?

পূর্ণ।—বোধ হয় ঋতু মাহাত্ম্য।

পত্রিকা মৃদু হাসিয়া কহিলেন, উভয়েরি মাহাত্ম্য। জয়দেব গোস্বামী বলিয়াছেন,——

অদ্যোৎসঙ্গবসৎ-ভুজঙ্গকবল-ক্লেশাদিবেশাচলং।
প্রালেয় প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ॥
কিঞ্চ স্নিগ্ধ রসাল মৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহুঃকুহুরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ॥

পূর্ণশশী কহিলেন, আমি অমন গীত শুনি নাই। কি তুমি বলিলে, বুঝিলাম না। সংস্কৃত ভাষা আমি জানি না। বুঝাইয়া দাও।

পত্রিকা দেবী জয়দেবের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীখণ্ড শৈলে অর্থাৎ মলয় পর্ব্বতে সর্ব্বদা সর্প বাস করে, মলয়ানিল সেই ভুজঙ্গের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া হিমাচলের তুষারে অবগাহন করিবার নিমিত্ত উত্তরবাহী হয়। আর সুস্নিগ্ধ আম্র মুকুল অবলোকন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল কোকিলেরা অস্ফুট স্বরে কুহু কুহু রব করে।

পূর্ণশশী প্রফুল্লমুখে কহিলেন, হাঁ, এখন বুঝিলাম। জয়দেব কি চমৎকার কবি!— অতি অপূর্ব্ব গায়ক। তিনি প্রকৃতির গতিকে

আর ঋতুর মহিমাকে নির্জ্জীব পদার্থ বায়ু আর বনচর পক্ষীর সহিত মিলাইয়া উপমা দিয়া কল্পনা দেবীর সন্ধি পূজা করিয়াছেন ! তাঁহার পায় কোটি কোটি নমস্কার !

নিত্যকামী কহিলেন, তোমার জয়দেবের চেয়ে আমার পত্রিকা গায় ভাল। পত্রিকার গানগুলি আর গলাখানি বড় মিষ্ট।

বৃদ্ধ ছলগ্রাহী এখন পত্রিকার খোষামোদ করিতেছেন। পাটনায় তিনি পত্রিকার মনের কথা পাইয়াছেন, পত্রিকা তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। এই জন্য এত খোষামোদ। "পত্রিকার গলাখানি বড় মিষ্ট।" এই কথা শুনিয়া পূর্ণশশী আর পত্রিকা মুখ ফিরাইয়া মুখ টিপিয়া একটু একটু হাসিলেন; নিত্যকামী তাহা দেখিতে পাইলেন না।

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড অতীত। গগনমণ্ডলে বসন্তচন্দ্র উজ্জ্বল শুভ্র কিরণ বিস্তার করিয়া হাস্য করিতেছেন, প্রকৃতিদেবী হাসিতেছেন, ধরণীদেবী হাসিতেছেন, জলে নিশানাথ-রঞ্জিনী কুমুদিনী হাসিতেছেন। পত্রিকা হাসিয়া কহিলেন, পূর্ণশশি ! আমরা অন্যমনস্ক হইয়া কতকক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া আছি, ঐ দেখ, আকাশের পূর্ণশশী কত দূর আসিয়াছেন, তোমাকেই বা ধরিতে আসিতেছেন, না হইলে অত হাসি কেন ?—অত শীঘ্র শীঘ্র গতিই বা কেন ?—চল আমরা পালাই। নিত্যকামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দ্বিজবর ! আসুন, শিবিরে যাই, রাত্রি অধিক হইতেছে।

নিত্যকামী চম্‌কিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, পত্রিকা আমাকে দ্বিজবর বলিল ! কেন বলিল ?--আমার দশা তবে কি হইবে ? ঐ রত্ন লাভ না হইলে আমি কখনই বাঁচিবনা। পত্রিকা তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। হাসিমুখে কহিলেন, মুনিবর ! আপনি কি ভাবিতেছেন ?

আমি আপনারে দ্বিজবর বলিয়াছি, তাহাতে কি কোনো দোষ হই-য়াছে? দেখুন, আপনি গুরুলোক, মান্য লোক, সুধু বর বলিলে অপমান করা হয়, তাচ্ছীল্য বুঝায়, সেইজন্য একটী দ্বিজ কি একটী মুনি আগে বলিয়া বর বলি; ইহাতে আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আমি আপনারি পত্রিকা।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধড়ে প্রাণ আসিল। তিনি খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া গদ্ গদ্ স্বরে কহিলেন, পত্রিকে! জীবনের পত্রিকে! তুমি লক্ষ্মী;—তুমি আমার মানস সরোবরের শতদল কমল,—তুমি আমার হৃদ্‌কমলের কমলা!—তুমি বাঁচিয়া থাক, আমি তোমারি।

পত্রিকা মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, অত বলিতে হইবে না, আমি ভুলি নাই। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। আশীর্ব্বাদ করুন, শীঘ্র আমাদের বিবাহ হউক। পূর্ণশশীরও বিবাহ হউক। হাঁ, আর একটী কথা।—আপনি আমারে কমলা বলিলেন, তবে ত আপনি এখন অবধি কমলাকান্ত হইবেন?—যতদিন বিবাহ না হয়, ততদিন আপনার নাম থাকুক, কমলাকান্ত শর্ম্মা।

নিত্যকামী আহ্লাদে ঢলিয়া পড়িলেন;—যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখান হইতে তিন চারি পা টলিয়া গেলেন, কহিলেন, 'তথাস্তু'। তুমি যা বলো, তাই আমার মঞ্জুর। আমাদের পূর্ণশশী পৃথিবীর পূর্ণশশী,—তুমি গগনের পূর্ণশশী। তোমার মর্য্যাদা বড়। এখন রাত কত পত্রিকে?

রাত্রি অনেক হইয়াছে, প্রায় এক প্রহর আগত। আসুন, শিবিরে যাই। শশি! চল ভাই, আর নয়।

তিন জনেই বস্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন, বিশ্রামের পর আহা-রাদি সমাপন হইল। পূর্ণশশীর মন কিছু চঞ্চল। পাটনা ত্যাগ

করিয়া অবধি এই শিবিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জগতের শোভা দেখিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হইতেছিল, এখন বন্দিনীর ন্যায় পটা-বাসে আবদ্ধ হইয়া মনে আর সুখ নাই। ম্লানমুখে পত্রিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয় সখি! এ কোথা এলেম?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনী বিদ্যাধরী।

"ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে॥"

জয়দেব।

রজনী প্রভাত হইল। পূর্ণশশীর বদন বিষণ্ণ। পত্রিকা কারণ জিজ্ঞাসা করেন, কিছুই বলেন না। নিত্যকামী জিজ্ঞাসা করেন, দীর্ঘনিশ্বাস উত্তর পান। অসুখে অসুখে সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যার পর পত্রিকা পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শশি! রাজকুমারকে দেখিবার নিমিত্ত কি তোমার মন চঞ্চল হইয়াছে?

উত্তর পাইলেন না।—পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিলেন, উত্তর নাই। তৃতীয়বার প্রশ্ন, তাহাতেও সমান ফল। চতুর্থ প্রশ্নে পূর্ণশশী যেন কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার অত কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন?

প্রয়োজন আছে। না থাকিলে জিজ্ঞাসা করিব কেন?—পত্রিকা রাগ করিলেন না,—হাসিলেন।—হাসিতে হাসিতে ঐ দুটী কথা বলিলেন।

নিত্যকামী উহাঁদের উভয়ের মনের ভাব কিছুই বুঝিলেন না।—গম্ভীরভাবে,—সে শরীরে আর সে স্বভাবে যতদূর গাম্ভীর্য্য সম্ভব,—ততটুকু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, রাজপুত্র পাটনায় গেলেন না, প্রয়াগে থাকিবেন বলিয়াছিলেন, এখানেও নাই, তবে তিনি কোথায়? কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে বটে, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। আমি ততদিন বিলম্ব করিতে পারি না।—দেখিতেছি, পূর্ণশশীর বিবাহ অগ্রে হইল না;—তুমি—

কথা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বেই পূর্ণশশী করতালির দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া চুপ করিতে বলিলেন। অপ্রফুল্ল,—ম্লান বদন ঊর্দ্ধে তুলিয়া একটী নিশ্বাস ফেলিলেন। পত্রিকার দিকে সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, সখি! আমি বড় অভাগিনী!—বলিয়াই মুখখানি নত করিলেন, পদ্মচক্ষু দিয়া দুফোঁটা জল মাটিতে পড়িল।

পত্রিকা শশব্যস্ত হইলেন। তাঁহার নবনীকোমল চিবুকে হস্ত দিয়া মুখখানি তুলিলেন। করুণস্বরে কহিলেন, এ কি! কান্না কেন?—তোমার শত্রু অভাগিনী হোক্, তুমি রাজরাণী হইবে।—একবার একটী স্বর্গকন্যার প্রতি দেবরাজ রুষ্ট হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাধরী কত কষ্ট পাইয়া পুনরায় সুরপুরে আদরিণী হইয়াছিল। তুমি যদি সে আখ্যান শ্রবণ কর, তবে এ সামান্য ক্লেশ এখনি ভুলিয়া যাইবে।

পূর্ণশশী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ভাল, তবে বলিয়া যাও, শুনিতেছি। দেখি, যদি মনকে সুস্থ করিতে পারি।

পত্রিকা গল্প আরম্ভ করিলেন,—পূর্ণশশী, নিত্যকামী, আর সহচরীরা এক মনে শুনিতে লাগিলেন।

বৃহস্পতির শিষ্যেরা যাহাকে কিন্নরী বলেন, মহম্মদের শিষ্যেরা

যাহাকে পরী বলেন, আমি তাহাকে বিদ্যাধরী বলিলাম। বিদ্যাধরীদের পাখা আছে, তাহারা উড়িতে পারে।

একদা বসন্তকালের প্রাতঃকালে একটী বিদ্যাধরী নন্দনবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছিল। স্বর্গের কাম্য উদ্যানে প্রবেশ করিবার তাহার অনুমতি ছিলনা। যে গন্ধর্ব্ব দেবকাননের প্রহরী, তিনি ঐ বিদ্যাধরীকে নিবারণ করিতেছিলেন। অভাগিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল, আমি মহাপাপী, শচীপতি আমারে অভিসম্পাত করিয়াছেন,আমি সুরপুরীর সুখ হারাইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলাম, কোথাও আমার সুখ নাই! দেবী ইন্দ্রাণী আমারে তত ভাল বাসিতেন, এখন আমি অকূলে ভাসিয়াছি, কোথায় আছি, সে কথা কি তিনি একটীবারও জিজ্ঞাসা করেন?—হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি আপনার চরণে ধরি, একটীবার সরুন, একটীবার আমি নন্দনে প্রবেশ করিব, দেবরাজ—দেবরাণীর পাদপদ্ম দর্শন করিব, আমি আপনার চরণে ভিখারিণী;—একবার দয়া করিয়া পথ ছাড়ুন।—আমি ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াছি, কত মনোহর পর্ব্বত, কত মনোরমা স্রোতস্বতী, কত ঊর্ম্মীময় সুগভীর সমুদ্র, কতশত রমণীয় উপবন, কত কত মনোহর রাজপ্রাসাদ, আর কতশত রূপবান রূপবতী পুরুষ প্রকৃতি দর্শন করিয়াছি, চন্দ্রলোক, নক্ষত্র লোক, নাগলোক সন্দর্শন করিয়াছি, কতশত কমনীয়-কান্তি সুরভি স্বভাবকুসুম আঘ্রাণ করিয়াছি, কোথাও কিছুতেই আমার সুখ হয় নাই। অনন্তকাল অনন্তজগতে যদি ভ্রমণ করি, তাহা হইলেও বিন্দুমাত্র সুখ পাইব না। এক মুহূর্ত্ত নন্দনবাসে যে আনন্দ,অনন্ত বৎসরেও তাহা কোথাও সুপ্রাপ্য নয়। হে গন্ধর্ব্বরাজ! আপনি অনুমতি করুন, মুহূর্ত্তমাত্র নন্দন দর্শন করি।

দ্রৌপদী-বিলাপ।

আকর্ষিছে দুঃশাসন কুরু কুলাঙ্গার,
পাঞ্চালীরে, কেশে ধরি, আনিতে সভায়,
পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন দস্যু অগ্রজ আদেশে!
হুঙ্কারিছে বারম্বার দাসী দাসী বলি—
নরাধম, পাপকর্ম্মা, নিষ্ঠুর চণ্ডাল;—
আছাড়িয়া পড়ি ভূমে, কাঁদিলা দ্রৌপদী।
কাঁদিয়া কহিলা বালা, ওরে দুঃশাসন!
পাপকুরু! ছাড় মোরে, রজস্বলা আমি!
এক বস্ত্রা, কুলবধূ, সভা মাঝে বসি
গুরুজন, পঞ্চপতি, ভাসুর, শ্বশুর,
দেশ বিদেশীয় রাজা, আচার্য্য ব্রাহ্মণ
অগ্নিময়; কুলবালা কেমনে যাইবে,
সে সভায়? ছাড় কেশ, করিরে মিনতি!
শুনিল না কোনো কথা, হাসিল দুর্ম্মতি
দুঃশাসন, কোনো কথা শুনিল না কাণে!
আয় আয় দাসী, বলি, আকর্ষিল বলে!!
কহিল কর্কশ স্বরে, দাসপত্নী দাসী!
রজস্বলা একাম্বরা, বিবস্ত্রা বা হও,
দ্যূত পরাজিতা দাসী, লজ্জা কি তোমার?

আবার কাঁদিলা সতী, পরিত্রাহি রবে,
অনাথিনী, হায় হায়! কাঁদিলা বিফলে!
বলে আকর্ষণ করি, লইল সভায়—
পাপমতি। দুর্য্যোধন হাসিলা নিহারি।
হাসিল শকুনি, কর্ণ, কাঁদিলা পাঞ্চালী।
চাহি চাহি ঘন ঘন পঞ্চ স্বামী পানে,
দগ্ধকুরঙ্গিণী সম, দ্রুপদ দুহিতা
দিশাহারা, ধর্ম্মভয়ে জড় সড় হয়ে,
কহিলা কাঁদিয়া পুনঃ সভারে সম্ভাষি।
ভীষ্মদেব! ডুবিল কি আজি কুরুকুল
কলঙ্ক পঙ্কিল হ্রদে? ডুবিল কি আজি
তোমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম দুর্য্যোধন কূপে?
দ্রোণাচার্য্য! এ কুলের শূরাচার্য্য তুমি,
হেরিছ কি এ দুর্দ্দশা অবলা বালার?
সিংহের ঘরণী কাঁদে শৃগালিনী সম!
হে বিদুর! কুরুকুলবধূ অভাগিনী,
লজ্জাহীনা সভামাঝে হেরিছ নয়নে?
ধিক্ তোমাদের ধর্ম্মে, ধিক্ ক্ষত্র কুলে!
রাজার কুমারী আমি, রাজ কুলবধূ,
আনিয়াছে সভা মাঝে লজ্জহীনা করি—
রাজার আদেশ ইহা মন্দ কে বলিবে?
সত্য কি তা? যদি হয়, বুঝিলাম তবে—
কুরুকুলে কিছু আর ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই!

পাপাত্মা রাজার মতে মত সবাকার!
কটু কথা কভু ভুলে এক দিন তরে,
ফুটে নাই অভাগিনী পাঞ্চালীর মুখে,
আজি সেই অভাগিনী সভা মধ্য খানে
উচ্চারিছে কটুবাণী বড় মনো দুখে!
সহিতে পারি না আর এত অপমান,
এ যন্ত্রণা;—কুলবালা লজ্জা তেয়াগিয়ে!
দ্যূতে পরাজিত পতি কুচক্র ছলনে,
তাই কুরুকুলবধূ কৌরব সভায়—
ডাক ছেড়ে কাঁদিতেছে ভিখারিণী সম!
শুন কহি রাজগণ! ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
অভাগী পাঞ্চালী কভু লজ্জা পরিহরি—
আসেনি দেখাতে মুখ রাজার সভায়।
মনে হয় একদিন স্বয়ম্বর দিনে,
এসেছিনু মাল্য হস্তে লক্ষ রাজা মাঝে;
সেই দিন এই মুখ দেখেছেন যাঁরা,—
আজি সভা মধ্যস্থলে আরো কত লোকে—
তাঁরা ছাড়া;—দেখিলেন কাঙ্গালিনী প্রায়!
হায় হায় এই ছিল কপালে লিখন!!
চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, মেঘ, একদিন তরে—
দেখে নাই দ্রৌপদীর বদন মোচন,
কুরু সভা মাঝে আজি অনাথা দ্রৌপদী!
দ্রুপদ কুমারী আমি পাণ্ডব মহিষী,

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখী পার্ষত ভগিনী,
কুরুরাজ কুলবধূ পতিব্রতা সতী,
কি কুক্ষণে সহি আজি এত অপমান !
কেহ কিছু বলিলে না, রহিলে নীরবে ;
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্রিকুলে ধিক্ শতবার !
আজি আমি সহিলাম, কাল সহিবে না,
অবশ্য কালের ফল হইবে ভুঞ্জিতে !
অন্ধরাজ ! কাঁদিতেছে তব পুরবধূ,—
দেখিতে কি পাও তাহা ? কেমনে দেখিবে ?
চক্ষু নাই, অন্ধ তুমি নিজ ভাগ্য দোষে !
আরো অন্ধ করিয়াছে রাজা দুর্য্যোধন !!
কাতরে করুণ স্বরে কাঁদিলা পাঞ্চালী
কৃষ্ণা ;—দুঃশাসন তবু ধৈর্য্য বাঁধিল না !
বলে আকর্ষিয়ে দুষ্ট ধরিল বসন।
বসন হরিতে আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন ॥
কাঁদিয়া কাতরা সতী করিলা বারণ।
ডাকিলেন লজ্জা রাখ লজ্জা নিবারণ ॥
কোথা হে পাণ্ডব সখা ! শ্রীমধুসূদন !
এ বিপদে দেহ দেখা বিপত্তি বারণ ॥
অকূলে পড়েছি প্রভু, কূল নাহি পাই !
লজ্জা নিবারণ কর এই ভিক্ষা চাই ॥
হৃদিপদ্মে উর আসি বিপদ নাশন !
দ্রৌপদীর লজ্জা নাশে পাপী দুঃশাসন ॥

ত্রাণ কর ত্রাণনাথ ! তোমার দাসীরে।
নতুবা হে চক্রপাণি, চক্র হান শিরে॥
মৃত্যু বাঞ্ছা করি আমি অন্য বাঞ্ছা নাই।
যেখানে ছিলাম আগে, সেই খানে যাই॥
সহে না অবলা প্রাণে এত অপমান।
আশীর্ব্বাদ কর দেব ! ছেড়ে যাক প্রাণ॥
ভকত বৎসল হরি উরিলেন আসি।
অলক্ষিতে পাঞ্চালীরে কহিলা সম্ভাষি॥
ভয় নাই এই আমি আসিয়াছি তোর।
কি করিবে পাপ কুরু প্রকাশিয়ে জোর ?
কি বস্ত্র হরিবে তব হরুক দুর্ম্মতি।
সঙ্গে সঙ্গে আমি তব রহিলাম সতি !
আকর্ষিলা দুঃশাসন ধরিয়া বসন।
এক খসে আর আসে অপূর্ব্ব ঘটন॥
যত বস্ত্র টেনে লয় তত বস্ত্র হয়।
ভেবাচেকা দুঃশাসন বুদ্ধি শুদ্ধি লয়॥
অপমান হয়ে শেষে কহে ভূপতিরে।
না পারিনু উলঙ্গ করিতে দ্রৌপদীরে॥
ক্রোধে জ্বলি দুর্য্যোধন কহিলা তাহায়।
জাদু বিদ্যা খেলাইছে, বস্ত্র হয় তায়॥
কত ইন্দ্রজাল জানে নন্দের কুমার।
একে একে পরীক্ষা লইব আমি তার॥
কাজ নাই বস্ত্র হরি ক্ষান্ত হও ভাই।

দাসী ধরে আনিয়াছ, দাসী আমি চাই ॥
হাসি হাসি সম্ভাষিয়ে নানা কথা বলি।
উরুদেশ চাপড়িয়ে হয় কুতূহলী ॥
হাসি হাসি দ্রৌপদীরে দেখাইলা উরু।
সেই পাপে সবংশে মজিল পাপ কুরু ॥
পাঞ্চালী দিলেন শাপ মনানলে জ্বলি।
জ্বলে যাবে কুরুকুল এই কথা বলি ॥
গর্জ্জিলেন বৃকোদর যেন কাল ফণী।
করিলেন পাঞ্চালীর স্বরে প্রতিধ্বনি ॥
শোন্ শোন্ দুঃশাসন কুরু কুলাঙ্গার!
সমরে ও পাপ বক্ষ চিরিব তোমার ॥
হুঙ্কারি করিব পান রুধিরের ধার।
তবে এই মনাগুন নিবিবে আমার ॥
ভেদিব তোমার বুক বিঁধি তীক্ষ্ণ শূল।
বেঁধে দিব দ্রৌপদীর ঐ এলোচুল ॥
শোন্ শোন্ নরাধম পাপী দুর্য্যোধন!
সমরে তোমারে আমি করিব নিধন ॥
যে উরু দেখায়ে আজি কর অহঙ্কার।
গদাঘাতে সেই উরু ভাঙ্গিব তোমার ॥
যদি এ প্রতিজ্ঞা মম না করি সফল।
পোড়াইব ভীম দেহ জ্বালিয়ে অনল ॥
যদি এ প্রতিজ্ঞা খণ্ডে ঘটিলে সমর।
বৃথা নাম ধরি আমি বীর বৃকোদর ॥

পরাজয়ী ধর্ম্মরাজ চলিলেন বনে।
জানাইব ক্ষত্রিধর্ম্ম কুরুক্ষেত্র রণে॥
একা আমি সংহারিব শত কুরুপাপ।
তবে আমি ভুলে যাব দ্রৌপদী বিলাপ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপাল।

রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্য অর্পিব কাহারে?
জিজ্ঞাসিলা ধর্ম্মরাজ এই প্রশ্ন সার,
সভামাঝে। রাজগণ উঠিলা চমকি
সহসা, কহিতে কেহ নারিলা স্বরূপ
মীমাংসা। ভাবিলা সবে কে হবে নিপুণ,
পূরিতে ধর্ম্মের প্রশ্ন, ধর্ম্ম উপদেশে।
উঠিয়া কহিলা ভীষ্ম কুরু পিতামহ।
ধর্ম্মরাজ! এত কেন করিছ বিচার?
যদুকুলপতি কৃষ্ণ পাণ্ডবের সখা;—
শাস্ত্রে যাঁরে গাইতেছে পূর্ণব্রহ্মরূপ,
গুণে মানে বলে বীর্য্যে প্রধান পুরুষ,
তাঁরে তুমি অর্ঘ্য দিয়ে অগ্রে কর পূজা,
যজ্ঞের প্রধান ভাগী যজ্ঞেশ্বর হরি।
অর্ঘ্য দান কর তাঁরে যজ্ঞ পূর্ণ হবে।

সাধু সাধু বলি যত সাধু রাজাগণ
সত্যব্রত গঙ্গাপুত্র বাক্যে দিলা সায়।
রুষিয়া উঠিলা ক্রোধে ভীষ্মকে নিন্দিয়া
চেদিরাজ, শিশুপাল, বৈরী শ্রীকৃষ্ণের
চিরদিন। গরজিলা ভীষণ নিঃস্বনে।
কহিলা যাদবে ডাকি শুন কৃষ্ণ তুমি!
ভীষ্ম আজি করিতেছে কীর্ত্তন তোমার
সুমহিমা। জানি আমি যত বড় তুমি!
স্ত্রীহত্যা গোহত্যা পাপ অলঙ্কার তব!
কাপুরুষ কুরু ভীষ্ম তুমি কাপুরুষ,
কাপুরুষ কুরুকুলে রাজা যুধিষ্ঠির,—
কাপুরুষ আর চারি পাণ্ডুর কুমার!
শুন কৃষ্ণ! আমি জানি, চন্দ্র সূর্য্য জানে,
সাগর, অম্বর, নদ, নদী, আর গিরি,
সকলেই জানে তুমি দাসপুত্র দাস,
তুমিও আপনি জান মিথ্যা কথা নয়।
মাতুলে করেছ বধ রাজ্যলাভ আশে
যদু বংশে রাজা নাই ভুলেছ কি তাহা?
রাজা না হইলে কভু যজ্ঞে অর্ঘ্য পায়?
বীর তুমি, এই কথা কথার কৌশলে
জানাইল ভীষ্মদেব মোহিবারে সবে!
ক্লীব ভীষ্ম, মিথ্যাবাদী, কুলের অধম;—
নপুংশকে কি জানিবে বীর কারে বলে?

শিশুকালে বধিয়াছ তুমি নন্দ সুত,—
মায়াবিনী কংস দূতী পূতনা রাক্ষসী ;—
রমণী সে দূতী, তাতে কি তব পৌরুষ ?
নারী বধ করে যারা নারী মধ্যে গণি ;—
বেশী যদি থাকে কিছু, নারী হত্যা পাপ।
গাছ দুটী ভাঙ্গিয়াছ, জমল অর্জ্জুন—
জীর্ণ বৃক্ষ, স্বভাবত জাতিতে অসার ;
কে না তাহা পারে কৃষ্ণ ? গরুতেও পারে।
ভাঙ্গিয়াছ জীর্ণ শীর্ণ গোপের শকট,
তাতে কি হয়েছে সিদ্ধ তব বীরপনা ?
আর কি করেছ তুমি গোকুল বিহারি ?
বধিয়াছ অশ্বাসুর, বৃষাসুর রণে,
মারিয়াছ বকাসুর গোকুলের মাঠে;
তাতে কি বলিব আমি কৃষ্ণ মহাবীর ?
গোবধের পাপী তুমি পাখী মারা হরি ;
তা ত নয় বীরধর্ম্ম, আক্কুটীরা পারে।
আর কি করেছ কৃষ্ণ ! বল দেখি শুনি ?
ননী চুরি করিয়াছ গোপিনীর ঘরে ;
রাজা নয়, বীর নয়, তারে বলে চোর।
আর কি করেছ তুমি ? গোপসুত দাস !
বহেছ নন্দের বাধা, চরায়েছ ধেনু,
খাইয়াছ বহু অন্ন, অন্ন ভিক্ষা করি ;
পেটুকের ধর্ম্ম, তা ত বীরধর্ম্ম নয় !

কালীদহে ডুবেছিলে মর নাই বিষে ;
বাঁচায়েছ গোপশিশু কালিন্দীর জলে ;
সে কাজ বীরের নয় সাপুড়েরা জানে।
গোঠে গোঠে কুঞ্জবনে গোপিনী বিলাস ?
রাখালের ধর্ম্ম সেটা, বীরধর্ম্ম নয়।
আর কি করেছ কৃষ্ণ ? করিয়াছ বটে !
ধরিয়াছ সপ্তদিন গিরি গোবর্দ্ধন।
হাসি পায় হে গোপাল ! সে কথা তুলিতে।
ক্ষুদ্র গিরি গোবর্দ্ধন বল্মীকের ঢিবি !!
মায়াবী তোমার মত বহু দেখিয়াছি,
দেখে শুনে এতদিন রাখিয়াছি মনে।
মায়াবী গোয়ালাপুত্র শঠ শিরোমণি !
মনে করে দেখ দেখি জরাসন্ধ বধে—
কত খেলা খেলেছিলে সাজিয়ে ব্রাহ্মণ ?
প্রবেশিয়াছিলে পুরে গুপ্ত দ্বার দিয়া,—
পূজা নিতে পার নাই অব্রাহ্মণ বলি !
গোয়ালা ব্রাহ্মণ হয়, হাসি পায় শুনে !
বীরত্ব দেখায়েছিল ভীম ধনঞ্জয় !
শেষে প্রতারণা করি বধিলে রাজারে !
ভীষ্ম আজি বলিতেছে পূর্ণব্রহ্ম তুমি !
তুমিও ফুলিয়া উঠে ভাবিতেছ মনে—
তবে আমি হইলাম, জগত ঈশ্বর !
কিন্তু কৃষ্ণ ! বৃথা তুমি কর অহঙ্কার !

ক্লীবের কথায় কভু, দেবত্ব কি হয় ?
আরো দেখ, সুরূপসী ভীষ্মকের সুতা
রুক্মিণী,—আমারে আগে দত্তা হয়েছিল,
তুমি তারে ছলা পাতি করিলে হরণ
দস্যুমত; অন্যপূর্ব্বা নারী পরিগ্রহ
করিয়াছ ; ধিক্ ধিক্ যাদব শৃগাল !
এই ত গৌরব তব ! এই ত গরিমা !
বল, বীর্য্য, দেব ভাব, এই ত সকল !
দূর মূর্খ ! গোপ দাস ! যদুকুল গ্লানি !
এত বলি নীরবিলা অট্ট অট্ট হাসি
শিশুপাল,—চেদিপতি,—চাহি সভাপানে।
হাসিলেন জনার্দ্দন, পরুষ বচনে
তার। মৃদু হাসি পুনঃ কহিলেন, শুন
চেদীশ্বর ! ক্ষমিয়াছি আমি এতদিন
শত অপরাধ তব জননী বিনয়ে।
গর্ব্বে দর্পে মত্ত তুমি গোমায়ু বর্ব্বর !
আজি আমি ক্ষমিবনা, পূর্ণ হলো কাল।
এত বলি চক্র দিয়া কাটিলেন শির,
লীন হলো শিশুপাল-তেজ, বিষ্ণুতেজে ॥

বাল্মীকির তপোবনে লক্ষ্মণের প্রতি

সীতা।

কি কথা শুনালি ভাই ! অশনির প্রায় !
রবিকুল শশধর, প্রাণপতি রঘুবর,
ইহ জনমের মত ত্যজিলা সীতায় !!

উহু ! বুক বিদরয়ে শুনিয়া বচন।
সকলি তিমিরময়, দেহ যেন মম নয়,
থর থর কাঁপিতেছি, ধররে লক্ষ্মণ !

জনম অবধি কেহ নাহিক সীতার।
পড়েছিনু ধরাতলে, জনক দুখিনী বলে,
দয়া করি লইলেন পালনের ভার॥

সেই চির দুখিনীর, কি জানি কি ফলে।
স্বপনের অগোচর, পতি হল রঘুবর,
ডাকিতেন দুখিনীরে প্রণয়িনী বলে।

প্রাণের সমান ভাল বাসিতেন রাম।
মোর লাগি সরোদনে, ফিরেছেন বনে বনে,
অবশেষে অন্বেষণে গেলা লঙ্কাধাম।

তবে এবে কি দোষেতে ত্যজিলেন পতি,
সত্য করি বল ওরে   দেবর লক্ষ্মণ মোরে,
শুনিয়া ত্যজিব প্রাণ, নাহি আর গতি।

এমন গুণের পতি নাহিক কাহার।
সেই গরবে দুখিনী,   হয়েছিল গরবিণী,
ভাবিতাম নারী জন্ম সফল আমার।

দুখিনীর এত সুখ সয় কি কপালে ?
দেখিনু যেন স্বপন,   দুই দিনে উদ্‌যাপন,
সকালের সুখ রবি ঢাকিল সকালে।

হে পিত ! জনক ! কেন সাধিলে গো বাদ ?
তুমি না পালিলে পরে,   তখনি যেতাম মরে,
ঘটিত না দুখিনীর বিষম বিষাদ।

হে মাত ! ধরণি ! কেন ধরিলে আমায় ?
কেন বিদেহ পতিরে,   দিয়াছিলে দুখিনীরে,
এখন কাহার হাতে দিবে তনয়ায় ?

বিশ্বামিত্র মহাঋষি ! কেন গো তখন।
আনিয়া রাঘববরে,   মোরে সঁপে দিলে করে,
একবার দেখ আসি কি দশা এখন।

সতিনীর বধূ আমি, কেকয়ী তোমার !
কেন হইল না রীষ,   কেন খাওয়ালে না বিষ,
তা হলে এ দুখিনীর হতো উপকার।

পঞ্চবটী বনে যবে হরিণের তরে।
গেলেন দেবর, স্বামী, একাকী রহিনু আমি,
শ্বাপদে কেন না মোরে খাইল না ধরে ?

শুনেছি রাক্ষসগণ নরমাংস খায়।
এই দশা হবে বলে, লঙ্কাতে রাক্ষস দলে,
না করি বিনাশ, বুঝি ছাড়িল আমায়।

যখন প্রাণের পতি শুধিলা অনলে।
ভাবিলাম একবার, প্রাণ রাখিব না আর,
ভুলিনু, হেরিয়া রামচরণ কমলে।

আদরের বউ আমি কৌশল্যা তোমার !
দেখ আসি একবার, কি দশা ঘটেছে তার,
একাকিনী অনাথিনী করে হাহাকার।

কোথা মহারাজ তুমি গুণের শ্বশুর !
এস এস একবার, কি দশা দেখ সীতার,
কাঁদিছে তাহার দুখে শৃগাল কুকুর।

কোথা অরুন্ধতী তুমি সতী পুণ্যবতী।
যার নামে হরষিতা, তোমার সাধের সীতা,
নিবিড় বনের মাঝে করিবে বসতি।

হে বশিষ্ঠ গুরুদেব ! ঋষি মহামতি !
তুমি জীবিত থাকিতে, সীতারে বিদায় দিতে,
কেমনে করিলা মতি রঘুকুল পতি ?

হে রঘুকুলের পতি সীতার জীবন !
বলহে বল প্রকাশি, কি দোষ করেছে দাসী,
জীবনের মত তারে দিলে বিসর্জ্জন !

পরিহাস করি কভু করনাই রোষ।
একবারে বনে দিলে, মায়া দয়া তেয়াগিলে,
চরণে করেছে দাসী কি এমন দোষ ?

এত যদি মনে ছিল ত্যজিবে আমারে।
তবে হর শরাসন, কেন ভাঙ্গিলে রাজন,
কেন বা সোণার মৃগ গেলে ধরিবারে ?

মোর লাগি বনে বনে কেন বা কাঁদিলে ?
কেন বা আমার তরে, লইয়া যত বানরে,
অশেষ আয়াস পেয়ে জলধি বাঁধিলে ?

মিছা মিছি কেন তবে বালীরে বধিলে ?
মোর লাগি কেন রাম, গিয়াছিলে লঙ্কাধাম,
রাবণে বধিয়া কেন পাতকী হইলে ?

আবার কেন হে তবে আনিলে ভবনে ?
কেন বা আমার বলে, রাখিলে হৃদিকমলে,
কেনই বা পুন মোরে পাঠাইলে বনে !

এতই দেখিতে যদি পার না সীতারে।
অপর দাসীর প্রায়, রাখিতে যদি আমায়,
তাতেও জুড়াতো প্রাণ হেরিয়া তোমারে।

খণ্ডিতে পারে না কেহ কপাল লিখন।
মিছে করি অনুতাপ, আপনি করেছি পাপ,
অবশ্য তাহার ভোগ ভুগিব এখন।

তোমার ঔরস জীব ধরেছি উদরে।
তাতেই পোড়া জীবন, ত্যজিতে সরেনা মন,
নতুবা কি ভাবিতাম ক্ষণেকের তরে?

যা হবার হইয়াছে দেবর লক্ষ্মণ!
কোরো এই উপকার, একটী কথা আমার,
তোমার দাদারে বোলো করিয়া স্মরণ।

হে রাঘব! দুখিনীর একমাত্র ধন।
বিহনে তব চরণ, কখন ভাবেনি মন,
জ্ঞানকৃত কোন দোষ করিনি কখন।

ভাঙ্গিতে হরের ধনু বধিতে রাবণ।
কত ক্লেশ মোর তরে, হয়েছে হে কলেবরে,
দুখিনী বলিয়া সব ক্ষমিবে রাজন্।

হে জনক! হে বশিষ্ঠ! শ্বশুর সুমতি!
হে কৌশল্যে! অরুন্ধতি! জননি সুমিত্রা সতি!
জনমের মত সীতা করিছে প্রণতি।

—

বর্ত্তমান অবস্থা।

গত মাসে আমরা আমাদিগের দেশের কতকগুলি শোচনীয় অবস্থার বিষয় বলিবার অবসরে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের দেশীয় বঙ্গভাষার কথা কিছুই বলা হয় নাই। পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে বাঙ্গালা একটী ভাষার মধ্যেই পরিগণিত হইত না, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ সমাদরও ছিল না। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সময়ে বাঙ্গালাভাষার এতাদৃশ গৌরব ছিল না। রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার যত্নে ও আয়াসে বাঙ্গালাভাষা এক্ষণে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে। নানাপ্রকার বাঙ্গালা সাহিত্য দিন দিন নূতন ভাব ও নূতন অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশিত হইতেছে। ইহা আমাদিগের একটী সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। বাঙ্গালা সাহিত্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, বিজ্ঞানাদি বিষয় সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে আমাদিগের অনেকাংশে মঙ্গল সাধন হইবার সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষাপ্রণালী ব্যতীত সামাজিক অন্যান্য বিষয় কি অবস্থায় আছে, দেখা উচিত। বড় দুঃখের বিষয়, সমাজের উন্নতির দিকে কাহাকেও প্রায় বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতে দেখিতেছি না। সকলেই আপন আপন নাম বাহির করিবার জন্যই ব্যতিব্যস্ত ও আপনার সুখেই মত্ত; জাতীয় সমাজ কি অবস্থায় পতিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সে চিন্তা কেহই করিতেছেন না। কিরূপে সমাজের দুরবস্থা অপনীত হইবে, কিরূপে জাতীয় গৌরব রক্ষা হইবে, সে চিন্তা সহস্রের মধ্যে এক জনেরও আছে কি না সন্দেহ। দুর্ভাগ্যক্রমে কালসহকারে আমাদিগের সকল প্রকার গৌরবই অতীত গর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, তথাপি আমরা সুসভ্য ইংরাজ জাতির গৌরব, বুদ্ধিমত্তা ও সভ্যতার অংশী বলিয়া বৃথা অভিমানে গর্ব্বিত ও মত্ত হইতেছি। সুসভ্য, কার্য্যদক্ষ ইংরাজ জাতি রেলওয়ের কল, ময়দার কল, চিনির কল, পাটের কল, ও কাপড়ের কল প্রভৃতি নানাপ্রকার কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাড়িৎ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্ণবযান সৃষ্টি করিয়া আমদানী রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন; সে গৌরবে আমরা কখনই গৌরবান্বিত হইতে পারি না, অথবা আমরা কখনই সে গৌরবের অংশী হইতে পারি না,—পারিবও না। সুসভ্য ইংরাজ জাতি আমাদিগের দেশের সিংহাসন অধিকার করিয়া অনেকাংশে আমাদিগের দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন,

কিন্তু তাহাতে আমাদিগের সমাজের বা জাতীয় গৌরবের কিছু মাত্র শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না, বরং স্বভাবসিদ্ধ আলস্যেরই বৃদ্ধি হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সুসভ্য ইংরাজ জাতির বল, বিক্রম, কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা আমাদিগের উদ্দীপক না হইয়া, প্রকারান্তরে নির্ব্বাপক হইতেছে। অনেকানেক বঙ্গীয় সুশিক্ষিত যুবক অনুকরণ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধূতিচাদরের পরিবর্ত্তে পায়জামা কোট্ পরিধান করিতেছেন, শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য নানাপ্রকার আহারের পরিবর্ত্তন করিতেছেন, ইংরাজী ভাষায় লেক্‌চার দিয়া বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু কৈ, তাঁহারা ত সমাজের প্রতি একবারও কটাক্ষপাত করিতেছেন না। কৈ, তাঁহারা ত এক দিনের জন্যও ইংরাজ জাতির কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন না। কৃতবিদ্য বঙ্গ যুবকগণ যদি বৃথানুকারী না হইয়া সার্থকানুকারী হন্, তাহা হইলে অনায়াসেই সমাজের মঙ্গল সাধন হইতে পারে, অনায়াসেই জাতীয় গৌরবের বৃদ্ধি হইতে পারে। তাঁহারা শরীরতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, ও পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতির বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া অনায়াসেই জাতীয় সমাজের শারীরিক ও মানসিক বলের ঔৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন। তাঁহারা মনে করিলে সুসভ্য ইংরাজ জাতির ন্যায় আমাদিগের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে নানাবিধ যন্ত্র সমূহের আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারেন। তাঁহারা মনে

করিলে অনায়াসেই ধনবৃদ্ধির নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাঁহারা সমবেত হইলে অনায়াসেই বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি সমাজগত কুপ্রথা সমূহের নিরাকরণ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা সমাজের দুর্গতির বিষয় একবারও মনে করেন না। (ইংরাজদিগের প্রসাদে এক্ষণে নানাবিধ চাকরির সৃষ্টি হইয়াছে) তাঁহারা বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই সামান্য চাকরির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, এবং সেই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই আপন আপন অর্জ্জনস্পৃহার চরিতার্থতা সম্পাদন করেন। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান সাধনভূত ধনাগম, শারীরিক ও মানসিক বল বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? এখনকার বঙ্গযুবকগণ চাকরীর দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করাই অতি সুলভ বিবেচনা করিয়া থাকেন; অর্থাগমের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে তাঁহাদিগের অনুকরণ বৃত্তি একদিনের জন্যও কার্য্যক্ষম ইংরাজ, য়িহুদী ও অন্যান্য জাতির কার্য্যদক্ষতার প্রতি ধাবিত হয় না। আমরা এখন কৃতবিদ্য যুবকগণের এই পর্য্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইতেছি যে, তাঁহারা কখনই কোন আয়াসগম্য পথের দিকে যাইতে চান না, অক্লেশে ও অনায়াসে যে সকল কাজ নির্ব্বাহ হয়, সেই দিকেই ধাবিত হইয়া থাকেন। সামান্য একটী একটী চাকরী পাইলেই তাঁহারা আজন্ম সেই দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবিত কাল অতিবাহিত করেন। সুদৃঢ় দাসত্ব-শৃঙ্খল তাঁহাদিগের নিকটে এখন সুগন্ধি মাল্যদাম

অথবা মনোহর স্বর্ণহারের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। তাহার সুদৃঢ় বন্ধনে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিতেছেন না, প্রত্যুত সাধীন বৃত্তিভোগী চিরসুখীর ন্যায় অনুপম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, মুক্তকণ্ঠে কত প্রকার অহঙ্কার সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, আপনাদিগকে কত প্রকারে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন, সুসভ্য জাতিগণের সমকক্ষ বলিয়া কত গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপন আপন অবস্থা ও কার্য্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন না। ধন্য কাল! তোমার অপার মহিমা!! আমাদিগকে এতদূর দুরবস্থায় নিপাতিত করিয়া, স্বাধীনতা, ঐক্য, মান, সম্ভ্রম ও বলবীর্য্য প্রভৃতি সমস্ত ধনে বঞ্চিত করিয়া এখনও কি তোমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না? ইহা অপেক্ষাও কি হীনাবস্থায় নিক্ষেপ করিতে হইবে? তোমার অচিন্ত্য প্রভাব! তোমার প্রভাবে,—তোমার মোহিনী শক্তি-প্রভাবে এখনকার কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ও অন্ধ হইয়া পড়িতেছেন। তোমার মোহিনীশক্তি-প্রভাবে তাঁহারা সময়ে সময়ে এককালে হিতাহিত বিবেচনাশূন্যও হইতেছেন। তোমার মোহিনী-শক্তি-প্রভাবেই তাঁহাদিগের শারীরিক বলের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বলও অন্তর্হিত হইতেছে। কোন স্থানে একটী চাকরি খালি হইয়াছে শুনিলে শত শত কৃতবিদ্য যুবক আবেদন পত্র ও প্রশংসাপত্র প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হন, অবশেষে পরীক্ষা দিতেও কৃতনিশ্চয় হন, তাহাতে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র গৌরবের হানি হয়

না। কিন্তু যাহাতে ধন বৃদ্ধি হইবে, আপন আপন সুখ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে, জাতীয় গৌরব রক্ষা হইবে, সমাজের উন্নতি সাধন হইবে, এরূপ কোন কার্য্যের দিকে নেত্রপাতও করেন না। আমরা আজন্মকাল শুনিয়া আসিতেছি ও দেখিতেছি যে, বাণিজ্য বৃত্তি অর্থোপার্জ্জনের প্রধান সাধনভূত। বাস্তবিক এই উৎকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিলে আমাদিগের যে পরিমাণে অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা, তাহা দাসত্ব বা অন্যান্য বৃত্তি দ্বারা সুসিদ্ধ হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। ইহা আমাদিগের দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানেন, কিন্তু আজ কৃতবিদ্য নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কাহাকেও সেই সুখময়ী বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখিতেছি না। আমাদিগের দেশে যাঁহারা এই গৌরবান্বিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই অকৃতবিদ্য ও অনভিজ্ঞ; এমন কি, যাঁহারা চাকরী করিতে অক্ষম হন, তাঁহারাই অগত্যা এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করেন। লোকের কি ভ্রান্তি! ঐ সকল স্ববৃত্তিপালিত ভ্রাতৃগণকে চাকরিপ্রিয় ভদ্রসন্তানেরা নীচবৃত্তি উপজীবী বলিয়া উপহাস করেন! যাহারা ছয় ঋতুর শীতাতপ ও বারিধারা মস্তকে ধারণ করিয়া আমাদিগের নিত্য জীবিকা উৎপাদন করিয়া দেয়, তাহারা চাষানামে হেয়!—স্ববৃত্তির প্রতি দেশের লোকের যতদিন এইরূপ অনাদর ও কুসংস্কার থাকিবে, ততদিন আমাদিগের প্রকৃত মঙ্গলের আশা নাই।

বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট জানা যায় যে, আমাদিগের যাহা কিছু সৌভাগ্য ছিল, তাহার আর কিছুই নাই,—যাহা কিছু নূতন হইয়াছে, তাহাও পূর্ণ করিতে এখনো অনেক অভাব। কতকগুলি যুবা হাস্য করিয়া গর্ব্বভরে বলেন, খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে "সভ্যতার" পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। আমরা মধ্যে মধ্যে এই গর্ব্ব শ্রবণ করিয়া হাস্য করি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা কি, তাহা আমরা বুঝি না। জাতীয় গৌরবের বিসর্জ্জন যদি সভ্যতা হয়, তবে তাহার পরকাষ্ঠা হইয়াছে। ভোজ্য ও পরিধেয় পরিবর্ত্তনের চেষ্টা যদি সভ্যতা হয়, তবে তাহার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। সর্ব্ববর্ণের একাকার ও অসবর্ণ বিবাহের ঘটকতা যদি সভ্যতা হয়, তবে তাহার আর বাকী নাই। নারীজাতির স্বেচ্ছাচার যদি সভ্যতার অলঙ্কার হয়, তবে যে স্বর্ণকার তাহা গড়িতেছেন, তিনি আর্য্য ভূমে অভূতপূর্ব্ব সভ্যতা আনয়ন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐগুলি যদি যথা প্রত্যাশিত যথার্থ সভ্যতা না হয়, তবে আমাদিগের সমাজ সংসারে প্রত্যহ এক একবার তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। বারান্তরে আমরা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

কল্কিপুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

শুক কহিল, হে শুভে! যখন তুমি আশুতোষের শিষ্যা হইয়াছ, তখন তুমিই ধন্য ও যথার্থ পুণ্যবতী। এক্ষণে যাহা শ্রবণ করিলে শুকাকার হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় ও ভগবানের প্রতি ভক্তি উদয় হয় এবং যাহা শ্রবণ করিলে জীবের মানসিক আনন্দের পরিসীমা থাকে না, মহেশ্বর স্বয়ং যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই শ্রুতিসুখকর জপধ্যান সম্বলিত বিষ্ণুপূজাবিধি শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। যদি আমি এই স্থানে আপনার মুখে সেই পরম পবিত্র বিষ্ণুপূজাবিধি শ্রবণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমারও পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

পদ্মা কহিলেন, হে শুক! ভগবান্ শশাঙ্কশেখর যেরূপ বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি বলিয়াছেন, তাহা অতীব পবিত্র। শ্রদ্ধার সহিত সেইরূপ অনুষ্ঠান, উহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারে। এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই বিষ্ণুপূজাবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মনুষ্য পূর্ব্বাহ্ণে স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক শুচি হইবেন, পরে হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক জল স্পর্শ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিবেন, পরে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া বিধানানুসারে অঙ্গন্যাস, ভূতশুদ্ধি ও অর্ঘ্যসংস্থান করিবেন। তৎপরে কেশবকৃত্যাদি ন্যাস দ্বারা তন্ময় হইবেন। পরে আত্মাকে বিষ্ণুময় চিন্তা করিয়া হৃদিস্থিত সেই বিষ্ণুকে সংকল্পিত আসনে

সংস্থাপন করিবেন। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ প্রভৃতি উপচারে অর্চ্চনা করিয়া হৃদয়পদ্ম মধ্যগত, প্রফুল্ল-বদন, ভক্তের অভীষ্ট ফলদাতা সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে চরণ হইতে কেশান্ত পর্য্যন্ত ধ্যান করিবেন। পরে "ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তুতি পাঠ করিবেন।

যোগসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি শ্রীর আলয় স্বরূপ, যাঁহার ভক্ত ভৃঙ্গগণ তুলসী দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, যাঁহার রক্তবর্ণ নখসম্পন্ন অঙ্গুলি-পত্র দ্বারা গঙ্গাজল চিত্রিত হইয়াছে, আমি সেই বিষ্ণু পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম। ভগবান বিষ্ণুর যে চরণ কমলবৃন্ত গ্রথিত মণি সমূহ দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে, যে চরণে রাজহংসের ন্যায় শব্দায়মান নূপুরযুগল শব্দিত হইতেছে, যাহাতে সচঞ্চল পীত বসনাঞ্চল লম্বমান হইয়া প্রচলিত পতাকার ন্যায় বিরাজমান হইয়াছে, এবং যাহাতে সুবর্ণময় ত্রিবক্র বলয় শোভা পাইতেছে, আমি সেই চরণকমল-বৃন্ত স্মরণ করি। ভগবান নারায়ণের যে জঘনযুগল বিনতানন্দন গরুড়ের গলস্থিত নীলকান্ত মণির ন্যায় শোভাসম্পন্ন, যাহার মধ্যদেশে অরুণ বর্ণ মণির ন্যায় গরুড়ের চঞ্চু দ্বয় বিরাজিত রহিয়াছে, যাহার নিম্নে আরক্ত চরণ যুগল শোভা পাইতেছে, যাহা ভক্তগণের লোচনানন্দ-জনন, আমি সেই জঘন দ্বয় স্মরণ করি। উৎসবকালে স্কন্ধার্পিত বিদ্যুৎপ্রভ পীতবসন পতিত হওয়াতে যাহা বিচিত্রবর্ণ হইয়াছে, চঞ্চল গরুড়মুখ বিনির্গত সামগানে যাহার মহিমা প্রকাশিত হইতেছে, জগৎপতি বিষ্ণুর সেই পীবর জানুযুগল আমি স্মরণ করি। যাহা বিধাতা, যম ও কন্দর্পের আধার, ত্রিগুণাপ্রকৃতি

পীত ও বিচিত্র বসনরূপে যেখানে বাস করেন, জীবগণের আধার সংযুক্ত দুকূল যে স্থলে শোভা পায়, আমি সেই খগপৃষ্ঠস্থ ভগবান নারায়ণের কটিদেশ চিন্তা করি। যাহাতে ত্রিবলী শোভা পাইতেছে, যে স্থলে আবর্ত্ত সদৃশ নাভিসরোবরে ব্রহ্মার জন্মপদ্ম প্রস্ফুটিত, যে স্থানে নাড়ী নদী সমূহের রসদ্বার অন্ত্র-সিন্ধু উল্লসিত হইতেছে, যাহা এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের আধার, যাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমরাজী সুশোভিত রহিয়াছে, ভগবানের তাদৃশ শ্রীসম্পন্ন উদর আমি স্মরণ করি। কমলার কুচকুঙ্কুমে, হারে, কৌস্তুভ প্রভায় বিরাজমান, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, হরিচন্দনজাত কুসুম মালায় বিভূষিত, অতি মনোহর ভগবানের হৃৎপদ্ম আমি স্মরণ করি। যে বাহুযুগল সুবেশের আশ্রয়, বলয় অঙ্গদাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, যে বাহুযুগল দর্পান্ধ দৈত্যকুলের বিনাশ সাধন করিয়াছে, যে বাহু যুগল গদা ও সুদর্শন তেজে অরাতিকুল পরাভূত করিতেছে, ভগবানের সেই দৈত্যদলন দক্ষিণ বাহুযুগল আমি মনে মনে স্মরণ করি। মুররিপু বিষ্ণুর যে বামভুজদ্বয় করি-করোপম শ্যাম সুন্দর, শঙ্খপদ্ম বিভূষিত, যে ভুজদ্বয় মণিভূষণ সুশোভিত, যে হস্তের লোহিত অঙ্গুলী জানুস্পর্শ করিয়াছে, পদ্মালয়া লক্ষ্মীর প্রীতিপ্রদ, সেই মনোহর করযুগল আমি স্মরণ করি। অমল মৃণাল সদৃশ নির্ম্মল রেখাত্রয় চিহ্নিত, বনমালাসুশোভিত, মুক্তিমন্ত্রের রমণীয় ফলের বৃন্তস্বরূপ, পরম সুন্দর, ভগবানের সেই মুখপদ্ম-মৃণালরূপ কণ্ঠ আমি অনুক্ষণ ধ্যান করি। রক্তপদ্ম সদৃশ, রক্তাধরোষ্ঠে কমনীয়, সহাস দশন বিকাশ-বিকাসিত, বচনসুধাসমন্বিত, মনোপ্রীতিজনন, চঞ্চল নয়নপত্রে সুচিত্রিত, লোকরঞ্জন, সেই ভগবান নারায়ণের বদনকমল আমি অনুক্ষণ স্মরণ করি। যাহা হইতে মদনমহোৎসবের সৃষ্টি,—যাহা দেখিলে কমলার হৃদয়-

পদ্ম বিকসিত হয়, ভগবানের মুখপঙ্কজস্থিত সেই জ্রূপত্র আমি স্মরণ করি। কপোল-চুম্বিত মকরকুণ্ডল সুশোভিত দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ-মণ্ডলের প্রকাশক, চঞ্চল অলক চুম্বনে যাহার অগ্রভাগ আকুঞ্চিত, মণিময় কিরীট প্রান্ত সংলগ্ন, দেব দেব শ্রীহরির সেই শ্রুতিযুগল আমি স্মরণ করি।

সুচিত্র তিলক সুশোভিত, কমনীয় কামিনীর লোচন সদৃশ, সুরভিত গোরোচনা-রচিত অলকা-লাঞ্ছিত, ব্রহ্মের একমাত্র আশ্রয়, মণিময় কিরীট সুশোভিত, সর্ব্বজন মনোনয়নহারী, সেই পরাৎপর হরির সুপ্রশস্ত ললাটদেশ আমি স্মরণ করি। নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম শোভিত, কুটিল, দীর্ঘ, কমলার প্রীতিপ্রদ, পবন প্রকম্পিত, কৃষ্ণমেঘ সদৃশ রুচির, শ্রীবাসুদেবের চিকুরজাল আমি হৃদ্‌পদ্ম মধ্যে স্মরণ করি।

যাঁহার শরীর জলদ সদৃশ, নয়ন দ্বয় চন্দ্র সূর্য্য স্বরূপ, ভ্রূযুগল ইন্দ্রধনু সদৃশ, যাঁহার নাসিকা দীর্ঘ, বিদ্যুৎ সদৃশ, অনিলান্দোলিত পীত বসন, ঈদৃশ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি হরির শ্রীপাদপদ্ম আমি ধ্যান করি। আর তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করি।

আমি অতি দীন, বেদবিহিত সেবাদি বিহীন, আমার শরীর পাপেতাপে পরিপূর্ণ, লোভাক্রান্ত, শোকমোহাদি মনোবেদনায় অভিভূত, হে বাসুদেব! কৃপাবলোকন করিয়া আমারে পরিত্রাণ করুন।

যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুর এই আদ্য ও মনোহর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ষোড়শ শ্লোক রূপ পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া স্তব ও নমস্কার করিবে, সেই সকল বিধিজ্ঞ ব্যক্তি শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে।

পদ্মা কথিত, শিবপ্রোক্ত এই স্তব অতীব পবিত্র, ধন্য, যশস্কর,

আয়ুস্কর, স্বর্গফলপ্রদ, পরম শান্তিপ্রদ। এই স্তব ইহ পরলোকে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ। যে সকল মহাত্মা এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহারা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

লিবিংষ্টোন।

অধ্যবসায় যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ, তাহা পৃথিবীর উন্নতি-কামুক মহানুভবেরাই যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সৌভাগ্য ও পূর্ব্ব গৌরব এক মাত্র অবিরাম অধ্যবসায়ের ফল। এখন আমরা সে গৌরবের সহিত আধুনিক অপরাপর সুসভ্য জাতির অধ্যবসায়ের তুলনা করিতে পারি না। আমেরিকার যে সৌভাগ্য, ইউরোপ তাহাতে আজিও বঞ্চিত,—আর্য্যভূমির যে সৌভাগ্য, আমেরিকা আজিও তাহাতে বঞ্চিত, তথাপি ইউরোপের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যের মূল যে অধ্যবসায়, তাহা এক প্রকারে এখন জগতের শিক্ষাস্থল হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রসাদে ইহাঁরা এখন বিমলানন্দ লাভ করিতেছেন।—একটী একটী সূত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে ইহাঁদের যতদূর শ্রম ও যতদূর যত্ন, মহারত্ন সংগ্রহ করিতেও সাধারণ লোকের তাদৃশ শ্রম ও যত্ন অলক্ষিত। অধিক কি, প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে ইউরোপ এখন জগতের রাজা অথবা দেবতা। কিছুকাল পূর্ব্বে যাঁহারা ভয়াবহ হইবার নিমিত্ত নানাবিধ বর্ণে স্ব স্ব শরীর চিত্রিত করিতেন, এখন তাঁহারা

সহাস আননে প্রকৃতিকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিতেছেন। সেই চিত্র সাধনার্থ জীবন বিসর্জ্জন দিতেও অপরাঙ্মুখ। বর্ত্তমান সময়ে ডাক্তার লিবিংষ্টোন তাহার নূতন ও উজ্জ্বল সাক্ষী।

আফ্রিকার নীল নদ স্মরণাতীত কালাবধি অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে,—কিন্তু কোথায় ইহার জন্ম, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রাচীন মিসর পরাজিত, অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণকারীরা নিস্তব্ধ। কেহ কেহ বলিতেন, চন্দ্রপর্ব্বত উহার উৎপত্তি স্থান, কেহ কেহ নূতন স্থির করিয়াছিলেন, নয়ানজা হ্রদ উহার মূল। ডাক্তার লিবিংষ্টোন স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশ, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নীলের জনক উদ্দেশে বহির্গত হইয়াছিলেন। কত দিন, কত কষ্টে, তাঁহার জীবন যাপিত হইয়াছে, ব্রিখণ্ডের সমাচারপত্র লেখকেরা অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার নিরাশ্রয় পরিবারের প্রতিপালনার্থ চাঁদা হইয়াছে; কিন্তু তখনও তিনি বাঁচিয়াছিলেন। অবশেষে অবলম্বিত কার্য্য সিদ্ধ করিয়া এই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। অধ্যবসায়ের এমন আত্মাহুতি মূলক উদাহরণ জগতের শিক্ষাস্থল হউক, এবং ডাক্তার লিবিংষ্টোনের পবিত্র আত্মা নিরাময়ে দ্বিতীয় জগতে শান্তি উপভোগ করুক, এই আমাদের অভিনন্দন।

পিপীলিকা।

ইসাইটম পিপীলিকারা কোন গ্রামের সন্নিহিত হইলে সর্ব্বাগ্রে চর পাঠায়। চরেরা গিয়া অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ দিলে পঙ্গপালের ন্যায় সকলে গিয়া গ্রাম আক্রমণ করে। গৃহস্থ পরিজনেরা পোষা পশু পক্ষী লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করেন। বাটীতে পৌছিয়া পিপীলিকারা পোকা মাকড় ইঁদুর বিড়াল যাহা পায় সমস্ত মারিয়া ফেলে। পরে উহাদিগের শব ও অপর খাদ্যদ্রব্য সমস্ত বহন করিয়া লইয়া যায়। ভার বুঝিয়া সামগ্রী বহনে বাহক নিযুক্ত করে। কেহ কেহ সম্মুখ ধরিয়া টানে, কেহ কেহবা পশ্চাৎ দিক্ হইতে ঠেলা-মারিতে থাকে। অবশেষে সমস্ত লুট সংগ্রহ হইলে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করে। ইহাদিগের বৃত্তান্ত-লেখক কহেন যে, যুদ্ধযাত্রাকাল ভিন্ন অপর সময়ে ইহারা বৃক্ষছায়ায় আমোদ প্রমোদে কাল হরণ করিয়া থাকে।

নবাব পিপীলিকা।

এই জাতীয় পিপীলিকারা কোন শ্রমের কার্য্যই করে না। ইহাদিগের বহুসংখ্যক ভৃত্য আছে, তাহারাই সকল প্রকার কার্য্য করে। প্রভুর গাত্র চাটা ও ঝাড়া, পৃষ্ঠে করিয়া বহন করা, আহার মুখে তুলিয়া দেওয়া ও সন্তানসন্ততির লালনপালন করা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই সেই সেবকেরা নির্ব্বাহ করে। সর্ব্ব বিধায়ে ইহাদিগের নবাবী চাল, সেই নিমিত্তই ইহাদিগের নবাব উপাধি দেওয়া হইয়াছে। একদা কোন সাহেব একটী কাচের বাক্স মধ্যে প্রচুর খাদ্য সহ কয়েকটী নবাব পিপীলিকা ও উহাদের শাবককে আবদ্ধ করেন। তাহারা

এত শ্রমকাতর যে, সন্তানগণকে যত্ন করা দূরে থাকুক, আপনারা স্বয়ং মুখে করিয়া আহার করিতেও অশক্ত, সুতরাং কতকগুলি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। অবশেষে সাহেব পরীক্ষার্থ কতকগুলি গোলাম পিপীলিকাকে তথায় ছাড়িয়া দিলেন। উহারা যত্ন করাতে নবাবদিগের অণ্ড সমস্ত ফুটিল এবং কর্ত্তাদিগের মুখে খাদ্য তুলিয়া দেওয়াতে সে যাত্রা তাহারা রক্ষা পাইল। নবাবেরা কেবল এক কর্ম্মে পটু। ইহারা যুদ্ধ করিতে বিলক্ষণ তৎপর। শত্রুকে পরাভব করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের অস্ফুট ডিম্ব সকল আপনাদিগের দুর্গে আনয়ন করিতে সক্ষম। নবাবেরা দলবদ্ধ হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শত্রুদিগের দুর্গ আক্রমণ করে। বিপক্ষকে পরাজিত করিতে পারিলে তাহাদিগের ডিম্বগুলি মুখে করিয়া আনে। কদাচিৎ দুর্ভাগ্য বশত জয় যুক্ত হইতে না পারিলে ইহাদিগের অপমানের একশেষ হয়। গোলামেরা মুখ ভারি করিয়া থাকে, আহ্লাদ সহকারে অভ্যর্থনা করে না, এবং কিছু ক্ষণ পর্য্যন্ত নগরে প্রবেশ করিতেও দেয় না। কিন্তু জয়ী হইলে দাসদিগের আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না, অগ্রসর হইয়া প্রভুদিগের অভ্যর্থনা করে, মুখে যথেষ্ট পরিমাণে আহার তুলিয়া দেয় এবং শত্রুপক্ষের অণ্ডগুলি দুর্গ মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে। ডিম্ব ফুটিলে প্রথম হইতেই সেই সকল শাবকেরা জানিতে পারে যে, উচ্চ বর্ণের সেবার নিমিত্তই তাহাদিগের জন্ম, সুতরাং বিনা কষ্টে চিরকালই দাসবৎ রহে। দাসেরা সাংসারিক যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র জীব বটে, কিন্তু ইহাদিগের বুদ্ধির কি আশ্চর্য্য কৌশল! দেখুন কৃষকদিগের ন্যায় ইহারা যথাকালে বীজ বপন করে, শস্য ভিন্ন অপর কোন ঘাস উৎপন্ন হইলে তাহা

কর্ত্তন করিয়া ফেলে, পক্ক হইলেই বিচিগুলি কাটিয়া গৃহজাত করে এবং যথাসময়ে বিচালি নাড়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া রাখে। কেবল একবার নহে বর্ষে বর্ষে পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়া থাকে। শস্যগুলি রসা ধরিলে সুদিনে সমস্ত বাহিরে আনিয়া শুকাইয়া লয়, কেবল কলালগুলি ফেলিয়া দেয়। আবার জাতিভেদ, ব্যবসায় ভেদ, আপন সাহায্যার্থ বন্যজীবকে পোষা, ক্ষীণদিগকে দাস করা, এ সমস্ত বিষয় যে কেবল মানব জ্ঞানের ফল, এমত নহে, কীট পতঙ্গেও আছে। দিল্লীর লুঠ কালীন সম্রাট মহম্মদ সাহা পলাই-বার উদ্দেশে সিংহাসন হইতে নামিয়া, সম্মুখে জুতা ফিরাইয়া দিবার লোক উপস্থিত না দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আসন পরিগ্রহণ করেন এবং শেষে বন্দী হন। কিন্তু নবাব পিপীলিকাদের সম্মুখে আহার অথচ গোলাম উপস্থিত নাই বলিয়া, অনাহারে প্রাণ ত্যাগ, ইহাতে কি অধিক ওমরাই চাল প্রদর্শিত হয় না? এবার এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। এরূপ প্রবন্ধ পাঠ করিতে পাঠকবর্গ যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিতে যত্ন করিব!

মদালসা।

রাজকুমার নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত দর্শনে মনে মনে সাতিশয় চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। মন ক্রমশই অপ্রসন্ন, স্ফূর্ত্তি শূন্য ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অবশ্যই কোন না কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, নতুবা সহসা এরূপ দুর্লক্ষণ সকল লক্ষিত হইবে কেন? আমার চিত্ত অত্যন্ত দৃঢ় ও গাম্ভীর্য্য যুক্ত হইয়াও যখন এরূপ আকুল ভাবাপন্ন হইতেছে, তখন যে রাজধানীতে কোনরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ বা অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও মনকে সুস্থির করিতে পারিতেছি না। বুঝি প্রিয়তমা মদালসারই কোন অমঙ্গল হইয়াছে, নতুবা আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে কেন? অথবা মহর্ষি যে রত্নমালা প্রত্যর্পণ করিলেন না,—কহিলেন, তোমার আলয়ে দেখিতে পাইবে, উহা কি বঞ্চনা বাক্য? ঐকথা বলিয়া কি তিনি তাহা হস্তগত করিলেন? সেই মহামূল্য বস্তু হারাইয়া মহতী ক্ষতি হইল বলিয়াই কি মন চঞ্চল ও দুর্নিমিত্ত দর্শন হইতেছে? না, তাহাতে আমার প্রশস্ত চিত্ত কখনই এত ব্যাকুল হইতে পারে না। সামান্য রত্নহারের নিমিত্ত যে আমার মন কাতর হইবে, ইহার সম্ভাবনাই নাই। অতএব নিশ্চিত বোধ হইতেছে, কোনরূপ বিষম বিপত্তি ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। যুবরাজ ঋতধ্বজ মনে মনে এইরূপ ও অন্যান্য নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে অতিবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজকুমার রাজপুরীতে উপনীত হইয়া অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি যখন নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন এরূপ বেগে আসিয়াছিলেন যে, কেহই

তাঁহাকে রাজকুমার ঋতধ্বজ বলিয়া চিনিতে পারে নাই। কিন্তু যখন অশ্বপরিহার পূর্ব্বক পাদচারে রাজভবনে প্রবেশ করেন, তখন রাজপুরের সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং কেহই তাঁহাকে অবশ্য কর্ত্তব্য নমস্কার বা উচিত সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজকুমারও মদালসার দর্শন লালসায় এরূপ উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, প্রবেশ সময়ে অমাত্য বা ভৃত্যবর্গের সহিত কোন কথা না কহিয়া একবারে পিতৃচরণসমীপে উপনীত হইলেন। মহারাজ শত্রুজিৎ প্রিয়তম পুত্রের অভাবিত সমাগম দেখিয়া প্রথম ক্ষণে যার পর নাই বিস্ময়ান্বিত হইলেন, পরক্ষণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাঁহার সহিত গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তিনি প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কপটী মুনির আগমন হইতে মৃত্যুসংবাদ দান পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজমহিষী ভৃত্যমুখে প্রাণসম পুত্রের অসম্ভাবিত আগমন সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সতৃষ্ণনয়নে পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবা মাত্র তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি অমঙ্গল দূর হউক, বলিয়া পুত্রের কল্যাণার্থ নানাবিধ মঙ্গলসূচক বাক্য কহিতে লাগিলেন। তখন মদালসার মরণজনিত শোকানল মহারাজ ও রাজমহিষীর মনে প্রবল বেগে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। শত্রুজিৎ ভাবিতে লাগিলেন, দুরাত্মা ভণ্ড তপস্বী অথবা মুনিবেশধারী কপটাচারী শত্রু কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়া গেল! নৃশংস অবলীলাক্রমে একটী নির্দোষ পতিব্রতা রমণীর প্রাণ বধ করিল! হায়! পাপাত্মা নিষ্ঠুরদিগের কিছুই অসাধ্য নাই! ঋতধ্বজ-জননী স্নুষাশোকে, হা মদালসে! তুমি বৃথা প্রাণ

পরিত্যাগ করিয়াছ! অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র তুমি যাহার নিমিত্ত প্রাণধনে তৃণসম জ্ঞান করিয়া বিসর্জ্জন করিলে, এই তোমার সেই হৃদয়বল্লভ ভর্ত্তা অক্ষত শরীরে সমাগত হইয়াছেন, তুমি এখন কোথায় রহিয়াছ, দেখিতে পাইতেছ না। হায়! তোমার স্বর্ণ-লতিকার ন্যায় কোমল কলেবর ভস্মসাৎ হইয়া গেল! অহহ! এ কি ইন্দ্রজাল! না কোন দৈবী মায়া, কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না। মহারাজ! কি কারণে এরূপ ঘটনা হইল, তাহা কি আপনি জানিতে পারিয়াছেন? যদি জানিয়া থাকেন, তবে আমার সমক্ষে বর্ণন করিয়া সুস্থির করুন। আমি যারপর নাই আকুল হইয়া পড়িয়াছি। মহারাজ কহিলেন, রাজ্ঞি! মদালসার শোকে আমিও এখন বিহ্বল হইয়াছি, চিত্ত প্রকৃতিস্থ নাই, সুতরাং কার্য্য কারণ ভাব কিছুই স্ফুরিত হইতেছে না। ক্ষণকাল পরে সকলই জানিতে পারিব।

রাজকুমার ঋতধ্বজ প্রাণসমা মদালসার মরণ সংবাদ শুনিয়া কিয়ৎকাল চিত্র পুতলির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইলে দেখিলেন, জনকজননী বধূশোকে অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন। তখন তিনি তৎকালোচিত সান্ত্বনা বাক্যে পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া ভণ্ড মুনির তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং কহিলেন, সে দুরাত্মা কদাচ ঋষি নহে, মায়াবী দৈত্য মুনিবেশ ধারণ করিয়া শত্রুতা সাধন করিয়া গিয়াছে সংশয় নাই। অতএব হে পিত! আপনি এক্ষণে সুস্থমনে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। মাতঃ! আপনিও নিজ অন্তঃপুরে গমন করুন আর বৃথা শোক তাপের প্রয়োজন নাই। অতীত দুঃখের আলোচনায় কষ্ট ভিন্ন কিছুমাত্র সুখ বা লাভ নাই। আমি এখন নিজ বাসভবনে

গমন করি। এই বলিয়া রাজকুমার স্বীয় অন্তঃপুরে চলিলেন। বয়স্য বর্গও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মদালসার অসন্নিধান বশতঃ উহা শ্রীভ্রষ্ট, বিবর্ণ ও অন্ধকারময় হইয়া রহিয়াছে। হে পিতঃ! তৎকালে পুরপ্রবেশে রাজকুমারের মনের ভাব যেরূপ হইয়া উঠিল, আমরা তাহা কি করিয়া ব্যক্ত করিব? তবে তাঁহারই মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তদনুরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন তিনি শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন, যখন প্রিয়তমা মদালসা সন্নিধানে আসিয়া পরম সমাদরে মধুর স্বরে প্রণয় সম্ভাষণ করিলেন না, তখন তাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি সকল একবারে স্খলিত হইয়া গেল। অনুচর বয়স্যবর্গ তাঁহার তাৎকালিক মুখশ্রী ও ভাবভঙ্গী দর্শনে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনিও এই মুহূর্ত্তে মদালসার পদবীর অনুসরণ করিবেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে শূন্য দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমার মৃত্যুশোক এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, তৎপ্রভাবে তাঁহার অসামান্য ধৈর্য্য ও অলৌকিক গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সমস্ত বীরোচিত গুণগ্রাম অন্তর্হিত হইয়া গেল। যখন প্রশস্ত কাষ্ঠখণ্ড অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতে থাকে, তখন তাহার রসময় পদার্থ অপরাংশ দিয়া যেমন নিরন্তর নির্গত হয়, সেইরূপ শোকানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধীভূত হওয়াতে নয়ন দ্বার নিঃসৃত প্রভূত অশ্রুপ্রবাহ অনবরত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কণ্ঠরোধ হওয়াতে কিয়ৎকাল কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে মূর্চ্ছা যেন তাঁহার তাদৃশ দশা দর্শনে দয়াবতী হইয়া তাঁহাকে একবারে অচেতন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে বয়স্যগণ হাহাকার করিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিলেন, এবং বিস্তর চেষ্টা দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। নৃপকুমার

তখন চেতনার সঞ্চারে প্রাণবল্লভা মদালসার মোহিনী মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং ধরাতলে নিপতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সহচরগণ তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্ত কতই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন নৃপকুমার ঋতধ্বজ হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা প্রিয়তমে! হা পতিপ্রাণা মদালসে! তুমি আমার অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণ মাত্র জীবন বিসর্জ্জন করিলে, কিন্তু তোমার মরণবার্ত্তা শুনিয়া এখনও আমি জীবিত রহিয়াছি! অহো! পুরুষ জাতির হৃদয় কি কঠোর! হা কঠিন প্রাণ! আর কতক্ষণ এরূপ সন্তাপানলে দগ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? জানিলাম, আমার হৃদয় পাষাণ বা বজ্র অপেক্ষাও কঠিনতর। হায়! আমি কি কৃতঘ্ন! যিনি আমার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ মাত্র সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই অমূল্য প্রাণধন তৃণসম তুচ্ছজ্ঞান করিয়া প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা ও পাতিব্রত্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন, আমি তাঁহার নিমিত্ত কি করিলাম! এখনও যে মদালসার অদর্শনে এই দেহভার বহন করিতেছি, ইহাতেই আমার যারপর নাই কৃতঘ্নতা প্রকাশিত হইতেছে! প্রিয়তমা মদালসা যে জীবিতাবস্থায় আমাকে প্রাণাধিক বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহাই সত্য। আর আমি যে তাঁহার প্রতি ঐ রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতাম, সে কেবল কপটজাল মাত্র। হা কৃতঘ্ন প্রাণ! আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? আমি নিশ্চিত জানি, তোমাকেও মদালসার অনুসরণ করিতে হইবে। তুমি কখনই তাদৃশ ধনে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারিবে না, তবে কেন বৃথা কলঙ্কভাগী হইতেছ? উত্তর কালে লোকে কহিবে, পতিপরায়ণা মদালসার অদর্শনেও ঋতধ্বজের দেহে প্রাণ ক্ষণমাত্র

অবস্থান করিয়াছিল, এ কলঙ্ক অতীব দুষ্পরিহর ও অত্যন্ত দুঃসহ। হা প্রাণাধিকে প্রিয়তমে! কেন তুমি আমারে আশ্রয় করিয়াছিলে? তোমার এরূপে অকাল মৃত্যু ঘটনা হইবে বলিয়াই কি বিধাতা আমার সহিত পরিণয় সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছিলেন? জানি না, আমি কত পাপই করিয়াছিলাম, নতুবা বিধাতা আমারে তাদৃশ রত্ন প্রদান করিয়া হরণ করিবেন কেন? হা সখি কুণ্ডলে! তুমি প্রাণসমা মদালসাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে বৈধব্যোচিত ধর্ম্মসাধনে গমন করিয়াছ, কিন্তু জানিতে পারিতেছ না যে, তোমার প্রিয় বয়স্যা আমারই নিমিত্ত প্রাণধনে বঞ্চিত হইয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। হায়! আমার বীরতায় ধিক্! জীবনেও ধিক্! যখন পতিপ্রাণা মদালসার বিরহ সহ্য করিয়া রহিলাম, এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, তখন আমার শূরতা কোথায়? ক্ষত্রজাতিসুলভ ওজস্বিতাই বা কোথায়? আমি নিশ্চিত বুঝিলাম, অকৃত্রিম প্রণয় অতি বিরল, তাহা সকলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় না। মাদৃশ পুরুষেরা নিতান্ত ধূর্ত্ত ও অত্যন্ত কপটী। নতুবা তাদৃশী পতিপরায়ণা কামিনীর ঈদৃশ মরণে জীবন রাখিব কেন?

প্রিয় সখি কুণ্ডলে! কেন তুমি আমারে সে অমূল্য নিধি দেখাইয়াছিলে?—কেন তুমি আমারে মদালসা দান করিয়াছিলে।—তোমার কৃত উপকারে যখন আমি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আপনাকে সুখী মনে করিয়াছিলাম; আজ আমি মদালসা বিহীনে গৃহশূন্য, আশ্রয়শূন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় হইয়াছি! তখন আমি তোমারে পরম উপকারিণী মনে করিয়াছিলাম, আজি আমার মনে হইতেছে, তুমি, যদি আমার সে উপকার না করিতে,—যদি তুমি আমারে

মদালসারত্ন মিলাইয়া না দিতে, তাহা হইলে আমার যথার্থ উপকার করা হইত। মদালসার সহিত পরিণয় না হইলেই আমার ভাল হইত। কুণ্ডলে! তুমি কি জানিতে না যে, আমি মহাপাষণ্ড রাক্ষস, নর কলেবর ধারণ করিয়া পৃথিবীর একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজকুল কলঙ্কিত করিতেছি! তুমি কি জানিতেনা যে, আমার হৃদয় লৌহবজ্র অপেক্ষাও কঠিন! ওঃ! মদালসা নাই! আমি বাঁচিয়া আছি! আবার সাধুশীলা কুণ্ডলারে তিরস্কার করিতেছি! আমি কি পাপিষ্ঠ, নরাধম, হে ধর্ম্মশীলে! তুমি আমারে ক্ষমা করিও না! হে প্রিয়ে মদালসে!—হা জীবিতেশ্বরি! তুমি নাই! আমি আছি?—মিথ্যা কথা।—আমি নাই, তুমি শুনিয়াছিলে, আমি নাই!—এখন তুমি কোথায়?—কতদূর গিয়াছ?—আমি আছি, ভুলিয়া গিয়াছ?—না,—ভুলিও না,—যাইও না,—দাঁড়াও,—এখনি এই আমি,—তোমার অকৃতজ্ঞ ঋতধ্বজ,—এই আমি এখনি তোমার অনুসরণ করিব!

সুধীবর রাজকুমার এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে অশ্রু মার্জ্জন পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সেই মৃগলোচনা মদালসা আমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে আমিও যদি তাঁহার নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জন করি, তাহাতে তাঁহার কি উপকার হইবে? কিছু লাভ হইবে না, বরং যদি আজীবন অন্য নারীর অঙ্গস্পর্শ না করিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক স্বকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে দিন যাপন করিতে পারি, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ গৌরব আছে, তাহাই তাঁহার পক্ষে শ্লাঘ্য, আমারও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। বিশেষতঃ ভর্ত্তা যদি অন্য রমণীর মুখাবলোকন না করে, যোষিদ্গণের পক্ষে তদপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর কিছুই নাই।

আর এখন তাঁহার উদ্দেশে নিরন্তর রোদন করিবারই বা ফল কি? যাহা ঘটিয়াছে, তাহার অন্যথা করিতে কাহারও সাধ্য নাই, সুতরাং অপ্রতিবিধেয় বিষয়ে অজ্ঞ পুরুষের ন্যায় বৃথা শোক তাপ প্রকাশ করাও মাদৃশ বীর পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। উহাতে কেবল শত্রুদিগের নিকট পরিভবাস্পদ হইতে হয়। বিশেষতঃ যাবৎ পিতা মাতা জীবিত থাকিবেন, তাবৎ তাঁহাদিগের শুশ্রূষা ও অবশিষ্ট শত্রুগণের বিনাশ সাধন করিতে হইবে। দুরাচার দৈত্যেরা সম্মুখ সমরে অক্ষম হইয়া কপটজাল বিস্তার পূর্ব্বক কাপুরুষের ন্যায় আমাকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত কৌশলে মদালসাকে বিনাশ করিয়াছে, এক্ষণে যদি আমি মদালসার শোকে অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে জীবন ত্যাগে প্রবৃত্ত হই, অথবা উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াই, তাহাতে অরিগণের অভীষ্টসিদ্ধি ভিন্ন আর কোনরূপ ফল নাই। পূর্ব্বে আমি প্রাণ মন প্রাণবল্লভা মদালসার করে সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং প্রাণের প্রতি আমার আর প্রভুতা নাই, ইহা নিতান্তই তদায়ত্ত, যতদিন এই দেহে জীবন থাকিবে, তাবৎ সেই প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমার রূপমাধুরী চিন্তা ও গুণগান করিয়া যতদূর পারি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিব। আর প্রাণ পরিত্যাগে প্রিয়তমা মদালসার কোন উপকার হউক বা না হউক, আমি নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করিতাম, যখন ভাবিলাম, যিনি আমার অকুশল সংবাদ মাত্র শুনিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত আমার প্রাণ পরিত্যাগ করা অতি সামান্য কথা, প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও আমি তাঁহার ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইব না, অতএব এখন স্থির করিলাম, প্রিয়তমার সন্তোষের নিমিত্ত আজ হইতে অন্য রমণীর মুখাবলোকন করিব না। এজন্মে আর অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া পাপপঙ্কে বিলীন হইব না।

পূর্ণ-শশী।

আমি উড়িতে পারি, আমার জগৎ সন্দর্শনের আক্ষেপ নাই। তুষারাবৃত, কুসুমশোভিত, স্বভাবসজ্জিত হিমালয় পর্ব্বত দর্শন করিয়াছি,—পার্ব্বতীনাথের পর্ব্বত-নিবাসে পার্ব্বতীসহ গিরীশ-চন্দ্রকে কৈলাস পর্ব্বতে দর্শন করিয়াছি, সুমেরু শিখরে, নীলাদ্রি-চূড়ায়,—বিন্ধ্যাচল স্তবকে, ধবল অচলে, কাঞ্চনশৃঙ্গে, স্বভাব-সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়াছি,—ভাগীরথীনীরে,—সাগরসঙ্গমে,—ভোগবতী প্রবাহে স্নানকেলি করিয়াছি, কোথাও আর এমন সুখ, এমন আনন্দ উপভোগ করি নাই,—পবিত্রতোয়া মন্দাকিনী বহুদিন আমারে দর্শন দেন নাই, তাঁহার সহাস আনন, রজতবক্ষ, প্রফুল্ল ঊর্ম্মি বহুদিন আমি সন্দর্শন করি নাই। আমি মহাপাতকিনী;—হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি পার্থিব বৈকুণ্ঠ কাশ্মীর উপত্যকায় সঞ্চরণ করিয়াছি, সুরবালা সদৃশ বিলাসিনীকুলের সহবাস করিয়াছি, কিছুতেই মনের সুখ ফিরাইয়া আনিতে পারি নাই। সকল শোভা, সকল আনন্দ, একত্র করিয়া ঠিক দিয়াছি,—সকল প্রমোদের সমষ্টি করিয়া স্তূপের উপর উপবেশন করিয়াছি, এক লহমার নন্দন-সুখ উপভোগ করিতে পারি নাই। জগতে তেমন সুখ নাই। তুলনা করিব ভাবিয়াছি, প্রমোদ কানন মনে হইয়াছে, অমনি কাঁদিয়া আকুলিনী হইয়াছি। হে গন্ধর্ব্বরাজ! তিলেক সদয় হউন,—স্বর্গ-দ্বার ছাড়িয়া একটীবার মুহূর্ত্তমাত্র সরুন, আমি নন্দন দর্শন করি।

প্রহরী গন্ধর্ব্ব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সুরমালিকে! তুমি কি বল?—পাঠক মহাশয়! মনে রাখিবেন, পত্রিকার আখ্যায়িকার নায়িকার নাম সুরমালা। ইন্দ্রাণী আদর করিয়া তাহারে সুরমালিকা বলিতেন।—গন্ধর্ব্বপতি গম্ভীরভাবে কহিলেন, সুরমালে! যদি তুমি দেবধামের উপযুক্ত কোনো সুদুর্লভ উপহার আনিয়া দিতে পারো,

তবে দেবরাজ সদয় হইয়া তোমারে নন্দনবনে প্রবেশ করিতে দিবেন। তোমার সকল পাপ মোচন হইবে।

বিদ্যাধরী চিন্তা করিতে লাগিল। দেবধামের উপযুক্ত সুদুর্লভ উপহার।—সে অমূল্য পদার্থ কোথায় পাইব? পৃথিবীর কোন্ দেশে তেমন অমূল্য নিধি আছে?—সমস্ত ভূমণ্ডল আমি প্রদক্ষিণ করিয়াছি। যেখানে মনুষ্য আছে, তাহা আমি জানি,—যেখানে পশুরাজ সিংহ আছে, তাও আমি জানি,—যেখানে যূথপতি গজেন্দ্র বিচরণ করে, তাও আমি জানি,—যেখানে শশ, মৃগ, ময়ূর, কোকিল, শুক, আর কপোতেরা আছে, তাও জানি,—গভীর জলধিতলে মণি-মুক্তা লুকানো আছে, তাও আমি জানি,—দেবাসুরে সমুদ্রমন্থন কালে অমরেরা যেখানে অমৃত পাইয়াছিলেন, সেখানে এখন যে রত্ন আছে, তাও আমি জানি,—মনোহর শৈল শৃঙ্গে, আনন্দ প্রবাহিণী তরঙ্গিণীগর্ভে যে সকল মণিমরকত ঝক্‌মক্ করিতেছে, তাও আমি জানি,—নীলকান্ত, সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, সামন্তক, আর অয়স্কান্ত, এই পঞ্চ রত্নেরও বিরাজবাস জানি,—যে সকল নাগেন্দ্রের মাথায় মাণিক জ্বলে, তাও আমি জানি; বিনা শ্রমে সংগ্রহ করিতেও পারি; কিন্তু তাতে কি সুরলোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিব?

চক্ষু বুজিয়া ভাবিল,———

প্রথম।—ভা।

দ্বিতীয়।—র।

তৃতীয়।—ত।

চতুর্থ।—ব।

পঞ্চম।—র্ষ।

প্রথম উপহার।

আহা!—

কে দিবে দেখায়ে রাহা, কার কাছে যাইরে!
দেবের দুর্লভ নিধি, কার কাছে পাইরে!
কে করে এ উপকার, কে হবে সখা আমার,
দেবরত্ন উপহার,
কার কাছে চাইরে!

সদয় হবে কি বিধি, পাব কি সে মহানিধি,
ত্রিজগতে সে নিধি কি,
কারো কাছে নাইরে?

বিদ্যাধরী উড়িল।—এই গীত গাইতে গাইতে কামচারী বিদ্যাধরী নীচের দিকে নামিল।—উড়িয়া উড়িয়া কত দূরই যাইতেছে, অন্তরীক্ষ গতি—কামচারী কিন্নরী, তাহার গতি কে দেখিতে পায়?—যাইতে যাইতে ভারতবর্ষের প্রতি প্রথমেই তাহার চক্ষু পতিত হইল;—নামিতে লাগিল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পত্রিকা একটু থামিলেন।—যেন কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।—নিত্যকামীর ঐ গল্প ভাল লাগিতেছিল না। কেবল পত্রিকা বলিতেছেন, এই জন্য বসিয়া ছিলেন। গল্প শুনিতেছিলেন না;—পত্রিকা মুখ নাড়িতেছেন, হাত নাড়িতেছেন, এ দিক ও দিক চাহিতেছেন, তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিতেছেন, হাসিতেছেন, এক এক বার গম্ভীর, এক এক বার চঞ্চল হইতেছেন, দুল নড়িতেছে, অলকা উড়িতেছে, এই সকল দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহাকে নিস্তব্ধ

দেখিয়া হর্ষভরে কহিলেন, বেশ গল্প,—মস্ত গল্প! উঃ! অত কথা কহিতে তোমার বড় ক্লেশ হইয়াছে; চলো, বিশ্রাম করিবে চল! উঃ! অত কথাও মনে কোরে রেখেছিলে?—মস্ত গল্প!—বাঃ! বেশ গ—

পূর্ণ-শশী করতালি দিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করিলেন। নিত্যকামীর কথায় পত্রিকা উত্তর দিলেন না; পূর্ণ-শশীকে কহিলেন, দেখ শশি! আমাদের এই ভারতভূমি প্রকৃতি সতীর পরম আদরিণী তনয়া। ইহাঁর শরীরে সকল প্রকার অলঙ্কারই শোভা পাইয়াছে। আমরা আর কি বলিব, স্বর্গের বিদ্যাধরী ইহাঁর গুণ কীর্ত্তন করিয়াছে। আমি তাহার মুখে শুনি নাই, পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, বিদ্যাধরী বলিয়াছিল, ভারতক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। এখানে ভাস্বর ভাস্করের শুভ্র কিরণ, নিশানাথ শশধরের সুশীতল রশ্মিমালা, রজতময় গিরিশ্রেণী, কাঞ্চনবরণী স্রোতস্বতী, মনোহর পুষ্প-কানন, সুগন্ধি চন্দনকুঞ্জ, হাস্যমুখী কমলিনী,—প্রমোদিনী কুমুদিনী, সকলি সুন্দর,—সকলি রমণীয়; এমন শোভা জগতে নাই।

বিদ্যাধরী এই শোভা দর্শন করিল।—দর্শন করিয়াই শূন্য হইতে নীচে নামিতে লাগিল।—সিন্ধুকূলে উপনীত। অন্তরীক্ষে থাকিয়া এতক্ষণ যে শোভা দেখিতেছিল, এখানে সে শোভা বিবর্ণ।—মলিন,—বিষণ্ণ,—বিবর্ণ!—সিন্ধুনদের জল যেন রক্ত দিয়া মাখানো!—এক জন যবন বীরদর্পে ক্ষত্রপুরী লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, অন্তঃপুর ছারখার করিয়াছে, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বালিকা, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, বীর, সকলকেই অস্ত্রানলে দগ্ধ করিয়াছে!!—নিষ্ঠুর যবন অনলকে পূজা করে না,—হিন্দু ক্ষত্রিয় মৃত্যুকালেও হৃদয়ের শোণিত দিয়া হুতাশনের পূজা করিয়াছেন, কামিনীরা শিশুশোণিতের সহিত নিজ

শোণিত মিশাইয়া অগ্নিদেবের আর সিন্ধুনদের পূজা করিয়াছে, কিছু আর বাকী নাই! কেবল একজন বীর পুরুষ রুধিরাক্ত শরীরে অবশ হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার তূণে কেবল একটী মাত্র শর অবশিষ্ট। তিনি সেই শর নিক্ষেপ করিয়া জন্মভূমির নিকট শেষ বিদায় লইবেন, এই আকিঞ্চন। শর নিক্ষেপ করিলেন,—কম্পিত হস্তের লক্ষ্য,—লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গেল! দিগ্বিজয়ী মুসলমান হুহুঙ্কারে গর্জ্জন করিয়া কহিল, "থাক্ থাক্ পাষণ্ড! পাপের প্রতিফল ভোগ কর্!"—বলিতে বলিতে তীক্ষ্ণধার খড়্গে ঐ মাতৃভূমিপ্রিয়, স্ত্রীপুত্রবিয়োগী, স্বাধীনতা প্রত্যাশী, রাজ্যভ্রষ্ট বীরেন্দ্রের কণ্ঠচ্ছেদ করিল! সেই রক্তবিন্দু—পবিত্র রক্তবিন্দু ভূতলে পড়িতেছিল, কিন্নরী হায় হায় বলিয়া অঞ্জলি পাতিয়া ধরিল।—ধরিয়াই শূন্যপথে উড়িয়া গেল। সুরনন্দনের দ্বারে সেই সুরেন্দ্র রক্ষক দণ্ডায়মান। তিনি অগ্রগামী হইয়া দ্বার অবরোধ করিয়া কহিলেন, কি?

বিদ্যা।—দুর্লভ বস্তু আনিয়াছি।

প্রহরী।—দেবদুর্লভ?

বিদ্যা।—তাহাই।

প্রহরী।—কি?

বিদ্যা।—এক ফোঁটা রক্ত।

প্রহরী।—এক ফোঁটা রক্ত দেবদুর্লভ কিসে?

বিদ্যা।—স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন। জন্মভূমি রক্ষার শেষ চেষ্টা। বংশ নাশ, রাজ্য নাশের প্রায়শ্চিত্ত। ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজার কণ্ঠে যবন খড়্গের শেষ নিদর্শন।

প্রহরী গন্ধর্ব্ব বিস্মিত হইলেন;—কহিলেন, দুর্লভ বস্তু বটে,

কিন্তু ইহাতেও দেবরাজ তুষ্ট হইবেন না। ইহা অপেক্ষাও দুর্লভ রত্ন আনিতে হইবে। দেখিতেছ না, এই প্রকাণ্ড স্ফাটিক দ্বার একটু মাত্রও নড়িতেছে না।

বিদ্যাধরী কাঁদিল।—কাঁদিয়া বলিল, গন্ধর্ব্বরাজ! ভারতবর্ষ আমার বৈকুণ্ঠধাম,—সেখানকার স্বাধীনতার শেষ নিদর্শন শোণিত-বিন্দু দেবদুর্লভ হইল না,—বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। আমি এখন নাচারে পড়িয়াছি, আবার আমারে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে হইল। দেখি দেখি, উহা অপেক্ষা অমূল্যরত্ন আর কোথাও আছে কিনা,—আর কোথাও পাই কিনা?—এই কথা বলিয়া কাতরা বিদ্যাধরী পুনরায় উড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় উপহার।

মিসরের চন্দ্রপর্ব্বত জগৎপ্রসিদ্ধ। পৌরাণিকেরা অনুমান করেন, ঐ গিরিমূলে অনুদ্দিষ্টমূল নীলনদের জন্ম।—চন্দ্রশিখর সত্য সত্য নীলের পিতা কিনা, কে জানে?—আমি জানি না। আসে পাশে পঙ্কিল জলাশয়ে পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কহিল, আমরা জানিনা। তবে আর কাহারে জিজ্ঞাসা করিব?—কাহারেও না।—একা আমি দেখিব, এই স্থান সত্য সত্য সুখস্থান কিনা? বিদ্যাধরী এই খানে আসিয়াছে। সে আমারে বলিবে, এখানে দেবদুর্লভ বস্তু আছে কি না?

বিদ্যাধরী নামিল।— সম্মুখে গোলাপকুঞ্জ।—সুগন্ধে আমোদিত গোলাপবন।—মধুকরেরা ঝঙ্কার করিতেছে, মৃদু বাতাস বালকের মত খেলা করিতেছে, পবন দেব প্রাচীন ঋষি হইয়াও এখানে আজ শিশু সাজিয়াছেন।—কুঞ্জের এক নির্জ্জন প্রদেশে একটী হ্রদের

ধারে একজন মুমূর্ষু যুবা শয়ন করিয়া আছে। হাসিতেছে না, কথা কহিতেছে না,—হাতমুখ নাড়িতেছে না,—কেবল স্থির নেত্রে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে।—এক দিকেই কাতর নয়নে চাহিয়া আছে।—থাকিয়া থাকিয়া মৃত্যুযাতনায় অস্ফুট রব করিতেছে।—বিদ্যাধরী গুপ্তভাবে থাকিয়া তাহা দেখিল।—উভয়ের চক্ষে পলক নাই।

যুবা পরম সুন্দর। আহা! এমন সুন্দর যুবা এখানে এ দশায় কেন?—মরিতে আসিয়াছে?—কেন মরিবে?—আহা! এর কি কেউ নাই?—কি দুঃখে মরিবে?—কেহ দেখিতে নাই,—কেহ কাঁদিতে নাই,—তপ্ত হৃদয়ে এক বিন্দু জল দেয়, এমন একটী প্রাণীও কাছে নাই! আহা! উহার হৃদয়ে এমন কি অনল জ্বলিতেছে?—কে জানে?—জল দিলে কি জুড়াইবে?—কি বলিতে পারি?—উহার চক্ষের নিকটে ঐ যে কেমন সুন্দর ফোয়ারাতে, কেমন সুন্দর হ্রদহৃদয়ে, কেমন সুন্দর সুশীতল সলিল বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতেছে, উহার এক অঞ্জলি হৃদয়ে ছিটাইলে কি সুস্থ হয়?—কি বলিতে পারি?—বিদ্যাধরী এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ উপবনের পশ্চিম কুঞ্জ ভেদ করিয়া বিদ্যুতের উদয় হইল!—বিদ্যাধরী চমকিয়া উঠিল;—ভাবিল, এ বিদ্যুৎ নয়,—স্বর্গের দূতী!—ঐ যুবার আত্মাকে লইতে আসিয়াছে! এখনি লইয়া যাইবে!—আহা! এইবার উহার আত্মা স্বস্থানে গিয়া জুড়াইবে!

চক্ষের নিমেষে সেই তেজোময়ী মূর্ত্তি ঐ ধূলিশায়ী যুবার নিকটে দৌড়িয়া গেল।—কোনো দিকে চাহিল না, শশব্যস্তে তৃণলুণ্ঠিত যুবার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া চীৎকার স্বরে কহিল,—“না—না,—তোমার চন্দ্রমুখ ফিরাইও না;—আমার দিক হইতে তোমার ও প্রিয় বদন ফিরাইও না!” এই কথা বলিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল।—

যুবার অবসন্ন মস্তকটী আপনার উরুদেশে স্থাপন করিয়া এক দৃষ্টে মুখ পানে চাহিল,—চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া তাহার মুখে পড়িল।

বিদ্যাধরী তখন দেখিল, বিদ্যুৎ নয়,—স্বর্গের দূতী নয়,—নর-সুন্দরী;—সুরসুন্দরীর চেয়েও রূপবতী মানবী কামিনী।—রূপে বন আলো হইল। যৌবনের ছটায় মুমূর্ষু পথিকের কান্তিশূন্য মলিন মুখ যেন দীপ্তি পাইতে লাগিল। কিন্তু কামিনী উন্মাদিনী। বিনোদ মুখে হাসি নাই, বিনোদ মস্তকের কেশগুলি আলু থালু, দুই পাশ দিয়া অলকাগুচ্ছ আকুল ভাবে মুখের অর্দ্ধেকটুকু ঢাকা দিয়াছে, যেন পূর্ণ-শশীর উপর কৃষ্টমেঘ ভাসিতেছে! অঙ্গে অলঙ্কার শ্রীভ্রষ্ট,—বসন অযত্নে—অলজ্জায় শিথিল,—পদ্মচক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রু! অথচ রূপে বন আলো করিয়াছে। বিদ্যাধরী এই ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া অবাক হইল।

কামিনী অতি যত্নে সজল নয়নে যুবার মুখখানি সোজা করিয়া ধরিতেছেন, অবশ মস্তক আবার লুটাইয়া পড়িতেছে!—আবার তুলিতেছেন, আবার পড়িয়া যাইতেছে! আবার তুলিয়া করুণস্বরে বলিতেছেন, "চাও!—আমার পানে চাও!—ফেরো! একটী বার আমার দিকে ফেরো!—কেন?—চিনিতে পারিতেছ না?—পারিবে।—চাও! একটীবার চাও।"—বলেন আর কাঁদেন,—বলিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। আবার বলিলেন,—"কেন?—আমি কি তোমার নই?—কেন?—আমি তোমারি!—" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার কহিলেন, "যাইবে?—কেন যাইবে?—কোথায় যাইবে?—তুমি আমার হৃদয় আলো করিয়াছ,—তুমি গেলেই রজনী হইবে;—সে রাত্রি লইয়া কি করিব?"

বসন্তে বিরহিণী।

কেন হইল এমন!
সদা হুহু করে মন,   পুড়িছে পোড়া জীবন,
কানন সমান মনে হতেছে ভবন!
কেন হইল এমন!

—

আছে সেই ত সকল।
সেই ছাদেরি উপর,   বসেছি সন্ধ্যার পর,
সে আকাশে সেই শশী সেই তারাদল।
আছে সেই ত সকল।

—

তবে কেন পোড়ে মন!
সেই বাড়ী সেই ঘর,   সে শ্বশুর সে দেবর,
ধীরে ধীরে বহে সেই মলয় পবন
তবে কেন পোড়ে মন।

যেন সকলি আকাশ।

দেখিতেছি গাছ পালা, বাড়ীঘর দেবশালা,

চখে দেখিতেছি বটে, মনে অপ্রকাশ।

যেন সকলি আকাশ।

—

হেরি সকলি আঁধার।

উঠেছে ত শশী তারা, তবু যেন দিশা হারা,

চিনিতে পারি না কিছু কিবা কিবাকার,

হেরি সকলি আঁধার।

—

একি হইল গো মোর!

দাঁড়াইলে মাতা ঘোরে, চলিলে পা পড়ে সোরে,

নেশায় বিভোল যেন ঠিক্ নেশাখোর।

একি হইল গো মোর।

—

কিবা করিব এখন।

উড়ু উড়ু করে মন, কিছু না থাকে স্মরণ,

আমি যেন আমি নই আর কোন জন।

কি বা করিব এখন।

অবিরত অন্য মন।

যে যা বলে করি তাই, খেতে হয় তাই খ

কি করিনু কি খাইনু থাকে না স্মরণ।

অবিরত অন্য মন।

কেন কেন হেন হয়।

নাহি দেহে জ্বরজ্বালা, তথাচ কেমন জ্বালা,

কিছুতেই রুচি নাই সব বিষময়।

কেন কেন হেন হয়।

হল বোবার স্বপন।

প্রকাশ করিতে চাই, প্রকাশিতে যাই যাই,

কে যেন আসিয়া মুখে দেয় আবরণ।

হল বোবার স্বপন।

আর ঢাকা নাহি রয়।

দেখে মোর ভঙ্গিভাব, সকলে বুঝেছে ভাব,

ঠারে ঠোরে কত লোকে কত কথা কয়।

আর ঢাকা নাহি রয়।

ওই ডাকিল আবার।
বাজিল বাজ সমান, গেল গেল গেল প্রাণ,
কোথাও কিছুতে আর নাহিক নিস্তার।
ওই ডাকিল আবার।

কেন কেন হান শর।
পতি মোর এলে ঘরে, যত পার উচ্চস্বরে,
ডেকোরে এখন মোরে ক্ষম পিকবর।
কেন কেন হান শর।

যাও যাও উড়ে যাও
পতি যবে ছিল ঘরে, ডাকিতে মধুর স্বরে,
এবে কেন কটু ভাসে আমারে জ্বালাও
যাও যাও উড়ে যাও।

তুমি নরমে জ্বালাও।
নারী বিরহিণী হলে, ডাক পিক কত ছলে,
পুরুষের কাছে কই কখন না যাও।
তুমি নরমে জালাও।

কেন কেন সুধাকর।
পেয়ে একাকিনী সতী, হইল এমন মতি,
চুপে চুপে সতী অঙ্গে ছোঁয়াইছ কর।
কেন কেন সুধাকর।

তুমি পার হে সকল।
গুরুনারী যেই হরে, কিছুতে না ভয় করে,
অনাসে সতীর কাছে প্রকাশে সে বল
তুমি পার হে সকল।

আমি পতিরতা সতী।
পরপুরুষের কর, নহে মোর সুখ কর,
সরাও সরাও ত্বরা ওহে নিশাপতি!
আমি পতিরতা সতী।

কিবা অভাব তোমার।
সাতাশ রমণী যার, হেন মতি কেন তার,
রোহিণীর গলে দাও ও করের হার।
কিবা অভাব তোমার।

সতী কলঙ্কে ডরায়।

কলঙ্ক ভূষণ যার, কলঙ্কে কি ভয় তার,

তুমি হে কলঙ্কীশশী ভয় নাহি তায়।

সতী কলঙ্কে ডরায়।

সর সর পূর্ণ শশী

আর কারো কাছে যাও, রূপের ছটা দেখাও,

সতীর নয়নে তব দেহময় মসী।

সর সর পূর্ণ শশী।

বলি ওহে রতিপতি।

হইয়া সতীর পতি, কেমনে বধিবে সতী,

সুধাও দেখি হে গিয়া কি বলেন রতি।

বলি ওহে রতিপতি।

বধ কাহার পরাণ?

আমার নহে ত প্রাণ, তাহারে করেছি দান,

যার প্রাণ সে আসুক তবে হেন বাণ।

বধ কাহার পরাণ?

যদি বধিবে নিশ্চয়।
নাশিতে সতীর প্রাণ, নারিবে তোমার বাণ,
পার যদি হান বাজ তবেই ত হয়।
যদি বধিবে নিশ্চয়।

ভস্ম করে সতীপতি।
যিনিহে আমার পতি, তিনিও সতীর পতি,
না জানি তাহার কোপে কি হবে দুর্গতি।
ভস্ম করে সতীপতি।

বুঝি এলো সমাচার।
শুনি গিয়া ভাল করে, শুনিনু অস্ফুট স্বরে,
চড়কের দিনে পতি আসিবে আমার।
বুঝি এলো সমাচার।

প্রাণ রহিল নিশ্চয়।
জল আশে চাতকিনী, যাপিছে দিবা যামিনী,
তখনি অমনি হল জলদ উদয়।
প্রাণ রহিল নিশ্চয়।

হল ভাবনা সফল।

দারুণ বিরহানল, হইতে ছিল প্রবল,

আশানীরে সে অনল হইল শীতল।

হল ভাবনা সফল।

প্রেরিত কবিতা।

বর্ত্তমান সময়ে অন্তঃপুর-শিক্ষায় উৎসাহ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এ জন্য আমরা একটী ভদ্রকুলকামিনী-বিরচিত এই কবিতা দুটী নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

প্রভাত।

যামিনীর দর্প নাশি, তপন উদিত আসি,
হইলেন নীল নভস্তলে।
কুমুদ মলিন মুখী, হিমাংশু হইয়ে দুখী,
তারা সহ যান অস্তাচলে॥
দারিদ্র্য-দুঃখিত জনে, আদিত্যের আগমনে,
আনন্দের সলিলে ভাসিল।
রোগী শোকী অতি ক্ষীণ, নয়নে নিরখি দিন,
ম্লান মুখে হরষে হাসিল॥
ব্রহ্ম মূর্ত্তি দরশনে, সাধক আনন্দ মনে,
মহাযোগ সাধিতে বসিল।

প্রভাত হেরিয়া পাখী, আসন করিয়া শাখী,
যেন সাম গাইতে লাগিল ॥
রজনী-বিরহাগুনে, কাঁদিতেছে সকরুণে,
মহীরূহ অচল বলিয়া।
হৃদে ভাবি বিভাবরী, শিশিরের ছলা করি,
অশ্রু ফেলে বিরহে গলিয়া ॥
ছেলে বুড়ো আদি করি, সবে শয্যা পরিহরি,
নিজ নিজ কাজে মন দিল।
হেরি দিবসের শোভা, মধুকর মধুলোভা,
পদ্ম মধু খাইতে লাগিল ॥

শ্রীমতী ——

দ্বিতীয়।

জগদীশ্বরের প্রতি।

(অকারণ চোর সৃষ্টি।)

ওহে প্রভু জগদীশ ! জগত আধার !
কেন করিয়াছ সৃষ্টি চোর দুরাচার ॥
এ ভবে ভবেশ ! যদি চোর না রহিত,
অমরাবতীর তুল্য অবনী হইত ॥
চোরের ভয়েতে ধনি স্থির নাহি রয়,
চোরের ভয়েতে গৃহী সশঙ্ক হৃদয় ॥

তস্করের ভয়ে কেহ পরিয়ে ভূষণ,
সুখেতে করিতে নারে রজনী যাপন ॥
চোর লাগি কত শত সাধুর নন্দন,
নিগড় বন্ধন পরি হারান জীবন ॥
চোর লাগি ষাট্ হাজার সগর নন্দন,
কপিল মুনির কোপে ভস্মরাশি হন ॥
চোর লাগি রাহুগ্রস্ত রবি শশধর,
চোর লাগি অহল্যার শিলা কলেবর।
চোর লাগি এক বাণে বালীর মরণ,
চোব লাগি কর্ণ বীর ত্যজিল জীবন ॥
চোর লাগি সীতা সতী কত কষ্ট পান,
গর্ভবতী হয়ে সতী বনবাসে যান ॥
চোর পরিবাদে কৃষ্ণ দ্বারকা-ভূষণ,
দ্বাদশ বৎসর কাল গৃহত্যাগী হন ॥
পরিহরি পরিবাদ হরি যদুপতি,
বিষম সঙ্কট হতে পান অব্যাহতি ॥
ওহে প্রভু তেজোরাশি হয়ে কৃপাবান,
দুরন্ত চোরের করে কর পরিত্রাণ ॥

শ্রীমতী——

(চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত।)

সুখের দিন।

১

সুখের দিন্, পেয়ে দিন, ঘনিয়ে ঘনিয়ে আস্‌ছে কাছে।
বামুনগণে, তরাস্ মনে, কতই গণে কি হয় পাছে॥

২

বাম্‌নী ভাবে, ভাল হবে, চাল শুকাতে আর কবে না।
এলো মাথে, কাপ্‌ড় হাতে, কাক্ তাড়াতে আর হবে না॥

৩

খোলা কাটা, পিণ্ডি বাটা, চণ্ডী পাঠে হবে মানা।
কুশের আসন, পাটের বসন, ভস্ম ভূষণ কিকারখানা॥

৪

কলারপাতে, চাল্ কলাতে, কচ্‌লাইতে আর হবে না।
কালো পাঁটা, কুম্‌ড়ো কাটা, মাটির পুতুল আর খাবে না॥

৫

শিলা পূজা, শেয়াল পূজা, গরু পূজা হবে মানা।
(গেলে) ওল্‌ড ফুল, চোকের শূল, এসব ভুল আর রবে না॥

৬

কমল বনে, কমলগণে, আড় নয়নে হাস্‌বে চেয়ে।
ফুল্ তুলসী, হয়ে খুসি, হাস্‌বে বসি রক্ষা পেয়ে॥

৭

(ছিল) নয়ন সুখ, নয়ন সুখ, পেয়ে দুখ চল্লো ধেয়ে।
এল তেড়ে, কালাপেড়ে, চক্রবেড়ে সুযোগ পেয়ে ॥

৮

(যাবে) বুড়ো ডেভিল্, আস্‌বে সিভিল্, চেয়ার টেবিল দিবে থানা।
সময় পেয়ে, ফানস্ নিয়ে, হাস্‌বে সকের বৈঠকখানা ॥

৯

লাঠি মারা, তর্ক করা, পণ্ডিতেরা ছেড়েই দিবে।
(আবার) পাড়ার মেয়ে, সভায় যেয়ে, রিজন্ দিয়ে কথা কবে ॥

১০

(হবে) শুঁড়ীর বাড়ী, ছড়াছড়ি, গোয়ালারা ভাত পাবে না।
(হবে) মদের বাহার, বিস্কুট আহার, দুদের আদর আর রবে না॥

১১

এক ভোজেতে, সকল জেতে, টেবিল পেতে খাবে খানা।
জাতের আচার, জাতের বিচার, জাতের গুমর আর রবে না॥

১২

ফাউল্ করি, সেম্পেন্ সেরি, টেবিলপরি দিবে থানা।
কাঁচের গ্লাসে, একসা এসে, তলব করবে ঘুগ্‌নি দানা ॥

১৩

চেয়ার এঁটে, রোষ্ট কেটে, চায়্‌নাপ্লেটে খাবে খানা।
(হবে) ছুরির ঘটা, চাম্‌চে কাঁটা, হাতের কাজটা আর রবে না ॥

১৪

(যাবে) ঢোল তবলা, বীণ বেহালা, তাদের জ্বালা আর সবে না।
(বাজ্‌বে) বেষ্ট বাজনা, কন্সার্টিনা, হার্‌মনিয়া ফ্লুট্‌ পিয়েনা॥

১৫

(যত) মেয়ে দলে, গোহেল্‌ বলে, সাড়ী ফেলে গাউন্‌ লবে।
(আবার) বনেট্‌ পরে, লাগাম ধোরে, ফেটিং চড়ে হাওয়া খাবে॥

১৬

(মিছে) হিঁদুধর্ম্ম, অপকর্ম্ম, একটী ব্রহ্ম মান্‌বে সবে।
চতুরানন, পঞ্চ আনন, গজ-ষড়ানন কেউ না রবে॥

শ্রীকঃ——

পদার্থ সংস্থান।

পদার্থ।—পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যাহার জ্ঞান হয়, তাহাকে পদার্থ বলে; যথা আলোক চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই বলিয়া এক প্রকার পদার্থ, শব্দ কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাই বলিয়া অন্য এক প্রকার পদার্থ।

ভূত।—ভূমণ্ডলে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, সেই সকল অতি সূক্ষ্ম বিভাগ পূর্ব্বক যে যে অমিশ্রিত মূল পদার্থ প্রাপ্ত হই, তাহাদিগকে ভূত বলে। এক্ষণে পঞ্চষষ্টি ভূত আবিষ্কৃত হইয়াছে; যথা অক্‌সিজিন্‌, হাইড্রোজিন্‌, নাইট্রোজিন্‌, কারবণ ইত্যাদি। ইহাদের গুণ পৃথক পৃথক এবং পরস্পরে মিলে না; যথা অক্‌সিজিন জ্বালাইলে আপনি জ্বলে, এবং অপর বস্তুর প্রজ্বলনে সাহায্য করে, এবং

কোন প্রজ্জ্বলিত বস্তু ইহাতে নিক্ষেপ করিলে উজ্জ্বলরূপে জ্বলে। হাইড্রোজিন্ জ্বালাইলে জ্বলে, কিন্তু কোন প্রজ্জ্বলিত পদার্থ ইহাতে নিক্ষেপ করিলে নির্ব্বাপিত হয়। নাইট্রোজিন না আপনি জ্বলে, না অপরের প্রজ্জ্বলনে সাহায্য করে। পুনশ্চ নিশ্বাস দ্বারা আমরা অক্সিজিন লই, এবং তাহারই দ্বারা জীবিত আছি, অন্যান্য ভূতের সে গুণ নাই।

অণু ও পরমাণু।—প্রত্যেক বস্তুকে সূক্ষ্মরূপে যতদূব পারা যায়, তত দূর বিভাগ করিলে প্রতি বিভক্ত অংশকে অণু বলা যায়। তদ্রূপ ভূতের প্রত্যেক বিভক্ত অংশকে পরমাণু বলে। ইহা হইতে সহজে অনুমিত হইতেছে, প্রত্যেক অণুতে কতিপয় পরমাণু থাকিতে পারে; যথা জলের প্রতি অণুতে হাইড্রোজিনের দুই ভাগ এবং অক্সিজিনের এক ভাগ আছে।

আণবীয় শক্তি।—অণু সকল কতিপয় আকর্ষণ ও দূরীকরণ শক্তি দ্বারা পরস্পরে আবদ্ধ ও স্পৃষ্ট হইয়া এক এক পৃথক বস্তু হয়, এই আকর্ষণ ও দূরীকরণ শক্তিকে আণবীয় শক্তি বলে, যদ্দারা অণুগণ পরস্পর সম্মিলিত হইতে চায় তাহাকে আণবীয় আকর্ষণ কহা যায়, এবং যদ্দ্বারা অণু সকল পরস্পর হইতে দূরীকৃত ও পৃথক হইতে চায়, তাহাকে আণবীয় দূরীকরণ কহে। ইহার পরিমাণ আণবীয় আকর্ষণ সম্বন্ধে অতি অল্প; কিন্তু যখন স্বাভাবিক উষ্মা (Temperature) বাড়ে, তখন ইহাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই হেতু সকল পদার্থের তিন প্রকার অবস্থা, (১) কঠিন, যথা কাষ্ঠ, প্রস্তর, স্বর্ণ ইত্যাদি, (২) দ্রব, যথা জল, তৈল, দুগ্ধ; এবং (৩) বাষ্পীয়, যথা বায়ু. ধূম। যদি কোন বস্তুর স্বাভাবিক উষ্মা অতি অল্প হয়, তবে উহা কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়; যদি উষ্মা অধিক হয়, তবে

দ্রব হয়; এবং যদি তদধিক হয়, তবে বাষ্প হয়। যথা গন্ধক সাধারণ উষ্মায় কঠিন, কিন্তু কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিলে দ্রব হয়, এবং অতিশয় উত্তপ্ত করিলে বাষ্প হয়। তাদৃশ জল সাধারণ উষ্মায় দ্রব, কিন্তু যদি অতিশয় শীতল করা যায়, তবে উহা কাঠিন্যাবস্থা পায়, অর্থাৎ তুষার হয়, এবং যদি অত্যন্ত উত্তপ্ত করা যায়, তবে বাষ্প হয়। এই স্থানে মনে রাখা উচিত যে, শৈত্য কোন বিশেষ গুণ নহে, কেবল তাপহীনতামাত্র। এই সকল কথা তাপের বিষয়ে স্পষ্টরূপে সবিশেষে বলা যাইবে।

কাঠিন্যের প্রধান স্বভাব এই যে, বস্তুবিশেষের অণুরাশির পরস্পর সম্বন্ধে স্থিতি, পরিশ্রম বা শক্তি ব্যয় ব্যতিরেকে সহজে পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না, সুতরাং ঐ বস্তুর আকার চির-স্থায়ী,—পরিবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু দ্রব ও বাষ্পীয় বস্তুর আকার ও অণুরাশির পরস্পর সম্বন্ধে স্থিতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়;—যথা এক প্রকার অবয়ববিশিষ্ট পাত্রের জল অন্য প্রকার অবয়ব-বিশিষ্ট পাত্রে ঢালিলে তাহা দ্বিতীয় পাত্রের কলেবর ধারণ করিবে। বাষ্পের বিশেষ গুণ এই, অণুরাশির তরলতা ও দূরীকরণ শক্তি দ্রবতার তারল্যাদি অপেক্ষা অধিকতর।

দ্রব ও বাষ্পীয় পদার্থকে তরল পদার্থ বলা যাইতে পারে।

আণবীয় আকর্ষণ ত্রিবিধ। প্রথম, সমাণু আকর্ষণ অর্থাৎ এক স্বভাবের দুই অণুতে যে আকর্ষণ হয়, যথা জলের দুই অণুতে। ইহা কঠিন বস্তুতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে। দ্রব বস্তুতে অল্প এবং বাষ্পে আরও অল্প। দ্বিতীয়, ভিন্নাণু আকর্ষণ, অর্থাৎ ভিন্ন স্বভাবের অণুতে যে আকর্ষণ হয়, যথা কাঠিন্য দ্রবতাস্পর্শে, কাঠিন্য বাষ্পস্পর্শে, এবং দ্রবতা বাষ্পস্পর্শে। তাহার দৃষ্টান্ত, এক খণ্ড

কাষ্ঠ জলে নিমগ্ন করিয়া উঠাইলে দুই এক বিন্দু জল তাহাতে লাগিয়া থাকে। তৃতীয়, রাসায়নিক সম্বন্ধ, অর্থাৎ দুই বস্তু পরস্পরে মিলাইলে তাহা আপনা আপনি মিশ্রিত হইয়া এক দুই কিম্বা তিন পৃথক বস্তু হয়, যথা যদি কোন বস্তু জ্বলে, তবে উহা দূরবর্ত্তী অক্সিজিন টানিয়া লইয়া রাসায়নিক কার্য্য করে। এই সম্বন্ধের উপর সমস্ত রাসায়নিক বিদ্যা নির্ভর করে;—রাসায়নিক সংযোগ ও বিয়োগ ইহারই দ্বারা সিদ্ধ হয়।

স্বাভাবিক শক্তি।—যখন আমরা জানিতে চাই, কি কি কারণে নৈসর্গিক কার্য্য ও ঘটনাবলি উৎপাদিত হয়, তখন কতিপয় স্বাভাবিক শক্তি অনুভব করিয়া লই; তাহারা জড় পদার্থ সমূহে কারণস্বরূপ হইয়া প্রকৃতির যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করে। তাহা এই, আকর্ষণ, শব্দ, তাপ, আলোক, চুম্বকত্ব ও তাড়িৎ। ইহারা কি, ও ইহাদের স্বভাব কি প্রকার, তাহা অদ্যাপি জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানা আছে, তাহারা হয় স্বভাবের গুণ, নয় কোন প্রকার সূক্ষ্ম তরল পদার্থ, যাহা জড় পদার্থের প্রতি অণুকে বেষ্টন করিয়া অসীম রূপে রহিয়াছে, তাহার গতি-বিশেষ। অনেকে উত্তরটি অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম তরল পদার্থের গতি-বিশেষ মানিয়া থাকে। এই বিশ্বব্যাপী তরল সূক্ষ্ম পদার্থকে আমাদের মুনিঋষিরা অবস্থাবিশেষে কোন সময়ে ব্যোম বা আকাশ, কোন সময়ে প্রভা, অনল ও বায়ু বলিতেন। ইহার মধ্যে পূর্ব্বটি আমাদিগের অনুমোদনীয় কারণ আকাশ যাদৃশ ভূমণ্ডল ও আর আর গ্রহগণকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, তাদৃশ উক্ত সূক্ষ্ম তরল পদার্থ প্রতি অণুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

মঙ্গলাচরণ।

বিশ্বপতির বিশ্বচক্রের আর এক চক্র আবর্ত্তিত হইল। ১২৮০ বঙ্গাব্দ অতীত হইয়া ১২৮১ সাল সমাগত হইয়াছে। "পূর্ণশশী" ষষ্ঠচন্দ্র প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্তম চন্দ্রে অধিষ্ঠিত। শশী দর্শনাভিলাষী বন্ধুবান্ধবগণ ইহার প্রতি সুপ্রসন্ন নয়নে দর্শন করিলে ক্রমশঃ আমরা মৃগাঙ্ক শোধনে যত্নবান হইব। এই স্থানে একটী জ্যোতিষী ঘটনার উল্লেখ করিতে হইল। পাঠক মহাশয় এটীকে রহস্য মধ্যে গণনা করিবেন। যে পূর্ণিমায় পূর্ণশশীর জন্ম হয়, সেই কার্ত্তিকী রাস পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। মুক্তির পর ছয় মাস কাল যথাবিধানে ইহার উদয় হইয়াছে। বৎসর সমাপ্ত হইল, আমরা নবীন বৎসরে উপনীত হইলাম, পূর্ণশশী সপ্তম মাসে পদার্পণ করিল, অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্চর্য্য সংঘটন! পুনরায় চন্দ্রগ্রহণ! পূর্ণশশীকে বারম্বার রাহুগ্রস্ত দর্শন করিয়াও আমরা বিচলিত হই নাই, বরং ইহার প্রতি ক্রমশই আমাদিগের মমতা বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু এই কারণে এ মাসে আমরা নববর্ষোৎসবে ইহার বর্ষ বৃদ্ধি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিলাম না। জগদীশ্বরের প্রসাদে ও আপনাদিগের অনুগ্রহে দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে আগামী শারদীয় কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় মনোরথ সিদ্ধ করিব।

অলৌকিক ক্রিয়া।

"যদি আমরা সূর্য্যোদয়ের পরে নিদ্রিত হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের অমঙ্গল হইবে।" নাগা পাহাড়-বাসী নাগাজাতির এই যে এক প্রবাদ আছে, তাহা অসভ্য জাতির বাক্য বলিয়া কেহ কেহ উপেক্ষা করেন, কিন্তু সভ্য জাতির শাস্ত্রীয় ঋষিবাক্য ও গুরুবাক্যে ইহার আদর্শ আছে, এটী যখন ভাবি, তখন অধ্যবসায়শীল নাগাদিগকে কোলে করিয়া নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয়। তাহারা ঐ একটী ক্ষুদ্র বাক্যে জগৎকে বুঝাইতেছে,—কেবল কথায় নহে,—দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছে, উদয়াস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম কর, কিছুই অসাধিত থাকিবে না। একজন বলিতে পারেন, ইহাতে কি বুঝিব?—আমরা উত্তর দিব, এই বুঝিবেন, জগতে অলৌকিক কার্য্য নাই।—অলৌকিক কার্য্য কি, আমরা তাহা বুঝি না। পুরাণে নারায়ণের দশবিধ অবতারের উল্লেখ আছে, তাঁহা-দিগের ক্রিয়া, ক্রীড়া, অথবা লীলাগুলি "অলৌকিক" বিশেষণে বর্ণিত।—যাহাতে ঐ বর্ণনা, তাহার প্রতিপাদ্য কর্ত্তা দেবতা; সুতরাং দেবতার কার্য্য দৈব বিশেষণে ব্যবহার্য্য;—লৌকিক হইতে পারে না। কারণ লৌকিকের সহিত তাহার সংস্রব নাই। যদি এমন হইল, তবে মানুষী

কার্য্যে অলৌকিক সম্পর্ক রহিল না। ভাল, অর্থসাধন রীতিমধ্যে উহাকে পাওয়া যায় কি না, তত্ত্ব করা আবশ্যক। লোকাতীত,—লোকের সাধ্যাতীত, ইহার মধ্যেও ত কিছু অলৌকিক পাইলাম না। কারণ লোকের সাধ্যাতীত জাগতী কর্ম্ম নাই।—অতি সামন্য লোকেও সচরাচর বলিয়া থাকে, “ মনিষ্যির অসাধ্য কর্ম্ম নাই।”—তবে এমন হইতে পারে, যাহা মনুষ্যের জ্ঞানের অতীত,তাহাই অলৌকিক।—উত্তম,—কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সকলের জ্ঞান কি একরূপ? তখন কি উত্তর দিবেন? এক বৎসরের শিশু একটী ব্যাঘ্র দেখিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে যাইবে, অষ্টম বর্ষীয় বালক ব্যাঘ্র দেখিযা পলায়ন করিবে, পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় পরাক্রান্ত পুরুষ ব্যাঘ্রকে বাধ্য করিয়া নাচাইবে,কিম্বা বীরদর্পসহকারে বধ করিবে। তবে স্থির হইতেছে, জ্ঞানের অগম্য বা শক্তির অপ্রতুলতাই অলৌকিক ক্রিয়ার হেতু হইতে পারে। সাধারণ মানুষী শক্তি উহার হেতু নহে।

যে যে উপাদানে মানবদেহ নির্ম্মিত, তাহার শক্তি ঐশী শক্তিসম্পন্ন। এই প্রমাণে আর্য্য ও পাশ্চাত্য ভূমের কোনো কোনো গণনীয় পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যজাতি মাত্রেই একটী না একটী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। মনুষ্যের মনে ও বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহে সকল ক্ষমতাই বিরাজ করে, কেবল যাহার উপর সেই সেই ক্ষমতা খাটা-

ইতে হইবে, সেইগুলির সর্ব্বদা সংযোগ হয় না বলিয়াই মূল ক্ষমতার কার্য্য হয় না, এই মাত্র বিশেষ। ইংরাজীতে যেমন "অ্যাক্‌টিব" ও "নিউটার" ক্রিয়া আছে, ইহাও সেইরূপ। নতুবা অস্তিত্বে অপ্রত্যয় নাই। প্রমাণকারীরা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন, মনুষ্যমাত্রেই অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন। জগতের মধ্যে এমন যে শ্রেষ্ঠ ও সার বস্তু ধর্ম্ম, তাহাও এক এক ব্যক্তির অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন বিনা পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। আদিম বৈদিক ধর্ম্ম স্বস্থানে রাখিলেও অপরাপর শাখা ধর্ম্মে ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। মুশা, য়িশা, ও মহম্মদ যদি ঈশ্বরের সহিত বাক্যালাপ, মৃতের জীবনদান, ও স্বর্গ হইতে ধর্ম্মপুস্তক আনয়ন প্রভৃতি আশ্চর্য্য ক্রিয়া ঘোষণা না করিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহাদিগের প্রতি লোকের এতাদৃশ বিশ্বাস জন্মিত? ইহাতেও প্রমাণ হইতেছে, যদি অলৌকিক ক্রিয়া থাকে, তবে সকল মনুষ্যই ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই ক্রিয়ার শক্তিসম্পন্ন।

যখন ইংরাজেরা আমাদিগের দেশে প্রথম আসিলেন, যখন অল্পে অল্পে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষারূপ সূর্য্য প্রাচ্য পর্ব্বতের স্বচ্ছ স্তবকে প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ হইল, তৎকালে এদেশের কতকগুলি "বাবু" আমাদিগের পৌরাণিক বর্ণনায় ঘোরতর পরিহাস করিতে শিখিলেন। পুষ্পক রথের নাম শুনিলেই তাঁহারা বদন বিকৃত

করিয়া হাস্য করিতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বায়ব্যাস্ত্র, বরুণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির কথা উঠিলেই বাল্মীকি ও ব্যাসকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করিতেন, দেবতাদিগের আদেশে পবন আসিয়া রামের কর্ণে কিছু কহিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা আমাদিগের পূজ্যতম কবিগুরুকে যৎপরোনাস্তি উপহাস করিতেন! এখন সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসাদেই সকলের ভ্রান্তিতিমির ভেদ হইয়া সত্যসূর্য্য প্রতিভাত হইতেছে। বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় তরণী, বৈদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ মনুষ্য দ্বারা সৃজিত হইল, সমুদ্রগর্ভ, নদীগর্ভ আশ্রয় করিয়া বিদ্যুৎমালা দিগ্‌দিগন্তে চলিয়া গেল, ছয়মাসের দূরের সংবাদ এক দিনে আসিতে লাগিল, ব্যোমযানের গঠনে ও উড্ডয়নে স্বর্গীয় বিমান আবির্ভূত হইল, এখন আর মনুষ্যের সাধ্যাতীত অলৌকিক ক্রিয়ার ভ্রম রহিল না। সমরক্ষেত্রে অস্ত্রসংযোগে বিদ্যুৎ, বজ্র, আলোক, অন্ধকার, দর্পণ ও জল উদ্ভূত হয়, ফ্রসো-ফ্রাঙ্কো সংগ্রামে নেপোলিয়ন ও উইলিয়ম, বিস্‌মার্ক ও মাক্‌মোহন তাহা দেখাইয়াছেন, শ্রীহর্ষের হংসদূত ও নেপোলিয়নের কপোত-দূতেরা সপ্রমাণ করিয়াছে। আকাশমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি, গতি ও আকৃতি বিজ্ঞানবলে নিরূপিত হইতেছে, এ প্রত্যক্ষের অপলাপ করিবেন কে? যাহা কিছু পূর্ব্বে অজ্ঞানবশত অলৌকিক বোধ ছিল, এখন চাক্ষুষ প্রমাণে তাহাকে লৌকিক বলিতে হইতেছে। নল রাজার শকট চালনায়

অবিশ্বাসীরা এখন স্বয়ং এক দিনে কলিকাতা হইতে কাশী যাইতেছেন। যে সকল দেশ দুর্গম অথবা অগম্য বোধ ছিল, যে সকল কার্য্য দুঃসাধ্য বা অসাধ্য জ্ঞান ছিল, তাহা এখন সুগম, সুসাধ্য ও সহজ জ্ঞান হইতেছে। অতএব আমরা প্রথমাবধি কহিতেছি, জগতে মানুষের অসাধ্য অলৌকিক ক্রিয়া নাই। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, "অসম্ভব ও অসাধ্য শব্দ পৃথিবীর অভিধান হইতে খারিজ করা কর্ত্তব্য।" কথা সত্য, আমরাও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করি।

আমরা বঙ্গবাসী,—যে দেশে সমৃদ্ধিশালী গৌড়রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ বিরাজ করে, যে দেশে পলাসির যুদ্ধে লার্ড ক্লাইবের জয়, যে দেশে অক্রীত দাসদিগের দাসত্বই জীবিকা, আমরা সেই বঙ্গদেশবাসী নির্জ্জীব,—নির্জ্জীব যদি গালাগালি হয়, তবে ক্ষীণজীবী। আমরা কার্য্যকে বাঘ দেখি, এই জন্যই অসাধ্য, সাধ্যাতীত, অসম্ভব ও অলৌকিক বাক্য গুলির আমাদিগের নিকট এতদূর আদর! অদ্য যে অনুক্রমণিকায় এই প্রস্তাবের অবতারণা, তাহার মূল তাৎপর্য্য বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের হৃদয়ঙ্গম হইতে অবশিষ্ট নাই। যদবধি বঙ্গবাসীর হৃদয় হইতে অলৌকিক কুসংস্কার দূর না হইতেছে, যতদিন সুসাধ্য বোধে অক্লান্ত অধ্যবসায় যোগে সমস্ত সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্তি না জন্মিতেছে, ততদিন এদেশের আভ্যন্তরীণ মঙ্গল দর্শনের আশাই নাই।

কল্কিপুরাণ।

দ্বিতীয়াংশ।

প্রথম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, তখন সাধুসম্মত সুবুদ্ধি শুক পদ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি পদ্মে! আপনি সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান নারায়ণের সর্ব্বাঙ্গীন পূজার বিষয় বর্ণন করুন। আমি বিধানানুসারে সেই পূজার অনুষ্ঠান করিয়া ত্রিভুবনে বিচরণ করিব।

পদ্মা কহিলেন, শুক! মন্ত্রবিৎ উপাসক ভগবান বিষ্ণুকে পূর্ণাত্মা জ্ঞানে এইরূপে তাঁহার চরণ হইতে কেশ পর্য্যন্ত অন্তরে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। জপাবসানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। পরে পাদ্য অর্ঘ্যাদি নিবেদিত দ্রব্য সকল বিশ্বক্‌সেন প্রভৃতিকে প্রদান করিবে। তৎপরে সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষ বিষ্ণুকে মনের সহিত চিন্তা করিয়া হরির নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য গীতে প্রবৃত্ত হইবে। অবশেষে নির্ম্মাল্য-শেষ মস্তকে ধারণ করিয়া নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিবে। হে শুক! এই আমি তোমার নিকট কমলাবল্লভ বিষ্ণুর পূজাবিধি বর্ণন করিলাম। এইরূপ বিধানে ভগবানের অর্চ্চনা করিলে সকাম ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হয়, এবং কামনাশূন্য সাধক মুক্তিমার্গ লাভ করিয়া থাকে। এই পূজা বৃত্তান্ত দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণের আনন্দজনক ও শ্রুতিসুখকর।

শুক কহিল, দেবি পতিব্রতে! আপনি ভগবান নারায়ণের প্রতি ভক্তি লক্ষণ বিষয়ে যাহা যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া

পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আমি পাপাত্মা পক্ষী, আমিও এখন আপনার প্রসাদে এতদ্দ্বারা মুক্তিলাভে সমর্থ হইব। আপনি রত্নালঙ্কার-ভূষিতা সচেতনা কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায়, আপনার ন্যায় রূপময়ী মূর্ত্তি ত্রিভুবনে নাই; বোধ করি, আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হইবেন। আপনার ন্যায় রূপবতী, গুণবতী ও পবিত্রমতী কামিনী আর ত নয়নগোচর হয় না। আর আপনার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্রও ত্রিভুবনে কাহাকেও দেখি না। তবে সমুদ্রপারে আমি এক অলোকসামান্য পুরুষ দেখিয়াছি, তিনিই আপনার উপযুক্ত পাত্র, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও অত্যাশ্চর্য্য রূপসম্পন্ন। তাঁহার সেই ভুবনমোহন রূপ বিধাতৃ-নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় না। আমি বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, ভগবান বাসুদেবের সহিত তাঁহার কোন অন্তর নাই। দেবি! আপনি অমিততেজা ভগবান্ বিষ্ণুর যেরূপ মূর্ত্তি বর্ণন করিলেন, আমি অবিকল সেই মূর্ত্তিই তথায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

পদ্মা কহিলেন, হে বিহগরাজ! তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহার জন্মগ্রহণের কারণই বা কি? এবং তিনি তথায় কি কি কার্য্য করিয়াছেন? বোধ হয় তুমি তাহার সমস্তই অবগত আছ, অতএব এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট বর্ণন কর। হে বিহঙ্গম! এক্ষণে বৃক্ষ হইতে আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমার যথোচিত সৎকার করিতেছি। তুমি এই সমস্ত বীজপুর ফল আহার কর এবং সুশীতল সলিল পান কর। আহা! তোমার চঞ্চুযুগল পদ্মরাগ হইতেও সমুজ্জ্বল ও সুবর্ণ; এস, আমি তোমার ঐ চঞ্চুযুগল রত্ন দ্বারা আরও মনোহর করিয়া দি। সূর্য্যকান্ত মণি দ্বারা তোমার স্কন্ধর এবং মনোহর মুক্তাকলাপ দ্বারা পক্ষতি সাজাইয়া দিব।

আমি তোমার পত্র ও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কুঙ্কুম রাগে রঞ্জিত এবং সুগন্ধে আমোদিত করিয়া দিব। তোমার পুচ্ছে মনোহর মণিসমূহ এবং চরণে নূপুর পরাইয়া দিব,—অঙ্গচালন মাত্রেই সুমধুর শব্দ সমুত্থিত হইবে। আজ আমি এইরূপে তোমার স্বরূপের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিব। তোমার অমৃতময় বচন পরম্পরায় আমার মনো-ব্যথা অপনীত হইয়াছে, এক্ষণে আদেশ কর, সখীদিগের সহিত আমাকে কি করিতে হইবে ?

অতি ধীরপ্রকৃতি বিহগবর পদ্মার এই কথা শুনিয়া প্রসন্নমনে তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, পরম কারুণিক রমাপতি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে এবং ধর্ম্ম রক্ষার মানসে ভ্রাতৃচতুষ্টয় এবং অন্যান্য জ্ঞাতিগণের সহিত শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশার গৃহে বাস করিতেছেন। তিনি উপনয়নের পরেই সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর মহাত্মা রামের নিকট হইতে সমস্ত গান্ধর্ব্ব ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা এবং মহাদেবের নিকট হইতে অশ্ব, অসি, শুক, কবচ ও বরলাভ করিয়া পুনর্ব্বার শম্ভলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মতিমান্ কল্কি শম্ভলে আগমন করিয়া ভূপতি বিশাখযূপকে বিবিধ ধর্ম্মো-পদেশ দিয়া অধর্ম্ম অপনয়ন করিয়াছেন।

পদ্মা শুকমুখে এই সকল কথা শুনিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন, এবং শুককে নানাবিধ রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবান্ কল্কিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত করপুটে কহিলেন, হে শুক! তুমি বিলক্ষণ বাক্য বিন্যাস কুশল; আমি তোমাকে আর কি শিখা-ইয়া দিব, তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিতেছি যে, যদি তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্তির ভয়ে আসিতে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে প্রণামের সহিত আমার কর্ম্ম দোষ জানাইয়া কহিও যে, আমার ভাগ্য ক্রমে মহা-

দেবের বরও শাপস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, পুরুষগণ আমাকে দর্শন করিলেই স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শুক পদ্মার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ ও প্রণাম পূর্ব্বক আকাশপথে উড্ডীন হইয়া অবিলম্বেই শম্ভলে সমুপস্থিত হইল। পরমতেজস্বী কল্কি শুককে সমাগত দেখিয়া শশব্যস্তে তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন। শুকের সমস্ত শরীর স্বর্ণরত্নে বিভূষিত দেখিয়া তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। বহুবিধ প্রশংসাবাদের পর পানীয়দানে শুককে সুস্থ করিলেন। অনন্তর তাহার পৃষ্ঠোপরি করকমল অর্পণ ও মুখোপরি মুখপ্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুক! তুমি কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়া কি কি অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিলে? এতদিন কোথায় অবস্থান করিতেছিলে? এবং কোথা হইতেই বা এই সকল মণিকাঞ্চনময় অলঙ্কার লাভ করিলে? আমি সর্ব্বদাই তোমার সহিত একত্র বাস করিতে অভিলাষ করি, তোমার অদর্শনে এক মুহূর্ত্ত কালও আমার এক যুগের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে।

শুক ভগবান কল্কির এই কথা শুনিয়া প্রথমত তাঁহাকে প্রণাম করিল, পরে পদ্মা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তৎ সমুদায় এবং আপনার অলঙ্কার প্রাপ্তির সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। ভগবান্ কল্কি শুকমুখে তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সানন্দ মনে শিবদত্ত হয় রত্নে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বরে শুকের সহিত সিংহলে প্রস্থান করিলেন। সমুদ্র পারস্থিত সলিলবেষ্টিত সিংহলের শোভার সীমা নাই। উহার স্থানে স্থানে বিমান সকল শোভা পাইতেছে; যে দিকে নেত্রপাত করা যায় সকলই মণি কাঞ্চনে সমুজ্জ্বল; প্রত্যেক প্রাসাদের শিখরদেশে পতাকা সকল শোভা

পাইতেছে; শ্রেণীবদ্ধ আপণ, অট্টালিকা ও গোপুর সমূহে উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ভগবান্ কল্কি অবিলম্বে সিংহলে সমুপস্থিত হইয়া কারুমতী পুরী অবলোকন করিলেন। ভ্রমরগণ পদ্মগন্ধ সদৃশ পুরমহিলাগণের গাত্র গন্ধে বিমোহিত হইয়া অবিরত উহার চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। পুরীমধ্যস্থ সরোবরে মরালকুল সন্তরণ করাতে কমল কুল সর্ব্বদাই দোদুল্যমান হইতেছে। সরোবর সকল সর্ব্বদাই বিকসিত কমলে, মুখরিত অলিপুঞ্জে ও চঞ্চল মরালকুলে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উহাতে জলকুক্কুট, দাত্যূহ, হংস ও সারসগণ অবিশ্রান্ত সুমধুর শব্দ করিতেছে। উহার স্বচ্ছসলিলে লহরী লীলা অতীব মনোহর। পুরীর স্থানে স্থানে কপিত্থ, অশ্বত্থ, খর্জ্জূর, বীজপূব, করঞ্জক, পুন্নাগ, পনস, নাগরঙ্গ, অর্জ্জুন, শিংশপ, ক্রমুক ও নারিকেল, প্রভৃতি পাদপ সকল অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছে। উপবনস্থ বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে অবনত হইয়া রহিয়াছে। ভগবান্ কল্কি পুর প্রান্তে বনাবলিবেষ্টিত মনোহর সরোবর অবলোকন করিয়া শুককে বলিলেন, এই সরোবরে স্নান করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। শুক প্রভুর এই কথা শুনিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, আপনি স্নান করুন আমি পদ্মাশ্রমে গমন করি; এবং তাঁহার শুভ সংবাদ লইয়া অবিলম্বে এই স্থানে আগমন করিতেছি।

দ্বিতীয়াংশের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

পিপীলিকা।

গত বৎসরের শেষ দুইমাসে আমরা এই কীটের আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া আশা করিয়াছিলাম যে, এতাদৃশ ক্ষুদ্র কীটের এতাদৃশ কার্য্য শৃঙ্খলা দর্শনে পাঠকগণ অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। আমাদের সে আশা নিতান্ত নিষ্ফলা হয় নাই। অনেকেই পিপীলিকাকে আগ্রহের সহিত আদর করিয়াছেন, এইজন্য আমরা এই নববর্ষ সমাগমে পাঠকগণের প্রিয়পাত্র সেই পিপীলিকাগুলিকে পুনরায় তাঁহাদিগের সম্মুখে ছাড়িয়া দিতেছি।

একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়াছেন, পৃথিবী মধ্যে পিপীলিকার মস্তিষ্ক অপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য পদার্থ নয়নগোচর হয় না। এই ক্ষুদ্রকায় কীটের বুদ্ধির কথা শুনিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। অদ্য কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে তাহাদিগের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। মনুষ্যের ন্যায় ইহারা সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে তিন প্রকার শ্রেণী দেখা যায়,—স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীব। প্রথমেরা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় এবং শেষোক্তেরা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু অধিক বলবান্। সকলেরই মস্তকের দুই পার্শ্বে হস্তীশুণ্ডের ন্যায় দুইটী করিয়া শূঁয়া আছে, উহা দ্বারা দ্রব্যাদি স্পর্শ, পরীক্ষা ও পরস্পর মনের ভাব ব্যক্ত করে, এবং কেহ কেহ অনুভব করেন যে, উহাই ইহাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়। সম্মুখস্থিত দুইটী কঠিন থোবনা দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তু সকল ধরে ও কাটে। ইহাদের গলা ক্ষুদ্র ও সরু। বক্ষস্থলের দুই পার্শ্বে চারি খানি পাখা, এবং পশ্চাৎ-

ভাগে পাকস্থলী। ক্লীবদিগের পাখা নাই। উহাদের ছয় খানি করিয়া পা আছে, পশ্চাতের চারি খানি অপেক্ষাকৃত বড়। কোন কোন জাতীয় স্ত্রী ও ক্লীবের ইহার ব্যতিক্রম স্থল আছে। কাহারও কাহারও সমস্ত শরীরে অম্ল রস থাকায় মনুষ্যেরা চাট্‌নীতে উহা উপাদেয় বলিয়া ব্যবহার করে।

ক্লীবেরাই গৃহ নির্ম্মাণ, আহার আয়োজন, ডিম্ব ফুটান ও বাস-রক্ষা প্রভৃতি সমাজের প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য সম্পন্ন করে। দিবা-ভাগে ইহাদিগকে নিষ্কর্ম্মা থাকিতে দেখা যায় না। ইহাদিগের অভাবে সমাজ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। গর্ব্ভধারণ ও প্রসবের সুখ দুঃখ কিছুই জানেনা বটে, কিন্তু ইহারাই সন্তানগণকে মাতৃবৎ প্রতি-পালন যুদ্ধ বা সন্ধির বিষয় নির্দ্ধারণ এবং ইহারাই প্রাণ দিয়া রাজ্যের মঙ্গলসাধন করে। ইহাদিগের বাসগৃহ বা গ্রাম নানা মাল মস্‌লায় প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে মাটি ও কাষ্ঠই প্রধান। লাল পিপীলিকারা কাট, খড়, বিচালি, শুষ্ক পত্র ও মরা কীটাদি দিয়া বাটী নির্ম্মাণ করে। সমান ভূমিতে গর্ত্ত করিয়া ভিতরে বড় বড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর ও রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করে, এবং ঐ খোঁড়া মাটি লইয়া উপরের তলা নির্ম্মিত হয় এবং তাহাই পিপীলিকার ঢিবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। গুম্বজের ন্যায় আকৃতি হওয়ায়, ঝড়ে বা শত্রুতে ইহার হানি করিতে অক্ষম অথচ প্রচুর পরিমাণে সূর্য্য রশ্মি গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে। ঢিবির উপরিভাগে একটী সিংহদ্বার ও পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার থাকে; কিন্তু অধিকাংশ গুম্বজনিম্নে একটী দ্বার এবং তথা হইতে এক সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ এরূপ ঘোর ফেরে প্রস্তুত যে, নগর মধ্যে বৃষ্টি বা শত্রু প্রবেশ করা সুদুষ্কর। এক জাতি জর্দ্দা পিপীলিকা দিবাভাগে উপর তলায় থাকে, এবং রাত্রি

কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আট ঘাট বন্ধ করিয়া যায়। প্রত্যহ এইরূপ পথ অবরোধ করিতে ও খুলিতে বহু সংখ্যক পিপীলিকার দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। বৃষ্টি বা শিশির পতনের পর ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করে; সচরাচর সন্ধ্যার পরেও আরম্ভ করিয়া থাকে। চারিদিক্ হইতে মাল মসলা লইয়া সকলে আইসে, কোন গোলমাল থাকে না এবং মিস্ত্রিগণ যথাস্থানে সমস্ত নিয়োগ করিয়া থাকে।

স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকাগণ গ্রাম মধ্যে বদ্ধ থাকে। কোন ক্রমেই বাহির হইতে পায় না। তবে বর্ষাবসানে অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসে প্রথম বহু সংখ্যক পুরুষ, পরে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক স্ত্রী বাহিরে আকাশে আসিয়া বিহার করে। ইহার পরক্ষণেই পুরুষগণের মৃত্যু হয়। স্ত্রীগণ গর্ব্ভবতী হইয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে। কেহ কেহ বা কতকগুলি কর্ম্মিষ্ঠ ক্লীব সমভিব্যাহারে লইয়া নূতন নগর স্থাপন করে, প্রত্যাগমনের পর গর্ব্ভবতীগণ স্বয়ং আপন আপন পক্ষগুলি নষ্ট করে, অথবা ক্লীবেরা উহা ছিঁড়িয়া দেয়। অতঃপর আর গৃহত্যাগ করিতে পারে না। নিচের তলায় অবস্থিতি করে এবং সর্ব্বদা প্রহরী দ্বারা রক্ষিত হয়, তবে সময় বিশেষে উপর তলায় যাইবার অনুমতি পায়। এ অবস্থায় তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে ক্লীবেরা বিশেষ চেষ্টা করে। মুখে মুখে আহার ধরে এবং কোন আপদ বা আশঙ্কা উপস্থিত হইলে গুর্ব্বিনীদের নিভৃত ও নিশ্চিন্ত স্থানে অগ্রে গিয়া রাখিয়া আইসে।

বহুতর স্ত্রী পিপীলিকা একত্রে বাস করে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার কলহ হয় না। গর্ভবতীবা চলিতে চলিতে ডিম পাড়ে, সহচর ক্লীবেরা উহা কুড়াইয়া ভিন্ন

ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট গৃহে লইয়া যায়। যথাস্থানে স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা জিহ্বারস দেয় ও ওলট পালট করে; তাপের পরিবর্ত্তন হেতু এক ঘর হইতে অপর ঘরে লইয়া গিয়া রাখে ও মধ্যে মধ্যে তা দেয়। এক পক্ষ পরে মাথা ও মুখগুলি বাহির হয়, অপরার্দ্ধ আবৃত থাকে। এই সময়ে ধাত্রীগণ নিয়ত মিষ্টরস খাইয়া তাহাই উদ্গার করিয়া শাবকগণকে আহার দেয়। ইহার পর গুটী বাঁধে, প্রজাপতির ন্যায় ইহারা আপনারা বাহির হইতে পারে না। কার্য্য কুশল পিপীলিকারা সেই সকল গুটী আর্দ্র করিয়া কাটিয়া দেয়, তখন ডিম হইতে বাচ্ছা বাহির হয়। তাহার পর স্ত্রী ও পুরুষ বাচ্ছাগণকে সবিশেষ যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করে, সূর্য্য রশ্মি ঢিপিতে লাগিলে পর নিম্ন তলস্থ সকলকে শুভ সংবাদ দেয়। কেহ আলস্য করিলে তাহাকে কামড়াইয়া বাহির করে। কিয়ৎক্ষণ সকলে আসিয়া রোদ্ পোয়ায় ও জড়াজড়ি করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করে। ডিম্ব ও শাবকদের অল্পক্ষণ মাত্র রৌদ্রে রাখে; অধিক উত্তাপ কালীন উপর তলায় লইয়া যায় এবং অপরাহ্ণে পুনরায় বাহিরে আনে। শিশুদিগকে প্রথম প্রথম স্বয়ং বেড়াইতে ও আহার করিতে শিখায় এবং পদলোম দিয়া উহাদিগের অঙ্গ সকল পরিস্কার করিয়া দেয়।

দ্রব্যাদি বহনে ইহারা যে কতই কৌশল প্রকাশ করে, তাহা বলা যায় না। অধিক ভার হইলে কতকগুলি একত্রিত হইয়া টানে, অপরেরা অন্য দিক্ হইতে ঠেলিতে থাকে। কতই উলট পালট ও দিগ্‌বাজি খায়, কিন্তু কিছুতেই ছাড়ে না, যে কোন প্রকারে হউক উহা গৃহে লইয়া যাইতেই চায়।

ইহাদিগের পরস্পর বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ ও প্রেম দেখা যায়, এবং সেই নিমিত্ত পরস্পর সাহায্য করিতে বিশেষ যত্নবান। কেহ শ্রান্ত

হইলে অপরে তাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করে। যাহারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করে তাহারা সদা সর্ব্বদা ব্যস্ত, অন্যে তাহাদিগকে আহার আনিয়া যোগায়, কেহ আহত হইলে অন্যে তাহাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে গমন করে। লাট্রিল নামক এক জন সাহেব একটী পিপীলিকার শূয়া ছিঁড়িয়া দেওয়াতে অপর একটী আসিয়া জিবে করিয়া ফোঁটা কতক জর্দ্দা রস ক্ষত স্থানে লাগাইয়া আরাম করে। ইহারা পরস্পর বিলক্ষণ চিনিতে পারে এবং বহুদিনের পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। কীটতত্ত্বজ্ঞ হুবর সাহেব এক দল পিপীলিকা ধৃত করিয়া কতকগুলিকে একটী কাচের বাক্স মধ্যে রাখিলেন ও অপর গুলিকে ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা নিকটস্থ এক বৃক্ষতলে বাসা করিল। ৪ মাস পরে তাঁহার বন্দী পিপীলিকাদের মধ্যে কয়েকটী সুযোগ ক্রমে পলাইয়া বৃক্ষতলস্থ পূর্ব্ব আত্মীয়গণ সহ দেখা করাতে শূয়া দ্বারা পরস্পর আলিঙ্গন, মুখ চুম্বন ও নানা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক তথাকার গর্ত্তে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে তথা হইতে কতকগুলি বাহির হইয়া সাহেবের কাচের বাক্স হইতে সকলকে ডাকিয়া আনিল। একটীও তথায় রহিল না। ইহারা সুস্বাদু বা সুমিষ্ট দ্রব্য পাইলে পেটুকদের ন্যায় তাড়াতাড়ি আপনারাই উদরস্থ করে না, আত্মীয় ও সঙ্গীগণকে ডাকিয়া সকলে মিলিয়া খায়।

ইহারা সর্ব্বভুক। পচা বা টাট্‌কা মাংস, ফল, মূল, মিষ্টান্ন ও রস এ সমস্তই ইহাদের প্রিয়। ছোট ছোট কীট মারিয়া তাহাদিগের শোণিতও খাইয়া থাকে।

যতদিন বাঁচিব, সেই গজগামিনী মধুর ভাষিণী মদালসার পারলৌকিক কুশল সাধনে জীবন ক্ষয় করিব।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

অনন্তর নাগপুত্রেরা কহিলেন, পিতঃ! যুবরাজ ঋতধ্বজ অধুনা সেই প্রাণসমা প্রিয়তমা মদালসার বিয়োগে সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীভোগ বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়া সমান বয়স্ক সুশীল বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিতেছেন। যুবরাজ এখন এই ভাবে জীবিত কাল অতিবাহিত করিবেন। এ জন্মের মত তাঁহার সুখভোগ বাসনা একেবারে অন্তর্বিলীন হইয়াছে। হে তাতঃ! প্রিয়বয়স্যের তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলাম, এক্ষণে তাঁহার অনন্তর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে কে সমর্থ হইতে পারে? অন্যের কথা কি কহিব, দেবতারাও সমর্থ হইতে পারেন কি না সন্দেহ।

নাগরাজ পুত্রদ্বয়ের বাক্য শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! রাজকুমার ঋতধ্বজ আমার পুত্রদ্বয়ের বন্ধু, সুতরাং পুত্রস্থানীয়। তাঁহার যেরূপ শোকাবহ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম, ইহাতে কোন ক্রমেই ঔদাস্য অবলম্বন করিয়া থাকা সমুচিত নহে। বিশেষতঃ পুত্রেরা বন্ধুঋণে বদ্ধ হইয়াছেন, কোনরূপ প্রত্যুপকার সাধন দ্বারা ঋণমুক্ত হইতে উহাদিগের সামর্থ্য নাই, অতএব এই অনন্যসাধ্য ব্যাপারে আমারেই প্রবৃত্ত হইতে হইল, আমি ভিন্ন যুবরাজের বাঞ্ছিতার্থ সাধনে অন্য কেহ উদ্যত হইবে এরূপ বোধ হয়'না।

মহামতি নাগপতি এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া পুত্রদিগকে স্মিতমুখে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ! তোমাদিগের প্রিয় বয়স্য রাজকুমারের অভীষ্ট কার্য্য সাধ্যই হউক বা অসাধ্যই হউক, তৎসম্পাদন বিষয়ে আমি যথাবিধানে যত্নবান্ হইব। মনুষ্যেরা অসাধ্য বলিয়া তৎসাধনে যত্ন না করিতে পারে, কিন্তু আমি যদি নিরুৎসাহ হই, তাহা হইলে নিতান্তই কার্য্য হানি হইবে, আর সেই সুধীবর তরুণ বয়স্ক রাজকুমার আজীবন ব্রহ্মচারীর ন্যায় চির-দিন যারপর নাই অসুখে সময় যাপন করিবেন। যাবজ্জীবন প্রণয়িনী মদালসার কালানল সম অসহ্য শোকানলে তাঁহাকে দগ্ধ হইতে হইবে। দৈব ও পুরুষকার এই দুইটী সাধন থাকিলে অনায়াসেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। পৌরুষ প্রকাশে না হয়, আমি দৈবকে আশ্রয় করিয়া যাহাতে অচিরাৎ রাজকুমারের কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, সেইরূপ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইব। এই বলিয়া নাগেন্দ্র পুত্রদিগের নিকটে বিদায় লইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতের প্লক্ষাবতরণ নামক তীর্থে প্রস্থান করিলেন।

ঐ তীর্থ পবিত্র পুণ্যস্থান, তথায় গমন করিলে দেহ মন পবিত্র হয়। তথায় হিংসা, দ্বেষ, মৎসর প্রভৃতি কিছুই নাই। পবিত্রাত্মা ঋষিগণ সর্ব্বদা অবগাহনার্থ তথায় গমন করিয়া থাকেন। ঐ স্থান অপূর্ব্ব কুসুমামোদে নিয়ত আমোদিত। তথায় নানাবিধ কলকণ্ঠ বিহঙ্গম সর্ব্বদা কলস্বরে কূজন করে; এবং নির্ঝরিণীর নির্ম্মল বারি নিয়তই প্রবাহিত হয়। তথায় হিংস্র জন্তুগণের অসদ্ভাবে অন্যান্য প্রাণিবর্গ অকুতোভয়ে সতত বিচরণ করে। নানাবর্ণে সুরঞ্জিত শিখিকুল সর্ব্বদা নৃত্য ও মদালসা মৃগীগণ চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিয়া থাকে। তথায় স্বভাবের শোভা অতীব মনোহর। তথা হইতে

তুষার-সাগরের ন্যায় ধবলগিরির শ্বেতমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। নাগেন্দ্র সেই রমণীয় প্লক্ষাবতরণ তীর্থে উপনীত হইয়া তথায় অবগাহন পূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের রসনাবিলাসিনী সরস্বতী দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কিয়ৎকাল তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া পরিশেষে প্রণতি পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন।

হে ভগবতি ভারতি দেবি! তুমিই ব্রহ্মযোনি এবং স্বর্গ ও অপবর্গের উপায়স্বরূপ, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অবলীলাক্রমে প্রদান করিতে পার। তুমি অনাদি নিধন ও এই বিশ্ব সংসারের মূল কারণ, তুমিই সামাদি বেদচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়াছ, তোমাকে প্রাপ্ত হইলে কোন পদার্থেরই অসম্ভাব থাকে না। তুমি সৎ ও তুমিই অসৎ। পরম অক্ষর ব্রহ্ম ও ক্ষরাত্মক বিশ্ব এ উভয়ই তুমি, অতএব আমি তোমার চরণে বার বার নমস্কার করি। তুমি দারু সংস্থিত বহ্নির ন্যায় ও পার্থিব পদার্থান্তর্গত পরমাণুর ন্যায় সকল মূর্ত্ত শরীরে বিরাজমান আছ। কি স্থাবর জঙ্গম জগৎ, কি ওঁকারাত্মক অক্ষর সংস্থান সকলই তোমাতে অবস্থান করিতেছে। তিন বেদ, তিন লোক, ত্রিবিধ বহ্নি, তিন জ্যোতিঃ, বর্ণত্রয়, শব্দ ত্রয়, মাত্রাত্রয় ও গুণত্রয় তোমাতেই অন্তর্লীন আছে। তুমিই কালত্রয় রূপিণী আকাশবাসিনী সরস্বতী, তোমারে নমস্কার। তুমি অবিকৃত, পরিণাম রহিত ও বচনাতীত, অন্যের কথা কি, ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণও তোমার স্বরূপ কথনে সমর্থ নহেন, সুতরাং কিরূপে পরিমিত বর্ণে তোমার অপরিসীম মহিমার কীর্ত্তন করিব। তুমি নানাবিধ শক্তিশালী ব্যক্তিগণের মূল শক্তি, তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমিই বসু, তুমিই অর্ক, তুমি ব্রহ্মা, তুমি জ্যোতিঃ, তুমিই সাংখ্য বেদান্তাদিদর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, অধিক কি, তুমিই সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিয়া

রহিয়াছ। যাহা কিছু নিত্য পদার্থ ও যাহা অনিত্য বস্তু, যাহা স্থূল, যাহা সূক্ষ্ম ও যাহা অতি সূক্ষ্ম, যাহা ভূমিগত, যাহা অন্তরীক্ষস্থিত ও যাহা পাতালাদি অন্য ভুবনান্তর্গত, সেই সমস্ত পদার্থই তোমাতে উপলব্ধ হইয়া থাকে। তোমারই স্বরব্যঞ্জনে অখিল ভুবনকে ব্যক্ত করিতেছে। অতএব ভক্তিভাবে আমি তোমাকে অভিবাদন করি, তুমি কৃপা করিয়া এই দীন হীনের প্রতি করুণাকটাক্ষ নিক্ষেপ কর।

তখন সরস্বতী নাগরাজের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও মধুরস্বরে কহিলেন, বৎস নাগেন্দ্র! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা বল, আমি বর দান দ্বারা তাহা সফল করিব। তৎ শ্রবণে অশ্বতর কহিলেন, মাতঃ! যদি দীনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার ভ্রাতা কম্বলের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, আমার প্রতি সেইরূপ করুণা বিতরণ পূর্ব্বক কৃতার্থ করুন। হে দেবি! যাচ্ঞা করি, যেন আপনার কৃপায় আমি সমস্ত স্বর সম্বন্ধের অধিকারী হইতে পারি।

অনন্তর সরস্বতী কহিলেন, পন্নগেশ্বর! তুমি ও তোমার ভ্রাতা কম্বল আমার প্রসাদে সপ্তস্বর, রাগ, সপ্তগীত, সপ্ত মূর্চ্ছনা, একোন-পঞ্চাশৎ তাল ও গ্রামত্রয় এই সমস্ত গান করিতে পারিবে এবং আমার কৃপায় তোমরা অপর চতুর্বিধ পদ, ত্রিপ্রকার তাল ও ত্রিবিধ-লয় জানিতে পারিবে। আর আমি ঐ সমস্ত সঙ্গীতের অন্তর্গত যতিত্রয়, স্বর ও ব্যঞ্জন-সমন্বিত চতুর্বিধ বাদ্য তোমাদিগকে প্রদান করিলাম। তোমাদিগের সদৃশ গীতকর্ত্তা কি পাতাল, কি ভূলোক, কি দেবলোক কুত্রাপি থাকিবে না। এমন কি, তোমরা গান করিলে দেবদেব মহাদেব পর্য্যন্ত মোহিত হইবেন। এই সঙ্গীতের প্রভাবে

সংসারে তোমাদের কিছুই অসাধ্য থাকিবে না। এই বলিয়া কমলনয়না সরস্বতী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। ভগবতী সরস্বতীর প্রভাবে তাঁহারা দুই জনেই পদ তাল স্বরাদি সম্বলিত সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে অদ্বিতীয় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

নাগরাজ অশ্বতর ভ্রাতা কম্বলের সহিত মিলিত হইয়া মহাদেবের আরাধনার্থ তন্ত্রীবাদন পূর্ব্বক সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ংসময়ে ও নিশাভাগে সুমধুরস্বরে ভগবান ভবানীপতির আরাধনা ও স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, তৎশ্রবণে মহেশ্বর বৃষধ্বজ সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে নাগরাজ! আমি তোমাদিগের স্তব গানে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছি, এক্ষণে প্রার্থনা কি, ব্যক্ত করিয়া বল। তাঁহারা সেই দেবদেব ত্রিলোচনের দর্শনে আপনাদিগকে চরিতার্থ করিয়া মানিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আমাদিগের প্রতি কৃপা হইয়া থাকে, তবে বাঞ্ছিত বরদান দ্বারা আমাদিগকে চরিতার্থ করিতে হইবে, আমাদিগের আর অন্য কোন স্বার্থসাধন বিষয়ে অভিলাষ নাই। আমাদিগকে এই বর দিন, রাজকুমার ঋতধ্বজের পত্নী মদালসা অকারণে অসময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐ পতিপ্রাণা সতী যে বয়সে ও যেরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, যেন আবার সেই বয়সে ও সেই রূপে আমার কন্যা হইয়া অচিরাৎ জন্মগ্রহণ করেন।

মহাদেব কহিলেন, হে ভুজগরাজ! আমি তোমার প্রতি যার পর নাই প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা অসাধ্য ব্যাপার হইলেও আমার প্রভাবে অচিরাৎ লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু আমি তোমায় যেরূপ উপায় বলিয়া

দিতেছি, তুমি ভক্তিভাবে সেইরূপ আচরণ করিবে। মদালসার শ্রাদ্ধকালে যে পিণ্ডত্রয় প্রদত্ত হইবে, তুমি তাহার মধ্যমপিণ্ড পবিত্র মনে ভক্ষণ করিবে। তাহা হইলে সেই কল্যাণী মৃত্যুসময়ে যেরূপ ছিলেন, অবিকল সেইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া তোমার মধ্যফণা হইতে সমুদ্ভূতা হইবেন। এই বলিয়া উমাপতি অন্তর্ধান করিলেন। নাগরাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কম্বলের সহিত শিবচরণে প্রণাম করিয়া সানন্দমনে রসাতলে গমন করিলেন। অভীষ্ট সংসিদ্ধিজনিত আনন্দভরে তাঁহার মুখকমল প্রফুল্ল ও নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি পুলকিতান্তঃকরণে নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। কিয়দ্দিন পরে নাগেশ্বর শূলপাণির আদেশানুরূপ মদালসার শ্রাদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং তচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া নির্দ্দিষ্ট মধ্যম পিণ্ড ভোজন করিলেন। দৈবের কি অচিন্ত্য প্রভাব ও কি মহীয়সী শক্তি! ভোজন পরক্ষণেই নাগরাজের মধ্যম ফণা হইতে তদ্রূপাকৃতি সুলোচনা মদালসা আবির্ভূতা হইলেন। তদ্দর্শনে ভুজগেশ্বরের মনে আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী চারুশীলা মদালসার রূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বিধাতার রমণীরত্ন নির্ম্মাণ কৌশলের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে সেই সুমুখীর রূপলাবণ্য-প্রভায় নাগ-রাজের বাস-ভবন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নাগপতি এই বৃত্তান্ত কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। তিনি মদালসাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আর চিন্তা নাই, অচিরাৎ তুমি প্রাণ-পতির দর্শন পাইবে। এক্ষণে তুমি এই অন্তঃপুর মধ্যে আমার কন্যারূপে অবস্থান কর। এই বলিয়া তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক অন্তর্ভবনে রাখিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

এ দিকে নাগকুমারদ্বয় প্রতিদিন রাজকুমার ঋতধ্বজের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকে ও নানা শাস্ত্রের আলাপে কালাতিপাত করেন। একদা নাগকুলস্বামী অশ্বতর পুত্র-দ্বয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎসগণ! রাজকুমার ঋতধ্বজ তোমাদিগের পরম মিত্র ও বিশেষ উপকারী। আমি পূর্ব্বে তোমা-দিগকে কহিয়াছিলাম যে, তাদৃশ উপকারী বন্ধুর প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য, নতুবা মিত্রঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা নাই। তোমরা তাহার কি করিলে? আমি মনে মনে প্রত্যুপকারের বিষয় স্থির করিয়াছি, অতএব তোমরা যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার আলয়ে লইয়া আসিবে, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অভিলাষ হইয়াছে।

নাগকুমারেরা স্নেহবান পিতার তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া সানন্দমনে বয়স্য ঋতধ্বজের ভবনে গমন করিলেন এবং অন্যান্য আলাপের পর ক্রীড়া করিতে করিতে কহিলেন, সখে ঋতধ্বজ! আমরা প্রতিদিন তোমার ভবনে আগমন করিয়া থাকি, বন্ধুভাবে তুমিও আমাদিগের প্রতি যার পর নাই স্নেহ করিয়া থাক। আর তোমা হইতে আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার প্রত্যুপকারসাধনে আমাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ হয়। যদিও তোমার কোন বিষয়ের অপ্রতুল নাই বটে, তথাপি বন্ধুজনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণয়োপহারস্বরূপ একগাছি তৃণ প্রদান করিলেও তাহা সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হয়। যাহা হউক, আমরা তোমায় অনুরোধ করিতেছি, তোমাকে এক দিন আমাদিগের আলয়ে গমন করিতে হইবে।

রাজকুমার প্রণয়পবিত্র মিত্রগণের বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বয়স্যগণ! তোমরা কি কথা বলিতেছ, তোমরা

আমার হৃদয়াধিক বন্ধু, তোমাদিগের ভবন ও আমার ভবন, এ উভয়ের অন্তর কি? আমি জানি, এই আমার ধন, রত্ন, যান, বাহন প্রভৃতি যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, তাহাতে আমার যেরূপ অধিকার, তোমাদিগেরও সেইরূপ, তবে আমাকে যদি কিছু ধন রত্ন বা যান বাহনাদি প্রদান করিতে তোমাদিগের বাসনা হইয়া থাকে, তবে এই স্থানেই অর্পণ করিতে পার। দগ্ধ বিধাতা আমায় এরূপ বঞ্চিত করিয়াছেন যে, তোমরা আমার প্রাণাধিক বন্ধু হইয়াও মদীয় ভবনে মমতা প্রকাশ কর না, ভিন্নভাব মনে করিয়া থাক। যাহা হউক, যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে তোমরা অভিলাষী হও, তবে এই কর, আমার ভবনে ও যান বাহনাদি যাবতীয় ধনে যেন তোমাদিগের আত্ম সম্পত্তি বলিয়া বোধ থাকে। তাহা হইলেই আমি সবিশেষ অনুগৃহীত হইব। তোমরা ইহা নিশ্চিত জানিবে, যাহা তোমাদের, তাহা আমার এবং যাহা আমার, তাহা তোমাদের। অতএব হে বন্ধুগণ! তোমরা আমার বহিশ্চর প্রাণ, ঐরূপ ভিন্নভাবসূচক বাক্য আর কখনও বলিও না। ঐ প্রকার কথা শুনিলে আমার মর্ম্মস্থানে বেদনা বোধ হয়।

অনন্তর নাগপুত্রদ্বয় স্নেহপূর্ণ নয়নে প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, ঋতধ্বজ! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সকলই সত্য বটে, আমরাও মনে মনে সেইরূপ ভাবিয়া থাকি, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের স্নেহবান পিতা তোমার দর্শনে সমুৎসুক হইয়া তোমারে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন, সেই নিমিত্তই তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছি। তোমারে দেখিবার জন্য তাঁহার যে অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে, ইহা তিনি আমাদিগের সমক্ষে পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন।

কন্যা আবার চুপ করিয়া আবার কহিলেন, আমারে ফেলিয়া কোথায় যাইবে?—ইহলোকেও আমি তোমার, পরলোকেও আমি তোমার পাশে বসিব, এই আমার পণ,—এই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি কুমারী;—আমি এই চন্দ্রপর্ব্বতের নরপতির কুমারী, আমার বিবাহ হয় নাই,—আমি রাজকন্যা, আমারে ফেলিয়া কোথায় যাইবে? তুমি আমারে বিবাহ করিবে বলিয়াছ,—কর;—আমি তোমার স্ত্রী;—সঙ্গে সঙ্গে যাইব,—যেখানে যাইবে, সঙ্গে যাইব। তোমারে হারাইয়া পৃথিবীতে থাকিব না। জীবনে কাজ কি?—এ ছার জীবনে——"

রাজকন্যা কথা সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রিয়-রত্নের নেত্র স্থির হইল,—শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল!—রাজকুমারী আর কাঁদিলেন না, "এসো জন্মশোধ আলিঙ্গন করি!" বলিয়া গাঢ় আবেশে একটী চুম্বন করিলেন। সেই একটী চুম্বন সে জন্মের শেষ। "আমার সঙ্গে মৃত্যুর ঔষধ আছে!" এই কথা বলিয়া একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন! বিদ্যাধরী নক্ষত্র-গতি সমীপস্থ হইয়া দক্ষিণ করপল্লবে সেই নিশ্বাস ধরিল! কহিল, "সুখে নিদ্রা যাও! দ্বিতীয় জগতে তোমার বিশুদ্ধ আত্মার মঙ্গল হইবে! আমি চলিলাম!" রাজকন্যার প্রাণবায়ু তখন সেই নিশ্বা-সের সঙ্গে উড়িয়া গিয়াছে।

নিশ্বাস লইয়া বিদ্যাধরী উড়িয়া গেল।—অমরাবতীর দ্বারে গিয়া প্রহরীরে বলিল, এই দেখুন, একটী পরম রূপবতী যুবতী কুমারীর নিষ্কলঙ্ক পবিত্র প্রণয়ের শেষ নিদর্শন দীর্ঘ নিশ্বাস আনিয়াছি! গন্ধর্ব্ব হাসিয়া কহিলেন, সুন্দরি! হইল না!—এই দেখ, নন্দনের সিংহ দ্বার একটুও নড়িতেছে না। আরো কিছু দুর্লভ বস্তু চাই।

বিদ্যাধরী ভাবিল, তবে আর সুরপুরীর সুখ আমার অদৃষ্টে নাই। আরো দুর্লভ বস্তু কোথায় পাইব? ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার পৃথিবীর দিকে পক্ষ সঞ্চালন করিল।

তৃতীয় উপহার।

বিদ্যাধরী এবার সুমেরু পর্ব্বতে চলিল। মেরুশিখর একটী মনোহর পুষ্পকানন বিরাজিত। উপত্যকা ভূমিও মনোহর পুষ্পকুঞ্জে সুশোভিত। শ্বেত, লোহিত, পীত, পাটল, নীল ও আরক্তিম কুসুমাবলি প্রস্ফুটিত হইয়া সেই মনোহর স্থানটী আরও মনোহর করিয়াছে। সন্ধ্যাকাল, বসন্তের যৌবন দশা, মৃদুমন্দ মলয় মারুত সেই সকল সুদৃশ্য সুমোহন কুসুমের সুরভি পরিমল চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত করিয়া দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে। মধুপিপাসী, মধুমত্ত মধুকরেরা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, কুসুমগুলির পাখা হইয়াছে। ভ্রমরেরা একবার গুন্ গুন্ গুঞ্জন করিয়া ফুলে ফুলে মধুপান করিতেছে, একবার "মনে মনে তোরে যে ভালবাসি"— —যেন মধুরস্বরে এই গীত গাইতে গাইতে, পাতার উপর,—ফুলের উপর, উড়িতেছে,—উড়িতে জানে বলিয়া উড়িতেছে—না,—লোকে দেখুক, আমরা মধুপান করিয়া কেমন খেলা করিতেছি, এটী ভাবিয়াও উড়িতেছে না,—প্রমোদে মাতিয়া উড়িতেছে। পাঠক মহাশয়! ভ্রমর আর মৌমাছি, ইহারা দুই পৃথক শ্রেণী,—নিতান্ত পৃথক না হউক স্বতন্ত্র শ্রেণী।—আমি আজ মধুকর ভ্রমরকে মধুমক্ষিকা বলিব।—বলিবার একটী হেতুও আছে। আমি বলি-

তেছি না,—সুরবালা অপ্সরার মুখে এই শোভার বর্ণন হইতেছে,‚ মনে করুন, এটী যেন গান্ধর্ব্ব ভাষা।

পত্রিকা এই কথা বলিয়া একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, পরী বলিল, মধুপাবলি উড়িতেছে। বোধ হইতেছে যেন, সুমেরুর উপত্যকা ভূমির অলঙ্কার পুষ্পমালার উপর নীলমণি উড়িতেছে। স্থানের মাহাত্ম্যে নীলকান্ত মণির বুঝি পাখা উঠিয়াছে। গগন-বিহারিণী পরী যাহা বলে, তাহাই সম্ভব।

শৈলেন্দ্র সুমেরুর আসন্নতল পরম রমণীয়।—অচলবর রূপে ধূম্রবর্ণ, চন্দ্রকিরণে কটিশিলাখণ্ড শুভ্রবর্ণ, প্রতিফলিত সোমজ্যোতিতে স্বচ্ছ প্রস্তরমালা প্রতিবিম্বিত, নবীন হিমাংশু যেন রবি-শোকে,—দিবা শোকে শতধা—সহস্রধা বিদীর্ণ, শিখর গাত্রে যেন শত শত নক্ষত্র, শত শত অয়স্কান্ত জ্বলিতেছে,—খদ্যোতেরা স্পর্দ্ধা করিয়া পার্ব্বতী তরুলতাকে আচ্ছন্ন করিতে আসিয়াছে, পারিতেছে না, চন্দ্রমা তাহাদের দর্প চূর্ণ করিতেছেন। বিষণ্ণ নিশাকর ক্ষুদ্র-জীবির উপর এত ক্রুদ্ধ কেন?—কারণ আছে। গিরিনির্ঝরে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয় না, স্বচ্ছতোয়া নদীতে পদ্মিনীও ফুটে না। পঙ্কিল সরোবরেই কমল কুমুদ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পর্ব্বত-প্রদেশে তেমন জলাশয় নিকটে নাই, নিশানাথ সেই জন্য বিষণ্ণ আননে প্রণয়িনীর আবাসস্থান অন্বেষণ করিতেছেন। এ সময় কুমুদিনী ছাড়া যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহারই উপর কোপ হইতেছে। সেই জন্যই গিরিহৃদয়ে,—নির্ঝর সলিলে তাঁহার পাণ্ডু কলেবর খণ্ড খণ্ড হইয়া দশদিকে কুমুদিনীর তত্ত্বে ব্যস্ত হইতেছে। তারানাথের অসংখ্য তারকা চক্ষু আকাশ হইতে ভ্রুকুটি করিতেছে। পুষ্পকুঞ্জ আহ্লাদে হাসিতেছে। 'পরী দেখিল, শৈলতলে, শৈল-

শিখরে, নির্ঝর-সলিলে, অপূর্ব্ব শোভা;—চিত্ত বিমোহিনী—মনোহারিণী শোভা।

স্থানে স্থানে পুরাতন সিদ্ধ ঋষি আর সংসারবিরাগী তপস্বীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম। অপ্সরা সুরমালা সেই আশ্রম-প্রান্তে-ক্ষেত্র কুঞ্জে নামিয়াছে,—কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না,—কুঞ্জলতিকা বেষ্টিত মনোরম উপত্যকা জনশূন্য,—প্রাণীশূন্য নয়,—পশুপক্ষী নিনাদিত মধুকুঞ্জ;—হিংস্র জন্তু আছে, শ্বাপদ সিংহ ব্যাঘ্র আছে, হিংসা নাই, মনুষ্যসঞ্চার নাই,—মৃগশিশু ব্যাঘ্রক্রোড়ে, শশশিশু সিংহীক্রোড়ে সুখে বিহার করিতেছে, অজগর সর্প ভেকপুত্রের শিরশ্চুম্বন করিতেছে, কিন্তু মানব সঞ্চার নাই।—স্বর্গচ্যুতা সুরমালা যেন সত্যযুগ দর্শন করিল,—পৃথিবীতে ম্লেচ্ছ যবনাধিকার আরম্ভ, কলি প্রাদুর্ভূত, পরী তাহা জানিল না।

পত্রিকা যখনকার গল্প বলিতেছেন, তখন যবনভূষণ আকবর শাহের প্রপৌত্র আরঙ্গজেব দিল্লীর বাদশাই তক্তের সম্রাট, পরী সুরমালা যখন সুমেরুর আসন্ন ক্রোড়ে আসিয়াছে, তখন সেকেন্দর শাহ সিন্ধুনদকূলে দ্বিতীয় পরশুরামের (পোরসের) সহিত যুদ্ধ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, কালের সামঞ্জস্য নাই। গিজনীর মহম্মদ হিন্দুবংশ জয় করিয়াছেন, তথাচ পরী দেখিল, সত্যযুগ বিরাজমান্। ডাকাইত আসুক, তস্কর আসুক, দস্যু আসুক, রাক্ষস আসুক, ভারতভূমির তপোবনে অশান্তি আসিবে না। সুরমালা তাই দেখিল, সুমেরুর উপত্যকায় সত্যযুগ।

অপ্সরা সুরমালা সেই মেরুকুঞ্জের বহুদূর বিচরণ করিল, স্থানের রমণীয়তায় কখনো কখনো হর্ষোদয় হইতেছে, দেবলোকে প্রবেশের উপহার লইতে আসিয়াছি, পাইতেছি না, এই চিন্তায় কখনো

কখনো বিষণ্ণ হইতেছে। দূরে বনবাসী ঋষিদিগের আশ্রম দেখিতে পাইল, মানবসঞ্চার দেখিতে পাইল না। ক্রমশই বিষণ্ণ,—ক্রমশই —উদ্বেগযুক্ত।—রাত্রি চারিদণ্ড।

রাত্রি চারিদণ্ড।—নিশাপতি চন্দ্রমা পূর্ব্বাকাশে ঈষৎ হাস্য আননে তারকা মণ্ডলীর সহিত প্রেমভাবে আলাপ করিতেছেন,—পৃথিবীর দূরস্থ সরোবর সলিলে কুমুদিনী,—দিবাবিরহিণী—কুল-লজ্জাবিরহিণী কুমুদিনী এতক্ষণ মৌনমুখী ছিল, এখন অভিসারিকার ন্যায় ঘোম্‌টা খুলিয়া, মুখ তুলিয়া, বুক ফুলাইয়া জলের উপর ভাসিতেছে, নিশাকর এখন তাহারে দেখিয়া হাসিতেছেন। আকাশের সেই হাসির দীপ্তি ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত করিতেছে। ধরিত্রী জননী এ সময়ে জ্যোৎস্নাময়ী।

পুষ্পকুঞ্জের একটী পার্শ্বকেন্দ্রে একটী গোলাপ-শয্যাতলে একটী শিশু বসিয়া খেলা করিতেছে। পরী দেখিল, সেই বালক এক দৃষ্টে পুষ্পপ্রতি চাহিয়া আছে, হাসিতেছে, ভূমিতলে কোমল করপল্লব আঘাত করিতেছে, একটী ফুল ধরিবে ধরিবে বলিয়া হাত বাড়াইতেছে, ধরিতে পারিতেছে না। শিশুর বয়স ঊর্দ্ধ সংখ্যা দুই বৎসর। পুষ্প দুষ্প্রাপ্য হইল, উঠিয়া দাঁড়াইল, তথাপি ধরিতে পারিল না। কন্টক বিদ্ধ হইল, ব্যথা লাগিল, কাঁদিল না। বালকেরা যখন আনন্দে —নিমগ্ন থাকে, যখন কোনো প্রিয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন সামান্য অসুখে, সামান্য বেদনায় ভ্রূক্ষেপ করে না। সকলেই জানেন, বালস্বভাবে এটী প্রসিদ্ধ। সুরমালা দেখিল, বালক আলোহিত দুগ্ধ-বর্ণ, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল কমল সদৃশ, গ্রীবা হ্রস্ব, বক্ষ স্থূল, মোলায়েম, হস্তপদ নিটোল, গোল, কোমল। কেশগুলি অযত্নে রুক্ষ, সন্ধ্যা সমীরণে ফুরফুর করিয়া উড়িতেছে,—ইহাও এক অপূর্ব্ব শোভা। সুরমালা

ভাবিল, ইহার কি মাতা নাই? সাদরে যত্ন করে, এমন কি কেহই নাই? এই নিশাকালে এই বিজন প্রদেশে এমন অমূল্য রত্ন ছাড়িয়া দিয়াছে, দেখিবারও কি লোক নাই?—আমি ইহারে তুলিয়া লইব। এই অমূল্য নিধি আমার স্বর্গ-নন্দনে প্রবেশের মহার্হ উপহার হইতে পারিবে। ক্ষণকাল যদি আর কেহ আসিয়া ইহারে ক্রোড়ে করিয়া না লয়, ক্ষণকাল যদি আর কেহ আসিয়া এই পূর্ণশশীটী লইয়া না যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি এটীকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইব। দেবরাজ পুরন্দর আর শচীদেবী অবশ্যই ইহা প্রাপ্ত হইলে আমারে নন্দনবনে প্রবেশ করিতে দিবেন। দেখি, শিশু আর কতক্ষণ একাকী থাকিয়া আরও বা কি করে। এইরূপ চিন্তা করিয়া অপ্সরা সুরমালা একটী অশোকতরুর অন্তরালে দাঁড়াইল। কেহ দেখিতে না পায়, এই ভাবে লুকাইল।

আর দুই দণ্ড অতীত। সহসা উত্তরদিক হইতে গিরিকুঞ্জ ভেদ করিয়া একজন বিকটাকার, দীর্ঘকায় পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। তাহার শরীর ক্ষুদ্র তালতরু সদৃশ, বর্ণ কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ, হস্ত পদ পার্ব্বতীয় ভুজঙ্গের ন্যায়, মস্তকে এক গাছিও কেশ নাই, মস্তক শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা তৃতীয়াংশ ক্ষুদ্র। দন্ত বিশাল, কর্ণ ছোট, নাসিকা চাপ্‌টা, বক্ষ আর উদর এক আয়তনে প্রশস্ত। আপাদ মস্তক দর্শন করিলেই ঘৃণার সহিত ভয়ের সঞ্চার হয়।

বালক যেস্থানে বসিয়াছিল, ঐ আগন্তুক ভীষণ মূর্ত্তি ঠিক তাহারই অনতিদূরে আসিয়া বসিল। সেই লোক আকারে যাদৃশ ভয়ঙ্কর, মুখ চক্ষের ভাবে তাদৃশ ভয়ানকত্ব ছিল না। বরং সে মুখ—সে চক্ষু নিরীক্ষণ করিলে দুঃখ হয়। আকৃতিতে যে ভাব প্রকাশ করে, সে ভাবের অন্তর হইয়া দাঁড়ায়।

সেই মূর্ত্তি নিকটে আসিয়া বসিয়াই এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কে আসিয়াছে, পদ সঞ্চার হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া বালক সেই দিকে মুখ ফিরাইল। উভয়ের চারি চক্ষু একত্র মিলিত হইয়া নির্নিমেষ হইল। বালক স্থিরনেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে, যে মুখে এতক্ষণ মধুর হাস্য ক্রীড়া করিতেছিল, সে মুখে এখন হাসি নাই,—হাসি নাই, কিন্তু কোনো শঙ্কার চিহ্নও নাই। স্থির, গম্ভীর, প্রশান্ত, নিশ্চল। অসুরোপম তস্কর মনে মনে ভাবিল, এ কি আশ্চর্য্য! এই দুগ্ধপোষ্য শিশু আমাকে দেখিয়া ভয় পাইল না! জনস্থানের সর্ব্ব প্রাণী আমার নামে, আমার দর্শনে আতঙ্কে আকুল হয়, এই কোমল হৃদয় শিশু একটীবার কম্পিতও হইল না, চক্ষে এক বিন্দু জলও আসিল না,—বিস্ফারিত চক্ষু একটীবার মুদ্রিতও করিল না! কি আশ্চর্য্য! যেন কোনো সুখদৃশ্য বস্তু দর্শন করিয়া আমোদিত হইতেছে! এমন নির্ম্মল-চিত্ত বালক আমি কুত্রাপি দেখি নাই।

দৈত্য ও বালকের অচঞ্চল নেত্রমিলন সন্দর্শন করিয়া বৃক্ষান্তরাললুক্কায়িতা পরী মনে করিল, আহা! এ কি অপূর্ব্ব ভাব! এই অসুরের কঠোর চক্ষু অপ্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, আর এই শিশুর সুকোমল নেত্রপুট যেন নিষ্কম্প সলিলে পদ্মের ন্যায় হাস্য করিতেছে! আহা! এই শিশুটী কি জ্যোতির্ম্ময়!—নির্ভীক, দেবোপম, শান্তিগুন সম্পন্ন! ইহার প্রতি নিশ্চয়ই দেবতাদের অনুগ্রহ আছে সন্দেহ নাই। এই দুরন্ত দস্যুর বিকট চক্ষু যেন দুটী নির্ব্বাণোন্মুখ দেউটীর ন্যায়;—সমস্ত রাত্রি জ্বলিয়াছে ইহ জগতের যাবতীয় দুষ্ক্রিয়া সমাধা হইতে দেখিয়াছে, সাক্ষী হইয়াছে, আর এই হিন্দোলালালিত পবিত্র হৃদয় বালকের চক্ষু যেন নবোদিত

অরুণের তুল্য নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল! এই উভয়ের সঞ্চারে,—সংক্রমণে আজ আমি কি শোভাই দর্শন করিলাম।

বালক সেই ভীষণ মূর্ত্তির প্রতি স্থির নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। অসুরের নেত্রপুটও সমভাবে স্থির। সে পুনরায় ভাবিল, অহো! জগৎ কি লোভের সামগ্রী! আমি আজন্ম অধর্ম্মপথে ভ্রমণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হই নাই, আজ প্রাতঃকালেও আমার মন অসৎ-পথের প্রতি ঘন ঘন আবর্ত্তন করিয়াছে! আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এখন আর সে ভাব নাই। এই পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া,—ভূতলে জানু পাতিয়া বসিল;—নয়নযুগল উর্দ্ধদিকে তুলিল, দুটী পাণিতল একত্র করিয়া ভগবানের উদ্দেশে অনুতাপ করিতে লাগিল। এক একবার সমীপস্থ শিশুর বদনমণ্ডলে কটাক্ষপাত করে, তাহার হৃদয় হাসিতেছে, চক্ষু হাসিতেছে, ওষ্ঠ হাসিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ হাসিতেছে, দেখে, আর অহি-গর্জ্জনের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, আবার উর্দ্ধমুখ হয়।

পাপাত্মার অনুতাপ দুর্ল্লভ বাক্য। তাহা শ্রবণ করিলে ভয় হয়, করুণার উদয় হয়, শেষে আনন্দও জন্মে। গিরিকুঞ্জোপবিষ্ট পাষণ্ডের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল। সে কাতরস্বরে কহিল, ভগবন্! আমি ঘোর নারকী,—ঘোর পাষণ্ড,—পামর, আত্মবঞ্চক, তস্কর, দুরাশয় ও নশংস চণ্ডাল। আমি তোমার পবিত্র নাম মুখে আনিতেও অধিকারী নই। হে শুভঙ্কর! তুমি আমারে শুভ কর্ম্মে মতি দাও; হে ক্ষমঙ্কর! তুমি আমারে ক্ষমা কর! দীনদয়াল! আমি মহাপাপী, আমারে দয়া কর!—দয়াময়! আমি দয়ার পাত্র নই, তবুও দয়া ভিক্ষা করি-তেছি, তোমার বিশ্বময়ী করুণায় কি আমি বঞ্চিত হইব? হে করুণা-নিধান! এ অকিঞ্চন মূঢ়ের প্রতি করুণা কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, আমি তোমার করুণাময় নামের ছায়ায় দাঁড়াইয়া একবার ক্রন্দন করি!

অশোকবনে জানকী।

১

দারুণ বরষা আগমনে।
বসি রঘুকুল লক্ষ্মী অশোক কাননে॥
একাকিনী অনিবার, নয়নেতে শতধার,
বহে অশ্রু পঙ্কজ আননে।

২

এইমাত্র রক্ষচেড়ী দল।
পাটল লোহিত চক্ষু করিয়ে পাকল॥
দুই হাতে বেত্র ধরি, তর্জ্জন গর্জ্জন করি,
করে গেল জানকীর অন্তর বিকল।

৩

আহা সতী সুবর্ণ প্রতিমা!
অকলঙ্ক রবিকুল কমল গরিমা॥
যেন শান্তিনিকেতন, অবিষাদ অনুক্ষণ,
শারদ গগনে যথা ফুটন্ত চন্দ্রিমা।

৪

এত যে মলিন চন্দ্রমুখ।
যে নিরখে তার মনে উপজয় দুখ॥
তবু সুবিমল কান্তি, কাননে বিতরে শান্তি,
অসুখেও হৃদে যেন বিরাজিছে সুখ।

৫

সাগরের ঢেউ শারি শারি।
গিরিমূলে প্রতিঘাত করে আগুসারি॥
এক এক বায়ু ঘায়, আসে আর ফিরে যায়,
অচল অচল রাজে কাঁপাতে না পারি।

৬

প্রশান্ত মূরতি সরলার।
অঙ্গরাগ তবু কিছু অঙ্গে নাহি মার॥
মুখখানি হাসি হাসি, নিরানন্দ নীরে ভাসি,
ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে জ্যোতি নাহি আর।

৭

বিষাদিনী রাম মনোরমা।
ফুরাইয়ে গেছে যেন আনন্দ সুসমা॥
কত যে কি ভাবিছেন, একা বসে কাঁদিছেন,
আচম্বিতে সে বিজনে আইল সরমা।

৮

করপুটে সরমা সুন্দরী।
কহিল আমি গো দেবী নমস্কার করি॥
কেন মা বিরস মুখ, আজি কি নূতন দুখ,
হাঁা গো মা! তোমার মনে জগত ঈশ্বরি?

৯

না গো মা! নূতন কিছু নয়।
পুরাতন দুখানলে দহিছে হৃদয়॥
তাপিত অন্তর যার, কবে থাকে সুখ তার?
ধীরে ধীরে দিলা সীতা এই পরিচয়।

১০

মা জননি! এ কথা কেন মা!
রাজার কুমারী তুমি, রাম-মনোরমা।
ঘুচিবে সকল দুখ, হেরিবে পতির মুখ,
আধো কাঁদো কাঁদো মুখে, কহিলা সরমা॥

১১

দেবতারা হবেন সদয়।
আশু হবে শশিমুখি! সুদিন উদয়॥
রাজার দুহিতা মাতা, তোমারে সদয় ধাতা,
হবেন হবেন দেবি হবেনি নিশ্চয়॥

১২

না গো মা ! রাজার মেয়ে নই !
তা হলে কি হ্যাঁ সরমে ! কাঙ্গালিনী হই !
পতি মম রঘুবর, কোশলের অধীশ্বর,
তাঁর দাসী হয়ে আমি, এ যন্ত্রণা সই !

নূতন সংযোগ।

এবারতা কহি সতী সরমা সদনে।
নীরবিলা চীরবাস আবরি বদনে ॥
নীরবিলা রক্ষোবধূ, সরমা সুন্দরী।
অঞ্চলে বদন পদ্ম আচ্ছাদন করি ॥
নীরবিল যেন শোকে, অশোক কানন।
স্তব্ধ হলো প্রকৃতির, প্রফুল্ল আনন ॥
নিশ্বাসি কহিলা পুনঃ জনক কুমারী।
নতমুখী বিধুমুখী, নেত্রে ঝরে বারি ॥
শুন মা সরমা সতি ! মম পরিচয়।
দুখিনী সীতার দুখে, তাপিবে হৃদয় ॥
রাজ কন্যা নহি আমি, অতি অভাগিনী।
মাতাপিতা কেহ নাই, জনম দুখিনী ॥
জনম দুখিনী সীতা, সকলেই বলে।
ফলিতেছে কর্ম্মফল, অদৃষ্টের ফলে ॥

তুমি মা কুশলে থাক, রাজরাণী হয়ে।
সুখী হও সুলক্ষণে ! পতিপুত্র লয়ে॥
বল মা আবার বল, শুনি সুবদনি !
পোহাবে কি কভু মম, অশুভ রজনী ?
হবে কি উদয় আর, মঙ্গল ভাস্কর ?
হবে কি উদয় পুনঃ, সুখ শশধর ?
হবে কি সীতার ভাগ্যে, রাম দরশন ?
হবে কি এ দুখিনীর, দুঃখ বিমোচন ?
হবে কি সীতার চক্ষে, শুভ দরশন ?
হবে কি সদয়, পুন দেবর লক্ষ্মণ ?
হবে কি সীতার ভাগ্যে, পৃথ্বী শুভকরী ?
পোহাবে কি জানকীর, এ কাল সর্ব্বরী ?
আছে কি সে শুভ আশা, সর্ব্ব শুভঙ্করী ?
সত্য করে বল দেখি, সরমা সুন্দরি !
বল না মা, বল না মা, ধরি দুটী হাত।
সীতারে সদয় কি মা, হবে সীতানাথ ?
কহিলেন রামপ্রিয়া, তিতি অশ্রুধারে।
কাঁদি কাঁদি হাতে ধরি, সখী সরমারে॥
উত্তরিলা রক্ষোবধূ, সরমা সুন্দরী।
বিভীষণ ধর্ম্মপত্নী, ধর্ম্মকুলেশ্বরী॥
শুন মা ধরেন্দ্রসুতা, শুনমা সুরমা !
হবে তুমি অচিরাতে, পতিহৃদিরমা॥

দেবতারা আশীর্ব্বাদ, করিছে তোমায়।
দাসী আমি এ কাহিনী, কহি তুয়া পায়॥
স্বপনে দেখেছি কালি, নিশা অবসানে।
আকাশে উঠিছ তুমি, চড়িয়া বিমানে॥
দক্ষিণে শ্রীরামচন্দ্র, বামেতে লক্ষ্মণ।
কর জোড়ে পুরোভাগে, রাজা বিভীষণ॥
নিকটে বানরপতি, সুগ্রীব রাজন।
আসে পাশে বিচরিছে, যত কপিগণ॥
পদতলে শুয়ে আছে, পবন সন্তান।
রণজয়ী ভীমদেহ, বীর হনূমান॥
আমিও রয়েছি সাথে, সহচরী প্রায়।
শুভ সমাচার মাগো, নিবেদি তোমায়॥
বাজিছে দুন্দুভি, শঙ্খ, গগনে সঘনে।
আমোদিত পুষ্পরথ, পুষ্প বরিষণে॥
বিষাদে হাসিয়া সীতা, ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কহিলেন সরমারে, সুমধুর ভাষ॥
হ্যাঁগো মা সরমা! একি সত্য বিবরণ?
সত্য কি হইতে পারে, নিশার স্বপন?
মনে মনে সাধ হলে, ফলে কোন্ কালে?
হেন দিন হবে কিমা, সীতার কপালে?
অতি অলক্ষণা আমি, এ মহী মণ্ডলে।
ত্রিজগতে সকলেই, কুলক্ষণা বলে॥

বিবাহে করিলা পিতা, ধনুর্ভঙ্গ পণ।
না পারিলা নড়াইতে, যত রাজগণ॥
হলো না সীতার বিয়ে, বলিল সকলে।
অভাগিনী একাকিনী, ভাসি নেত্র জলে॥
তার পর প্রজাপতি, হলেন সদয়।
আচম্বিতে রামচন্দ্র, হলেন উদয়॥
হরধনু ভাঙ্গিলেন, শ্রীরাম আমার।
সেই দিনে এদুখিনী, দাসী হলো তাঁর॥
পথে যবে আসিতেছি, অযোধ্যা ভবনে।
অকারণে বাধে রণ, ভার্গবের সনে॥
রোধিয়া পরশুরামে, রঘুকুলপতি।
অভাগীরে নিজপুরে, আনিলেন, সতি!
তার পর রাজপুরে, হইল প্রচার।
রাম রাজা হইবেন, লয়ে রাজ্য ভার॥
আমি রাজরাণী হব, আনন্দ অপার।
মনে হলে সে কাহিনী, থাকিনাকো আর॥
শ্বাশুড়ী কেকয়ী মম, কুমন্ত্রণা করি।
লইলেন মানসের, সর্ব্বসুখ হরি॥
রাজার মহিষী তিনি, ফণিরূপ ধরি।
খেলাইলা রাজপাটে, গরল লহরী॥
অভিষেক হয়ে গেল, সকলে উল্লাস।
বিধাতা করিল সতি! সে সুখে নিরাশ॥

কেকয়ী আপন মনে, পূরাইতে আশ।
উপবাসী রামচন্দ্রে, দিলা বনবাস !!
সেই শোকে মহারাজ, হারান জীবন।
রবিকুলরবি অস্তে, করিলা গমন ॥
বনবাসে আসিলাম, সন্ন্যাসিনী হয়ে।
পতিসহ মতিমান্, লক্ষ্মণেরে লয়ে ॥
অরণ্যেও সুখী, সতি ! হলো না অভাগী।
কাঁদিছেন রঘুবর, দুখিনীর লাগি !!
হরিল বিজনবনে, দুরন্ত রাক্ষস।
স্মরিতে সে পূর্ব্বকথা, অন্তর অবশ ॥
বলিব কি, মা সরমা ! বলিতে না পারি।
পাপিষ্ঠ রাবণ রাজা, বড় মায়াধারী ॥
যবে সে লইয়া আসে, সাগরের পারে।
কত যে কেঁদেছি আমি, কি কব তোমারে ॥
পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, সবারে সম্ভাষি।
রাম রাম রাম বোলে, কাঁদিয়াছে দাসী ॥
ডাক ছেড়ে কাঁদিয়াছি, ত্যজি লজ্জাভয়।
তথাপি পাষণ্ড দস্যু, হলোনা সদয় ॥
কিছুতে না ছেড়ে দিল, উড়ায়ে আনিল।
অশোক কাননে এনে, বন্দিনী করিল ॥
নিতি নিতি বাড়ে শোক, অশোকের বনে।
কত পাপ করিয়াছি, রাঘব চরণে ॥

আমারে বিবাহ করি, এত অলক্ষণ।
রাজ্যত্যাগী, বনবাসী, রাজার নন্দন ॥
অতি অলক্ষণা আমি, সরমা সুন্দরি।
রাক্ষসী এসেছি আমি, নারীরূপধরি ॥
রবিকুল কলুষিত, আমারি কারণে।
ধিক্ ধিক্ সরমা গো, এ ছার জীবনে ॥
সূর্পনখা সমা আমি, অতি পাপীয়সী।
অযোধ্যার সুখনাশা, পাপিনী রাক্ষসী ॥
সেই হেতু বিধাতার লিখনের ফলে।
পড়িয়াছে কুলক্ষণা, রাক্ষস কবলে ॥
সে পাপের প্রতিফলে, এই ফল পাই।
রাক্ষসের পুরীমাঝে, লভিয়াছি ঠাঁই ॥
বলিতে বলিতে সীতা, ধীরে ধীরে ঢোলে।
পড়িলা মূর্চ্ছিতা হয়ে, সরমার কোলে ॥
চেতনা পাইয়া পুনঃ, কাঙালিনী সমা।
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা, কাঁদিলা সরমা ॥
মুছিয়া নয়নজল, কহিলা সরমা।
শান্ত হও কেঁদো না মা, রঘুকুলরমা ॥
শান্ত হও কমলাক্ষি! চন্দ্রনিভাননি!
পদ্মচক্ষে জলধারা, ফেলোনা জননি!!
এত বলি রক্ষবালা, সচঞ্চল মন।
অঞ্চলে মুছায়ে দিলা, পঙ্কজ নয়ন ॥

হেনকালে, কি বিপদ, ঘটে অকস্মাত।
বিনামেঘে বনে যেন, হলো বজ্রাঘাত॥
দেখিলা সরমা সতী, কান্তার তোরণে।
আসিতেছে দশানন, চেড়ীগণ সনে॥
দেখিয়াই মহাভয়ে কাঁপিল হৃদয়।
ভাবিল এখানে থাকা, ভাল কথা নয়॥
শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া, কহিল সীতারে।
আসি মা! বিদায় হই, ভুলোনা আমারে॥
ওই দেখ, আসিতেছে, লঙ্কা অধিপতি।
আমারে দেখিলে অতি রুষ্ট হবে সতি!
পতি মম শ্রীরামের, লয়েছে শরণ।
তাহাতেই জাতক্রোধ, রাজা দশানন॥
আমি তব দাসী হই, জানিলে আবার।
সর্ব্বনাশ হবে দেবি! রক্ষা নাহি আর॥
ত্বরান্বিতা হয়ে সীতা, কাঁপিয়া সঘনে।
কহিলেন সরমারে, সজল নয়নে॥
একাকিনী থাকিলাম, কি হবে আমার!
এসোমা এখন! তবে, এসোমা আবার॥
উত্তরিলা রক্ষোবধূ, কাতর বচনে।
সরমা জনম মত দাসী শ্রীচরণে॥
বলিয়া প্রণাম করি, দ্রুত গেলা চলে।
জানকীর সুখতারা, ডুবে অস্তাচলে॥

একাকিনী রহিলেন, রাঘবমহিষী।
স্বর্ণলতাগাছি যেন, লতাসহ মিশি॥
নতমুখে বিধুমুখী, রহিলেন বসি।
ঊষার আকাশে, যথা পূর্ণিমার শশী॥
আতঙ্কে কুঞ্চিত তনু, কাঁপিতে লাগিল।
প্রচণ্ড পবনে যেন, পদ্মিনী কাঁপিল॥

জ্বলন্ত পাবক সম, কালান্তক বেশে।
হাসিয়া লঙ্কেশ তথা, উত্তরিল এসে॥
হেরি অধোমুখে সীতা, মুদিলা নয়ন।
করযুগে কুচযুগ, করি আবরণ॥
বসিলেন তপস্বিনী, উদাসিনী প্রায়।
স্নেহশূন্য এলোকেশ, দুপাশে লুটায়॥
মেঘে ঢাকা শশী যেন, নিতান্ত মলিনী।
কেতুগ্রহ বিমর্দ্দিনী, যেমন রোহিণী॥
অনাদৃতা কীর্ত্তি যথা, শ্রদ্ধা মানহীনা।
প্রতিহতা আশা সমা, প্রজ্ঞা পরিক্ষীণা॥
রাহুগ্রস্ত পৌর্ণমাসী, নিশাশশী-সমা।
ম্লানমুখী প্রভাহীনা, রবিকুল রমা॥
ছিন্ন ভিন্ন যথা জলে, কমলিনী দল।
শুষ্কতোয়া সরসীর পঙ্কময় জল॥

স্রোত হীনা নদী যথা, বিশিখ অনল।
করিকরবিমর্দ্দিত, যথা শতদল॥
কৃষ্ণপক্ষ যামিনীর, অপ্রভার ন্যায়।
যূথপতি বিরহিণী, করিণীর প্রায়॥
রামগত-প্রাণা সীতা, সোণার প্রতিমা।
তেমনি মলিনী যেন, শশাঙ্কে নীলিমা॥
শুকায়ে গিয়াছে মার, বদন কমল।
কাঁপিছেন বাতে যথা কদলীর দল॥

তরলত্ব ;—দ্রবত্ব।

তরল পদার্থের গুণ।—যে প্রকারে যে দিকে চাও, ও যত ক্ষুদ্র অংশে আবশ্যক হয়, সেই প্রকারে সেই দিকে ও তত ক্ষুদ্র অংশে তরল পদার্থকে সহজে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এবং পরস্পর সম্বন্ধে অণুসকলের স্থান পরিবর্ত্তন করা যায়, সুতরাং ইহা সর্ব্ব-প্রকার আকার ধারণ ও পরিবর্ত্তন করিতে পারে। উক্ত গুণকে তরলত্ব এবং পদার্থকে তরল বলে।

দ্রবত্ব ও বাষ্পীয়ত্ব।—দ্রব অর্থাৎ গলিত ও বাষ্প, এই দুই পদার্থের অবস্থার মধ্যে প্রভেদ আছে, যথা গলিতাবস্থায় চাপনীয়ত্ব (Compressibility) ও বর্দ্ধনীয়ত্ব (Expansibility) অপেক্ষা-কৃত অতি অল্প; যথা জল (২০০০০) বিংশতি সহস্র ভাগের মধ্যে এক ভাগ অনেক কষ্টে অল্পীকৃত করিতে পারা যায়। কিন্তু বাষ্পে উক্ত গুণদ্বয় সমধিক ; পূর্ব্বগুণকে দ্রবত্ব বলে ও দ্রব পদার্থকে দ্রাব্য বলা যাইতে পারে, এবং বাষ্পীয় গুণকে বাষ্পীয়ত্ব ও বাষ্পীয় পদার্থকে বাষ্প কহে, সুতরাং দ্রবত্ব অপেক্ষা বাষ্পীয়ত্বের তরলত্ব অধিক।

ভর। ইহা হইতে সহজে অনুমিত হইতেছে যে, প্রত্যেক তরল বস্তু যে পাত্রে থাকে, তাহার গাত্রোপরি ভর (pressure) বা চাপ দেয়, অর্থাৎ তরল হইয়াও কিঞ্চিৎ বল প্রকাশ করে ; নতুবা যদি ঐ পাত্রে বদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে সেই ভর গুণে পতিত হইত, (যথা জল) কিম্বা পূর্ব্বাকার পরিবর্ত্তন করিত, (যথা বাষ্প)। আবার

ঐ পাত্রও উক্ত তরল পদার্থের উপরে ভর দিতেছে, যদ্দ্বারা উহা বদ্ধ রহিয়াছে; ইহাকে বাহ্যিক ভর বলা যাইতে পারে, এবং প্রথম কথিত ভরকে আভ্যন্তরীণ ভর কহা যাইতে পারে। ফলতঃ আভ্যন্তরীণ ভর নিম্নগ ও বাহ্যভর ঊর্দ্ধগ।

মাধ্যভর। সূক্ষ্মতঃ ভর কি আভ্যন্তরিক কি বাহ্যিক—এক স্থানে কার্য্য করে না; তাহা বিস্তারিতরূপে সর্ব্বত্র থাকে। কিন্তু তাহার সাধারণ ফল এক বিন্দুতে সমানীত হয়। যে বিন্দুতে মাধ্যাকর্ষণ (Centre of Gravity) আছে, সেই সাধারণ ফলকে মাধ্যভর বলে। উপরে বলা হইয়াছে যে, আভ্যন্তরিক ভর নিম্নগ ও বাহ্যিক ভর ঊর্দ্ধগ, তাহা এখানে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা তরল পদার্থের স্থৈর্য্যভাব রক্ষা করিতে গেলে নিম্নগ আভ্যন্তরিক মাধ্যভর ও ঊর্দ্ধগ বাহ্যিক মাধ্যভর এক বিন্দুতে সম্মিলিত করা চাই; তাহা না হইলে তাহা পড়িয়া যাইবে বা পরিবর্ত্তিত হইবে। এই জন্য ঘটিতে বা অন্য কোন পাত্রে জল রাখিলে তাহা স্থির থাকে।

ভরসাম্য। যদি তরল পদার্থের কোন ভাগে বাহ্যিক ভর সন্নিবেশিত করা যায়, তবে তাহা অন্যান্য সকল ভাগে সমভাবে সর্ব্বদিকে, কি নিম্নে কি উচ্চে, সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইবে, ইহাকে ভরসাম্য বলে। যথা—যদি একটি পিচ্‌কারীর চারিটি সমমুখ থাকে, তবে পিচ্‌কারী-দণ্ড দ্বারা অভ্যন্তরস্থ জলে ভর দিলে চারি মুখ হইতে চারি সম স্রোতঃ নির্গত হইবে, আর যদি অসম চারি মুখ থাকে, তবে যেমন অসম, তেমনি অসম চারি স্রোতঃ নির্গত হইবে।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে কতিপয় নিয়ম নির্ণয় করা যাইতেছে; যথা (১) কোন তরল পদার্থের, উপর বাহ্যিক ভর যত নিবেশিত হয়, তাহার অঙ্গ ব্যাপ্তি (volume) তত হ্রাস প্রাপ্ত হয়;—ইহা

বাষ্প বিষয়ে স্পষ্টরূপে খাটে। (২) ভর সমকোণে অর্থাৎ সম্মুখে বল প্রকাশ করে। পৃথিবীর আকর্ষণের বিষয় বিবেচনা করিলে এই দুইটী সিদ্ধ হয়। (৩) তরল পদার্থের গভীরত্ব যত বাড়িবে, ইহার প্রতি স্তরের ভর তত বাড়িবে; ও যত কমিবে, স্তরের ভরও তত কমিবে। (৪) প্রতি স্তরের ভর সর্ব্বত্র সমান। (৫) দুই প্রকার তরল-পদার্থ, যাহা পরস্পরে মিশে না, যথা জল ও তৈল, এক দণ্ডায়মান বক্র নল, যাহার দুই মুখ উপরে হইবে, তাহাতে ঢালিলে প্রত্যেকের স্তম্ভনিম্নতা তাহাদের ঘনত্বানুসারে হইবে, অর্থাৎ যাহার ঘনত্ব যেমন অধিক হইবে, তাহার উচ্চতা তেমনি অল্প হইবে ও অন্যের ঘনত্ব যত অল্প হইবে, তত তাহার উচ্চতা অধিক হইবে, কারণ উভয়ের স্তম্ভ পরস্পরে ও গুরুত্বে সমান হওয়া চাই।

চতুর্থ নিয়ম হইতে এইটি প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তরল পদার্থের প্রতি স্তরের ভর তদাধার পাত্রের আকারের উপর নির্ভর করে না; যথা এক ত্রিকোণ বিশিষ্ট পাত্রে জল রাখিলে নিম্নস্থ এক কোণের বিন্দুর ভর (যদিচ তাহার উপর জলস্তম্ভ নাই, তথাপি) তদনুসারী স্তরের মধ্যবিন্দুস্থ ভরের সঙ্গে সমান হইবে।

ইহা হইতে আরও প্রতীত হইতেছে, দুই কিম্বা তদধিক দ্রব পদার্থ পূর্ণ পাত্র, যেরূপে স্থিত হউক না কেন, নল দ্বারা সংযুক্ত করিলে সকল পাত্রের দ্রবপদার্থের ঊর্দ্ধতল সমান হইবে।—এই গুণ দ্বারাই কৃত্রিম ও নৈসর্গিক উৎসের সৃষ্টি হইয়া থাকে;—যথা কোন স্থানে যে প্রকারে পার, সেই প্রকারে এক জলস্তম্ভ করিয়া তাহার নিম্নদেশে এক নল সংযোজন পূর্ব্বক ঐ নল যত দূর অন্তর ও যত উৎস চাও, তত দূর অন্তরে লইয়া গিয়া তাহার গাত্রোপরে তত ঊর্দ্ধমুখে নির্ম্মাণ করিয়া দিলে আশামত উৎস হইবে। তদ্রূপ

আট, বা দশ ক্রোশ অন্তরে স্থিত এক উচ্চ ভূমিগর্ভ হইতে আর এক জলস্রোতঃ কোন নিম্ন ভূমির অভ্যন্তর দিয়া আসিতে আসিতে কোন স্থানে ঊর্দ্ধে সুড়ঙ্গ পাইলে স্রোতের কিয়দংশ ঊর্দ্ধে উঠে। এই পদ্ধতিক্রমে ইউরোপ ও অন্যান্য প্রধান রাজ্যের নগরে নগরে পরিষ্কৃত জল সঞ্চালিত হয়।

উক্ত নিয়মাবলি হইতে তরল পদার্থের একটি প্রধান গুণ অনুমিত হইতেছে,—যথা—তরলপদার্থ, অতি ক্ষুদ্র হইলেও গুরুপদার্থ অতি বৃহৎ হইলেও তাহাকে বহন করিতে পারে। এই গুণ বাষ্প অপেক্ষা দ্রবপদার্থে অধিক, কারণ তাহা প্রায় অদাবনীয়, সুতরাং ইহার ব্যবহারবিশেষে নানাবিধ জলযন্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে। যথা ভারবাহী জল যন্ত্র, ভারোত্থাপক জলযন্ত্র, জলভস্ত্রা ইত্যাদি।

ভারবাহী জলযন্ত্র। এক জলপূর্ণ শক্তচর্ম্মপাত্র হইবে, তাহার নিম্নে এক দণ্ডায়মান বক্র নল সংযুক্ত থাকিবে; ইহার জলস্তম্ভের উচ্চতা চর্ম্মপাত্রস্থ জলের ঊর্দ্ধতল হইতে যত অধিক হইবে, তত গুরুপদার্থ চর্ম্মপাত্রের উপরে চাপাইতে পারা যাইবে।

ভারোত্থাপক জলযন্ত্র। এক শূন্য স্তম্ভে এক বায়ুরোধক (অর্থাৎ বায়ু এক দিক হইতে অন্য দিকে যাইতে বা আসিতে পারে না, অথচ ঊর্দ্ধে ও নিম্নে সহজে সঞ্চালিত হয়) পাত্র আছে। এক দণ্ডায়মান বক্র নল ঐ শূন্য স্তম্ভের নিম্নদেশে সংযুক্ত আছে। উক্ত পাত্রের উপরে ভার স্থাপন পূর্ব্বক নলে জল ঢালিলে ঐ পাত্র ভার লইয়া উঠিবে।

জলভস্ত্রা।—ইহা ভারোত্থাপক জলযন্ত্র সদৃশ; ইহার শূন্যস্তম্ভ ক্ষুদ্র ও উপরের মুখ বন্ধ, সুতরাং উক্ত ভারবাহী পাত্র ভার লইয়া না উঠিতে পারিয়া তাহাকে ঐ বন্ধ মুখে চাপিবে।

পার্থিব বৈকুণ্ঠ।

পৃথিবী যেমন পূর্ব্বে জলময়ী ছিলেন, পৃথিবীর ইতিবৃত্তও তদ্রূপ বহুকাল পর্য্যন্ত জলময় ছিল। পুরাণশাস্ত্র আমাদিগের জগচ্ছবি অবলোকনের একমাত্র দর্পণ; কিন্তু উহার কাচগুলি কাব্যখনি হইতে উৎপন্ন, আবিষ্ক্রিয়া অবধি অমার্জ্জিত, সুতরাং তাদৃশ স্বচ্ছ নহে, মানবচক্ষু তাহাতে প্রকৃত প্রতিবিম্ব দর্শনের অগ্রে কতকগুলি রন্ধ্র দর্শন করে। এই কারণে প্রাচীন ইতিহাস অবগত হইবার স্পৃহা হইলে কতক পরিমাণে সঙ্কর-ফলক অবলম্বন করিতে হয়। পৃথিবী জলময়ী ছিলেন, এ প্রমাণ প্রাচ্য পাশ্চাত্য মিশ্রকাচময় দর্পণেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে প্রভেদ এই যে, পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্য কিছু কালসঙ্কীর্ণতাপ্রিয়। পশ্চিম জগতের ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহাশয়েরা অবধারণ করিয়াছেন, যিশু খ্রীষ্টের জন্মের চারি সহস্র চারি বৎসর মাত্র পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, প্রাচ্যমতে উহা দুঃসাহসিক অনুমান। প্রাচ্য পণ্ডিত মহাশয়েরা অনুমান করেন, সৃষ্টিকাল স্মরণাতীত। এক স্থানে কথিত আছে, সপ্তম মন্বন্তরে মহর্ষি কশ্যপ দেবসৃষ্টি সাধন করিলে উদকরাশি ভেদ করিয়া জগৎ উত্থিত হয়। ইহা সম্ভব হইতে

পারে, কিন্তু মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ অবতার স্থরজনক কশ্য-পের দেবসৃষ্টির অগ্রে কি পরে, এবং পূর্ব্ব ছয় মন্বন্তরে জগতের চিহ্ন ছিল কিনা, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। সেটী সহজ প্রশ্ন নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাঁহাকে নোয়া নাম দিয়া মহা-প্লাবনের পরিচয় দেন, কতিপয় প্রাচ্য পণ্ডিত খণ্ড প্রলয়ের প্রমাণ দিয়া তাঁহাকে রাজা প্রিয়ব্রত বলেন। বস্তুতঃ নোয়া যে, মহাপ্রলয়ের সমকালীন লোক ছিলেন না, তাহার একা-ধিক প্রমাণ আছে। যাহা হউক, আমরা পার্থিব বৈকুণ্ঠের নাম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছি, এখনো বৈকুণ্ঠের নিকটে যাইতে পারি নাই, দেখিতে হইবে, বৈকুণ্ঠ কতদূর। আধুনিক চিন্তাশীল ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীকেই স্বর্গ মর্ত্য রসাতলের আধার বলিয়া মীমাংসা করেন। সকলেরই যে, এক প্রকার মত, এমন কথা কে বলিবেন? আমরা এতদূর সর্ব্বজ্ঞতাব ভাণ করিতে জানি না। অনিশ্চিত বিষয়ে যাঁহার যেরূপ অভিমত, তিনি সেইরূপ বলিতে পারেন, সকলেরই সমান অধিকার। আমরা যাঁহাদিগের কথা কহিতেছি, তাঁহারা বলেন, কৈলাস পর্ব্বত যেমন স্বর্গ নহে, হরপার্ব্বতী যেমন পৃথিবী মধ্যেই বিহার করিতেন, কাশ্মীর উপত্যকাও সেইরূপ বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ ছিল। মহাদেব অপেক্ষা নারায়ণের মহিমা ন্যূন নহে, উচ্চ। অতএব শোভাময় কাশ্মীরের নাম বৈকুণ্ঠ এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী নগর, পর্ব্বত, উদ্যান,

কুঞ্জ ও নদনদী প্রভৃতি সুরলোক (স্বর্গ) নামে বিখ্যাত ছিল। আর প্রাচীন সিদ্ধপুর (১) রাজ্য পাতাল বলিয়া আখ্যাত।

এই বর্ণনায় ভুল আছে কিনা, তাহার বিচার আমরা অদ্য করিব না। কথিত আছে, একটী প্রলয়ের পর সর্ব্ব প্রথম কাশ্মীর (২) রাজ্য উত্থিত হয়। আর একটী প্রলয়ের পর সিদ্ধপুরের উত্থান। বৈকুণ্ঠপুরীর আখ্যান আমরা এই সময়েই প্রাপ্ত হই, সুতরাং কাশ্মীরকে পার্থিব বৈকুণ্ঠ বলিতে হইল। এখন আমরা ইতিহাসের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিব, কাশ্মীরের বৈকুণ্ঠ নাম কতদূর অন্বর্থ হয়।

কাশ্মীরের প্রথম রাজা নীল (৩)। তাঁহার পর বহুদিন বহু রাজার উল্লেখ নাই। ধারাবাহিক বংশানুক্রমে জনার্দ্দন নামে একজন রাজা হন। তিনি কলিযুগ প্রবর্ত্তনের কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, জনার্দ্দন হস্তিনাধিপতি রাজা যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা এবং তদীয় অরাতি জরাসন্ধের সখা। একদা জরাসন্ধ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী মথুরা রাজ্য আক্রমণার্থ আম-

---

(১) ইহার আধুনিক নাম আমেরিকা।

(২) দ্বিতীয় বার উত্থিত হইল কি না? যদি তাহা হয়, তবে প্রথম বারে বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধাম থাকা সম্ভব।

(৩) নাগজাতি তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করে। এ নাগ সর্প নহে, তথাকার আদিম মনুষ্যেরা ঐ নামে পরিচিত ছিল।

ন্ত্রণ করেন। জনার্দ্দন আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহার অনুবল হইয়া যমুনাতীরে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক উভয়ে সসৈন্য মথুরা বেষ্টন করিলেন। প্রথম যুদ্ধে যদুপতির সৈন্যদল পরাজিত হইয়াছিল, তাহার পর তাহারা রণজয়ী হইল, জনার্দ্দন রণশায়ী হইলেন। জনার্দ্দনের পর তৎপুত্র প্রথম দামোদরের রাজ্যাভিষেক। দামোদর এই পরম রমণীয় বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর হইয়াও সুখী হইলেন না, পিতৃনিধন নিবন্ধন মনে মনে কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অতিশয় আক্রোশ ছিল। তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন। কিসে বৈরনির্যাতনে কৃতকার্য্য হইবেন, নিয়ত সেই ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন যায়. একদিন তিনি শুনিলেন, গান্ধার রাজ্যে (৪) কয়েকটী কন্যার স্বয়ম্বর হইবে, তথায় সপরিবার শ্রীকৃষ্ণের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, সিন্ধুনদের তীরে স্বয়ম্বরসভা সজ্জিত হইবে। অবসর বুঝিয়া দামোদর বহুসংখ্যক পদাতি ও অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে ঐ স্বয়ম্বরের বিঘ্ন করণোদ্দেশে সিন্ধুকূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সত্য সত্যই মহা সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। গান্ধারের বিস্তর লোক রণক্ষেত্রে জীবন হারাইল, অবশেষে বাসুদেব সুদর্শন চক্রে দামোদরের শিরশ্ছেদন করিলেন।

যশোবতী নামে দামোদরের এক মহিষী ছিলেন, তিনি

(৪) পূর্ব্বে আফগানস্তান ভারতবর্ষের অধীন ছিল, যবনেরা স্বতন্ত্র করিয়াছেন। গান্ধার রাজ্যের আধুনিক যাবনিক নাম কান্দাহার।

তখন গর্ভবতী। কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে তাঁহাকেই কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষেক করা হয়। রাজমন্ত্রীরা তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, মধুসূদন একটা পৌরাণিক শ্লোক শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। যথাসময়ে রাণী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন, পিতামহের নামানুসারে তাঁহার নামকরণ হইল। তিনি দ্বিতীয় জনার্দ্দন অভিধানে অভিহিত হইলেন। সেই শিশু অতুল্য স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। যাহাদিগকে দেখিয়া বালকের অকলঙ্ক অধরোষ্ঠে ঈষৎ হাসি আসিত, তাঁহার জনকের অমাত্যবর্গ তাহাদিগকে প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করিতেন। শিশুর হাস্যে কোনো অর্থ নাই, ইহা তাঁহারা চিন্তা করিতেন না। মন্ত্রিগণ যদি সেই ক্ষীরপোষ্য শিশুর অর্দ্ধস্ফুট অমিয় বচন বুঝিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আর লজ্জার সীমা থাকিত না। রাজসভায় যখন প্রজামণ্ডলী বিচার প্রার্থনায় সমাগত হইত, অমাত্যগণ তখন শিশুকুমারকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া বিচারকার্য্য সমাধা করিতেন। এই সময় কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ। যুবরাজ জনার্দ্দন তৎকালে শৈশবাবস্থা অতিক্রম করেন নাই বলিয়া, পৃথিবীর সমস্ত রাজন্যমণ্ডলীর একত্রীভূত মহাসমরে কোনো পক্ষেই তাঁহার সাহায্য যাচিত হয় নাই।

দ্বিতীয় জনার্দ্দনের পর ৩৫ জন রাজার বিবরণ প্রাপ্ত

হওয়া যায় না। এইরূপ জনশ্রুতি যে, তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট ছিলেন বলিয়া ইতিহাস লেখকেরা ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ষট্‌ত্রিংশ রাজার নাম লব। তিনি অতিশয় সমরপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বহু সংগ্রামের বিবরণ কীর্ত্তিত আছে। তিনি লোবার (৫) নগর নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, ঐ নগরে অন্যূন অশীতিলক্ষ প্রস্তরময় গৃহ ছিল। রাজা মৃত্যুকালে ঐ নগরটী ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া যান। তাঁহার পুত্র কুশেশ্বর কোনো মহৎ কার্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন না, কিন্তু তিনিও কুরুহর নামক গ্রাম বিপ্রসাৎ করিয়া গিয়াছেন।

কুশেশ্বরের পুত্র খগেন্দ্র বিশেষ ধৈর্য্যশীল ও পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। আদিম নিবাসী নাগেরা তাঁহার প্রতি বৈরাচরণ করাতে তিনি সেই নাগকুল প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কবিরা এই উপলক্ষে একটী উত্তম রূপক বর্ণন করিয়াছেন। খগেন্দ্রশব্দের অর্থ পক্ষীরাজ গরুড়, আর নাগশব্দে সর্প। অতএব খগেন্দ্রের দ্বারা নাগবংশ ধ্বংস হইয়াছে। রাজা খগেন্দ্র খগেক্ষণা ও মূষা রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমন হইলে

(৫) বোধ হয়, লোবারের অপভ্রংশই লাহোর। কিন্তু লাহোর প্রস্তরময়ী রাজধানী নহে, প্রস্তরাবাসের ভগ্নাবশেষও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

তদাত্মজ সুরেন্দ্র উত্তরাধিকারী হন। তিনি যেরূপ পরাক্রান্ত, তদনুরূপ সুশীল ও প্রশান্তপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি সৌরা নাম্নী এক নগর স্থাপন করিয়া তথায় সুরেন্দ্রভবন নামে একটী মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই।

রাজা সুরেন্দ্রের মৃত্যুর পর গদাধর অভিধেয় একজন অপর বংশীয় রাজা কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি হস্তীশালা নামক একখানি গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র সুবর্ণ অতিশয় দানশীল নরপতি ছিলেন। তিনি যাচকবর্গকে স্বর্গ দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। করল (বর্ত্তমান কর্ণাল) প্রদেশে সুবর্ণমণি নামে তিনি একটী খাল খনন করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র জনক প্রজাগণকে বাৎসল্যভাবে পুত্রবৎ পালন করিতেন। পিতার ন্যায় ব্যবহার ছিল বলিয়াই তাঁহার নাম জনক হইয়াছিল। বিহার এবং জালর নগর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তদীয় পুত্র শচীনর অতি ক্ষমাশীল নৃপতি ছিলেন। তিনিও দুটী বৃহৎ নগর স্থাপন করিযা গিয়াছেন। শচীনর নিঃসন্তান।

শচীনরের পরন্তন রাজার নাম অশোক। তিনি শকুনির পৌত্র। সেই রাজা নিষ্কলঙ্ক ও সত্যবাদী ছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার উপাস্য দেবতা। তিনি ধর্ম্মারণ্যের সীমাস্থলে বিতস্তা নদীর সৈকত পুলিনে একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ

করান। উহার উচ্চতা এতদূর যে, শিখরদেশ নয়নগোচর হয় না। শ্রীনগর রাজধানী তাঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ নগরে তৎকালে ৯৬ লক্ষ সুরম্য গৃহ বিদ্যমান ছিল, এরূপ বর্ণিত আছে। রাজা অশোক শ্রীবিজয়েশ দেবের মন্দিরের জীর্ণ প্রাচীর ভগ্ন করিয়া পাষাণময় নূতন প্রাচীর প্রস্তুত করাইয়া দেন। অশোক এবং ঈশ্বর নামে তিনি আর দুটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। তাঁহার রাজত্ব-সময়ে ম্লেচ্ছগণ রাজ্য আক্রমণ করাতে তিনি নির্জ্জন বাস অবলম্বন করিয়া যোগবলে প্রাণত্যাগ করেন।

অশোকের পুত্র জালোক ঐ ম্লেচ্ছদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি কান্যকুব্জদেশ জয় করিয়া তথা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ কতিপয় চাতুর্ব্বর্ণীয় ব্যক্তিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। ইহার পূর্ব্বে কাশ্মীর অতি হীনাবস্থ রাজ্য ছিল, তথায় বিচারকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইত না। জালোক রাজা তাহার সুশৃঙ্খলা করেন। তিনি অষ্টাদশ দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি বেদব্যাসের এক শিষ্যের নিকট সর্ব্বদা নন্দীপুরাণ শ্রবণ করিতেন। জ্যেষ্ঠ রুদ্রদেব তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। তিনি সোদর দেবেরও পূজা করিতেন।

এই সময়ের একটী কৌতুকাবহ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। রাজা এক দিবস প্রাতঃকালে বিজয়েশ্বরের মন্দিরে যাইতে-

ছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে একটী সুন্দরী কামিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই মোহিনী তাঁহার নিকট কিছু ভক্ষ্যদ্রব্য যাচ্ঞা করে। “ যাহা চাহিবে, তাহাই দিব ” বলিয়া নরবর অঙ্গীকার করিলে সেই কামিনী এক বিকটাকার মূর্ত্তি ধারণ করিল।—কহিল, আমি নরমাংস ভক্ষণ করিব। রাজা কিঞ্চিৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, তোমার অনৈসর্গিক ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত আমি অপর প্রাণীর হিংসা করিতে পারিব না, আমার নিজের অঙ্গ হইতে যে স্থানের ইচ্ছা, সেই স্থানের মাংস তুমি ভক্ষণ কর। রাক্ষসী তাঁহার এই বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তিমতী হইল। সদয় ভাবে কহিল, রাজন্! তুমি অপরের প্রাণকে এত মূল্যবান্ জ্ঞান কর, আমি তোমার মাংস ভক্ষণ করিব না। তুমি দ্বিতীয় বুদ্ধদেব।—রাজা জালোক নিজে শৈব ছিলেন, বুদ্ধদেবকে জানিতেন না ;—জিজ্ঞাসা করিলেন, বুদ্ধ কে ?—এই প্রশ্নটী অতি কৌতুকাবহ। অশোক রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, বৌদ্ধ পিতার পুত্র বুদ্ধদেবকে চিনিলেন না, এটী চমৎকার রহস্য ! যাহা হউক, রমণী তাঁহার প্রশ্নে এই উত্তর করিল যে, লোকালোক পাহাড়ের প্রান্তভাগে কৃত্তিকা নামে এক জাতি ছিল। ঐ পাহাড়ে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পায় না। কৃত্তিকারা বুদ্ধদেবের উপাসনা করিত। যাহারা তাহাদিগের অনিষ্ট করিত, তাহাদিগের প্রতি তাহারা ক্রুদ্ধ

হইত না। যাহারা তাহাদিগের বিরুদ্ধে অনধিকার চর্চ্চা করিত, তাহাদিগকে তাহারা ক্ষমা করিয়া বরং প্রকারান্তরে উপকার করিত। তাহারা সকলকে সত্য ও জ্ঞান শিক্ষা দিত, এবং যে অজ্ঞান তিমির সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দূর করিবার ইচ্ছা করিত। তুমি সেই পবিত্র জাতির অপকার করিয়াছ। আমাদিগের এক ধর্ম্মশালায় ঢোল বাজিত, সেই বাদিত্রশব্দে একবার তোমার নিদ্রার বিঘ্ন হইয়াছিল, সেই জন্য তুমি দুষ্ট মন্ত্রীগণের কুমন্ত্রণায় ঐ ধর্ম্মশালা ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। বৌদ্ধেরা তাহাতে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার প্রাণ বধ করণার্থ আমারে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের প্রধাম পুরোহিত তাহাতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, “জালোক রাজা মহা পরাক্রান্ত, তাঁহার সহিত বিরোধে আমরা পারিয়া উঠিব না। রাজা যদি স্বর্ণ দ্বারা সেই ধর্ম্মশালা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তবে তাঁহাকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।” তাঁহার এই উপদেশে আমি ছদ্মবেশে তোমার মন বুঝিতে আসিয়াছি। দেখিলাম, তুমি অতি ধার্ম্মিক, প্রাণিহিংসা কর না, তোমাকে বধ করা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মে জীবহিংসা বড় নিষিদ্ধ। এইরূপ কথোপকথনের পর ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিতে রাজা অঙ্গীকার করিলেন, মায়াবিনী চলিয়া গেল।

রাজা জালোক নন্দীক্ষেত্রে শিব মুনীশদেবের মন্দির

নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রচুর ঐশ্বর্য্য উৎসর্গ করেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল তপস্যাতে অতিবাহিত হইয়াছিল। কনকবাচিনী-নদী-তীরে চিরমোচন তীর্থে তিনি মহিষীর সহিত মহাপ্রস্থান করেন। ঐ তীর্থে মহাকাল জ্যেষ্ঠ রুদ্র বিরাজমান আছেন। রাজা তাঁহার মন্দিরে আপন অন্তঃপুরের একশত সেবিকা নিযুক্ত করিয়া দেন। তাহারা শিবের প্রীত্যর্থে নৃত্যগীত করিত। চির-মোচন তীর্থে ত্রিরাত্রি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া রাজা ও রাজ-মহিষী অনিত্য ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবলোকে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার পর দ্বিতীয় দামোদর রাজা হইলেন। তিনিও পরম শৈব ছিলেন। তিনি যক্ষরাজ কুবেরের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া যক্ষ স্থপতিগণের দ্বারা একটী সেতু নির্ম্মাণ করান। যক্ষেরা স্থপতিবিদ্যায় বিলক্ষণ দক্ষ ছিল। রাজ্য মধ্যে জলপ্লাবন নিবারণার্থ তিনি উহাদিগের দ্বারা একটী প্রস্তরবন্ধ প্রস্তুত করাইতে অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু একটী দুর্ঘটনায় তাহাতে বিঘ্ন জন্মিল। রাজা দামোদর একদিন একটী শ্রাদ্ধ করিবার পূর্ব্বে স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন, পথে কতিপয় ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া রাজা আপন মনে নদী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা যোগবলে বিতস্তাকে তাঁহার পদতলে আনিয়া

কহিলেন, "এই দেখুন মহারাজ! বিতস্তা নদী আপনার নিকটে আসিয়াছেন, এখন আমাদিগকে ভোজ্য দান করুন।" রাজা উহা ইন্দ্রজাল ভাবিয়া রুক্ষস্বরে বিপ্রগণকে কহিলেন, এখন যাও, আমি স্নান না করিয়া তোমাদিগকে ভোজন করাইব না। ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, তুমি সর্প হইয়া প্রাণী হিংসা কর।—শেষে বিস্তর অনুনয়ের পর কহিলেন, যদি একদিনে আদ্যোপান্ত রামায়ণ শ্রবণ করিতে পার, তবেই শাপমুক্ত হইবে। রাজা দামোদর সেই দিন অবধি বৃহৎ ভুজঙ্গাকার ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, উগ্রমূর্ত্তি ঋষিদিগের ক্ষমতাকে ধিক্! তাঁহারা এক কথায় একজন এত বড় রাজাকে নষ্ট করিয়া দিলেন! শত্রুতে মহিমা হরণ করিলে পুনরায় আয়ত্ত হয়, ব্রাহ্মণে নষ্ট করিলে আর তাহা ফিরিয়া আইসে না।

কল্কিপুরাণ।

দ্বিতীয় অংশ।—দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ভগবান কল্কি সরোবর সন্নিধানে মনোহর অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া জলাহরণ-পথে স্বচ্ছ স্ফটিক নির্ম্মিত সোপানে প্রবালখচিত বেদিতে বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। সেই স্থানে ভ্রমরগণ সরোজ-সৌরভে ব্যগ্র হইয়া মধুর শব্দে ইতস্তত

ভ্রমণ করিতেছে, অভিনব পত্রসম্পন্ন কদম্বকুঞ্জে তত্রত্য সূর্য্যকিরণ নিবারিত হইতেছে। মহাত্মা কল্কি পুলকিত মনে তথায় উপবেশন পূর্ব্বক শুককে পদ্মার আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। শুক তথায় গমন পূর্ব্বক নাগেশ্বর বৃক্ষে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, পদ্মা দেবী হর্ম্ম্য-তলে পদ্মপত্রে শয়ন করিয়া আছেন, সখীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার নিশ্বাসবায়ুসন্তাপে মুখপদ্ম ম্লান হই-তেছে। তিনি সখীপ্রদত্ত চন্দনচর্চ্চিত বিকসিত কমল হস্তে লইয়া সঞ্চালন করিতেছেন। তৎকালে তিনি রেবা-সলিলসিক্ত, পদ্মপরাগ-সম্পন্ন দক্ষিণাগত মনোহর সুস্নিগ্ধ বায়ুকেও নিন্দা করিতেছেন।

সুধীর করুণ হৃদয় শুক প্রিয়বাক্য দ্বারা পদ্মাকে পরিতুষ্ট করিল। পদ্মা তাহার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া কহিলেন, শুক! তুমি আমার নিকটে এস। তোমার মঙ্গল হউক! তোমার সমস্ত কুশল ত? শুক কহিল, শোভনে! আমার সমস্তই মঙ্গল। পদ্মা কহি-লেন, হে শুক! যে দিন পর্য্যন্ত তুমি এখান হইতে গমন করিয়াছ, সেই দিন হইতে আমার মন যে কিরূপ চঞ্চল হইয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না। শুক কহিল, দেবি! এক্ষণে রসায়ন প্রভাবে আপনার সমস্ত চাঞ্চল্য অপনীত হইবে। পদ্মা কহিলেন, শুক! রসায়ন আমার পক্ষে এখন নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। শুক কহিল, দেবি! ভগবান শশাঙ্কশেখরের প্রসাদে রসায়ন এখন আপনার নিতান্ত সুলভ হইয়াছে। পদ্মা কহিলেন, শুক! আমি অতি হত-ভাগিনী, আমার আর রসায়ন কোথায়? শুক কহিল, বরবর্ণিনি! চিন্তা করিবেন না, এই স্থানেই আছেন, আমি সরোবরতীরে তাঁহাকে রাখিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। পদ্মাদেবী এইরূপ কথোপ-কথনে যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া শুকের মুখে মুখ ও নয়নে

নয়ন সন্নিবেসিত করিয়া তাহাকে যথোচিত সমাদর করিলেন। বিমলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা, বিলাসিনী, চারুমতী ও কুমুদা, পদ্মার এই আটটী সখী ছিল। তিনি তাহাদিগের সহিত জলক্রীড়ার্থ গমনে উদ্যত হইয়া কহিলেন, সখীগণ! তোমরা আমার সহিত সরোবরতীরে চল। এই কথা বলিয়া পদ্মাদেবী বিচিত্র শিবিকাযানে আরোহণ পূর্ব্বক মনোহরবেশা সখীগণের সহিত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন, এবং রুক্মিণী যেমন যদুপতির দর্শনে ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও ভগবান কল্কির দর্শনলালসায় ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। নগরবাসী যে সকল পুরুষগণ পথে, চতুষ্পথে ও বিপণিতে অবস্থান করিতেছিল, তৎকালে তাহারা পদ্মার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। স্ত্রীগণ পুরুষদিগকে নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া বিবিধ প্রকার দৈব পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। পথে আর একটীও পুরুষ রহিল না। যৌবনগর্ব্বিতা বলবতী কামিনীগণ শিবিকা বহনে প্রবৃত্ত হইল। পদ্মাদেবী শুকের বচনানুসারে শিবিকায় আরোহন পূর্ব্বক সখীগণের সহিত সরোবরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর চন্দ্রবদনা শোভনা প্রমদাগণ সারস-হংসনাদিত পদ্মরেণু সুবাসিত সরোবর-সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক কুমুদিনীর বিকাশের নিমিত্ত সুধাকরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভৃঙ্গগণ তাহাদিগের বদনসৌরভে মদান্ধ হইয়া পদ্মিনীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের মুখপদ্মে বসিতে লাগিল, বারম্বার নিবারিত হইলেও গন্ধাধিক্য বশত পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

পদ্মাদেবী হাস্যপরিহাসে, নৃত্যগীত বাদ্যে ও করগ্রহে পরম

পরিতুষ্ট হইয়া জলকেলীকাতরা সখীগণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সখীগণও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তৎপরে তিনি স্মরশরে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে শুকের কথা স্মরণ করিয়া সখীগণের সহিত জল হইতে উত্থিত হইলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট কদম্বকুঞ্জে গমন করিয়া দেখিলেন, প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মহামণি-সমন্বিত বিচিত্র ভূষণ-বিভূষিত ভগবান কল্কি শুকের সহিত মণিময় বেদিকায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে-ছেন। পদ্মা সেই তমালনীল, পীতাম্বরধর, সুচারু পদ্মলোচন, আজানু-লম্বিত বাহুযুগল, স্থূলায়ত বক্ষ, শ্রীবৎস কৌস্তুভ কান্তি কমনীয়, জগৎ-প্রভু কমলাপতির সেই অদ্ভুত রূপ নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, সুতরাং তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার করিতে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। শুক তাঁহাকে জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে পদ্মাদেবী শঙ্কিত হইয়া শুককে নিবারণ করিলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই রূপবান মহাবল পুরুষ যদি আমারে অবলোকন করিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভগবান শশাঙ্কশেখরের বর লইয়া আমার আর কি হইবে? সে বর আমার পক্ষে শাপস্বরূপ হইয়া উঠিল।

চরাচরাত্মা জগতের অধীশ্বর ভগবান কল্কি পদ্মার মনো-গত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জাগরিত হইলেন, এবং দেখিলেন, মধুসূদনের অগ্রে কমলাদেবীর ন্যায়, আপন সম্মুখে মনোহর রূপ-শালিনী পদ্মাদেবী দণ্ডায়মান আছেন। তিনি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিবা-মাত্র পদ্মাদেবী লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। ভগবান কল্কি সখী-গণ পরিবৃতা, মায়ার ন্যায় মনোহারিণী সেই কামিনীকে অবলোকন করিয়া কাম-বিমোহিত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! আমার নিকটে এস। ভাগ্যক্রমেই আজ তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক্ষণে এই

সাক্ষাৎ মঙ্গলজনক হউক ! কান্তে ! তোমার এই বদনচন্দ্র কন্দর্পজনিত তাপের অপনয়ন করিয়া আমারে সুশীতল করুক। সুলোচনে ! আমি জগতের নাথ, তথাচ কাল মন্মথ-সর্প আমারে দংশন করিয়াছে। তোমার লাবণ্যরসামৃত ভিন্ন আমার আর শান্তির উপায় নাই। সেই শান্তি এই আশ্রিতের জীবন। পুরুষকার বা পুণ্য দ্বারা সেই শান্তিলাভ হওয়া দুর্লভ। সাদী যেমন সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশ দ্বারা প্রমত্ত গজ রাজের কুম্ভ বিদারণ করে, সেইরূপ তোমার এই মনোহর আয়ত ভুজযুগল নখরূপ অঙ্কুশাঘাতে আমার হৃদয়-নিহিত মন্মথরূপ মত্ত হস্তীকে বিদীর্ণ ও দূরীকৃত করুক। বসনাচ্ছাদিত তোমার এই স্তনযুগল, কন্দর্পের প্রতোদের ন্যায় সমুন্নত হইয়া রহিয়াছে, উহা আমার বক্ষ দ্বারা অবনত হইলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সুমধ্যমে ! রোমাবলী চিহ্নে চিহ্নিত তোমার এই সুবিভক্ত ত্রিবলী ঋতুরাজের সোপানও দুর্গাশ্রম তুল্য। রম্ভোরু ! পুলিন সদৃশ তোমার এই নিতম্ববিম্ব সূক্ষ্ম বসন সংসর্গে পরম রমণীয় হইয়াছে। এই নিতম্ব সংযোগে কামী ব্যক্তির কামোন্মত্ততা অপনীত হয়। এক্ষণে আমার হৃদয়-সলিল সন্নিবেশিত, অঙ্গুলিপত্র চিত্রিত, মরাল শব্দানুকারী নূপুর সুশোভিত, তোমার পদপঙ্কজ দ্বারা কামসর্প দংশনজনিত বিষ উপশমিত হউক।

পদ্মাদেবী কলিকুল-নাশন ভগবান কল্কির এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং তাঁহার পুরুষত্ব অবিনশ্বর দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। পরে তদ্গত চিত্তে সখীগণের সহিত অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরজনসেব্য নিজপতি কল্কিকে সমাদর পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

মদালসা।

যুবরাজ আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উদ্দেশে মিত্র জনকের চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে বন্ধুগণ! আমাকে দেখিবার নিমিত্ত পিতার মন যে সমুৎসুক হইয়াছে, ইহা আমার পরম-সৌভাগ্য। চল, আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তাঁহারা তিন জনে প্রথমতঃ রাজভবন ও তৎপরে রাজধানী অতিক্রম করিয়া পুণ্যসলিলা গোমতীর উপকূলে উপনীত হইলেন। এই স্থান অতীব রমণীয়। স্রোতস্বতীর উভয়কূলবর্ত্তী নব দূর্ব্বাদল-শোভিত প্রশস্ত প্রান্তর হরিৎমণি বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। তন্মধ্যে স্রোতস্বতী গোমতীর শুভ্র প্রবাহ নীল মেঘ মধ্যস্থিত ছায়াপথের ন্যায় শোভমান হইতেছে। দিবা অবসান-প্রায়, বাসরমণি দিকচক্র পরিভ্রমণ করিয়া যেন বিশ্রামার্থে অস্তাচল শিখরশায়ী হইলেন। পূর্ব্বদিক্ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। শ্রান্তিহর দক্ষিণানিল মৃদুমন্দবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তীর-তরুস্থিত বিহঙ্গগণ সুমধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। স্বভা-বের সেই আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিয়া রাজকুমারের মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই গোমতী পার হইলেই বোধ হয় বন্ধুভবন প্রাপ্ত হইব। ইত্যবসরে নাগেন্দ্র-কুমারেরা কহিলেন, সখে! আমাদিগের কটিবস্ত্র দৃঢ় রূপে ধারণ কর। এই নদী মধ্যে এক সুরঙ্গ আছে, সেই পথে আমাদের ভবনে গমন করিতে হইবে। পাতালপুরে আমাদিগের বসতি, তথায় যাইতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই, তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না। আমরা তোমাকে অতি যত্ন পূর্ব্বক লইয়া যাইব। সেই পাতাল-লোক দর্শনে মনে মনে তুমি অতুল আনন্দ অনুভব করিবে।

যুবরাজ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মিত্রদ্বয়ের কটিবসন অবলম্বন

করিলেন। নাগকুমারেরা তৎক্ষণাৎ সখার সহিত নদী মধ্যে অবতরণ পূর্ব্বক সুরঙ্গপথে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রমে কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা সেই পাতালতলস্থ নাগলোক দেখিতে পাইলেন। রাজকুমার কখন সেই স্থান অবলোকন করেন নাই, সুতরাং দর্শন-মাত্র তাঁহার মনে বিস্ময়রসের সঞ্চার হইল। কৌতূহলরূপ অনলশিখা ক্রমশই প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। ঋতধ্বজ দেখিলেন, ভুজঙ্গগণের ভোগমণি দীপের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দীপ্তি পাইতেছে। কুমার, তরুণ ও বৃদ্ধ উরগগণ অপূর্ব্ব মণিভূষণে ভূষিত হইয়া বিচরণ করিতেছে। দিব্যরূপা নাগকন্যাগণ ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত হইতেছে, কোন স্থানে মুরজ ও কোন কোন স্থানে বীণা বেণু প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র বাজিতেছে। নাগ-কুমারদ্বয় তথায় নাগরূপ ধারণ করিলেন, তাঁহাদিগের ফণাপ্রভায় দিক সকল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নৃপনন্দন তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া সপ্রেমস্বরে কহিলেন, বয়স্য! তোমরা এখন স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর শোভমান হইতেছ। নাগপুত্রেরা কহিলেন, মিত্র! এই পাতালের অধীশ্বর নাগরাজ অশ্বতর আমাদিগের পিতা। তিনি দেবলোকেরও মাননীয়, শান্তস্বভাব এবং অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়। চল এখন তোমাকে তাঁহার সমীপে লইয়া যাই। এই বলিয়া তাঁহারা রাজকুমারকে লইয়া রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ঋতধ্বজ সেই রাজপুরীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে নানা কক্ষ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা রাজসভায় উপনীত হইলেন। রাজকুমার দিব্য বসনভূষণ-সুশোভিত নাগেশ্বরকে স্বর্ণা-সনে উপবিষ্ট দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনিই হয় ত নাগরাজ অশ্বতর। তখন মিত্রদ্বয় প্রিয় মিত্র ঋতধ্বজকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, সখে! যিনি তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, ইনিই সেই নাগেশ্বর, ইনিই আমাদের পিতা। যুবরাজ শ্রবণমাত্র ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। নাগপুত্রেরা পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি যাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক চিত্তে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইনি সেই প্রিয় বন্ধু যুবরাজ ঋতধ্বজ। নাগকুলপতি অশ্বতর রাজকুমারের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক চিরজীবী হও, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, বৎস ঋতধ্বজ! পুত্রমুখে তোমার অসামান্য গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া আমি তোমার গুণপক্ষপাতী হইয়াছি। তুমি ধন্য, তুমিই যথার্থ সৎপুত্র, তোমার পিতামাতাই যথাথ পুত্রবান্ ও সৌভাগ্যশালী। তুমি শত্রুকুল নিপাত করিয়া ক্ষত্রিয়কুল সমুজ্জ্বল করিয়াছ। পিতামাতার শুশ্রূষা করিয়া অসামান্য ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছ। লোকে পরোক্ষে যাহার গুণ কীর্ত্তন করে, সেই শ্লাঘ্য; জনক জননীকে যে সুখী করিতে সক্ষম, সেই ধন্য; মহাজনের অন্তঃকরণে যে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে, তাহারই জন্ম সার্থক। দেবলোক, পিতৃলোক, মিত্রবর্গ, অর্থী ও বিকলেন্দ্রিয় এবং বন্ধুবান্ধবগণ যে গুণবান ব্যক্তির জীবনকামনা করে, সেই যথার্থ কৃতী। আমি পুত্রমুখে শুনিয়াছি, তুমিই এই সমস্ত অসামান্য গুণের একাধার। এই সংসারে তোমার কিছুমাত্র পরিবাদ নাই, তুমি সর্ব্বজনের প্রশংসনীয়, দরিদ্রের প্রতি দয়াবান্ ও বিপন্নের অদ্বিতীয় শরণ, প্রার্থনা করি, দীর্ঘজীবী হইয়া পিতামাতার ও জগতের আনন্দ এবং শত্রুকুলের হৃদয়জ্বর বর্দ্ধন কর। নাগরাজ রাজপুত্র ঋতধ্বজকে এই কথা

বলিয়া নিজ পুত্রদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে তোমরা রাজকুমারকে বিশ্রামগৃহে লইয়া যাও, যথোপযুক্ত উপাদেয় পানভোজনাদি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আদেশ কর। তৎপরে আমরা একত্র মিলিত হইয়া আহারাদি সমাধান পূর্ব্বক হৃদয়োৎসবকর কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিব।

তৎশ্রবণে নাগরাজপুত্রেরা প্রিয় মিত্র ঋতধ্বজকে বিশ্রামার্থ ভবনান্তরে লইয়া গেলেন। তৎপরে ভুজঙ্গপতি রাজকুমার ও নিজ কুমারদ্বয়কে আহ্বান করিয়া একত্র পরমানন্দে পান ভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজপুত্র বন্ধুভবনে সানন্দ মনে এক দিবস অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

একদা ভুজগরাজ রাজকুমারের সহিত অন্যান্য নানা প্রকার মধুরালাপের পর কহিলেন, নৃপকুমার! তুমি আমার পুত্রদ্বয়ের পরম হিতৈষী মিত্র, সুতরাং তোমার প্রতিও আমার পুত্রবাৎসল্য জন্মিয়াছে। তুমি আমার ভবনে আগমন করাতে আমি যারপর নাই প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমার মনে একটী বাসনা হইয়াছে, তোমাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। তুমি আমায় পিতৃবৎ মনে করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর। যান, বাহন, রজত, স্বুবর্ণ বা দিব্যাসন অথবা অন্য কোন দুর্লভ বস্তু যাহা চাহিবে, তাহাই আমি তোমারে প্রদান করিয়া প্রীতিলাভ করিব।

রাজকুমার ভুজগরাজের প্রস্তাব শুনিয়া অতি বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, তাত ! আপনি আমার পিতা, সুতরাং আপনার নিকট যাচ্ঞা করিতে আমার মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা ক্ষোভের উদয় হয় না। আপনার প্রসাদে আমার পিতৃভবনে স্বর্ণরজতাদি ভোগ্য বস্তুর অপ্রতুল নাই। এ ভবন হইতে যান বাহনাদি গ্রহণ করিয়া ভবনান্তরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন দেখি না। ভবদীয় ভবনে ও মদীয় পিতৃভবনে আমার কিছুমাত্র ভিন্ন ভাব নাই। অতএব আপনি ধনরত্নাদি প্রার্থনা করিতে আর আমায় অনুরোধ করিবেন না। আমি যে স্বীয় শিরোমণি দ্বারা আপনার চরণযুগল স্পর্শ করিলাম, এবং আপনি যে, কৃপা ও স্নেহ প্রকাশ করিয়া আমারে আলিঙ্গন করিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইয়া সর্ব্বরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভুজগরাজ যুবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণে যারপর নাই প্রীত হইলাম, তুমি আমার পুত্রদ্বয়ের পরমোপকারী মিত্র, এইজন্য ঐরূপ প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম। এক্ষণে পুনর্ব্বার কহিতেছি, যদি আমার নিকট ধনরত্নাদি গ্রহণ করিতে তোমার অভিলাষ না থাকে, তবে এমন কোন দুর্লভ বস্তু কামনা করিতে পার, যাহাতে তোমার প্রীতির উদয় হয়। আমি তোমার সমক্ষে অঙ্গীকার করিতেছি, যেরূপ প্রীতিকর বস্তু প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রদান করিব। ইহা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, তাত ! ভবদীয় প্রসাদে আমার ভবনে সকলই আছে, বিশেষতঃ আপনার দর্শনে আর আমার কোন বিষয়ের অসদ্ভাব নাই, আমি ভবদীয় দর্শনলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছি, এই মানুষ-শরীর আপনার অঙ্গস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে। আমার জীবিত সফল ও কর্ম্ম সার্থক

হইয়াছে, তবে যদি আমাকে নিতান্তই অভিলষিত বর দানে অভি-লাষী হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন, যেন আমার হৃদয় হইতে কখনও পুণ্যকর্ম্ম-সংস্কার অপনীত না হয়। তাহা হইলেই সুবর্ণ, মণি, রত্ন, দিব্য ভবন, যান, আসন, অন্ন, পান ও স্ত্রীপুত্র সকল পাওয়া হইল, কারণ ঐ সমস্ত বস্তু পুণ্যতরুর ফল। পুণ্যাসক্ত ব্যক্তির কিছুই অপ্রাপ্য নহে।

অশ্বতর কহিলেন, যুবরাজ! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য, ধর্ম্মাত্মা লোকের কিছুই দুর্লভ নাই। আমি বর প্রদান করিতেছি, তোমার মন নিয়ত ধর্ম্মপথে বিচরণ করিবে। কিন্তু যখন তুমি আমার গৃহে সমাগত হইয়াছ, তখন তোমাকে অবশ্যই আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। অধুনা তুমি, যাহা এই সংসারে দুষ্প্রাপ্য, এমন কোন বস্তু আমার স্থানে প্রার্থনা কর, আমি তাহাই তোমারে দান করিয়া প্রীতিলাভ করিব। ঋতধ্বজ ভুজগরাজের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া মিত্রদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা প্রিয়বন্ধুর হৃদয়গত তাবৎ ভাব অবগত ছিলেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ পিতৃচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, তাত! আমরা রাজকুমারের মনের কথা বিলক্ষণরূপে অবগত আছি। এক দুরাচার দানব মিত্রভবনে আগমন পূর্ব্বক বন্ধুর অমঙ্গল সংবাদ প্রদান করিলে, মিত্রপত্নী গন্ধর্ব্বনন্দিনী পতিপ্রাণা মদালসা তাহার প্রতা-রণা বুঝিতে না পারিয়া পতিশোকে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া-ছেন। এই কৃতজ্ঞ বন্ধু রাজকুমার তাহা শুনিয়া, যদবধি দেহে জীবন থাকিবে, তদবধি অন্য নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিব না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আপনার যদি উপকার করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে যাহাতে আমাদের মিত্র মদালসাকে দেখিতে পান, আপনি

তাহার কোন উপায় করুন। সেই পতিরতা গন্ধর্ব্বকুমারী মদালসার দর্শন ভিন্ন ইহাঁর মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। রাজকুমার তাঁহাকেই দেখিতে অভিলাষ করিতেছেন। অশ্বতর পুত্রদ্বয়ের কথা শুনিয়া কহিলেন, বৎস! পঞ্চভূতময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে আত্মা বিযোজিত হয়, এই সংসারে পুনরায় তাঁহার সংযোগ হওয়া নিতান্ত দুরূহ। স্বপ্ন বা মায়া দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মৃত ব্যক্তির দর্শনলাভের সম্ভাবনা নাই।

রাজপুত্র ঋতধ্বজ লজ্জাবনতমুখে মহাত্মা নাগপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! যদি একবার মায়াময়ী মদালসাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেও আমি সবিশেষ অনুগৃহীত হই। নাগরাজ কহিলেম, যুবরাজ! বালক হইলেও অভ্যাগত ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া মানিতে হয়, তুমি যখন আমার আলয়ে আগত হইয়াছ, তখন অবশ্যই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। যদি মায়াময়ী মদালসার মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে এই মুহূর্ত্তেই দেখাইতেছি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহগুপ্তা মদালসারে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং রাজকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, বৎস! দেখ দেখি, তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যা মদালসা এই কি না?

তখন রাজকুমার সহসা অসম্ভাবিত মদালসার রূপ দর্শনে প্রথম ক্ষণে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক, প্রিয়তমে মদালসে! তুমি এত দিন আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অবস্থান করিতেছিলে? এই বলিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিবার নিমিত্ত বেগে গাত্রোত্থান করিলেন। তদ্দর্শনে ভুজঙ্গরাজ

সত্বর হইয়া তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন; বৎস! কি কর; আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি যে মায়াময়ী মদালসা, স্পর্শ করিলেই অন্তর্ধান করিবেন। রাজকুমার ঐ কথা শ্রবণমাত্র হা প্রিয়ে! বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। অহো! ভুজঙ্গপতি অশ্বতরের কি আশ্চর্য্য শক্তি! ইনি মায়াবলে প্রিয়তমারে প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। এখন কি করি, প্রিয়তমাকে দর্শন করিয়া আমি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। এই মায়াময়ী ঘটনা আমার চিরপ্রদীপ্ত শোকানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল। এতদিন ইহাঁর বিরহানলে দগ্ধ হইয়াও কথঞ্চিৎ জীবিত ছিলাম। এক্ষণে অবিকল সেই প্রাণপ্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহাঁর সহিত সম্ভাষণ বা সম্মিলন না হইলে, কখনই জীবন ধারণে সমর্থ হইব না। হায়! ইন্দ্রজালের কি অদ্ভুত প্রভাব! যদি এই বিদ্যার প্রভাবে প্রাণপ্রিয়া মদালসা চিরদিন এইরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলেও নিরন্তর অবলোকন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি। হা প্রিয়তমে! তুমি দেখা দিয়াও কেন এখন কঠিন ব্যবহার করিতেছ! তুমি যে আমার অমঙ্গল শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিয়া স্নেহের ও অকৃত্রিম প্রেমভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, এখন এই দীর্ঘকালের পর আমারে প্রত্যক্ষ করিয়াও কথা কহিতেছ না কেন? হায়! এখন কি করিব! কি উপায়ে হৃদয়জ্বর শান্ত হইবে! কেমন করিয়াইবা আকুলচিত্তকে সুস্থির করিব। কেন আমি নাগপতির নিকট মায়াময়ী প্রিয়তমাকে দেখিতে প্রার্থনা করিলাম। আহা! এই সেই কমনীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেছি বটে, কিন্তু হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতেছে না। দর্শনক্ষণেই ইন্দ্রজাল মনে হইয়া যারপর নাই যাতনা পাইতেছি!

পূর্ণ-শশী।

ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া সেই ভীমমূর্ত্তি আবার কহিল, পরমেশ্বর! আমি মহাপাতকী, আমার কি নিস্তার হইবে না? হে বিশ্বপরিত্রাতা! আমার কি পরিত্রাণ হইবে না? আমি বিশ্ববঞ্চক নরাধম।—কত পতিপরায়ণা কুলললনার সতীত্বকুঞ্জের সৌরভিত পুষ্পদাম ছিঁড়িয়াছি, কত ধর্ম্মশীল গৃহস্থের শোণিতার্জ্জিত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছি, ধনলোভে মত্ত হইয়া দুগ্ধবতী জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া জীবনসর্ব্বস্ব দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন ধন অপহরণ করিয়াছি, কতশত পরিশ্রান্ত পান্থের অমূল্য প্রাণরত্নের সহিত ধনরত্ন হরণ করিয়াছি, আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। হে সর্ব্বসাক্ষিন্! তুমি সকলই দেখিয়াছ, সকলই জান, জগতে এমন পাপ কিছুই নাই, যাহা আমি করি নাই। এখন তোমাতে দেহ মন সমর্পণ করিলাম, আর আমি কখনো তোমারে ভুলিয়া কুপথে চলিব না। হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! আমারে ক্ষমা কর!

পাপী অনুতাপী এইরূপ কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়া পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার বিকট চক্ষু দিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। মাটীতে পড়িতেছিল, লুক্কায়িতা অপ্সরা সহসা প্রকাশ হইয়া অঞ্জলি পাতিয়া ধরিল।—উহা লইয়াই উভয় পক্ষে ভর দিয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া গেল। নন্দন-রক্ষক প্রহরী গন্ধর্ব্ব দেখিলেন, সুরমালা একজন পুরাতন পাপীর অনুতাপাস্ত অশ্রু আনিয়াছে; সুতরাং বহুমান করিয়া তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। সুরমালা সুররঞ্জন নন্দনকাননে প্রবেশ করিল। দুঃখের দিন গত হইয়া শুভ দিন আসিল।

পূর্ণশশী অনন্য মনে এই গল্প শুনিতেছিলেন, সমাপ্ত হইবামাত্র

হর্ষভরে পত্রিকাকে আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন, পত্রিকা হাস্যমুখে নিবারণ করিতে করিতে সরিয়া বসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সে কি তুমি না দেবপুত্র?

"উন্মত্তের স্খলিত কবরী
নিশ্বসন্তী বিশালং।"

দীর্ঘ উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া পত্রিকা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিবার অবসর হয় নাই, গল্পটী সমাপ্ত করিতে পত্রিকার উপর্য্যুপরি এক দিন দুই রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল। বিদ্যাধরী নন্দন কাননে প্রবেশ করিয়া সুখী হইল, পত্রিকা যখন এই কথা বলেন, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিযাম অতীত। নিত্যকামী অধৈর্য্য হইয়া গল্প শুনিতেছিলেন, ভাল লাগিতেছিল না, সমাপ্ত হইলে পর যেন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, প্রথম কথাগুলি বরং ভাল ছিল, শেষের কথা কিছুই নয়। পত্রিকার মুখে এমন গল্প বাহির হইবে, মনে করি নাই। এই কথা বলিয়া পত্রিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পত্রিকে! তুমি বলিলে বলিয়াই আমি এতক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিলাম, আর কেহ বলিলে আমি উঠিয়া যাইতাম। কারণ আমি তোমাকে বড়ই ভাল বাসি। পত্রিকা কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কে উঠিয়া যাইতে বারণ করিয়াছিল?—এই একটী মাত্র কথা কহিয়া পত্রিকা পূর্ণশশীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক দ্রুতপদে শয়নকক্ষে চলি-

লেন। ব্রহ্মচারীর ভয় হইল, তিনি সভয়ে পশ্চাদ্গমন করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, সুন্দরি! রাগ করিয়া গেলে?—পত্রিকা কথা কহিলেন না, ফিরিয়াও চাহিলেন না,—মৌনভরেই নিজকক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছিল, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া সকলেই স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিলেন। স্বচ্ছন্দ সুষুপ্তি হইল না, উষাকালেই সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, কেবল পূর্ণশশী কিঞ্চিৎ বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইলেন। নিত্যকামীর আদৌ নিদ্রা হইল না, পত্রিকা ক্রোধ করিয়া গেল, বিবাহে বিঘ্ন হইবে, এই উদ্বেগে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন, একবার উঠিলেন, একবার বসিলেন, একবার পটাবাসের গবাক্ষের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, আকাশের দিকে চাহিলেন, ভ্রান্ত মনে কখনো বা নক্ষত্র গণনা করিলেন, পত্রিকা ঘুমাইল কিনা, একবার গিয়া দেখিয়া আসি, এই ভাবিয়া দেখিতে গেলেন, দ্বার অবরুদ্ধ, আশা বিফল হইল, ফিরিয়া আসিলেন, আবার আসিয়া গবাক্ষের ধারে দাঁড়াইলেন,—দেখিলেন, সুখতারা উঠিল, প্রভাত-সমীরণ বহিল, নিত্যকামীর দীর্ঘ নিশ্বাস পবনহিল্লোলের প্রতিধ্বনি করিল, তৃণ-প্রাঙ্গণে উষার শিশির পড়িল, নিত্যকামীর অশ্রু যেন তাহারি অনুকৃতি দেখাইল। উষা আসিল,—চলিয়া গেল, অরুণোদয় হইল,—তিনি বিষণ্ণ মনে গৃহ হইতে বাহির হইলেন,—প্রবেশ-তোরণের পার্শ্বে একখানি আসনে ম্লানমুখে বসিয়া রহিলেন, কি উপায়ে প্রণয়িনীর মান ভঞ্জন করিব, সেই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তায় এককালে নিমগ্ন।

ওদিকে পত্রিকা ভাবিলেন, ব্রাহ্মণকে কল্য তিরস্কার করিয়াছি, তিনি কি করিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, দেখিতে হইল। ব্রাহ্মণ

ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, উত্তম রহস্য উপস্থিত হইয়াছে। চিন্তা করিয়া আপনা আপনি একটু হাসিলেন।—ব্রহ্মচারী কি করিতেছেন, দেখিবার জন্য চলিলেন। নিত্যকামী যে গৃহে শয়ন করেন, প্রথমে সেই গৃহের দ্বারে উঁকি মারিলেন, ব্রাহ্মণ গৃহে নাই,—দেখিতে পাইলেন না, ইতস্তত অন্বেষণ করিলেন, দেখা হইল না, বহির্দ্বারে গমনের উপক্রমে দেখিলেন, দরজার পার্শ্বে শিলা-পুরুষের ন্যায় ব্রহ্মচারী উপবিষ্ট। পাণিতলে কপোলদেশ বিন্যস্ত, দীর্ঘশ্মশ্রু বক্রভাবে বক্ষ বাহু অতিক্রম করিয়া নাভি আলিঙ্গন করিয়াছে। পত্রিকা ধীরে ধীরে সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, নিত্যকামী এত অন্য মনস্ক যে, কিছুই জানিতে পারিলেন না। পত্রিকা পশ্চাতের আস্তরণের উপর নিঃশব্দে গিয়া দাঁড়াইলেন,—ধ্যান-নিমগ্ন মূর্ত্তির গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন, তথাপি ব্রহ্মচারী জানিতে পারিলেন না।

পত্রিকা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সহসা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করতালি দিলেন। নিত্যকামী চমকাইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে পত্রিকা।—আহ্লাদে বুক ফুলিয়া উঠিল,—আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, এসো আমার মনোমোহিনী এসো!

পত্রিকা সসম্ভ্রম কহিলেন, বসুন, আপনি দাঁড়াইলেন কেন?

নিত্য।—হাঁ, বসিতেছি, তুমি অগ্রে বসো।

পত্রি।—আপনি বসুন, আমি বসিব না।

নিত্যকামী কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, কেন?—বসিবে না কেন? তোমার কি হইয়াছে?—রাগ করিয়াছ? কেন ক্রুদ্ধ হইলে?

পত্রি।—কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব?

নিত্য।—কেন? আমি তোমার অনুগত। আমার উপর।

পত্রি।—সে কেবল মুখে।

নিত্য।—ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শশধর বদনে! (শ্রীবিষ্ণু!) শশি-মুখি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর!

পাত্রিকার ভুবনমোহন মুখে একটু হাসি আসিল। সে হাসি নিত্যকামীকে দেখাইলেন না, মুখ ফিরাইয়া হাসিলেন, ব্রহ্মচারী দেখিলেন না।—ভুবনমোহিনী সেই বক্র দৃষ্টিতে,—সেই গম্ভীর ভাবে, সেই সুমধুর স্বরে কহিলেন, দ্বিজবর! ঐ গুণেই ত আমি তোমার নিকটে বিনামূলে বিক্রীত হইয়াছি। তুমি পুরুষরত্ন।

এত দিনের পর পত্রিকা আজ নিত্যকামীকে "তুমি" বলিলেন। নিত্যকামীর আনন্দের সীমা রহিল না, হাস্যমুখে আবার কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমারে এত ভাল বাস, জানিতাম না।

পত্রিকা তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, না জানিয়াই এই, জানিলে কি আর আমি এতদিন কাশ্মীরের রাজপুত্রের তাঁবু নিষ্কণ্টক রাখিতে পারিতাম?

"কেন পারিতে না? আমি তোমার সঙ্গে আছি, আমি তোমার সহায় আছি, আমি রাখিব।" নিত্যকামী এই কথা বলিয়া দীর্ঘ শ্মশ্রু সঞ্চালন পূর্ব্বক খল্ খল্ করিয়া হাসিলেন।

পত্রিকা বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। ঔষধ তলায় না, কিছু খেতে চায় না, এখন অনেক সুস্থ। মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, ঋষিবর! আমি চলিলাম,—বেলা হইতেছে, কে কোথা দিয়া আসিবে,—দেখিবে, আমি জাতিকুল হারাইব। কাজ নাই, আপনি বসুন, আমি চলিলাম।

বেলা তখন ছয় দণ্ড অতীত। নিত্যকামী কহিলেন, সুন্দরি! একটু থাকো, আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

পত্রি।—কি জিজ্ঞাসা করিবে, কর, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না, পূর্ণশশী কি মনে করিবেন।

"কিছু মনে করিবেন না, তিনি আমারে ঠাকুরদাদা বলেন, তুমি তাঁর সহচরী, আমার গৃহিণী, আমার কাছে আছ শুনিলে কিছুই মনে করিবেন না, কিছুই বলিবেন না। তুমি একটু থাকো, একটী মাত্র কথা আমি বলিব।"

ব্রহ্মচারীর এই কাকুতি শুনিয়া, প্রণয় সম্ভাষণ বুঝিয়া, পত্রিকা বলিলেন, একটী কথা?

নিত্যকামী কহিলেন, হাঁ, কেবল একটী মাত্র কথা।

পত্রিকা ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, সূর্য্য উদয় হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, এখনো আকাশে লুকাইয়া আছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, গঙ্গাযমুনা প্রবাহিত হইতেছে, সকলে সাক্ষী,—চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী,—অগ্নি সাক্ষী, নদনদী সাক্ষী, তুমি সত্য করিয়া বল, কবে তুমি আমারে বিবাহ করিবে?

মনে মনে হাসিয়া পত্রিকা মধুর বচনে কহিলেন, এই তোমার একটী কথা? সে জন্য ভাবিতে হইবে না। বিবাহ হইবে। যে দিনে পূর্ণশশীর বিবাহ হইবে, সেই দিনেই আমার বিবাহ।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া পত্রিকা ব্রহ্মচারীর দিকে পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়া ঘন ঘন পদক্ষেপে অন্দরাভিমুখে চলিলেন। নিত্যকামী আর থাকিতে পারিলেন না,—উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন। ডাকিলেন,—দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না,—সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন।—সুন্দরি! যেওনা,—দাঁড়াও,—আর একটী কথা। পুনঃ পুনঃ এইরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন, উত্তর পাইলেন না। পত্রিকা নয়নের অদৃশ্য হইয়া গেলেন,—যে মহলে তাঁহারা

থাকেন, পুরুষের সে মহলে প্রবেশের অধিকার নাই,—নিত্যকামী সেটী ভুলিয়া গেলেন—বিহ্বল হইয়া—"সুন্দরি !—সুন্দরি—যেও না,—আর একটী কথা——" বলিতে বলিতে অনেক দূর অনধিকার প্রবেশ করিলেন,—অনেক দূর সঙ্গে গেলেন, পথে কঞ্চুকী নিষেধ করিল, চৈতন্য হইল,—ফিরিয়া আসিলেন।—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে আবার কহিলেন,—মনে মনে নহে,—আত্মগত অনুচ্চকণ্ঠে আপনি কহিলেন, পূর্ণশশীর বিবাহ যে দিনে হইবে, আমার সহিত পত্রিকার বিবাহও সেই দিনে হইবে। তবে আর কি ?—এই ভাবিয়া গৃহোপকণ্ঠে ফিরিয়া আসিলেন, পত্রিকা চলিয়া গেলেন।

আহারাদির আড়ম্বরে আর নানাবিধ কথোপকথনে দিবা অতিবাহিত হইল, সন্ধ্যা উপস্থিত।

সন্ধ্যার পর পত্রিকাকে একান্তে পাইয়া পূর্ণশশী বিষণ্ণ বদনে মৃদুস্বরে কহিলেন, নিকটে এসো,—বলো, গত রজনীতে যখন তুমি বিদ্যাধরীর চমৎকার গল্প সমাপ্ত করিলে, তখন আমি তোমারে আহ্লাদে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলাম, তুমি নিবারণ করিলে, হাসিয়া মুখ ফিরাইলে, সরিয়া গেলে, সে ভাব তোমার কেন হইয়াছিল ?—হাতে ধরি, সত্য করিয়া বল, কেন সেরূপ করিয়াছিলে ?—দুই,—তিন বার এই প্রশ্ন করিলেন, পত্রিকা কিছু উত্তর দিলেন না। পূর্ণশশী উন্মাদিনী বিরহিণীর ন্যায় ব্যাকুলিনী হইলেন, অবিবাহিতা কুমারী বিরহযন্ত্রণা জানেন না,—মনোবেদনায় বারম্বার এক কথা বলিলেন, তৃপ্তিকর উত্তর পাইলেন না। অনেকক্ষণ পরে পত্রিকা কহিলেন, আমি কামচারী বিহঙ্গিনী,—গন্ধর্ব্ব-কন্যা,—যে রূপ ইচ্ছা, তাহাই ধারণ করি।

পূর্ণশশী কহিলেন, তাহাতে কি বুঝিব ? পত্রিকা হাসিয়া উত্তর করিলেন, তাহাতে এই বুঝিবে যে, আমি গন্ধর্ব্বকুমারী।

চারুশীলা শশী ঈষৎ অন্যমনস্ক হইয়া কিঞ্চিৎক্ষণ মৌন থাকিলেন,—একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ভগিনি ! এখন কি পরিহাসের সময় ?

পত্রি।—পরিহাস কিসে বুঝিলে ?

পূর্ণ।—কিসে না বুঝিব ?—তোমার গল্প শুনিয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছিল, আমি তোমারে আলিঙ্গন করিতে উঠিয়াছিলাম,—তুমি বারণ করিলে কেন ?—সরিয়া গেলে কেন ?—এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহার উত্তর করিতেছ না ; পাশ কথা পাড়িতেছ।

পত্রি।—একে বুঝি পরিহাস বলে ?

পূর্ণ।—নয় কেন ?—এক কথার আর জবাব দিলেই লোকে পরিহাস বলে।

পত্রিকা পুনরায় হাস্যমুখে কহিলেন, আহা ! সরলা ত সরলা ! মনে এক বিন্দু মলা নাই। আকাশের পূর্ণচন্দ্রে মৃগাঙ্ক দোষ আছে, এ পূর্ণশশীতে তিলাঙ্কও নাই। দেখ, তখন আমি তোমারে যে বারণ করিয়াছিলাম, সেটী ভাল। তুমি পূর্ণবয়স্থা, তাতে অবিবাহিতা, তাতে আবার আমাদের রাজকুমারের কাছে বাগ্দত্তা ;—দেখ, যে কুমারীর বিবাহ হয় নাই, সে কাহাকেও আলিঙ্গন করিতে পারে না। অনূঢ়া কুমারী যদি কাহারেও আলিঙ্গন করে,—সে পুরুষই হোক্, কি নারীই হোক,—কুমারী যদি কাহারেও আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে বড় দোষ। সে দিন রাজপুত্রও আমারে ঐ কথা বলিয়া দিয়াছেন"।

অশোক কাননে জানকীর প্রতি দশানন।

নিহারি নরারি রাজে, রাবণারি নারী।
বসিলেন নতমুখে, নেত্রে ঝরে বারি॥
আবরি মলিন বাসে, শীর্ণ তনুখানি।
অধোমুখী শশিমুখী, রবিকুল রাণী॥
তবু কি তা ঢাকা যায়, ফেটে উঠে রূপ।
ছায়া ঢাকা পূর্ণশশী, থাকে কি বিরূপ?
চারি দিকে শুষ্ক পর্ণ, শুষ্ক পত্রোদরে।
সুচারু ফুটন্ত ফুল, যথা শোভা করে॥
তেমতি শোভিলা বনে, জনক কুমারী।
এত যে মলিন, তবু, শশিদর্পহারী॥
মেঘে ঢাকা শশী যেন, থেকে থেকে ফুটে।
বিজনে বিকসে ফুল, পরিমল ছুটে॥
তেমনি রাঘবপ্রিয়া, সরম আবরি।
বসিলেন রামরূপে, ধ্যানযোগ করি॥
যোগাসনে ঋষি যেন, রজ্জু পরিহরি।
ভয়ে জড়সড় হয়ে, বসিলা সুন্দরী॥
হাসিয়া নিকটে আসি, দুষ্ট দশানন।
কহিতেছে রসাভাষে, অমিয় বচন॥
অয়ি বিশালাক্ষি সীতে। কেন এত ভয়?

কেন তুমি ঝাঁপিতেছ, জঘন হৃদয় ?
কেন তুমি লুকাইছ, কমল বদন ?
আমারে তোমার এত, ভয় কি কারণ ?
শুন সুলোচনে ! আমি কহিতেছি সার।
আমা হতে কোনো ভয়, নাহিক তোমার ॥
যখন হয়েছে মম, তোমাতে কামনা।
তখন ওসব ছলা ছাড় সুলোচনা ॥
বহুমান দান করি, করলো বরণ।
নিতান্ত তোমারি আমি লয়েছি শরণ ॥
আরো শুন, সুনয়নি ! শান্ত কর মন।
লঙ্কার ঈশ্বর আমি, বিখ্যাত ভুবন ॥
অভয়ে আমারে তুমি করিলে ভজন।
নারিবে করিতে কিছু, আর কোনো জন ॥
কারো হতে আর তব, না রহিবে ভয়।
এসো বামা ! হৃদে এসো, জুড়াই হৃদয় ॥
আরো শুন চারুশীলে ! বুঝাই তোমায়।
ধর্ম্মহানি শঙ্কা নাই, ভজিলে আমায় ॥
মোহিয়াছি তব রূপে, মোহিয়াছে মন।
মোহিনি ! আমার তুমি, জীবনের ধন ॥
হরিয়াছ মন প্রাণ, রূপের ছটায়।
হরিয়াছ চারু আঁখি ! কটাক্ষ ছলায় ॥
মজিয়াছি তব রূপে, বন্দী রূপফাঁদে।

মজেছে চকোর চক্ষু, তব কান্তি চাঁদে ॥
তোমারে হরিয়া আমি, হইয়াছি চোর।
মনোহরা, সব তুমি, হরিয়াছ মোর ॥
তুমি হইবে না চোর, আমি যাব ধরা।
এই কি বিচার তব, হ্যাঁলো, মনোহরা ?
চোর তুমি ! তাই আমি, করেছি হরণ।
বলে আমি তোমাধনে, করিব গ্রহণ ॥
পুরুষে নারীর রূপে, হইলে মগন।
কোরে থাকে হেন কাজ, জান প্রাণধন ॥
বিশেষে রাক্ষস আমি, রাক্ষসের পতি।
বলেতে রমণী ধরা, কুলের পদ্ধতি ॥
যারে তুমি ভাবিতেছ, ধর্ম্ম নাশ ভয়।
রাক্ষসের ধর্ম্ম সেটী, অধর্ম্মের নয় ॥
ধর্ম্ম অনুসারে আমি, ভজিব তোমারে।
স্বৈরিণী হবে না তুমি, ধর্ম্মের বিচারে ॥
আর যদি ভাবো মনে, চন্দ্রনিভাননে !
পাছে কেহ আসে, দেখে, বিলাসকাননে ॥
অয়ি ভীরু ! ভুলে যাও, ভেবোনা অন্তরে।
সে ভয় করোনা তুমি, আমার গোচরে ॥
নিজে আমি তব আশে, আসিয়াছি যবে।
কার সাধ্য হেথা আজি, উপনীত হবে ?
কেহ আসিবেনা বনৈ, কোন ভয় নাই।

আমারে সদয় হও, দোহাই দোহাই ॥
দুই পক্ষে দুই কথা, বলিলাম খুলে।
কোনো ভয় করোনাকো, সব যাও ভুলে ॥
আরো জেনো, পদ্মনেত্রে ! বাসনা আমার।
রসাভাষে অভিলাষ, করি পরিহার ॥
কিছু অনুরাগ নাই, নায়িকা বিলাসে।
কিছুমাত্র সাধ নাই, হাস্য পরিহাসে ॥
দেবীপদে বরি তোমা, পূজিব ললনে।
পূজনীয়া হবে তুমি, স্বর্ণ নিকেতনে ॥
কত নারী আছে মম, স্বর্গ বিদ্যাধরী।
কত বিলাসিনী আছে, সুরেশ সুন্দরী ॥
সবার উপরে আছে, রাণী মন্দোদরী।
তদুপরে পাটরাণী, হইবে সুন্দরি !
সকলেই সেবাদাসী, হইবে তোমার।
আমারে ভজহ সীতে, ভেবোনাকো আর ॥
পরিহর শোক রামা ! পরিহর শোক।
এ অশোকে হবে তুমি, অশোকে অশোক ॥
আরো বলি কমলাক্ষি ! পূর্ণেন্দু বদনা।
সকলেই কোরে থাকে, সুখের কামনা ॥
এই তুমি বোসে আছ, রুক্ষ এলো কেশে।
ভূতলে শয়ন কর, কাঙালিনী বেশে ॥
নিয়ত চিন্তায় রত, মলিন বসন।

উপবাসে ক্ষয় হয়, তরুণ যৌবন ॥
বল দেখি শশিমুখি ! করি নিবেদন।
একে কি বলিয়া থাকে, সুখের সাধন ?
এসোলো প্রসন্ন হও, পঙ্কজ-নয়নে !
আমারে আশ্রয় কর, সুপ্রসন্ন মনে !!
বিবিধ বিচিত্র মালা, অগুরু চন্দন।
সুশোভিত কর গাত্রে, দিব্য আভরণ ॥
মহা মূল্য বাস পর, চড় দিব্য যান।
সুর রমণীয় গৃহে, লহ আসি স্থান ॥
নৃত্য গীত বাদ্যামোদে, থাকিবে তথায়।
দেবের দুর্লভ বস্তু, ভুঞ্জাব তোমায় ॥
দেবের দুর্লভ সুখ, করিবে সাধন।
দেবের দুর্লভ রত্ন, করিবে ধারণ ॥
পারিজাত মন্দারের, আমি অধীশ্বর।
অধীশ্বরী হবে তুমি, শোভিবে সুন্দর ॥
মনোহর অট্টালিকা, সুবর্ণ প্রাসাদ।
বিচিত্র সোণার খট্টা, স্বর্ণময় ছাদ ॥
স্বর্ণময় সিংহাসন, স্বর্ণময়ী পুরী।
স্বর্ণদণ্ড, স্বর্ণছত্র, স্বর্ণ ভেরী তূরী ॥
সকলি তোমার হবে, ওলো বরাঙ্গনে !
সহস্র সহস্র দাসী, সেবিবে চরণে ॥
লঙ্কার ঈশ্বরী তুমি, হবে প্রমোদিনী।

আমারে প্রসন্ন হও, বিশ্ববিনোদিনী ॥
যাপিছ যৌবনকাল, নিশ্বাস পবনে।
পাবে কি এ রত্ন পুনঃ, ভাবিছ কি মনে ?
এ জগতে সুবদনি ! যাহা কিছু যায়।
ফিরে কি তা আসে আর ? ফিরে কেহ পায় ?
চোলে যায় স্রোতপথে, স্রোতস্বতী নীর।
চোলে যায় দ্রুতগতি, ধানুকীর তীর ॥
যায় বটে, ফিরে কি তা আসে আর বার ?
কভু নয়, কভু নয়, আসে নাকো আর ॥
তাই বলি বিধুমুখি ! মান বাড়ায়ো না।
সুখের যৌবনকাল, বৃথা কাটায়ো না ॥
গেলে আর ফিরে কভু, ফিরে আসিবে না।
যৌবন "এসেছি" বোলে কভু তুষিবে না ॥
তাই বলি শশিমুখি ! বাঞ্ছা কর সুখ !
আমারে প্রসন্ন হও, ঘুচে যাবে দুখ ॥
পাটরাণী হবে, তুমি, লঙ্কার ঈশ্বরী।
দাসী হয়ে রবে তব, রাণী মন্দোদরী ॥
আরো বলি সুরূপসি ! তুমি সুরূপসী।
তোমার রূপের কাছে, লজ্জিতা উর্ব্বশী ॥
দিব্যরূপ সৃষ্টিকারী, দেব প্রজাপতি।
তোমারে নির্ম্মাণ করি, চিন্তাহীন মতি ॥
চূড়ান্ত হয়েছে রূপ, শরীরে তোমার।

অণুহারা বিধাতার, পুঁজি নাহি আর ॥
অনুপম রূপরাশি তুমি লো ভামিনি !
ত্রিলোকে তোমার সমা, নাহিক কামিনী ॥
এত কথা কি বলিব, বায়ু বহ্নি প্রায় ।
বিধাতার মন টলে, হেরিলে তোমায় ॥
"বিষ্ণু যদি তোমারে, তিলেক তরে পান ।
লক্ষ্মী সরস্বতী পানে, ফিরিয়া না চান ॥"
নেত্র মম পড়িতেছে, যে অঙ্গে তোমার ।
নড়িতে চাহে না, কভু ফিরে নাক আর ॥
সর্ব্ব অঙ্গ মধুময়, তুমি মধুময়ী ।
আমারে আশ্রয় কর, প্রেমরসময়ী ॥
মোহ ছাড়, হও বামা ! ঠাট ছলা জয়ী ।
রাবণে আশ্রয় কর, প্রেমরসময়ী ॥
একান্ত তোমারি আমি, ওলো বরাননে !
মোহ ছাড়, দয়া কর, ভজ দশাননে ॥
সংসার সমুদ্র মথি, যত রত্নধন ।
এ জীবনে করিয়াছি, যাহা আহরণ ॥
সকলি তোমার সীতে ! সকলি তোমার ।
আমারে সদয় হও, ছলিও না আর ॥
মনোময়ী ! মনোরথ, কর লো সফল ।
সেবিবে তোমারে যত, রমণী মণ্ডল ॥
তোমার প্রীতির হেতু, ওলো সুলোচনে ।

ধরণী করিব জয়, এক শরাসনে ॥
জনক জনকে তব, বাড়াইতে মান।
সসাগরা বসুন্ধরা, করিব প্রদান ॥
আরো বলি কমলাক্ষি ! দেখাব তোমারে।
সমকক্ষ কেহ মম, নাহি এ সংসারে ॥
দেবাসুর নাগ নর, বড় বড় বীর।
সমরে আমার শরে, কেহ নহে স্থির ॥
পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি তব, হবে ধনপতি।
আমারে যৌবন দান, করলো যুবতি !
কারেও করো না ভয়, সব আমি পারি।
ভুবন বিজয়ী আমি, লঙ্কা অধিকারী ॥
কেবা ইন্দ্র, কেবা ব্রহ্মা, কেবা তব স্বামী ?
মনে রেখো রক্ষোলক্ষ্মি ! লঙ্কেশ্বর আমি ॥
আমারে ভজনা কর, সুচারু রূপসি !
লঙ্কার আকাশে তুমি, হবে পূর্ণশশী ॥

আরো যদি বিধুমুখি ! ভয় কর মনে।
আসিবে তোমার রাম, রাক্ষস ভবনে ॥
দেখিবে আমার তুমি, তার আর নও।
কলঙ্ক হইবে বোলে, ভীতা যদি হও ॥
সে ভয় কিছুই নাই, শান্ত কর মন।

কি সাধ্য রামের ? করে এথা আগমন ?
রাজ্যভ্রষ্ট বনচারী, জটাচীর ধারী।
ফলমূল খেয়ে ফিরে, কানন বিহারী॥
জীবনে সংশয় তার, কি করিবে রণ।
নরাশী রাক্ষসে তারে, করিবে ভক্ষণ॥
সন্ন্যাসী হইয়ে ফিরে, বিধি তারে বাম।
কেন ভয় কর রামা ! কোথাকার রাম ?
আমারে ভজনা কর, হও পাটরাণী।
রত্ন সিংহাসনে রেখে, সেবি পাদুখানি॥
স্বর্ণপুরে রাজ্য কর, স্বর্ণাসনে বসি।
স্বর্ণাকাশে শোভা পাও, স্বর্ণ পূর্ণশশী॥

নীরবিলা লঙ্কেশ্বর, এত কথা বলি।
আজি সীতা লভিলাম, মহা কুতুহলী॥
কি দেন উত্তর সীতা, শুনিবার তরে।
নিকটে বসিল দুষ্ট, প্রফুল্ল অন্তরে॥
আবার কাঁপিলা সীতা, জড়সড় হয়ে।
সরোষে সাহস কিছু পরাজিল ভয়ে॥
গর্জ্জিলেন নতমুখে, সুধাংশু বদনী।
লাঙ্গুলে তাড়িলে যথা, গর্জ্জে কাল ফণি॥
ভাবিলেন, ক্রোধ করা, হইবে বিফল।
ভাবিব অমৃত পাব, উঠিবে গরল॥

যা হোক্, নীরবে থাকা, উপযুক্ত নয়।
সময়ে উত্তর কিছু করিতেই হয় ॥
কিন্তু পরদারহারী, পাষণ্ড বর্ব্বর।
কেমনে ইহার সনে, করিব উত্তর ॥
মুখামুখী কোন কথা, কভু কহিব না।
পর পুরুষেয় ভাষা, কভু সহিব না ॥
কি করি, কি বলি, আর, কেমনেই বলি।
রোষে তোষে দুরাশয়ে, কেমনে বা ছলি ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে, করিলেন স্থির।
কথা কব, খেদাইব, তুলিব না শির ॥
ব্যবধান ব্যপদেশে, করি আকিঞ্চন।
একগাছি তৃণ, মাঝে, করিলা স্থাপন ॥
দুজনে পৃথক হয়ে, মৃদুল বচনে।
হিতকথা কহিলেন, রাজা দশাননে ॥
শুন লঙ্কা অধিপতি! বীরেন্দ্রপ্রধান।
শুনিয়াছি হও তুমি, অতি পুণ্যবান ॥
জগত বিজয়ী তুমি, রক্ষোকুলপতি।
শুনিয়াছি, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, শুদ্ধ তব মতি ॥
এ কেমন ব্যবহার, যাচ পরদার।
রাজা তুমি, রাজধর্ম্মে এ কোন্ বিচার ?
পরনারী হই আমি, সতী পতিব্রতা।
আর কিছু নাহি জানি, সদা পতিরতা ॥

আমারে ছুঁইতে চাও, কেন হেন আশা ?
ধর্ম্মের আবাসে কেন, অধর্ম্মের বাসা ?
ফিরে ঘরে যাও রাজা ! করি নিবেদন !
সুখে গিয়ে ভোগ কর, নিজ রাজ্যধন ॥
কেন মিছে সতীশাপে, যাবে রসাতল ।
রাজা তুমি, সব জানো, কি বুঝাব বল ॥
ফিরে ঘরে যাও রাজা, স্বর্ণ লঙ্কাস্বামী ।
ভূতলে শয়ন করি, কাঙালিনী আমি ॥
নিজ পত্নীগণে তুমি, রক্ষিবারে জানো ।
পর পত্নীগণে রাজা, সেই ভাবে মানো ॥
মঙ্গল হইবে তব, রক্ষকুলেশ্বর ।
রাজা তুমি, নারী আমি, কি কব বিস্তর ॥
মহা পরাক্রমে তুমি, শাসিতেছ ধরা ।
তোমার উচিত নয়, পরনারী হরা ॥
বড় বড় মন্ত্রী তব, আছে সভাস্থলে ।
কেহ কি এমন নাই, হিত কথা বলে ?
পরনারী হরা হোলে সুখহারা হয় ।
স্বর্গসুখ, ভোগ সুখ, তুল্য কভু নয় ॥
পরদারা হরে যারা, দুদিনের তরে ।
দুটীদিন পৃথিবীতে, সুখভোগ করে ॥
তার পর কি হইবে, নাহি থাকে মনে ।
অনন্ত নরক বাস, অনন্ত জীবনে ॥

লক্ষণেতে বুঝিতেছি, দেখিয়া স্বভাব।
সদাচারী সচিবের নিতান্ত অভাব॥
কারে বলে রাজমন্ত্রী, সমাজ উজ্জ্বল।
দেখ নাই লঙ্কেশ্বর, তাহাদের বল॥
শুন নাই কভু তুমি, তাহাদের বাণী।
ভোগেতে ভুলিয়া আছ, লয়ে নানা রাণী॥
ছিছি! ছিছি! এ কি কাজ! সাজে হে তোমায়।
পাপে মতি হলে, রাজ্য ছারেখারে যায়॥

আর এক কথা আমি, নিবারি তোমায়।
পূর্ণশশী আর তুমি বোলোনা আমায়॥
আছিলাম পূর্ণশশী, জনক সদনে।
আছিলাম পূর্ণশশী, অযোধ্যা ভবনে॥
আছিলাম পূর্ণশশী, পঞ্চবটী বনে।
ভ্রমিতাম গ্রহগতি, রামচন্দ্রসনে॥
যেদিনে আমারে তুমি, করিলে হরণ।
সেই দিন এ শশীতে, হইল গ্রহণ॥
আজি পুনঃ রাহু হয়ে এ আশ্রমে পশি।
গ্রাসিতে এসেছ লোভে, ক্ষীণ পূর্ণশশী॥
আর আমি পূর্ণশশী, পূর্ণশশী নই।
পুনঃ পুনঃ রাহু করে, আবরিত হই॥

ছাড় রাহু ! ছেড়ে যাও, পূর্ণশশী অরি।
পূর্ণশশী হই আমি, মুক্তি স্নান করি ॥

বলিতে বলিতে হলো, ক্রোধের উদয়।
নয়নে জ্বলিল বহ্নি, কাঁপিল হৃদয় ॥
রক্তাভা ধরিল নীল নলিন নয়ন।
জ্বলিল সতীত্ব তেজ, দীপ্ত হুতাশন ॥
কহিলেন দুরাচারে, পরুষ বচন।
অভয় হৃদয় সতী, রামপদে মন ॥
ওরে দুষ্ট নিশাচর ! পাপিষ্ঠ পামর !
বড় বাড়িয়াছে বুক, কিছু নাহি ডর ?
যাহা মুখে আসিতেছে, ভাষিতেছ তাই।
কুকুরে সিংহিনী বাঞ্ছা, কিছু লজ্জা নাই ?
কে তুই লঙ্কার রাজা ? কে তুই দুর্মতি ?
কে তুই পাষণ্ড দস্যু, বহু সৈন্যপতি ?
কেবা তুই অস্ত্রধারী রাক্ষস রাবণ ?
কি তুই দেখাস্ মোরে, মণি রত্ন ধন ?
থাক্ তোর লক্ষ লক্ষ, অমর সুন্দরী।
থাক্ তোর বহুরত্ন, রাণী মন্দোদরী ॥
থাক্ তোর স্বর্ণপুরী, স্বর্ণ সিংহাসন।
থাক্ তোর হয় হস্তী, বীর অগণন "

থাক্ তোর বহু পুত্র, বহু দাসদাসী।
থাক্ তোর বহু সৈন্য, রুধির পিপাসী॥
থাক্ সব, যত থাকে, কিছুতে না ডরি।
রামের প্রসাদে আমি তৃণজ্ঞান করি॥
যত ভেদ শিবা আর কেশরীতে বনে।
তত ভেদ তোতে আর, শ্রীরঘুনন্দনে॥
যত ভেদ গোষ্পদেতে, জলনিধি ধামে।
তত ভেদ তোতে আর, দাশরথী রামে॥
যত ভেদ গজপতি, বিড়ালে কাননে।
তত ভেদ রঘুপতি, আর দশাননে॥
যত ভেদ বায়সের, খগেন্দ্রের সনে।
তত ভেদ তোতে আর, শ্রীরঘুনন্দনে॥
শোন্ দুষ্ট! পাপমতি! কহি আমি তোরে।
আপনার ভাল মন্দ, দেখ্ চিন্তা কোরে॥
যদি জিতে সাধ থাকে, লঙ্কা অধিপতি।
যদি চাহ রক্ষিবারে, লঙ্কাব বসতি॥
তবে এক কর্ম্ম কর, ওহে রক্ষোবীর!
রামের চরণে গিয়ে, নত কর শির॥
স্বর্ণ দোলে তুলি মোরে, লহ স্কন্ধে করি।
আমি ক্ষমাইব তোরে, প্রভুপদে ধরি॥
কিছু অমঙ্গল তোর, হবেনা রাবণ।
দয়ার সাগর রাম, কমললোচন॥

দেখ্‌ ধূর্ত্ত ! মনে ভেবে, যত তোর বল।
চুরি কোরে এনেছিস, প্রকাশিয়ে ছল ।।
সে দিন শ্রীরাম যদি, থাকিতেন ঘরে।
ফিরে না আসিতে হতো, লঙ্কার ভিতরে ।।
আজি তুই, মন্দ বাণী, কহিস্‌ আমায়।
আসন্ন হয়েছে কাল, খণ্ডন না যায় ।।
সতী পতিব্রতা আমি, রামধ্যান মনে।
নিতান্ত জনম শোধ, দাসী শ্রীচরণে ।।
প্রভা যথা কভু নাহি, ছাড়ে প্রভাকরে।
তেমনি দুখিনী সীতা, ভাবে রঘুবরে ।।
এভাবে বিভাব চেষ্টা, করিছ বর্ব্বর।
সবংশে হইবি ধ্বংস, পাপিষ্ঠ পামর ॥
রবিতেজ শুষে যথা, জলধির নীর।
সেইরূপ রাম শর, শুষিবে রুধির ।।
রবিকুলে কালী দিবে, এত কি সাহস ?
দূর হও ! দূর হও ! দুরাত্মা রাক্ষস !

নাটকাভিনয়।

আজকাল আমাদিগের সাহিত্য সমাজের উন্নতিশীল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের রুচিরও অনেকাংশে পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে আমাদিগের যে রুচি-বিপর্য্যয়

ঘটিয়া আসিতেছিল, তাহা এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইতেছে। কৃষ্ণবিদ্যা সম্প্রদায় আর গোপালে উড়ে ও গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির যাত্রা শুনিয়া স্বাভাবিক আমোদপ্রিয়তাকে চরিতার্থ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা এক্ষণে বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত নাট্যামোদে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের পূর্ব্বগৌরবের সংস্থাপনে কৃতপ্রযত্ন হইয়াছেন।

বর্ত্তমান মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিমুলিয়া "বঙ্গরঙ্গভূমির" নাট্যালয়ে "একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া" এই দুইখানি প্রহসনের অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা যারপর নাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রথম প্রহসন, নূতন খানি এখানির অভিনয় অতি উৎকৃষ্টই হইয়াছিল, ইহার নায়ক গোপাল বাবু, নায়িকা সরলা ও অন্যান্য অভিনেতাদিগের মধ্যে বাচস্পতি ও ভাবিনী আপন আপন অংশ অতি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। এ অভিনয়টী দেখিয়া অনেক বাঙ্গালী সাহেবের চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা। যদি না হয়, তবে আমাদের নিতান্ত দুরদৃষ্ট! দ্বিতীয় প্রহসনখানির অভিনয়ও মন্দ হয় নাই, ইহার অভিনেতৃগণের মধ্যে ভক্ত বাবু, গদা, পুঁটী ও হানিফগাজীই উৎকৃষ্ট। এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উক্ত রঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ নবনাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। যদিও তাহা সমধিক প্রীতিপ্রদ হয় নাই, তথাচ গবেশ বাবু শ্রোতৃবর্গের যথেষ্ট আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রঙ্গভূমির অধ্যক্ষেরা স্ত্রীলোকদিগকে অভিনেতৃ দলে নিযুক্ত করিয়া একটী নূতন প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। সেটী ভাল কি মন্দ, তাহা বলা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং ক্ষান্ত রহিলাম।

——

দীর্ঘ জীবন।

জগতের প্রারম্ভাবধি মনুষ্যের আয়ু ক্রমশ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আদি কাল বিভাগ সত্য বা অলীক, তাহা আমরা বলিতে সমর্থ নহি। অতএব সে সময়ে মনুষ্য কতকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতেন, তদ্বিষয় আমরা কিছুই জানি না। কলিযুগের মাহাত্ম্যেও "বিংশত্যধিক শত বর্ষং পরমায়ুঃ" পাঠ লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু অধুনা এত দীর্ঘজীবী লোকও দৃষ্ট হয় না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রধান পুস্তক অনুসারে জানা যায় যে, প্রথম সৃষ্ট পুরুষ আদম নয় শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তৎপরে ক্রমশই মনুষ্যের জীবন হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একজন দীর্ঘজীবির নাম শ্রুত হওয়া যায়। রয়েল সোসাইটির পুস্তকে লিখিত আছে যে, টমাস পার ১৫২ বৎসর জীবিত ছিলেন ও হেন্‌রি জেন্‌কিন্স ১৬৯ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও এরূপ দীর্ঘজীবী অনেকেই হইয়া গিয়াছেন। তথাপি এই সকল দীর্ঘজীবীদিগের সংখ্যা সমষ্টি করিলে সমস্ত জগৎবাসী মনুষ্যদিগের সংখ্যার ভগ্নাংশের এক অংশ বলিয়া প্রতীতি হইবে না। মনুষ্যতত্ত্ববিৎ

পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধান ও ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা একটি নিয়ম জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালে যে সময়ে জগতে মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, সে সময়ে মনুষ্য অধিক কাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিত, কিন্তু মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি অনুসারে পরমায়ুর কাল হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। আর ইহাও দৃষ্ট হয় যে, কয়েকটী প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করিলে এখনও অধিক কাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে এ দেশে যে যোগশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা এইরূপ নিয়ম হইতে নিবদ্ধ হইয়াছিল। যোগীরা সেই নিয়ম বলে বহুকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন। আমাদিগের বক্তব্যের ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, সকলেই জনস্থান ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়া কাননে গিয়া বসতি করুন। আমরা যোগী শব্দের সে অর্থ গ্রহণ করি নাই। নিয়ম প্রতিপালক সংযমীকেই আমরা যোগী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। জল, বায়ু, স্থান, উত্তাপ, আলোক, ইহাই সকল জীবনের প্রধান পরিপোষক। জলবায়ুর দোষে অনেককেই অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতে হয়। এই দোষ হইতেই অনেক পীড়ার উৎপত্তি হয়। জন্মস্থান ও আবাস-ভূমির প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত নিয়ম নির্ধার্য্য করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সেই নিয়ম দেশ, কাল ও পাত্র বিবে-চনা করিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য। যে নিয়ম স্থাপন করিলে

ইংলণ্ডাদি শীতপ্রধান দেশে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা ভারতবর্ষাদি উষ্ণদেশে উপকারক না হইতে পারে। যে নিয়ম অবলম্বন করিয়া বালক পীড়া হইতে মুক্ত হইতেছে, বৃদ্ধের সে নিয়ম দ্বারা কোন উপকার দর্শিতেছে না, ইহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। কোন কোন পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত স্ত্রী ও পুরুষ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অবধারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু একটী নিয়ম স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে, দোষহীন জলবায়ু সেবন করিলে ও যথাকালে শারীরিক পরিশ্রম ও নিদ্রার বশীভূত হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতে পারা যায়। আমাদিগের দেশে অনেকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অবমাননা করা হইয়া থাকে। অনেকে তাহাকে সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মাদক দ্রব্য সেবন, ব্যায়াম আদি শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও নানাপ্রকার গার্হস্থ্য নিয়মের বিশৃঙ্খলা বশত অনেকেই অল্প বয়সে জীবন ত্যাগ করিতেছেন। অশ্রুত-পূর্ব্ব নানাপ্রকার উৎকট পীড়া অধুনা প্রকাশ পাইতেছে। এক জন বিজ্ঞ পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, মনুষ্যসংখ্যার ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়াই জাগতিক নিয়ম। জগতের নাশও মনুষ্য বৃদ্ধি বশতই হইবে। বহু সংখ্যক মনুষ্য বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে নানাপ্রকার নূতন পীড়া উৎপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই বাক্য কতদূর পর্য্যন্ত

সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সাধারণত যে পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে স্বাস্থ্যের ক্রমশ হীনত্বই দৃষ্ট হইতেছে।

শারীরিক পরিশ্রম জীবন পোষক ও মানসিক পরিশ্রম জীবন শোষক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আধুনিক জনসংখ্যা দেখিয়াও এই নিয়ম স্পষ্ট সিদ্ধ হয়। কৃষকেরা বহুকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, রাজনীতি ব্যবসায়ী, ভিষক্ ও মস্তিষ্কজীবী লোক তাহাদিগের অপেক্ষা অল্পকাল জীবিত থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ন্যায়শাস্ত্র ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্যেরা অপেক্ষাকৃত অধিক কাল জীবনধারণ করেন। কারণ মাদকাদি প্রাণনাশক দ্রব্যের ব্যবহার না করাতে তাঁহারা অধিক কাল স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। প্রাচীনকালে কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। প্রাচীনদিগের জীবনবৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি। যে পর্য্যন্ত আমাদিগের জানা আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, মানসিক পরিশ্রমকারীরা প্রাচীনকালেও দীর্ঘজীবি হইতেন না। মানসিক পরিশ্রমকারী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকাশক শাক্য সিংহ খৃষ্টের পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াও অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালীন অন্য অন্য লোক আরব ও তুরস্ক দেশে দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহার প্রমাণ খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পুস্তকে পাওয়া যায়। উপসংহার কালে

আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, অধুনা মানসিক পরিশ্রম করিয়াও যদি কয়েকটী প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে অনেক সময়ে অকাল মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

বয়ঃক্রম।

মনুষ্য চিরকাল জগতে অবস্থিতি করে না। জন্মিবা-মাত্রেই মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা করিতেও সমর্থ হয় না। প্রথমতঃ কিছুকাল নিতান্ত নিঃসহায় ও বলহীন অবস্থায় অতিবাহিত করে। সে সময়ে নানা প্রকার জ্ঞান, অভিলাষ, ইচ্ছা ও ভাব তাহার হৃদয়স্থ হয় না। শেষ কিছুকালেও পুনরায় প্রথম অবস্থার ন্যায় সময় অতিপাত করিতে হয়। জগতস্থ সমস্ত ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যের ন্যায় মনুষ্য-শরীরেরও উৎপত্তি, উন্নতি ও ধ্বংস কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। এই নিয়ম কোনো প্রকারেই লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না। যাঁহারা যৌবনে উন্মত্ত হইয়া নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়া করেন ও যাঁহারা দানাদি নানা সৎ কার্য্যে কাল অতিপাত করেন, তঁহাদিগের উভয়কেই যথাকালে বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু আলিঙ্গন করে। কোনো প্রকারের তোষামোদ ও ভয় প্রদ-

র্শন দ্বারা পরম নিয়ন্তার এই নিয়মকে দূরে রাখিতে পারা যায় না। যাহা হউক, এতদ্বিষয়ে আমরা কোনো কথা উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক নহি; মনুষ্য ও জীবগণের বয়ঃক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের উল্লেখ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। পণ্ডিতেরা মনুষ্যের বয়ঃক্রম সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা দুগ্ধপোষ্য অবস্থা, শৈশব, কিশোর, তরুণ, যুবা, বার্দ্ধক্য এবং জরা অবস্থা। সকলেই যে, এই সপ্ত ভাগেব সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে সমর্থ হন, তাহা আমরা বলিতেছি না। অনেকেই প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থাতে, কেহ বা তৃতীয় বা তৎ পর পর অবস্থাতে জীবন ত্যাগ করিতেছেন। অতি অল্প সংখ্যক লোকই সপ্ত পদবী আরূঢ় হইতে সমর্থ হন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কালে সকলেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। কেহ অতি অল্পকালের মধ্যে মৃত্যুপথে যাত্রা করিবেন বলিয়া তন্নিমিত্ত সপ্ত অবস্থার ভোগ সেই অল্প কালের মধ্যে আস্বাদন করিতে সমর্থ হন না। আমরা এ স্থলে কোনো নূতন কথা কহিতেছি না, ইহা সকলেই অবগত আছেন, বরং গ্রাম্য মনুষ্যেরাও ইহার যথার্থতা স্বীকার করিবেন ও কহিবেন যে, বালক মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যুবা বা বৃদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমরা সচরাচর কার্য্যে এই নিয়মের অবিচলিততা অবগত হইয়াও বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকি। উদাহরণ প্রদান করিয়া বাক্যের সমর্থন করা যদিচ আমা-

দিগের ইচ্ছা নহে, তথাপি কার্য্যকালে আনুসঙ্গিক দুই একটী কথা না কহিলেও চলিতেছে না। আর্য্যসমাজ মধ্যে যৌবন অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দিবার প্রথা এই নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে। সুসভ্য ইউরোপখণ্ডে যৌবনকাল প্রারম্ভ হইলে পর অর্থাৎ তরুণ অবস্থার অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গেলে পর পরিণয় কার্য্য করাও এই নিয়মের বিরুদ্ধ। বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের মধ্যে বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্য হইতে বৈমুখ হওয়াও এই নিয়মের অবমাননা মাত্র। যৌবন অবস্থা অতীত হইলে রসিক রসিকাদিগের পুনরায় যৌবন প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ঔষধ সেবন বা উপায়ান্তর অবলম্বন করাও নিয়মাবহেলন বৈ আর কিছুই নহে।

প্রথম দুগ্ধপোষ্য অবস্থা প্রায় দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে শিশুর দন্ত সকল বাহির হয়। তখন সে আপন পিতা মাতা ও অন্য বন্ধুবর্গকে চিনিতে পারে। অনেকাংশে দ্রব্যের জাতি জ্ঞানও হয়। এই দ্রব্য মনুষ্য জাতি বিশিষ্ট ও ঐ দ্রব্য বৃক্ষজাতি বিশিষ্ট, ইহা তখন বুঝিতে সমর্থ হয়। মেধা ও ভাবনা শক্তির বিলক্ষণ প্রভাব জন্মে না। তৎপরে শৈশব অবস্থা আরম্ভ হয়। ইহার সীমা প্রায় সপ্তম বা অষ্টম বৎসর। এই কালের মধ্যে দ্বিতীয় বারের কর্ম্মক্ষম দন্ত সকল প্রকাশ পায়। শরীর সবল হইতে থাকে। ধাবন, লম্ফন ও শীঘ্র

কার্য্য করিতে শিশুদিগের বিশেষ প্রীতি জন্মে। মানসিক ভাবেরও উন্নতি দৃষ্ট হয়। মেধাশক্তির বিশেষ প্রভাব জানিতে পারা যায়। বিবেচনা ও চিত্ত স্থির করিবার ক্ষমতা অধিক দৃষ্ট হয় না। রাগ, দ্বেষ ও বন্ধুভাবাদিরও প্রথম বিকাস হয়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী রাগ ক্ষণমাত্রেই দূর হয় এবং বন্ধুত্বের প্রগাঢ় ক্ষমতাও হৃদয়স্থ হয় না। গুরুজনকে কিঞ্চিৎ মান্য করিতে শিশু স্বতঃই ইচ্ছুক হয়। তৎপরে কিশোর অবস্থার আরম্ভ। শৈশব অবস্থায় যে সকল মানসিক ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল, এই অবস্থাতে তাহা পরিপক্ব হইতে থাকে। তৎপরে কিঞ্চিৎ মানসিক বিকার আরম্ভ হইলেই তাহা তরুণ অবস্থার প্রারম্ভ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের গুণ অনুসারে তরুণ অবস্থার প্রারম্ভের কালও ভিন্ন ভিন্ন। এই কাল হইতেই স্ত্রীপুরুষদিগের অবস্থার অধিক বিভিন্নতা ও তারতম্য দৃষ্ট হয়। প্রথম তিন অবস্থাতে বালক ও বালিকার উন্নতি সমকালেই হইতে থাকে। কিন্তু বালিকা প্রথমেই তরুণ অবস্থাতে পদার্পণ করে ও পর পর অবস্থার অল্প কাল স্বাদগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া পরিশেষে শীঘ্রই বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে কিশোর ও তরুণ অবস্থা প্রায় সমকালেই আরম্ভ হয়। তন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ ঐ উভয় অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন কাল নির্দ্দেশ করেন না। শীতপ্রধান দেশে বালিকারা দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসর

বয়ঃক্রমের মধ্যে কিশোর অবস্থা ত্যাগ করিয়া তরুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এদেশে ঐ কালের মধ্যে অনেকে তরুণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং পুত্রকন্যার মুখাবলোকন করিয়া সংসার আশ্রমের সকল ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অল্প বয়সে তরুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার দেশভেদ মাত্র কারণ নহে। পিতা মাতা ও শিশুর প্রাত্যহিক কার্য্য অনুসারেও শীঘ্র শীঘ্র অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। এতদ্দেশে যাঁহারা শিথিল অবস্থাতে কালাতিপাত করেন ও নানা পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাঁহারা শীঘ্র তরুণ হইয়া উঠেন। কিন্তু ইংলণ্ডাদি শীতপ্রধান দেশে যাঁহারা প্রত্যহ দৈহিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারাই শীঘ্র যুবা হইয়া উঠেন। এতদ্দেশে ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই বালকেরা তরুণ হইয়া উঠে। আমাদিগের বঙ্গদেশে, উত্তর পশ্চিম ও ভারতবর্ষের অন্য অন্য পাশ্চাত্যদেশ অপেক্ষা তরুণ অবস্থা শীঘ্রই প্রকাশ পায়। পরিণয়াদি কার্য্য এই তরুণ অবস্থাতেই হওয়া কর্ত্তব্য। শৈশব কালে বিবাহাদি দিয়া সুখভোগের ইচ্ছা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থার কথা সহৃদয় পাঠকদিগকে অধিক জানাইতে হইবে না। যৌবন অবস্থার সুখ ও দুঃখ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অনুভব করিতেছেন। বার্দ্ধক্য ও জরা অবস্থার কথা বারান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

পার্থিব বৈকুণ্ঠ।

(রাজাবলী।)

ব্রহ্মশাপে দামোদর রাজা সর্পাকার প্রাপ্ত হইলে হস্কা, যস্কা ও কানিস্কা নায়ক তিন জন তুরুস্ক ভূপাল কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে অভিমন্যু রাজা হন। তিনি তুরুস্কদিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করেন, তাঁহার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নাগরঞ্জনের পৌরোহিত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বলবান হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা কেবল শৈব পণ্ডিত ও পুরোহিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন এরূপ নহে, শিবপূজা রহিত করিতেও ক্ষমবান হইয়াছিলেন। নাগজাতি এই বিপ্লবে অস্ত্রধারণ করিয়া অনেক বৌদ্ধের মস্তকচ্ছেদন করে এবং প্রতি বৎসর শীতকালে তাঁহাদিগের গৃহসামগ্রী লুঠ করিয়া লইয়া যায়। রাজা অভিমন্যু এই বিপদের সময় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে শীতকাল অতিবাহন করিতেন। পরিশেষে চন্দ্রদেব নামক একজন সাধু ব্রাহ্মণ নীলপুরাণের মতস্থাপন করিয়া শান্তি স্থাপন করেন। তিনি একবার যক্ষদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।

অভিমন্যুর পর তৃতীয় জনার্দ্দন রাজা হন। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন, তাঁহার পুত্র বিভীষণ ৫৩ বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর ইন্দ্রজিৎ ও তৎপুত্র রাবণের রাজত্ব। রাবণের পুত্র দ্বিতীয় বিভীষণ ৩৫ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নর (ওরফে) কিন্নর রাজা হইলেন। তিনি অত্যন্ত নির্ব্বোধ ছিলেন। একজন বৌদ্ধ তাঁহার রাণীকে হরণ করিয়াছিল।

রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র ধর্ম্মশালা দগ্ধ করিয়া দেন, এবং ধর্ম্মশালার সম্পত্তিগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। সেই সময় রাজ্যস্থ এক ব্রাহ্মণের একটী পরম সুন্দরী রমণী ছিল। সেটী এক নাগের কন্যা। রাজা নর-কিন্নর তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া প্রথমে চরের দ্বারা তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করেন। চরেরা বহু ধনরত্নের লোভ দেখাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহাতে রাজা স্বয়ং নির্লজ্জ হইয়া তাহার স্বামীকে ঐ কথা বলেন। সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছিল বলা বাহুল্য। বরং উপযুক্তরূপ গালাগালি লাভ হইয়াছিল। অবশেষে রাজা একদল অস্ত্রধারী সেনা পাঠাইয়া ঐ বধূকে হরণ করিতে বলেন। সৈন্যগণ যখন ব্রাহ্মণের বাটীতে প্রবেশ করে, বিপ্রদম্পতী তৎকালে অপর এক গুপ্ত দ্বার দিয়া পলায়ন করেন। কন্যা পিতার ভবনে উপস্থিত হইয়া এই বিষয় ব্যক্ত করিলে নাগ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই নগর ভস্মসাৎ করেন। যে সকল লোক পলায়ন করিয়া পর্ব্বতে যাইতেছিল, তাহাদিগকেও দগ্ধ করা হয়। রাজাও সেই অনলকুণ্ডে দগ্ধ হন। সেই সময় বিতস্তার জল দগ্ধ নরদেহে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

নর রাজা কি কারণে ঐ কন্যার প্রতি হঠাৎ আসক্ত হইয়াছিলেন, তাহার একটী আশ্চর্য্য গল্প আছে। বিপ্রপত্নী একদিন আপনাদের ছাদে বসিয়া ছিলেন, নীচে কতকগুলি শস্য শুকাইতেছিল, একটা অশ্ব আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করাতে কন্যা নামিয়া আসিলেন, এবং গাত্রে ধাক্কা দিয়া অশ্বকে তাড়াইয়া দিলেন, অশ্বের গাত্রে তাঁহার পাণিতল ও অঙ্গুলীর চিহ্নে স্বর্ণ রেখা পড়িল। রাজা ইহা শুনিয়া ঐ কন্যা গ্রহণ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন। নাগ যখন রাজ্য ধ্বংস করেন, সেই সময় তাঁহার ভগিনী রমণী

আপন ভ্রাতার সাহায্য করিতে যাইতেছিলেন, এক যোজন পথ থাকিতে শুনিলেন, ভ্রাতার জয় হইয়াছে, সুতরাং ৫ যোজন ধ্বংস স্থান পশ্চাতে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ঐ স্থান অদ্যাপি রমণ্যটবী (রমণীর অরণ্য) নামে বিখ্যাত আছে। সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ নাশ করিয়া নাগ আপন বাসস্থান হইতে বহু দূরস্থ এক পর্ব্বতে গিয়া বাস করেন। তাহার নিকটে তিনি দুইটী সরোবর খনন করাইয়া গিয়াছেন। একটীর নাম অমরসর।—আজিও অমরেশ্বরযাত্রা উৎসবের সময় সেটী দৃষ্ট হয়। আর একটীর নাম জামাতৃসর। ঐ স্মরণীয় জামাতা ব্রাহ্মণের নামে উহা উৎসর্গীকৃত।

রাজ্যনাশের সময় রাজপুত্র সিদ্ধ রাজধানীতে ছিলেন না, বিজয়ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। তিনি পিতার শোকাবহ পরিণাম স্মরণ করিয়া শিষ্টশান্তভাবে ষষ্টি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষদশায় শিবলোকে প্রস্থান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। হিমালয়ের প্রত্যন্তই শিবলোক।

সিদ্ধের পুত্র উৎপলাক্ষ ৩০ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন। উৎপলের ন্যায় সুন্দর চক্ষু ছিল বলিয়া তাঁহার নাম উৎপলাক্ষ হইয়াছিল। তৎপুত্র হিরণ্যাক্ষ, তৎপুত্র হিরণ্যকুল, তাঁহার পুত্র মুকুল বা বসুকুল।—এই বসুকুলের অধিকারকালে ম্লেচ্ছগণ কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছিল।

বসুকুলের পুত্র মিহিরকুল রাজা হইলেন। তিনি ভয়ঙ্কর নৃশংস রাক্ষসতুল্য নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। দিবারাত্রি তাঁহার আদেশে রাজসভায় ও বিলাসস্থানে নরহত্যা হইত! স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা কিছুই বিচার করিতেন না! শবাশী বায়স গৃধ্রেরা তাঁহার সম্মুখে দলবদ্ধ হইয়া চীৎকার ও মাংস রুধির ভক্ষণ করিত! তাঁহার আর

একটী কার্য্য বর্ণিত আছে। একদিন তিনি রাণীর বক্ষস্থলে স্বর্ণবর্ণ পদচিহ্ন দর্শন করিয়া মহাক্রোধে অন্তঃপুররক্ষীকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে ব্যক্তি উত্তর করে যে, মহিষী সিংহলী বস্ত্রের কাঁচুলি পরেন। সিংহলীরা আপনাদের বস্ত্রে রাজার পদচিহ্ন স্বর্ণ দিয়া চিত্র করিয়া থাকে। মিহিরকুল এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সিংহল রাজ্য আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। রাজাকে বিনাশ করিয়া আর একজনকে সিংহাসনে বসাইলেন। প্রত্যাগমনকালে আরও কয়েকটী রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া আসিলেন। তিনি কেবল মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন না,—পশুর প্রতিও বিলক্ষণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। যখন তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করেন, সেই সময় একটা হস্তী শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়া চীৎকার করাতে একশত হস্তী চমকিত হইয়া চীৎকার করে। রাজা তাহাতে বিরক্ত হইয়া সেই একশত হস্তীর মস্তকচ্ছেদন করিবার আজ্ঞা দেন। তাঁহার আর একটী রাক্ষস ব্যবহার বর্ণিত আছে। একদিন তিনি চন্দ্রকুল্য নদীতে গমন করিতেছিলেন, পথে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপ দেখিলেন, কেহ তাহা স্থানান্তর করিতে সমর্থ নহে। রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, উহার মধ্যে এক যক্ষ আছে, সতী স্ত্রী ভিন্ন কেহই উহা সরাইতে পারিবে না। অতএব তিনি নগরস্থ বিস্তর কুলবালাকে আহ্বান করিয়া ঐ স্তূপ স্থানান্তর করিতে বলেন, কিন্তু কেহই পারিল না। শেষে চন্দ্রাবতী নাম্নী এক কুম্ভকারপত্নী উহা সরাইয়া দিল। রাজা দেখিলেন, নগরের এত রমণী অসতী, মহাক্রোধ হইল, তৎক্ষণাৎ পতি, পুত্র ও আত্মীয় সহ সমস্ত স্ত্রীলোককে বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিলেন !! লেখক বলেন,একদিনে তিন কোটি প্রাণী ধ্বংস করা হইয়াছিল !!! এইভয়ঙ্কর রাজা ৭০বৎসর রাজত্ব করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মিহিরকুলের আত্মাহুতির পর তাঁহার পুত্র বক রাজা হইলেন। দুরন্ত রাজার ঔরসে জন্ম বলিয়া প্রজারা প্রথমে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই, ক্রমে তাঁহার সততার পরিচয় পাইয়া সকলেই তৎপ্রতি ভক্তিমান হইল। বক ক্ষমাগুণে ও ধৈর্য্য-গুণে পৈতৃক রাজ্যে শান্তি ও নিরাপদ পুনঃস্থাপন করিলেন। তিনি লবণোৎস নামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজধানীর নিকটে লবণাম্বুর একটী ফোয়ারা ছিল, তদনুসারেই ঐ নগরীর নাম-করণ হয়। তাঁহার পিতার সংস্থাপিত মিহিরপুর এবং প্রতিষ্ঠিত দেবতা মিহিরেশ্বর এই সময় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু সুশীল বক পরিণামে প্রতারিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বার্ত্তা নাম্নী এক যোগিনী এক রজনীতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, তাহার মঠে দেবপূজা মহোৎসব হইবে, সপরিবার মহারাজের তথায় নিমন্ত্রণ।—রাজা কিছুমাত্র সংশয় না রাখিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসে পুত্রপৌত্রাদি সমভিব্যাহারে যোগিনীর আশ্রমে গমন করিলেন। কুহকিনী যোগিনী তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে নরবলি দিল! কেবল একটী পুত্রকে নষ্ট করিল না। বকরাজা ৬৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যোগিনী যে রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, তিনিই রাজা হইলেন। তাঁহার নাম ক্ষিতিনন্দ। তিনি ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বসুনন্দ উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি ৫২ বৎসর দুই মাস রাজ্যশাসন করেন। বসুনন্দের পুত্র দ্বিতীয় নর ৬০ বৎসর রাজ্যপালন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তদাত্মজ অক্ষ রাজা হইলেন। তিনিও ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অক্ষবল নগর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

অক্ষের পুত্র গোপাদিত্য সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সত্যযুগের সহিত তুলনা হয়। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বহু গ্রাম দান করিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ রসুন ভক্ষণ এবং অধর্ম্মাচরণ করিত, তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়া দ্রাবিড় ও অন্যান্য দেশ হইতে পবিত্রস্বভাব ব্রাহ্মণ আনাইলেন। এবং তাঁহাদিগকে প্রচুর ভূমি ও গ্রাম দান করিয়া আপন রাজ্যে বসবাস করাইলেন। তিনি জ্যেষ্ঠেশ্বর নামে একটী দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেবোদ্দেশ ভিন্ন রাজ্য মধ্যে কেহ পশু বলিদান করিলে রাজা তাহাদিগকে বিনাদণ্ডে নিষ্কৃতি দিতেন না। তাঁহার আরও নানাবিধ গুণ ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তিনি ৬০ বৎসর ছয় দিন রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছিলেন।

গোপাদিত্যের পুত্র গোকর্ণ ৫৭ বৎসর ১১ মাস রাজ্যশাসন করেন, তিনি নেপাল রাজ্যে গোকর্ণ নামে এক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গোকর্ণ তীর্থ আজিও বিদ্যমান আছে। তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রাদিত্য ৩৬ বৎসর তিন মাস দশদিন রাজত্ব করিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তিনি ভূতেশ্বর নামে এক শিব এবং অক্ষয়িনী নামে এক শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু উগ্রেশ নামে আর একটী শিব ও দশটী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীরা মাতৃচক্র নামে প্রসিদ্ধ।

নরেন্দ্রাদিত্যের পুত্র যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন। তাঁহার চক্ষুদুটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে কাণা যুধিষ্ঠির বলিত। প্রথমে তিনি কিছুদিন নীতিজ্ঞতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহার পর ধনমদে মত্ত হইয়া মহা অভিমানী হইলেন, ঘোরতর অহঙ্কার বৃদ্ধি হইল, রাজ্যের উপযুক্ত ও জ্ঞানবান অমাত্যগণকে

অপমান করিয়া মূর্খ ও স্বার্থপর লোকদিগকে রাজসভায় নিযুক্ত করিলেন। প্রজার প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইতে লাগিল। তোষামোদকারীরা রাজাকে অবিকল একটী ক্রীড়াপুত্তল করিয়া তুলিল। ফলতঃ তাঁহার আমোদ ও চাপল্য সকল লোকের বিপদের হেতু হইয়া উঠিল; সুতরাং মন্ত্রীরা বিদ্রোহী হইলেন, সৈন্যগণও তাঁহাদের বাধ্য হইল, নিকটবর্ত্তী রাজারাও সাহায্য দানে অঙ্গীকার করিলেন, যুধিষ্ঠির ভয় পাইলেন। প্রথমে সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু মন্ত্রীরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে যুদ্ধের সময় রাজা অগত্যা রাজ্যত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকার করিলেন। যখন তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাণীদিগের সহিত পদব্রজে বাটী হইতে বাহির হন, তখন লোকে তাহার দুরবস্থায় ক্রন্দন করিয়াছিল; কষ্টের সীমা ছিল না। ক্ষুৎপিপাসায় ও পথশ্রান্তিতে রাণীরা মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা সমস্ত ধন ও দাসদাসী কাড়িয়া লইয়াছিল। রাজা কিছুদিন মহাকষ্টে এক ধর্ম্মশালায় বাস করেন, তাহার পর এক রাজা দয়া করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেন। দুষ্কর্ম্মের ফল এইরূপ।

কল্কিপুরাণ।

দ্বিতীয় অংশ।—তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর দেবী পদ্মা সেই করুণাসাগর কল্কিকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু জ্ঞান করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং সপ্রেম গদগদস্বরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে জগন্নাথ! হে রমাপতে! হে ধর্ম্ম-

বর্ম্মধারিন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। হে বিশুদ্ধাত্মন্! আমি আপনারে চিনিতে পারিয়াছি। আমি আপনার নিতান্ত বশবর্ত্তিনী। প্রভো! আপনি আমারে রক্ষা করুন্। আমি যখন তপস্যা, দান, জপ ও ব্রত দ্বারা আপনারে পরিতুষ্ট করিয়া আপনার এই দুরারাধ্য চরণকমল লাভ করিয়াছি, তখন আমিই ধন্যা ও পুণ্যবতী। দেব! আপনি এক্ষণে আমারে অনুমতি করুন, আমি আপনার সুশোভন পদাম্বুজ স্পর্শ করিয়া রাজ সমীপে আপনার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিবার নিমিত্ত গৃহে গমন করি। অনুপম লাবণ্যময়ী দেবী পদ্মা এই কথা বলিয়া পিতৃসমীপে গমন পূর্ব্বক সখী দ্বারা ভগবান্ কল্কির আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা বৃহদ্রথ, ভগবান নারায়ণ পরিণয়োৎসুক হইয়া শুভাগমন করিয়াছেন, শুনিয়া যার পর নাই পুলকিত হইলেন এবং পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, পাত্র ও মিত্রগণের সহিত সমবেত হইয়া পুজোপকরণ গ্রহণ পূর্ব্বক মাঙ্গল্য নৃত্য গীত বাদ্য করিতে করিতে মহাভাগ কল্কিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ সকলেই তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল, কারুমতী পুরী বিবিধবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা ও স্বর্ণ তোরণে সুশোভিত হইল।

মহারাজ বৃহদ্রথ স্বজনগণের সহিত সরোবর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বিষ্ণুযশানন্দন জগদেকপাবন ভুবনেশ্বর বিষ্ণু মণিময় বেদীতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সলিলবর্ষী নিবিড় ঘনাবলীর উপরিভাগে তড়িম্মালা ও ইন্দ্রচাপ যেরূপ শোভা ধারণ করে, ভগবান্ কল্কির শ্যামসুন্দর অঙ্গের ভূষণ সমুদায়ও সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার লাবণ্য-নিকেতন কন্দর্প-বিজয়ী অঙ্গে সুন্দর পীত বসন শোভা পাইতেছে।

রাজা বৃহদ্রথ সেই রূপগুণসম্পন্ন সুশীল কমলাপতি কল্কিকে অবলোকন পূর্ব্বক সপুলকে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিয়া কহিলেন, হে জগন্নাথ! কানন মধ্যে যদুনাথ যেমন মান্ধাতা তনয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও আজ অসম্ভাবিত আগমনে আমারে কৃতার্থ করিলেন। রাজা বৃহদ্রথ এই কথা বলিয়া যথোপচারে কল্কির পূজা করিয়া তাঁহারে লইয়া হর্ম্ম্যপ্রাসাদ-পরিশোভিত নিজ ভবনে গমন করিলেন এবং পিতামহের আদেশানুসারে পদ্ম-পলাশ-নয়না পদ্মাকে পদ্ম-পলাশ-নয়ন পদ্মনাভ কল্কির হস্তে সমর্পণ করিলেন। তত্ত্বদর্শী ভগবান কল্কি প্রিয়তমা ভার্য্যারে প্রাপ্ত হইয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া এবং সিংহল দ্বীপ অতি রমণীয় স্থান দেখিয়া সেই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল রাজগণ পদ্মার দর্শনে নারীভাব প্রাপ্ত হইয়া পদ্মার সখী হইয়াছিলেন, তাঁহারা জগৎপতি কল্কিকে দেখিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন, এবং তাঁহারে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণ কমল স্পর্শ করিলেন। পরে ভগবান কল্কির আদেশানুসারে রেবা সলিলে স্নান করিবামাত্র পুনর্ব্বার পুরুষভাব প্রাপ্ত হইলেন। পদ্মা দেবী গৌরাঙ্গী ও ভগবান কল্কি শ্যামাঙ্গ; তাঁহাদিগের পরস্পরের রূপ সমন্বয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই যেন নীল, পীত বসনরাজী প্রকাশিত হইয়াছে। রাজগণ পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া কল্কির প্রভাব দর্শনে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, এবং সমধিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহারে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

হে প্রভো! আপনার মায়া প্রভাবে এই চরাচর জগতের অশেষবিধ বৈচিত্র কল্পনা হইতেছে এবং আপনার মায়া প্রভাবেই জগ-

ন্তের পরিণাম প্রত্যক্ষ হইতেছে। আপনি ত্রিলোকের উপকরণ সমস্ত জলপ্লাবিত হইতে দেখিয়া এবং মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ শ্রবণ না করিয়া প্রাণিশূন্য বিজন বিপিনে নিজকৃত ধর্ম্মসেতু সংরক্ষণের নিমিত্তই মহামীন রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; আপনার জয় হউক।

হে ভগবন্! দুর্দ্দান্ত দানবসেনাগণ যখন দেবরাজ পুরন্দরকে পরাজয় করিল, ত্রিভুবন বিজয়ী প্রবলপরাক্রান্ত হিরণ্যাক্ষ যখন দেবরাজকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, তখন আপনি বল দর্পিত দৈত্যের বিনাশ ও পৃথিবীর উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত মহাবরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এখন আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

হে মহাত্মন! পূর্ব্বে দেব দানবগণ যখন সমুদ্র মথনের নিমিত্ত অচলবর মন্দরকে সংস্থাপিত করিবার স্থান প্রাপ্ত না হইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন আপনি দেবগণের অমৃত পানেচ্ছা পূরণের নিমিত্ত কূর্ম্ম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, এখন আপনি এই দীন রাজগণের প্রতি প্রসন্ন হউন।

হে মহাভাগ! যখন ত্রিভুনবিজয়ী প্রবলপ্রতাপ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রধান দেবগণকে প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল, তখন আপনি দেবগণকে দৈত্যভয়ে ভীত দেখিয়া তাহাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত দিতিপুত্র দৈত্যরাজের বধসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুরে ব্রহ্মা বর দিয়াছিলেন, "ত্রিভুবনে শস্ত্র বা শাস্ত্র দ্বারা দিবারাত্রি মধ্যে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, কি নাগ কেহই তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না" আপনি এই সকল বিষয় বিচার করিয়া নরসিংহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য যখন আপনারে দেখিয়া ক্রোধে অধর দংশন করিতে

লাগিল, তখন আপনি নখাগ্র দ্বারা তাহার হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক প্রাণধনে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

হে দেব! আপনি ত্রিভুবন বিজয়ী বলিরাজকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবরাজ বলি যখন আপনার প্রার্থনা পূরণে সমুদ্যত হইয়া জলস্পর্শ করিলেন, তখন আপনি স্বাভিলাষ পুরণের নিমিত্ত বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিভুবন অধিকার করিয়া অগ্রজ দেবরাজ পুরন্দকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলিকে পাতালতলে প্রেরণ করিয়া দান ফল সংসাধনার্থ আপনি তাঁহার দৌবারিকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

হে বিশ্বেশ্বর! যখন অমিতবলবিক্রম হৈহয় প্রভৃতি ভূপাল অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তখন আপনি তাঁহাদিগের নিধনের নিমিত্ত ভৃগুবংশে জামদগ্ন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সেই রামাবতারে পিতার হোমধেনু হরণ নিবন্ধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্যা করিয়াছিলেন।

হে বিশ্বনাথ! আপনি, পুলস্ত্যবংশাবতংস বিশ্রবার পুত্র ত্রিলোকতাপন নিশাচর রাবণের বধের নিমিত্ত দিনকরকুলে মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং মহামুনি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে দিব্য অস্ত্র সমস্ত লাভ করিয়াছিলেন। সেই রামাবতারে আপনি প্রণয়িণী সীতা দেবীর হরণে সঞ্জাতরোষ হইয়া বানরগণ দ্বারা জলনিধি বন্ধন পূর্ব্বক রাবণকে বান্ধবগণের সহিত নিহত করিয়াছিলেন।

হে করুণাময়! আপনি যদুকুল জলধির শশাঙ্কস্বরূপ; আপনি

বলভদ্ররূপে বসুদেবের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ ও দৈত্যদানবগণকে প্রপীড়িত করিয়া ত্রিভুবনকে পাপশূন্য করিয়াছিলেন, সেই সময় সমস্ত দেবগণ অনুক্ষণ আপনার পদারবিন্দ সেবা করিয়াছিলেন।

হে বিশ্বব্যাপিন! আপনিই বিধিবিহিতবেদধর্ম্মানুষ্ঠানে ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ পরিহারের উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত বুদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রাকৃতিক প্রমাণকেই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি কলিকুল, বৌদ্ধ পাষণ্ড ও ম্লেচ্ছদিগের বিনাশের ও বৈদিকধর্ম্মসেতু সংরক্ষণের নিমিত্ত কল্কি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,। আপনার অনুগ্রহের কথা আর কি বলিব, আপনি আজ আমাদিগকে স্ত্রীত্ব নরক হইতে উদ্ধার করিলেন। হে করুণাসাগর! মাদৃশ পাপাত্মাগণের পক্ষে আপনার পাদপদ্ম দর্শন অতি সুদুর্ল্লভ। পিতামহ প্রভৃতি সুরগণের দুর্ব্বোধ্য আপনার এই অবতার পরিগ্রহ লীলাই বা কোথায়? আর বামাকুলাকুলিতমনা মৃগতৃষ্ণাতুর কামপরতন্ত্র আমরাই বা কোথায়? যাহা হউক, আমরা আপনার একান্ত অনুরক্ত আপনি প্রীতিপূর্ণ নয়নে আমাদিগকে আশ্বাসিত করুন।

দ্বিতীয়াংশের তৃতীয় অধ্যায়

সমাপ্ত।

মদালসা।

হা দগ্ধবিধাত! এই ঘটনা ঘটাইয়া আবার কেন ক্ষতে ক্ষার প্রদান করিতেছ! অয়ি প্রিয়তমে! একবার তুমি একাকিনী পলায়ন করিয়াছিলে, যদি দয়া করিয়া পুনর্ব্বার দর্শন দিলে, তবে যেন

আর সেরূপ আচরণ করিও না, এবার অন্তর্ধানকালে তুমি অবশ্যই আমারে সঙ্গে লইয়া যাইবে। অয়ি ভামিনি! কেন চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছ? তুমি আমার মরণ সংবাদে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমার অমঙ্গল শুনিয়াও স্বচ্ছন্দে জীবিত রহিয়াছি, ইহা ভাবিয়াই কি অভিমানে কথা কহিতেছ না? হায়! আমি কি অকৃতজ্ঞ ও কি পাপাত্মা! নতুবা এই প্রিয়তমার বিরহে কেন জীবিত থাকিব! রাজকুমার মনে মনে এইরূপ বিলাপ ও আক্ষেপ করিয়া নিস্পন্দনয়নে সেই সুলোচনার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন অশ্বতর যুবরাজের ঐরূপ ভাবান্তর দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! রাজকুমারের দাম্পত্য প্রণয় ও স্নেহ কি অসামান্য। ইহাঁর ভাব দর্শনে আমারও মন আকুল হইয়া উঠিল। যিনি সহস্র সহস্র অরাতিকে পরাজয় করিয়াছেন, তিনি আজ বিনা শরে ভূতলশায়ী হইলেন, আর এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পারা যায় না। এক্ষণে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া ইহাঁকে আশ্বস্ত করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এই ভাবিয়া তিনি রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ঋতধ্বজ! আর বৃথা ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই, এখন তুমি আশ্বস্ত হও। ইনি তোমার প্রকৃত প্রিয়তমা মদালসা, মায়াময়ী নহেন। ইনি জানিতেন, তুমি লোকান্তরে গমন করিয়াছ, সুতরাং সহসা আমার সদনে তোমাকে দর্শন করিয়া একবারে বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত ইহার চৈতন্যোদয় হয় নাই, সেই নিমিত্ত নিস্পন্দনয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। এই বলিয়া তিনি রাজপুত্র সমক্ষে মদালসার পুনর্জ্জীবন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

মদালসা সহসা অসম্ভাবিত পতিসমাগম দর্শনে মনে মনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এ কি ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাব ? না দৈবী ঘটনা ? প্রিয়তম লোকান্তরিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়াছিলাম, আবার কিরূপে ইহাঁর সমাগম হইল ? যাহা হউক, আজ কি সৌভাগ্যের দিন ! এরূপ ঘটনা ঘটিবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমিই বা কোথা হইতে এস্থানে আগত হইয়াছি ? যদি ইনি সত্য সত্যই আমার সেই প্রিয়তম হন, তবে কি আনন্দের বিষয় ! সন্দেহেরই বা বিষয় কি ? প্রিয়তমের সেই মনোহর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং আমাকে দর্শন করিয়া ইহাঁর যেরূপ ভাব ও যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে প্রাণনাথ ঋতধ্বজ ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি হইবার সম্ভাবনাই বা কি ? গাঢ়তম অন্ধকার হইতে আজ আলোক দর্শন হইল। আজ বিধি অপহৃত অমূল্য নিধি পুনঃ প্রদান করিলেন। সর-শোষ-কাতরা সফরী আজ জীবন দান পাইল। প্রিয়তমের বচনামৃত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে বহুকালের প্রদীপ্ত বিরহবহ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। নয়ন ও অন্তরাত্মা ক্রমে শীতল হইতে লাগিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দবাষ্পধারা অনিবার বেগে বিনির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখকমল প্রভাতকালীন শিশিরসিক্ত কমলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল এবং বিস্ময়ভাব হৃদয় হইতে অপনীত হওয়াতে লজ্জাভরে অবনত হইয়া রহিল।

এদিকে যুবরাজ ঋতধ্বজ নাগরাজ মুখে প্রিয়তমা মদালসার মৃতসঞ্জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন, এবং প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, তাত ! আপনার কৃপায় আমি আজ ধন্য ও চরিতার্থ হইলাম। অদ্য প্রিয়তমা মদালসাকে অর্পণ করিয়া

এই জীবলোক সনাথ করিলেন। আমি যে আপনার পুত্রদ্বয়ের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম, আজ তাহার চরম ফল প্রাপ্ত হইলাম। আপনি আমার যেরূপ উপকার করিলেন, ইহাতে আমারে আপনার ঋণে চিরদিন বদ্ধ থাকিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি নাগপতির চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার ও মিত্রদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া হৃষ্টমনে মদালসার সহিত নিজভবনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজকুমার নিজভবনে প্রবেশ করিয়া পিতা মাতার সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক মদালসার প্রাপ্তি বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। কল্যাণী মদালসাও শ্বশুর ও শ্বশ্রূ দেবীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক অন্যান্য স্বজনগণকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। মৃত মদালসার পুনঃ প্রাপ্তি সংবাদ প্রচার হইবামাত্র রাজপুর উৎসবময় হইয়া উঠিল। পৌরগণ আহ্লাদভরে নানাবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিল। যুবরাজ ঋতধ্বজ বহু দিনের পর প্রাণাধিকা প্রিয়তমারে পাইয়া তাঁহার সহিত নদীপুলিনে, কাননে ও নির্ঝরদেশে বিহার করিতে লাগিলেন। পুণ্যশীলা মদালসাও রমণীয় উপবনে ও বিবিধ রম্য প্রদেশে প্রিয়তমের সহিত মনের সাধে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ শত্রুজিৎ যথাবিধি বসুন্ধরা শাসন করিয়া যথাসময়ে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তৎপরে প্রজাগণ যুবরাজ ঋতধ্বজকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তিনিও প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া রাজমহিষী মদালসার সহিত পরম সুখে রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

পূর্ণ-শশী।

পূর্ণ শশী ঈষৎ হাসিয়া নতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বলিয়া দিয়াছেন ?

পত্রি।—এই বলিয়া দিয়াছেন যে, একটী পরম রূপবতী তপস্বী-কন্যার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। তিনি আসিতেছেন, তুমি তাঁহার নিকট যাও, এক সঙ্গে থাকো, দেখো যেন, কোন নর কি নারী তাঁহাকে আলিঙ্গন না করে, আর তিনিও যেন কোনো পুরুষ কি প্রকৃতিকে আলিঙ্গন না করেন।—সাবধান থাকিও, আর তুমি যখন—

পূর্ণ শশী বাধা দিয়া কৃত্রিম কোপের সহিত কহিলেন, যাও, আমি তোমার কথা শুনিব না। দেখ, আমি——

পত্রিকা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আর আমি যদি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে দিই, তাহা হইলে আমার কথা শুনিবে ?

পূর্ণ।—আমি এখান হইতে চলিলাম, তুমি—

উচ্চ হাস্যে কথা সমাপ্তির ব্যাঘাত জন্মাইয়া পত্রিকা সম্মুখ দিকে একটু সরিয়া বসিলেন। চন্দ্রদর্শনকৌতুকী চটুলা বালিকার ন্যায় ঊর্দ্ধ নয়নে পূর্ণ-শশীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আর যাইতে হইবে না, তুমি আমারে আলিঙ্গন করিও,—রাজপুত্র আসুন, তোমার বিবাহ হোক,—বিবাহের পর তুমি আমারে আলিঙ্গন করিও।

এইবারে পূর্ণশশী যথার্থ বিরক্ত হইলেন। শারদীয় নৈশাকাশের চঞ্চলার ন্যায় দ্রুতগতি দাঁড়াইয়া পত্রিকার দিকে কটাক্ষ করিলেন, বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ হন নাই —কটাক্ষপাত করিয়া পত্রিকাকে কহিলেন, দেখ, পত্রিকে!—আজ আমি বহুদিনের পর তোমারে নাম ধরিয়া প্রথম ডাকিলাম, কিছু মনে করিও না, আমার মনে কিঞ্চিৎ অসুখ হইয়াছে, আমি চলিলাম, তুমিও গিয়া শয়ন কর। রাত্রি অধিক হইয়াছে, তোমারে কিছু অকথ্য বলিয়াছি, কিছু

মনে করিও না, আমি উঠিলাম,—আমি চলিলাম, ক্ষমা করিও। তুমি গিয়া শয়ন কর।—আর তুমি ইহাও জেনো,ইহাও মনে রেখো,আমি রাজরাণী হইব না,—রাজপুত্রকে বিবাহ করিব না। এই আমি বেণী খুলিলাম, বসনভূষণ আমার কিছুই নাই,—মুনির পালিতা অভাগিনী কন্যা। আমি বনের মানুষ বনে চলিলাম।

পত্রিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—কহিলেন, বনের মানুষ! একটু বসো, আমি আসিতেছি।—বলিয়াই পশ্চাদ্দিকে চাহিতে চাহিতে ত্রস্তগতি কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

পূর্ণ-শশী একাকিনী মনে মনে কতখানা ভাবিতে লাগিলেন, এক এক বার বাষ্পপূর্ণ পদ্মচক্ষুদুটী পদ্মপাণিতলে মার্জ্জন করিলেন, একবার বিশ্ববিনোদ বদনে একটু হাসি আসিল, অমনি আপনা আপনি অপ্রস্তুত হইয়া মাথা হেঁট করিলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইল, আবার আত্মাবমানিনীর প্রস্ফুটিত চক্ষে বারিবিন্দু গড়াইল। উঠিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, কিন্তু কোথাও গেলেন না। দশ হস্ত পরিসর স্থানে পায়চারি করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালের কৌমুদীবর্ত্তী আকাশের ন্যায় তাঁহার বদনে যেন কখনো মেঘ, কখনো চন্দ্র ক্রীড়া করিতে লাগিল। গতিতে ক্ষণে ক্ষণে চপলা চমকিল। তিনি আপনা আপনি কহিলেন, বনের মানুষ বনে চলিয়া যাইব বলিয়াছি, কিন্তু কোথায় যাইব?—আমার সেই ব্রহ্মচারী পিতা কি আর সে বনে আছেন? তিনি হয় ত আমারে বিদায় করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। কোন্ নিরুদ্দিষ্ট তীর্থে চলিয়া গিয়াছেন, কিরূপে সন্ধান পাইব? হয় ত কোনো ভূতপ্রেতবেষ্টিত শ্মশানে গিয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন, আমি অবলা, কিরূপে সেই ভয়ঙ্কর প্রেতভূমিতে একাকিনী যাইব? আহা!

পিতা আমারে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, আমারে বিদায় দিয়া হয় ত তিনি আমারি শোকে যোগবলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন! আর কি এ জনমে আমি তাঁহার দেখা পাইব? আহা! তবে কি আমার সেই ব্রহ্মচারী পিতা নাই! তিনি কোথায় গেলেন?—তাঁহার সেই প্রশস্ত ললাট, সেই সুদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু, সেই সুমধুর গম্ভীর হাস্য, সেই স্নেহমাখা কথাগুলি এখনো আমার মনে জাগিতেছে! আর কি আমি তাঁহারে এ জন্মে দেখিতে পাইব না?—বলিতে বলিতে আবার নেত্রপুত্তলি ভেদ করিয়া দর দর ধারে বারিধারা কপোল দেশ প্লাবিত করিল।—অঞ্চলে মার্জ্জন করিয়া চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিলেন। নিষাদ-তাড়িতা কুরঙ্গিণী যেমন সভয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহে, তেমনি করিয়া চাহিলেন। সাশ্রু-নয়নে উপর দিকে চাহিয়া কহিলেন, তাত! তুমি কি নাই?—কেন নাই?—কোথায় গিয়াছ?—তোমার পূর্ণ-শশী,—আদরিণী পূর্ণ-শশী,—অভাগিনী পূর্ণ-শশী আর কি তোমার পাদপদ্ম দেখিতে পাইবে না?—আর কি তোমারে পিতা বলিয়া ডাকিতে পাইবে না?—আর কি তোমার পূজা করিবার আয়োজন করিয়া দিতে হইবে না?—আর কি তোমার মুখে যোগধর্ম্মের শাস্ত্রীয় কথা শুনিতে পাইব না?—আর কি আমি হাসিতে হাসিতে তোমার নিকটে বসিয়া হরিণশিশুর খেলা দেখিব না? আর কি তোমার দুঃখিনী পূর্ণ-শশীর মুখ ম্লান দেখিয়া আহার করিতে বলিবে না? মুখ শুকাইয়াছে, পিপাসা হইয়াছে, বলিয়া আর কি তোমার পূর্ণ-শশীর গায়ে পদ্মহস্ত বুলাইবে না? পিত! তোমার পূর্ণ-শশীর পিপাসা হইয়াছে, কে শীতল করিবে?—যতই বলেন, ততই নয়নযুগল জলে ভাসিতে থাকে, ততই চন্দ্রকপোল জলপ্লাবিত হয়।

উপবেশন করিলেন।—আর দাঁড়াইতে না পারিয়া আকুল হৃদয়ে নিরাসনে উপবেশন করিলেন। উন্মাদিনীর ন্যায় এক কথা বারম্বার বলিতে বলিতে আবার উঠিলেন। মৌনভাবে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া পরিস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, পিত! আমি কোথায় আসিয়াছি? আমারে কোথায় পাঠাইয়াছ?—কেন পাঠাইয়াছ?—আমি তোমার নিকট যাইব।—আমার বিবাহে কাজ নাই।—বিবাহ?—আমি বিবাহ করিব না।—বিবাহ?—উদাসিনীর আবার বিবাহ কি?—আমি তপস্বীকন্যা;—তপস্বীকন্যার বিবাহে কাজ কি? আমি বিবাহ করিব না;—তোমার আশ্রমে চলিয়া যাইব। কিন্তু কে লইয়া যাইবে?—কাহার সঙ্গে যাইব?—বৃদ্ধ নিত্যকামী পাগল,—পত্রিকাকে দেখিয়া অবধি আরো পাগল হইয়াছে, তাহাকে এখান হইতে লইয়া যাওয়া আমার কর্ম্ম নয়।—আর পত্রিকা?—পত্রিকা গেল কোথায়?—আমি বনের মানুষ বনে চলিয়া যাই, এই কথা বলিয়াছি বলিয়া কি পত্রিকা রাগ করিয়াছে?—রাগ করিয়াই কি চলিয়া গিয়াছে?—আর আসিবে না?—আমি—

কথা পার্শ্বস্থ একজন গুপ্ত শ্রোতার কর্ণে গেল। কে সেই শ্রোতা?—কে জানে?—খড়্ খড়্ করিয়া পটাবাসের একখানি দীর্ঘ যবনিকা সরিয়া গেল। এক অপূর্ব্ব অদৃষ্ট মূর্ত্তি গৃহপ্রবেশ করিলেন।—পূর্ণ-শশী তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে, লজ্জায় ও বিস্ময়ে মস্তকে বস্ত্রাবরণ টানিলেন,—জড়সড় হইয়া পটগৃহের একটী কোণে গিয়া বসিলেন,—নিঃশব্দে বসিলেন।

অপূর্ব্ব অদৃষ্ট মূর্ত্তি গৃহপ্রবেশ করিলেন। কাঞ্চনোজ্জ্বল গৌর বর্ণ, হাস্যপূর্ণ গম্ভীর বদন, পীবর বাহু যুগল, দীর্ঘ, কুঞ্চিত, গাঢ়-কৃষ্ণ কেশস্তবক, বিশাল বক্ষ, রুচির দশনপংক্তি, হরিদ্বর্ণ বপুস্ত্রাণ

আজানু চুম্বিত, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, মস্তকে ভাস্বর উষ্ণীষ, ললাটে হীরক জড়িত মণিটীকা আবদ্ধ, কটিদেশে স্বর্ণকোষ-যুক্ত বিরাট অসি সংলগ্ন, দক্ষিণ হস্তে অশ্বকশা।—নৈদাঘ মধ্যাহ্ণ ভাস্করের ন্যায় তেজোময়, বয়স অল্প। অবয়বের গঠনে তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা নাই। আজ যদি এ ক্ষেত্রে আমি অপ্রত্নক বাঙ্গালা ভাষার মহামহিম কবি হইতাম, তাহা হইলে দম্ভ করিয়া বলিতাম, সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষ পুরন্দর,—সাক্ষাৎ অনঙ্গ কন্দর্প,—সাক্ষাৎ ষড়ানন কার্ত্তিক!—এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সরলা পূর্ণশশীর ভয়, লজ্জা ও বিস্ময়ের উদয় হইয়াছে।

সেই তেজোময়ী মূর্ত্তি গম্ভীর স্বরে,—গম্ভীর অথচ সুমধুর স্বরে পূর্ণ শশীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বনের মানুষ! আমারে চিনিতে পার?—আমি তোমারে তোমার ব্রহ্মচারী পিতার আশ্রমে রাখিয়া আসিব।"

বর্ষা-পৌর্ণমাসীর অর্দ্ধ রজনীতে ঘোর জলদজালাচ্ছন্ন আকাশে বৃষ্টি ধরিয়া গেলে পূর্ণ শশী যেমন একবার ধূসর মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া একটু একটু উঁকি মারেন, শিবিরপার্শ্বোপবিষ্টা পূর্ণশশীও সেইরূপ ঈষৎ বস্ত্রাবগুণ্ঠন মোচন করিয়া একবার কটাক্ষ করিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না;—অধিক ভয়ে, অধিক লজ্জায় পুনরায় মস্তক নত করিলেন। আগন্তুক মূর্ত্তি "তিষ্ঠ" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পাছে আবার ফিরিয়া আইসে, এই আশঙ্কায়,—এই সংশয়ে এক দণ্ড কাল পূর্ণশশী সেখান হইতে সরিলেন না। যে ভাবে যেমন বসিয়া ছিলেন, সেই ভাবে তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন শঙ্কা গেল, তখন অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন।

পূর্ণচন্দ্র মেঘমুক্ত হইল। কিন্তু তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো উন্মাদিনী। কে আসিল, কে ছলিয়া গেল, কে আমাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে চাহিল, বনের মানুষ বলিয়া বিদ্রূপ করিল, পরপুরুষ, কখনো চিনি না, "চিনিতে পার" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?—তিনি কি কোনো দেবতা হইবেন? মায়া করিয়া কি ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন?—আমি নিরপরাধিনী দুঃখিনী অবলা, আমারে ছলনা করিয়া তাঁহার কি লাভ হইল? আমি ত কখনো কাহারও কাছে কোনো অপরাধ করি নাই, তবে এমন কেন হইল? কি যে ঘটিল, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। নিকটে পত্রিকাও নাই যে, জিজ্ঞাসা করি। হায় হায়! আমার এ কি দশা হইল! কেন আমি এখানে আসিয়াছিলাম! পিতঃ! আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছিলাম?—কেন তুমি এ বনবাসিনীকে আশ্রমবাসিনী করিতে পাঠাইয়াছ?—চিরবনবাসিনীর পক্ষে কি সংসারবাসিনী হওয়া সাজে? আর নয়!—আমি কখনই গৃহবাসিনী হইব না। এই আমি আশ্রমে চলিলাম,—চলি,—চলি,—এই চলিলাম!—বলিতে বলিতে আরও ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। কি বলেন,—কি করেন, কিছুই স্থির রাখিতে পারেন না। কথায় কথায় ভুল হইতে লাগিল। এই আমি সন্ন্যাসিনী সাজিলাম, এই—এই—আমি মাথার বেণী খুলিলাম, এই বসন ত্যাগ করিলাম, এই আমার উপযুক্ত সজ্জা হইল।

পাগলিনী যথার্থই এলোকেশী সাজিলেন। অঙ্গবসন আলু থালু হইয়া পড়িল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, দ্রুতপদে শিবির হইতে বহির্গত হইবার জন্য ছুটিলেন। দ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছেন, এমন সময় সহসা তড়িৎগতি পত্রিকা আসিয়া হস্ত ধারণ করিলেন।

"।,—ধরিও না,—কে তুমি ?—বাধা দিও না, ছাড়িয়া দাও, পিতার নিকটে যাই ! পিতা—আমার পিতা—ঐ আমার পিতা আমারে ডাকিতেছেন,—ছাড়িয়া দাও,—ছাড়িয়া দাও,—ধরিও না,—পিার নিকটে যাই। আমি——"

পত্রিকা পূর্ণ-শশীর এই অবস্থা দর্শন করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, শশি ! এমন করিতেছ কেন ?—কি হইয়াছে তোমার ?—যাহা বলিলে, তাহাই করিলে? সত্য সত্যই বনে মানুষ সাজিয়াছ ?—ছিঃ ! এমন করিতে নাই। তোমার কি মনে হইতেছে না যে, খানিকক্ষণ পূর্ব্বে তোমারে বলিয়াছিলাম, আমি গন্ধর্ব্বকুমারী, কামরূপী, যখন যে রূপ ইচ্ছা, তথনই সেই রূপ ধরিতে পারি। আমাদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, ভয় কি তোমার ? এইরূপ নানা বাক্যে প্রবোধ দিয়া পূর্ণ-শশীকে কতক প্রকৃতিস্থ করিলেন। পূর্ণ-শশী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পত্রিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পত্রিকে ! সত্য বল, এই মাত্র আমি যে মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, সে কি তুমি না কোনো দেবপুত্র ?

পত্রিকা এ প্রশ্নে কোনো উত্তর দিলেন না। পরে জানিবে, কেবল এই মাত্র বলিয়া পূর্ণ-শশীকে ধরিয়া লইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ণ-শশী আলুলায়িত কেশে পাগলিনীর ন্যায় যতক্ষণ গেলেন, ততক্ষণ বলিতে বলিতে গেলেন, এইমাত্র আমি যে মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, সে কি তুমি না দেবপুত্র ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণারণ্য।

" অতি সরল বাঁশের বাঁশী আমার।
বাঁশরীর মধুর স্বরে,
জগতের মন মোহিত করে,
সাধে কি মন মজেছে গোপীকার॥"

নীলঠাকুর।

উন্মাদিনী অবস্থায় পূর্ণশশীরে লইয়া পত্রিকা শিবির প্রবেশ করিবার পর বর্ণনাযোগ্য নূতন ঘটনা কিছুই হইল না। তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে এক জন দূত আসিয়া পত্রিকার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্রিকা সেই পত্রিকা পাঠ করিয়া মনে মনে কি ভাবিলেন, ব্যক্ত করিলেন না। পত্রবাহককে দুটী চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সংক্ষেপে হিন্দি ভাষায় উত্তর দিয়া, সেলাম করিয়া পত্রবাহক চলিয়া গেল। পত্রিকা একটু হাস্য করিলেন।

পূর্ণ শশী নিকটে বসিয়া ছিলেন, পত্রিকার ভাব অথবা হস্যের কারণ কিছুই বুঝিলেন না। নির্দ্দোষ বদনে স্বভাবসুলভ নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি?—পত্রিকা কহিলেন, কি বল দেখি?—রাজকুমারের নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে, তোমার বিবাহ।

পূর্ণ শশী মুখ নত করিলেন, কথা কহিলেন না।

বিরহিণী রাধিকা।

(কোকিলের প্রতি)

১

পাখি রে !—
কি দেখিতে এলে আর এ বিজন কাননে ?
কাঁদি দুখে একাকিনী, আজি রে নয়নমণি,
পরাণেশ বিহীনে !
কি কাজ সুখের গান, করে মম সদনে ?
একটী অমূল্য মণি, উজলি হৃদয় খনি,
রেখেছিনু যতনে,
হায় রে কপাল দোষে, হারাইনু সে ধনে !

২

পাখি রে !—
সলিল তরঙ্গ যেন, সমীরণ তাড়নে,
যেই দিন পিকবর, দোলায়ে মধুর স্বর,
মোহিতে রে শ্রবণে,
প্রেমের মধুর গান, শুনাইতে যতনে,
যে দিন পাতার তলে, গোপনে বসিয়া ছলে,
আরকত নয়নে,
হেরিতে প্রাণেশে মোরে, মধুকুঞ্জ কাননে ;

৩

পাখি রে !—

যে দিন পরাণ বঁধু, শুনে তোর স্বর রে,
দাঁড়ায়ে তরুর তলে, ধরিয়া দুখিনী গলে,
কতই যে আদরে,
সরল কোমল হাসি, মাখি মধু অধরে,
বলিতেন তোমা দেখি, "ডাকে তব প্রিয় পাখী,
ওই শাখা উপরে"
বলিয়া অমনি আসি, ধরিতেন অধরে !

৪

পাখি রে !—

স্মরিলে সে সব কথা, ব্যথা পাই মরমে !
বঁধুর বচনে সুখে, রহিতাম নতমুখে,
প্রেমমাখা সরমে !
কেমনে সে কথা পাখি, ভুলিব এ জনমে ?
থাকিতাম তরুতলে, অসুখ কাহারে বলে,
জানি নাই ভরমে ;—
মরমের দুখ পাখি, রয়ে গেল মরমে !

৫

পাখি রে !—

জল স্রোত যেন শ্যামা প্রকৃতি উরসে,
সুমধুর কলকলে, নাচি নাচি যায় চলে,
সমীরণ পরশে,

চিত্রিত চন্দ্রক যেন স্বচ্ছজল সরসে,
বঁধু মোর করে ধরি, তব স্বর লক্ষ্য করি,
দূরবনে হরষে ;
ভ্রমিতেন পাখি তোরে, দেখিবার মানসে !

৬

পাখি রে !—
ভ্রমিতেন প্রাণনাথ, কভু দূরকাননে ;
নিকুঞ্জ ভিতরে থাকি, তোমার মতন পাখি,
ডাকিতাম সঘনে;
প্রতিধ্বনি নিত ধ্বনি, প্রাণেশের শ্রবণে ;
অমনি সহসা আসি, হাসিয়া মধুর হাসি,
ধরিতেন বদনে ;
অমনি লজ্জায় মুখ, ঢাকিতাম বসনে !

৭

পাখি রে !
পূরবগগনে উষা, জাগে রক্তবরণী ;
গায় সুমধুর রবে, নিশান্তে কাকলী যবে,
কুঞ্জবন-মোদিনী,
(উষারে হেরিয়ে হাসে, মুক্তাময়ী ধরণী !)
তেমতি বঁধুর মনে, স্বরসুধা বরিষণে,
পিকবর ! আপনি,
জাগাতে মিলন সুখ,' দিবস কি রজনী।

৮

পাখি রে !—

কত দিন, কত দিন, মনে মনে ভাবিনু,
রাখিতে তোমারে ধরি, সোণার পিঞ্জরে করি,
কিন্তু হায় নারিনু !
বসন্তেরে তব তরে, কত কোরে সাধিনু !
ডাকিলাম তরুগণে, পুছিনু কুসুমবনে,
উত্তর না পাইনু !
আবার বসন্তে হায় ! কত কোরে সাধিনু !

৯

পাখি রে !—

বলিল বসন্ত মোরে, কি কাজ রে কোকিলে ?
তব যৌবন কানন, শ্যাম তাহে সমীরণ,
কে না জানে অখিলে ?
কণ্ঠ তব পিকবর, জেনে নাকি ভুলিলে ?
বসি বংশীধারী পাশে, হেসে হেসে মনোল্লাসে,
কলকণ্ঠে গাইলে,
বাড়িবে দ্বিগুণ সুখ, কি করিবে কোকিলে ?

১০

পাখি রে !

নাই সে সুখের দিন, আজি এই কাননে !
কাঁদে রাধা একাকিনী, আজি রে নয়ন মণি
পরাণেশ বিহীনে !

কি কাজ সুখের গান, কোরে মম সদনে ?
একটী অমূল্য মণি, উজলি হৃদয় খনি,
রেখেছিনু যতনে,
হায় রে কপাল দোষে, হারাইনু সে ধনে !

শ্রীকঃ

ডিমস্থিনিস।

গ্রীস দেশের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিসের নাম জগদ্বিখ্যাত। যাঁহারা তাঁহার সবিস্তার জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে পর্য্যায়ক্রমে বিস্ময়, কৌতূহল, আনন্দ ও শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে। আমরা এই বিশ্ববিখ্যাত বক্তার জীবন-চরিত উদ্ধার করিব না, একটী বিশেষ ঘটনার প্রসঙ্গ করিব, এই মানসে ইহাঁর নামটী এতৎ পত্রে অঙ্কিত করিয়াছি। মাসিডনের লোভপরতন্ত্র মহা স্বার্থপর রাজা ফিলিপ যৎকালে নানা কুচক্র করিয়া গ্রীসরাজ্য উদরস্থ করেন, তৎকালে আথেন্সের সাধারণতন্ত্র সভায় ডিমস্থিনিস যে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর যাবতীয় বাগ্মীর বক্তৃতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা ক্রমে ক্রমে সেই কয়েকটীর অনুবাদ করিয়া দিব ইচ্ছা করিয়াছি।

মহাত্মা ডিমস্থিনিস্ প্রথম বক্তৃতার অবতারণায় বলিয়াছেন, যখন আমরা কোন নূতন বিষয়ের আলোচনা করিবার নিমিত্ত সমবেত হই, তখন যে পর্য্যন্ত অপরাপর সভ্যেরা আপন আপন মত প্রকাশ না করেন, ততক্ষণ আমি নিস্তব্ধ হইয়া থাকি, যদি তাঁহাদের

মত আমার মতের সহিত ঐক্য হয়, তাহা হইলে আমি কোন কথাই কহি না। মতভেদ হইলে সর্ব্বশেষে আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। এ ক্ষেত্রে আমি সে রীতি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে উত্থিত হইয়াছি। হে আথেনীয় ভ্রাতৃগণ! এখন আমাদের অবস্থা অতি নিকৃষ্ট, কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে, ইহার সংস্কার হইতে পারে না, ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে। বোধ করি, আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন, বিষয়কার্য্যে সম্পূর্ণ অমনোযোগিতাই আমাদের বর্ত্তমান কষ্টের কারণ। যদি আমরা চিরদিন এইরূপ অলস হইয়া থাকি, অতীত গৌরবের উদ্ধারার্থ কোনরূপ চেষ্টা না করি, তবে সে গৌরব পুনঃপ্রাপ্তির আর আশা নাই। বাস্তবিক আমাদের এই বৃহৎ রাজতন্ত্রের মহতী মহিমা সেই পূর্ব্ব অবস্থা ও পূর্ব্ব সম্ভ্রম পুনরাগত দেখিতে নিতান্তই পিপাসী। আপনারা স্মরণ করিয়া দেখুন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্পার্টাবাসীরা কতদূর বীর্য্যবান ও ক্ষমতাশালী হইয়াছিল, আপনারাই বা কিরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কিরূপ ঔদার্য্য সহকারে এই রাজতন্ত্রের ও স্বদেশের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগের সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কেন আমি এ সকল পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতেছি, আপনারা এ প্রশ্ন করিতে পারেন। রাজতন্ত্রের গৌরব-সূর্য্য উজ্জ্বল হইবে, আপনারা আলস্য-নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জাগরিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বল বিক্রম প্রকাশ করিবেন, সে প্রশ্নে আমার এই মাত্র উত্তর। যাহাতে আপনারা শঙ্কিত হইবেন, যাহাতে আপনাদিগের অমঙ্গল হইবে, এমন কথা বলা আমার বাসনা নহে। যাহাতে আপনাদিগের মঙ্গল হয়, তাহাই আমার নিতান্ত বাসনা। আরও দেখুন, আপনারা যখন বাহুবল ও পরাক্রমে সসজ্জ ছিলেন, তৎকালে তদানীন্তন লাসিডিমনের প্রবলপ্রতাপ

আপনাদিগেরই দ্বারা অতি সহজে পরাজিত ও চূর্ণিত হইয়াছিল, আবার সেই আপনারাই এখন কূপমণ্ডূকের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। গর্ব্বিত ফিলিপের পরাক্রম আমাদের এই দুর্দ্দশার হেতু হইয়াছে।

এক দিকে অসংখ্য সৈন্যসামন্ত পরিরক্ষিত ফিলিপকে এবং অপর দিকে অধিকাংশ রাজ্যচ্যুতি নিবন্ধন আমাদের দৌর্ব্বল্যকে স্থাপন করিয়া যিনি বলিতে পারেন, ফিলিপ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ও দুর্দ্দান্ত শক্র, এমন কেহ যদি এ সভায় বিদ্যমান থাকেন, আমার মতে তিনি যথার্থবাদী। তথাপি তাঁহার এটী বিবেচনা করা উচিত যে, আমাদের এমন এক সময় ছিল, যখন পীড্না, পটিডিয়া, মিথোন এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী দেশ আমাদিগের অধিকারে ছিল, যে সকল নগর ও যে সকল রাজ্য এখন ফিলিপের অধিকৃত হইয়াছে, তাহা আমাদের ছিল। অনেক নগর ও রাজতন্ত্র আমাদের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া আপন আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিত। ফিলিপ যদি তখন এরূপ যুক্তি করিতেন যে, "আথেনীয়দিগের দুর্গাবলী আমার রাজ্যের সীমায় প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, আমাকে সাহায্য দান করে, এমন কেহই নাই, তবে আমি কি প্রকারে সেই আথেনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিব?" এরূপ চিন্তা করিলে কখনই তিনি এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং তাঁহার সমৃদ্ধিও এক্ষণে বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছে।

হে আথেনীয় ভ্রাতৃগণ! রাজা ফিলিপ বিলক্ষণ জানেন, দুইপক্ষ যোদ্ধার মধ্যে যিনি বিজয়ী হইবেন, ঐ সকল রাজ্য তাঁহারই পুরস্কার। যাহারা রণক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে, তাহাদের রাজ্য রণক্ষেত্রে

বিদ্যমান বীরপুরুষের অধিকৃত হয়।—অলস ও ভীরুর রাজ্য পরিশ্রমী ও সাহসী পুরুষের ভোগে আইসে। এই সকল চিন্তায় উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া রাজা ফিলিপ এখন যাবতীয় দেশ জয় করিতেছেন। আমরা কাষ্ঠস্তম্ভের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে যেন কৌতুক দর্শন করিতেছি। ঐ বলদর্পগর্ব্বিত রাজা এক্ষণে সমস্ত রাজ্যবাসিগণকে স্বাধীনতাচ্যুত প্রজাধমমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। কাহাকে কাহাকে সৈন্যবলে, কাহাকেও বা সন্ধিসূত্রে এবং কোন কোন ব্যক্তিকে বা মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করিতেছেন। লোকেও এখন আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেছে। কারণ যে লোক কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং সকল কার্য্যেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে সকলেই ইচ্ছা করে।

হে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ! আপনারা যদি প্রত্যেকে আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ নিজ ক্ষমতা ও অবস্থা অনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যোগী হন, ধনবানেরা যদি স্বদেশের হিতের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেন, বলিষ্ঠ ও যুবকেরা যদি সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হয়,—এক কথায় আপনারা যদি পূর্ব্বের ন্যায় সজীব হন, সকলে যদি নিষ্ফল আশা ও বৃথা তর্ক পরিত্যাগ করেন, অমুক ব্যক্তিরা রাজত্ব করিতেছে, আমার শ্রম আবশ্যক নাই, এমন কথা যদি না বলেন, অন্য অন্য সকলে রাজকার্য্য করিতেছে, আমার শ্রম কেন? কোনমতে প্রয়োজন হইতেছে না, এমন ধিক্কার যদি মনোমধ্যে উদিত হয়, তবে দেবতাদের অনুগ্রহে অপহৃত দেশ অবশ্যই পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, আমাদের রাজতন্ত্রের মহিমা ও গৌরব পুনরুদিত হইবে, এবং লোভান্ধ ফিলিপের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে উচিতমত দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক শাসিত করিতে পারিবেন। আপনারা এমন বিবেচনা কদাপি করিবেন না

যে, রাজ্যলোভী মহাভিমানী ফিলিপ চিরকাল অনশ্বর দেবতার ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয়রূপে লব্ধ সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ করিবেন। কারণ আপনারা নিশ্চয় জানিবেন যে, তাঁহার নিতান্ত অনুগত দাস ও মিত্রবর্গের মধ্যে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করে, ভয় করে, এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যে হিংসা করে। এটী মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব। আমরা আলস্যখট্টায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি, তাহারা আমাদিগের নিকট কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তাহাদিগের মনোভাব প্রচ্ছন্ন ভাবেই আছে। আপনারা এই সর্ব্বগ্রাসী আলস্য পরিত্যাগ করুন, দেখিবেন, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা সমস্তই সত্য ঘটিবে। যদি আলস্যের আধিপত্য থাকে, তবে এক্ষণে আমাদিগের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আরও হীন হইবে। অহঙ্কৃত ফিলিপের দর্প ও স্পর্দ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইবে। আমরা যুদ্ধ করিতে যাই কিম্বা শান্তির সেবায় নীরবে বসিয়া থাকিতে চাই, তিনি এক্ষণে তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। যতই আমরা জড়বৎ পড়িয়া থাকিব, ততই তিনি আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক যন্ত্রণা প্রদানে সমুদ্যত হইবেন।

কবে শুভ দিন সমাগত হইবে? হে স্বদেশীয় বন্ধুগণ! কবে আপনারা নিজ প্রতাপ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইবেন? কবে আপনারা উত্তেজিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিবেন? কবেই বা কর্ত্তব্য জ্ঞান ও আবশ্যক চিন্তা আপনাদিগকে ঋজুভাবে তুলিয়া বসাইবে? এবং কবে আপনারা আমাদের এই ইদানীন্তন অবস্থার স্থিরচিন্তা করিবেন? বলুন দেখি, বর্ত্তমান অবস্থা কি প্রকার বিবেচনা হয়? আমার মতে স্বাধীন লোকের দুশ্চরিত্রতা নিতান্ত মানহানিকর এবং অশ্রদ্ধেয়।

ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ।

বঙ্গভাষার প্রধানতম কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন। ইহাঁদের নাম কাহারও অবিদিত নাই। ইহাঁদিগের উভয়ের দ্বারাই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে অন্যতর একজনকে প্রাধান্য প্রদান করিলে অপরের অবমাননা করা হয়। সংক্ষেপে এইমাত্র কহা উচিত যে, ইহাঁরা উভয়েই তুল্য কবি ছিলেন। অদ্য আমরা তাঁহাদিগের বঙ্গকাব্যের গুণগান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না। তাঁহারা পারস্য ও হিন্দী ভাষাতে কি পর্য্যন্ত ক্ষমতাবান্ ছিলেন, তাহাই প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য। ধীমান পাঠক মহাশয় উত্তম রূপে অবগত আছেন যে, যৎকালীন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ জীবিত ছিলেন, তৎকালে ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা এ দেশে আরম্ভ হয় নাই। বিচার কার্য্যাদি সমস্তই পারস্যভাষায় সম্পাদিত হইত। যাঁহারা রাজপ্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন, বা উচ্চতম সামাজিক সুখভোগ করিতে অভিলাষী হইতেন, তাঁহারা যত্ন পূর্ব্বক পারস্যভাষা শিক্ষা করিতেন। তৎকালে হিন্দীভাষারও বহুল প্রচার ছিল। সে সময়ে প্রত্যেক সম্রাট্ ও রাজাদিগের সভায় এক বা অধিক হিন্দী ভাষাবিৎ কবি নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা স্বস্ব প্রভু দিগের বংশাবলী কীর্ত্তন ও সুমধুর স্বরে তাঁহাদিগের প্রশংসা গান করিতেন। দূরদেশে রাজসংবাদাদিও লইয়া যাইতেন। অবসর কালে রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া সম্রাটদিগের তুষ্টি সাধন করিতেন। এই প্রকার কবিদিগের নাম বন্দী অথবা ভাট। রায় গুণাকর ও কবিরঞ্জন উভয়ের গ্রন্থেই এই ভাট ভাষায় ভাষিত অনেক কবিতা আছে। তাহা কাব্য কর্ত্তাদিগের রচনা বলিয়াই বিখ্যাত। কেহ কেহ

কহিয়া থাকেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে যে সকল ভাট ছিলেন, তাঁহারাই সেই সকল অংশ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, কবিরা তাহাই স্ব স্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এই বাক্যের অধিক গুরুত্ব দেখিতে পাইতেছি না। কারণ উভয়েই বঙ্গভাষার প্রধান কবি বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারা যে পরের ভাষিত কবিতা স্ব স্ব গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবেন, তাহা যুক্তি যুক্ত বোধ হয় না, এবং ভাটদিগের কণ্ঠ নিঃসৃত যে সকল পদ উক্ত উভয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহা এতাধিক দুরূহ নহে যে, গণনীয় বঙ্গকবিদিগের রচনা শক্তির বহির্ভূত বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমাদিগের মত, পাঠকদিগের সমীপে ক্রমে সংস্থাপন করিতে যত্ন করিব। আমরা যে কার্য্যে অদ্য প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে যদি প্রাগুক্ত ভাট ভাষার কবিতা, উক্ত মহোদয়দিগের রচিত নাও হয়, তথাপি আমাদিগের সে উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে না। কারণ উক্ত কবিতা দুই জন সুপ্রসিদ্ধ কবির হস্ত বিনির্গত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যদি ভাট দিগেরই ভাষিত হয়, তাহা হইলে কোন্ কবিতা গুলি উত্তম তাহা দেখাইয়া দিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। অধিক বাক্যাড়ম্বর না করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

লিপিপ্রমাদ মুদ্রাঙ্কণ দোষ ও অন্যান্য কারণ বশতঃ হিন্দী ভাষার কবিতা সকল শুদ্ধরূপে মুদ্রিত হয় নাই। স্থানে স্থানে এই রূপ দোষ ঘটিয়াছে যে, যথার্থ শব্দ সকল আবিষ্কার করাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণ বশতঃ অনেকে সেই সকল স্থান পাঠ করিয়া যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। অন্য অন্য সভ্য জাতির কাব্য প্রবন্ধের ন্যায় বঙ্গভাষার কাব্যে টীকা নাই। যদিও

দুই এক খানি গ্রন্থ অর্থ সহিত প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু যাবৎ সকল কাব্যই অর্থ সহিত প্রকাশ না পাইতেছে, তাবৎ আমরা সাধারণরূপে প্রশংসা করিতে ইচ্ছুক নহি। এই স্থলে আমরা উভয় কবির হিন্দী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। স্থানে স্থানে শব্দের যথার্থ উচ্চারণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক একটী ইংরাজী অক্ষর সন্নিবেশিত করিয়াছি। বোধ করি পাঠক মহাশয়েরা এই অপরাধটী মার্জ্জনা করিবেন।

ভারতচন্দ্র।

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি।

গঙ্গ! কহো গুণসিন্ধু মহীপতি নন্দন সুন্দর ক্যোঁনহী আয়া।
যো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ তাহি সমুঝায় সুনায়া॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভূলগয়া অরু মোহি ভূলায়া।
ভট্ট হতা অবভট্ট ভয়া কবিতাইমে দাগ (gh) চঢ়ায়া॥
য়্যার কহা বহুপ্যার কিয়া গজবাজি দিয়া সির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া (z) জর পোশ কিয়া সব কাব্য পঢ়ায়া॥
গাঁওহী ধাম মহাকবি নাম দিয়া মণি দাম্ বঢ়াই বঢ়ায়া।
কাম গয়া বরবাদ সব্ অন্ত ভারতীকো নহী ভেদ জনায়া॥

ভাটের উত্তর।

ভূপ! মৈঁ তিহারী ভট্ট, কাঞ্চীপুর যায় কে।
ভূপকে সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায় কে॥
হাত যোড়ি পত্র দিহ্লো শীষভুমি নায়কে।
রাজপুত্রীকো কথা বিশেষ মেঁ সুনায় কে॥
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছি ভেদ ভায় কে।
একমে হাজার (z) লাখ মৈঁ কহা বনায় কে॥

বুঝিকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায় কে।
আনমেঁ ভয়া মহাবিয়োগী চিত্ত রায় কে॥
য়্যাহী মেঁ ক্যা ভয়া কঁহাগয়া ভুলায় কে।
বাপ মা মহাবিয়োগী দেখনে ন পায় কে॥
শোচি শোচি পাঁচ মাহ্ মৈঁ তহাঁ গঁওয়ায় কে।
আগুহী কহাহুঁ বাত বৰ্দ্ধমান আয় কে॥
য়্যাদ নহী হৈ মহীপ! মৈ গয়া জনায় কে।
পূছহু দিওয়ান জীউ বক্শী কো মঙ্গায় কে॥
বুঝি কে কহে মহীপ ভট্ট কো জনায় কে।
চোর কৌন হেতু পুনঃ চিহ্ন দেখ যায় কে॥
ভূপ কে নিদেশ পায়, গঙ্গা যায় ধায় কে।
চোর কো বিলোকি চিহ্ন শীষ ভূমি নায় কে॥
বেগহী কহা মহীপ পাস্ ভট্ট আয় কে।
সোহী যহী হৈ কুঙার কাঞ্চীরাজ রায় কে॥
ভাগ হৈ তিহারী ভূপ! উহ আপহী আয় কে।
বাস মেঁ রহা, তিহারী পুত্রী কে বিহায় কে॥
চোর কো মশান মেঁ কাহে দিও পঠায় কে।
ভাগমান্ আপিহী যায় লাহু মনায় কে॥
ভট্ট কে কহা মহীপ চিত্ত মোদ লায় কে।
লাওনে চলে মশান ভারতী মনায় কে॥

রামপ্রসাদ।

বাবুজী কোর্নিশ মেরা, বর্দ্ধামান বিচ তেরা,
নাম তো হমারা মাধো ভাট।
অরজ করুঙ্গা পীছে, ঘড়ী এক বৈঠিয়ে নীচে,
অরু তো নাগায়ে তুম (আপ) হাট।
আয়া হু জো চড়ি ঘোড়ী, তস্‌দীহ পাশ হুঁ বড়ী,
ও লেকিন্ ভূল গয়া সব।
খেলাফ্ ন কহুঁ বাবু, তুম্‌নে মুঝে কিয়া কাবু,
যাহ রুয়ে তুঝে (তুরা) দেখা জব (১)।
চৌন্থলিয়া দেব (২) কে, এ যশে আপকে স্থরত জৈসে,
দুন্‌য়িমেঁ পয়্‌দা কিয়া সোহী।

(১) আমরা অনেক স্থলে বর্গীয় জ ব্যবহার করিয়াছি, তথায় মুদ্রিত পুস্তকেতে অন্তস্থ য লিখিত আছে। বঙ্গভাষাতে লিখিতে হইলেও অন্তস্থ য ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু হিন্দীভাষায় কথন ও লিখন প্রণালী ভিন্ন রূপ। একটী উদাহরণ প্রদান করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। সংস্কৃত যদ্ যদা লিখিতে অন্তস্থ য এবং বঙ্গভাষায় "যখন" লিখিতেও অন্তস্থ য। কিন্তু হিন্দী লেখকেরা "যব" লিখিতে "জব" লিখিবেন। কারণ পাঠ করিবার সময়ে তাঁহারা "য়ব" উচ্চারণ করিবেন।

(২) হিন্দীর অন্তঃস্থ "বকারের" উচ্চারণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বঙ্গভাষাতে "ওয়" লিখিত হইয়া থাকে। ব কারের উচ্চারণ রক্ষা করা হয় না, ইহা বঙ্গ ভাষার একটী দোষ কহিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এক জন সাধারণ ব্যক্তির বাক্যে যে সমাজের গতি বিচলিত হইতে পারে না, তাহা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। অতএব সে বিষয়ের আর উল্লেখ করিলাম না।

দেখা হুঁ মুল্ক কেত্তা, ছত্রিয়ো মেঁ রাজা জেত্তা,
　　তেরা মুকাবিল নহীঁ কোই।
বীরসিংহ নাম রাজা, (২) জাত মেঁ হৈ বড়া তাজা,
　　সুনে (৩) হোগে উনকা জিক্র।
উনকে ঘর মেঁ লেড়কী এক, তারিফ করূ মৈঁ কেত্তেক,
　　রাত দিন শাদী কী ফিক্র।
কৌল এত্তা কি যে হৈও, (৪) হজীমত হিদেগা জো,
　　শাস্ত্র মেঁ ওহী উস্কা নাথ।
তুহমরা হুঁ এয়সা জান, জো কহুঁ সো কহা মান,
　　তুম সকোগে আও হমারে সাথ।

কবিরঞ্জনের কাব্যে অনেক হিন্দী পদ আছে। সে সকলের অদ্য অবতারণা করিলাম না। বারান্তরে প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব। এবং উভয় কবির মধ্যে হিন্দী ও পারস্য ভাষাতে কোন্ কবি অধিক নিপুণ ছিলেন, তাহাও পরে লিখিব।

---

(৩) শ্রু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকল হিন্দী ভাষাতে দন্ত্য সকার দ্বারায় লিখিত হয়, তজ্জন্য আমরাও সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি।

(৪) অস্তি শব্দের রূপ হিন্দী ভাষাতে "হৈও" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গভাষাতে কেবল ঐকারের উচ্চারণ করিতে হইলে নিতান্ত বিকৃত শব্দ উচ্চারিত হইবে। হিন্দীতেও এই শব্দের ব্যবহারে যথার্থ ঐকারের মান্য করা হয় না। বরং উচ্চারণের সময় "হ্যায়" এরূপ বোধ হয়। তথাপি লিখন প্রণালীর গৌরব রক্ষার্থে ঐরূপ লেখা হইল।

পুস্তকাধার।

ঐতিহাসিক রহস্য। প্রথম ভাগ। শ্রীরামদাস সেন প্রণীত ও শ্রীনিগাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। ইহাতে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, মহাকবি কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ, হেমচন্দ্র হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, বেদ প্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র এই কয়েকটী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তক খানি যদিও ক্ষুদ্র, কিন্তু বিলক্ষণ সারবান্। উল্লেখিত প্রস্তাব গুলির মধ্যে একটীও পরিত্যজ্য বা নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। রামদাস বাবু, বহরমপুরের বিখ্যাত যশা ভূম্যধিকারীর সন্তান, তিনি যে বিলাসানুরক্ত বান্ধবগণের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বদেশ হিত কামনায় ঈদৃশ মহৎ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সময় যাপন করিতেছেন, ইহা সমধিক গৌরবের বিষয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। তিনি যে স্বাক্ষর করণ নিযুক্ত আলস্যপূর্ণ লেখনীকে এত দূর কৃতকর্ম্মা করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে আমরা যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলাম। ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার ঈদৃশ উদ্যম যেন চিরস্থায়ী হয়।

দীক্ষাগুরু।

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎ পদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এখন তস্মৈ শ্রীগুরু কোথায় পাওয়া যায়? গৌতম ও গণপতি লুক্কায়িত হইয়াছেন, শাক্যদেব পৃথিবীতে নাই, মুসা ও য়িশা অন্তর্ধান করিয়াছেন, মহম্মদ, নানক, গোবিন্দ এবং চৈতন্য লোকান্তরপ্রাপ্ত, পৃথিবীতে এক্ষণে প্রকৃত দীক্ষাগুরু কোথায় অন্বেষণ করিব? দীক্ষাগুরু আবশ্যক নাই, এ কথা কেহ বলিতে দুঃসাহসী হইবেন না; কারণ পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই কোন না কোন প্রকারে দীক্ষা দান ও দীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। যাঁহারা দীক্ষা দান করেন, তাঁহারা গুরু, যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা শিষ্য অথবা সেবক।

গুরুর প্রতি শিষ্যদিগের সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি। গুরুরা মনুষ্য, কোনো দেশের কোনো শিষ্য এরূপ মনে করেন না। মনে করেন কিনা, ঈশ্বর জানেন, বাহিরে দেবতুল্য ভক্তি জানান। আমাদিগের দেশে গুরুশিষ্যের যে ভাব, কোন কোন দেশে তাহা অপেক্ষা উচ্চ। আমাদিগের দেশের শিষ্যেরা গুরুর প্রসাদে কর্ণমূলে এক একটী ইষ্টমন্ত্র প্রাপ্ত হন, সেই মন্ত্র প্রভাবে হৃদিপদ্মে এক একটী ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান হয়, সেই দেবতা সহস্রদলে সর্ব্বেশ্বরের আসন

পবিত্র করেন। ইষ্টবিশ্বাসে গুরুনর এদেশে গুরুদেব নামে পূজ্য হন। নারী, মূক, বধির, বিকলাঙ্গ এবং মূর্খ শিষ্যদিগের প্রতিনিধি হইয়া গুরুদেবেরা ইষ্টদেবতার পূজা করিতে পারেন, তাহাতে প্রত্যবায় হয় না, কিন্তু যথা সময়ে মন্ত্র গ্রহণ না করিলে প্রত্যবায় আছে। যদি দীক্ষিত হইবার অগ্রে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অসংশোধিত শরীর পবিত্র করিবার জন্য অন্তকালেও তাহার কর্ণে ইষ্ট নাম শুনাইতে হয়। দীক্ষা না হইলে স্ত্রীপুরুষ কাহারই দেহশুদ্ধি অথবা পবিত্র দেবকার্য্যে অধিকার হয় না। প্রত্যেক বংশেই এক এক জন কুলগুরু এবং এক একটী কুলদেবতা নির্দ্দিষ্ট আছেন।

শিরোনামে যে শ্লোকটী দেওয়া হইয়াছে, সেই মন্ত্রে গুরুদেবকে প্রণাম করিতে হয়। বড় দুরূহ পন্থা! যিনি ব্রহ্মপদ প্রদর্শন করেন, তিনি ব্রহ্ম জানিত সাধু পুরুষ। তাদৃশ পুরুষ জগতে দুর্ল্ভ।—দুর্ল্ভ পুরুষ অবশ্যই মানবজীবনের পরকালের গতি নির্দ্দেশ করিবার উপযুক্ত গুরু। যে মহাপুরুষ মহাগুরুকে চিনাইয়া দেন, তাঁহাকে প্রাকৃত মনুষ্য বলা ধৃষ্টতা। যে মহা পুরুষ এক সময়ে অগ্নিকে সর্ব্বভূতের অতিথি, সলিলকে অমৃত, জ্ঞানযোগকে সনাতন ধর্ম্ম এবং বায়ুকে সমুদায় জগৎ বলিয়া উপদেশ দিতেন, যিনি মঙ্গলের মধ্যে দাক্ষিণ্যকে, ধনের মধ্যে শাস্ত্রকে, লাভের মধ্যে আরোগ্যকে এবং সুখের মধ্যে সন্তোষকে উত্তম বলিতেন, যে মহাত্মা আনৃশংস্যকে

প্রধান ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্মকে সর্ব্বদা ফলবান্, মনঃসংযমকে শম দম ও অশোকের হেতু এবং সাধুর সহিত সন্ধিকে চিরস্থায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, কামনা এবং লোভ ত্যাগ যাঁহার ইষ্টমন্ত্র ছিল, সেই পুণ্যাত্মা সাধু পুরুষই "তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" মন্ত্রে প্রণম্য গুরু। তিনিই ধন্য, তিনিই সৎ এবং তিনিই ইহ-পর উভয় কালের মধ্যবর্ত্তী। এখন দেখানো হইল, দীক্ষাগুরু কতগুণের আকর হন। সংসারে তাঁহার কতদূর আস্থা, তাহাও দেখানো হইল। সময় ছিল, যে সময় এই প্রকার লক্ষণযুক্ত দীক্ষাগুরু মহাশয়েরা বঙ্গভূমির এক এক অংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সময় ছিল, যখন শিষ্য সেবক-দিগের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠাও অকপট উজ্জ্বল ছিল। এখন সময় আসিয়াছে, এ সময় বৈজ্ঞানিক ভূম্যাকর্ষণের ন্যায় উচ্চস্থ বস্তু অধোদিকে আকর্ষিত হইতেছে।

এ দেশের যে অংশে আমাদিগের বাস, সেই খণ্ডের মধ্যে কয়েকটী শ্রীপাট বহুদিন হইতে বিখ্যাত। ভাটভাড়া, কাঁটালপাড়া, বাগ্‌না পাড়া, মালপাড়া এবং খড়দহ। এই পাঁচটীর অতিরিক্ত আরও কয়েকটী শ্রীপাট আছে, তাহার তাদৃশ প্রসিদ্ধি নাই। দীক্ষাগুরুর বাসস্থান শ্রীপাট পাঠে লিখিতে হয়। কথিত পঞ্চ শ্রীপাটে অনেকগুলি গুরুদেব বাস করিতেন, আজিও করেন। তাঁহারা প্রভু, গোস্বামী, এবং ঠাকুর শব্দে পূজিত, গণিত এবং বর্দ্ধিত। সময় ছিল, যে সময় ঐ সকল শ্রীপাটের মধ্যে আমিষ প্রবেশ করিতে পাইত

না, ঠাকুরগোষ্ঠী সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ, স্নাত, পূত, সদাচারপরায়ণ, বিজিতেন্দ্রিয় এবং সত্যপ্রিয় ছিলেন। এখন অনেক অংশে বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, পৃথিবী শীতল, এবং সমুদ্র শান্ত ছিল, বায়ুমান যন্ত্র এমন সময় জানাইয়া দিল, পূর্ব্ব কোণে ঝড় উঠিবে। ঝড় আসিয়াছে! সাগরে প্রবল তরঙ্গ, বনস্পতি ছিন্নভিন্ন, গৃহদ্রুম চূর্ণায়মান! যেগুলি রক্ষা পাইয়াছে, তাহা হিম-কমল।

অনেক গুরুদেব আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা আজিও সদাচার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কালমাহাত্ম্যে উপহাসের ভয়ে অবসন্ন। আমরা কালমাহাত্ম্য বলিলাম কেন, এ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কেহ যেন আমাদিগকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান না করেন। আমরা এখন নিবীর্য্য হইয়াছি, যুদ্ধের উপযুক্ত বীরত্ব নাই। মধ্যে এক কোণে একখানি মেঘ উঠিয়াছিল, আমরা ভাবিয়াছিলাম, (যেমন ভাবি) সলিল বৃষ্টি হইবে। এক দল ভাবিয়াছিল, উল্কাপাত হইবে। চার্ব্বাকেরা বলিয়াছিল,—ফুঃ! ধূম্র বৃষ্টি হইবে! শেষে শেষ কথাই সত্য হইল; নেত্ররোধকারী ধূম্র বৃষ্টি হইয়া গেল! তাহার এক একটী অণুতে আমরা পাইলাম, "মনুষ্যের পাদপদ্ম পূজা করে বর্ব্বরে,—পরকাল মান্য করেও বর্ব্বরে।"

তবে কি পরকাল নাই?—কতক লোকের হৃদয়-সমুদ্রে এই দারুণ সংশয়-বায়ু ঘোর তরঙ্গ তুলিল। যদি পরকাল নাই, তবে আর কেন? এই সংশয়াকুল আনুমানিক তর্কে

অনেক শিষ্যের গুরুভক্তি ক্রমশঃ মরিচবিহীন কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল! গুরুদেবেরাও ক্রমে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তুলা-মানের একটী বাটী (পরিমাপক আধার) শূন্য অথবা লঘু হইলে পরিমেয় ধাতুর বাটী ঝুলিয়া পড়ে। এই প্রমাণে দুই দিকেই গোল হইল। শিষ্যে অভক্তি, গুরুতে হতাশ্বাস প্রবেশ করিল। যেখানে কিছু কিছু সম্বন্ধ থাকিল, সেখানেও মূলতত্ত্ব প্রায় শিথিল।—শিথিলতার মধ্যেও এখন দুটী শ্রেণী আছে। একটীতে পবিত্রতার ছায়া, আর একটীতে কলঙ্কের ছবি বিরাজ করে।—গুরুশিষ্য উভয় সম্প্রদায়েই দোষ আশ্রয় করিয়াছে। যে গুরুর ইষ্টমন্ত্রে কামনা ও লোভ বর্জ্জনের উপদেশ ছিল, সেই গুরু এখন লোভ ও কামনার ক্রীত দাস হইয়াছেন। যদি বাক্যপরম্পরায় অবিশ্বাস করা না যায়, তাহা হইলে আমরা বলিব, পার্থিব পরম দেবতা গুরু এক্ষণে শিষ্যের সহিত কেবল অর্থসম্বন্ধ মাত্র রাখিয়াছেন। শিষ্য যদি গুরুর অর্থলোভ চরিতার্থ করিতে পারে, তবে কৃপাপাত্র হয়, অসমর্থ হইলে অভিসম্পাতের পাত্র! অর্থের নিমিত্ত এক-জন পূজ্য গুরুর পুত্র এক্ষণে শিষ্যবাটীতে অতি হেয় কর্ম্মও করিতে পারেন। অধিক কথা কি, দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে একজন গুরু সামান্য স্বর্ণালঙ্কারের লোভে শিষ্যের একটী দুই বৎ-সরের পুত্রের জীবন নষ্ট করিয়াছিলেন!!! পেটিকা মধ্যে সেই শিশুর শবদেহ লুকাইয়া রাত্রিযোগে পলায়ন করেন। থানায় ধৃত হইলে দুর্গন্ধের কৈফিয়তে ইলিসমৎস্য বলিয়া-

ছিলেন ! তাঁহার রাজদণ্ড হইয়াছে বলা বাহুল্য। আর এক-বার এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যেই এক গুরুপত্নী আপন শিষ্যপত্নীর কণ্ঠহার চুরি করিয়া অশ্বকশা উপহার পাইয়া ছিলেন !

গুরুদেবদিগের কদাচারের সহিত কপটাচার আরম্ভ হই-য়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে পরমার্থ জ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু এখন অনেক গুরুবংশে মূর্খতা আধিপত্য করিতেছে। বেদব্যাসের বচন প্রমাণে মূর্খ হইলেই নাস্তিক হয়, নাস্তিক হইলেই মূর্খ হয়, সুতরাং মূর্খের কপটাচার অনিবার্য্য। এক একটী গুরুপুত্র আপন বাটীতে কালাপেড়ে ধুতি, কলের পৈতা, ইংরাজী বুট, আলবার্ট সিঁতি, এবং আতরাদি ঘ্রাণ ও পান অবশ্য গ্রাহ্য মধ্যে ধরেন ; যে শ্রীপাটে আমিষ প্রবেশ করিত না, সেখানে এখন এক এক প্রভুর বাটীতেও মৎস্য মাংস আদর প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু শিষ্যবাটীতে শূন্যপদ, রুক্ষকেশ, পট্ট-বস্ত্র, তুলসী বা রুদ্রাক্ষ মাল্য, স্বপাক নিরামিষ একাহার অব-লম্বন। এরূপ ছদ্মবেশ সচরাচর লোকে ভানুমতীর বাজীতেও দেখিবার আশা করেন না। এক একস্থানে এইরূপ, এক এক স্থানে অন্যরূপ প্রকাশমান। একদা আমরা এক প্রদেশস্থ গয়হড় শ্রেণীস্থ একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে শ্যামাপূজার নিম-ন্ত্রণে গিয়াছিলাম। এই পরিচয়েই পাঠক মহাশয় বুঝিলেন, তিনি শাক্ত, তাঁহার কুলদেবতা শক্তি।—পথে যাইবার সময় এক স্থানে দৃষ্ট হইল, দৃঢ় কটিবদ্ধ চারিজন ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে

দৌড়িয়া আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, সংক্ষেপে উত্তর পাইলাম, "ঠাকুর মশাই আসিতেছেন!"—কৌতূহল বৃদ্ধি হইল, প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দৃষ্ট হইল, আলুলায়িত দীর্ঘ কেশ, গণদেবতুল্য লম্বোদর, প্রায় বিবস্ত্র,ধূলায় ধূসর এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্কন্ধে লইয়া সেই চারিজন বাহক প্রত্যাগত হইতেছে। কে তিনি ? প্রশ্নোত্তর আবশ্যক নাই। একজন শাক্ত।—'অখণ্ড মণ্ডলাকারং'—ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চ্চনীয় পরম দেবতা ! এক এক জন শাক্ত কৌলের পরিবারে পদ্ধতি আছে, শ্যামাপূজার রজনীতে স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতি একত্র হইয়া গুরুদেবের সহিত মদ্যপান করেন। সুতরাং রাত্রিকালে ঐ গুরুদেবের অর্চ্চনা নাটকের শেষ অঙ্কের যেরূপ অভিনয় হইয়াছিল, লজ্জা ও ঘৃণা তাহা ব্যক্ত করিতে নিষেধ করে। বৈষ্ণবতন্ত্রের মধ্যেও এখন এক এক বাটীতে "রাধা শ্যাম" উপচারে যোগাচার হয় শুনা যায়।

গুরুদেবদিগের নিন্দা করিবার জন্য আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম না। যেরূপ ঘটিতেছে, তাহাই প্রসঙ্গাধীনে উদ্ধার করিতে হইল। বাস্তবিক দেহশুদ্ধির নিমিত্ত যদি মন্ত্রগ্রহণ আবশ্যক হয়, আর সেই মন্ত্র আদান প্রদানে যদি দীক্ষাগুরু প্রয়োজন থাকে, তবে সেই দীক্ষাগুরু এমনি হওয়া উচিত যে, যাঁহাকে মনোধ্বান্তারি আদিত্য বলিয়া সকলে পূজা করিতে পারেন।

কল্কিপুরাণ।

দ্বিতীয় অংশ।—চতুর্থ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ কল্কি অনুরক্ত নরপতিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এবং ক্রমে সংসারাসক্ত ও সংসার বিবেকীদিগের যেরূপ ধর্ম্ম কথিত আছে, তাহাও তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন।

তখন ভূপতিগণ ভগবান্ কল্কির বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরে তাঁহারা আপনাদিগের অতীত অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! মনুষ্যগণ কাহা দ্বারা, কিরূপে, স্ত্রী ও পুরুষ ভাব প্রাপ্ত হয়? আর বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এবং সুখ দুঃখই বা কিরূপে কোথা হইতে উপস্থিত হয়, ইহার কারণই বা কি? তাহা আপনি আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন, এবং অন্যান্য অনিশ্চিত বিষয় ও যাহা আমরা বিশেষরূপে জানি না, তাহাও বলুন। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ কল্কি অনন্ত নামক মুনিকে স্মরণ করিলেন।

তীর্থবাসী ব্রতধারী মুনিবর অনন্ত স্মরণ মাত্র, কল্কির দর্শনে মুক্তিলাভ হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সত্বরে তথায় আগমন করিলেন, এবং কল্কির নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব! আমারে কি করিতে হইবে এবং কোথাই বা যাইতে হইবে? আজ্ঞা করুন্।

মহাত্মা কল্কি মুনিবর অনন্তের সেই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, মুনে! আমি যাহা যাহা কহিয়াছি, তুমি সে সমুদায়ই

অবলোকন করিয়াছ, তোমার অবিদিত কিছুই নাই। দেখ, অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়া কেহই তাহার ফল লাভ করিতে পারে না। কল্কির এই কথা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ অনন্ত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া নরপতিগণ বিস্মিত মনে পদ্মপলাশনয়ন ভগবান্ কল্কিকে কহিলেন, ভগবন্! এই মুনিবর কি বলিলেন, আপনিই বা কি উত্তর প্রদান করিলেন, কি বিষয় লইয়া আপনাদিগের কথোপকথন হইল? আমরা তাহা শুনিতে একান্ত উৎসুক। মধুরিপু কল্কি নরপতিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখ, যে বিষয় লইয়া আমাদিগের কথোপকথন হইল, তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই প্রশান্তচিত্ত মহর্ষিকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা কর। রাজগণ কল্কির বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশ্নার্থ অবগত হইবার মানসে মুনিশ্রেষ্ঠ অনন্তকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! ধর্ম্মকঞ্চুক ভগবান্ কল্কির সহিত আপনার যে কথোপকথন হইল, উহা অতি দুর্ব্বোধ, ইহার কারণ কি? তাহা আপনি আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন্।

অনন্ত কহিলেন, পূর্ব্বকালে পুরিকানাম্নী পুরীতে বিদ্রুম নামে বেদবেদাঙ্গপারদর্শী, পরহিত-নিরত ধর্ম্মাত্মা এক মহর্ষি ছিলেন। তিনিই আমার পিতা। আর আমার মাতার নাম সোমা। তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা মাতার অধিক বয়সে আমার জন্ম হয়, কিন্তু প্রথমতঃ আমি ক্লীব ছিলাম। সুতরাং তৎকালে পিতা মাতা আমারে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত শোক করিতেন এবং লোকেও আমার আকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিত। পরে পিতা আমারে ক্লীব অবলোকন করিয়া দুঃখ, শোক ও ভয়ে আকুল হই-

লেন এবং গৃহপরিত্যাগ পূর্ব্বক শিব বনে গমন করিলেন। তিনি তথায় বিধানানুসারে ধূপ, দীপ ও অনুলেপন দ্বারা পূজা করিয়া দেবদেব শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, যিনি মঙ্গলপ্রদ, যিনি লোকের একমাত্র আশ্রয়, যিনি প্রাণীগণের আশ্রয়, বাসুকী যাঁহার কণ্ঠভূষণ, যাঁহার জটাজূটে ভাগীরথীর তরঙ্গরাজি বদ্ধ রহিয়াছে, সেই প্রগাঢ় আনন্দ-সন্দোহ দক্ষ দেবদেব শঙ্করকে নমস্কার করি! মঙ্গলদাতা মহাদেব পিতার এবম্বিধ নানাপ্রকার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া বৃষারোহণে আমার পিতৃসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া প্রসন্ন বদনে কহিলেন, বর প্রার্থনা কর। পিতা কহিলেন, দেব! আমার পুত্রটী ক্লীব হইয়াছে, এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। এই কথা শুনিবামাত্র দেবদেব মহাদেব আমার পুরুষত্ব প্রাপ্তিরূপ বরপ্রদান করিলেন, তৎকালে হরমোহিনী পার্ব্বতীও তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। আমার পুংস্ত্ব বর প্রাপ্ত হইয়া পিতা গৃহে প্রতিগমন পূর্ব্বক আমারে পুরুষাকার সম্পন্ন অবলোকন করিয়া আমার মাতার সহিত অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। তৎপরে দ্বাদশবর্ষ বয়সে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মহোৎসবে আমার বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। আমিও রূপগুণশালিনী মানিনী যজ্ঞরাত-তনয়ারে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বশীভূত হইয়া পরম পরিতুষ্ট মনে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে লাগিলাম। হে রাজগণ! কিছুকাল গত হইলে আমার পিতামাতা পরলোকগামী হইলেন। আমি বন্ধুবান্ধব ও ব্রাহ্মণগণকে লইয়া বিধানানুসারে তাঁহাদিগের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপন করিলাম। অনন্তর বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুরূপ ভোজন করাইয়া অবশেষে পিতা মাতার বিয়োগে একান্ত সন্তপ্ত হইলাম, এবং একান্ত মনে ভগবান্ বিষ্ণুর

আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান্ বিষ্ণু আমার জপ ও পূজাদি কর্ম্মে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বপ্নে আমারে কহিলেন, এই সংসারে স্নেহ মমতা প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, এ সমস্তই আমার মায়া। ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা, এইরূপ মমতায় যাহাদিগের মন নিতান্ত আকুল হয়, তাহারাই মদীয় মায়া প্রভাব-জনিত শোক, দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতির ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

ভগবান্ বিষ্ণুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাহার প্রতিবাদের নিমিত্ত উদ্যত হইলাম। আমাকে প্রতিবাদোন্মুখ দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম এবং পুরিকাপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণয়িনীর সহিত পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত বিষ্ণু ভবনে গমন করিয়া তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে এক পবিত্র আশ্রম নির্ম্মাণ করিলাম। অনুচরবর্গ আমার সমভিব্যাহারে ছিল, আমি ভার্য্যা ও তাহাদিগের সহিত সেই পবিত্র আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার মায়া সন্দর্শনের নিমিত্ত নৃত্যগীত ও জপ দ্বারা সেই শমনভয়-নাশন হরিকে নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলাম। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। দ্বাদশীর পারণাদিনে আমি বন্ধুগণের সহিত স্নান করিবার নিমিত্ত সাগরতীরে গমন করিলাম, এবং যেমন অবগাহনার্থ অবতীর্ণ হইলাম, অমনি ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, কোনমতেই উঠিতে সমর্থ হইলাম না। তৎকালে জলজন্তুগণ আমারে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। আমি একবার নিমগ্ন ও একবার ভাসমান হওয়াতে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্রমে জলহিল্লোলে বিচেতন হইয়া পড়িলাম, সুতরাং অঙ্গ সমস্তও অবশ হইল। তখন আমি বায়ুবেগ চালিত হইয়া জলধির দক্ষিণ কূলে উপনীত হইলাম। আমারে

তথায় মৃতবৎ পতিত দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা বৃদ্ধশর্ম্মা নামে পরম ধার্ম্মিক পুত্র-ধনসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনান্তে আমারে লইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন, এবং বহুবিধ যত্নে আমারে সুস্থ করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। হে রাজগণ! সেই স্থানে থাকিয়া আমি দিক্‌দেশ কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না; সুতরাং সেই বিপ্রদম্পতীকেই মাতাপিতা বিবেচনা করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে বৃদ্ধশর্ম্মা নানাবিধ উপায়ে আমারে বেদবিহিত ধর্ম্মে দীক্ষিত জানিয়া বিনয়ান্বিত হইয়া চারুমতী নাম্নী স্বীয় দুহিতার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। চারুমতী পরম সুন্দরী, তাঁহার বর্ণ উত্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল, এবং তিনি রূপ, গুণ ও শীলতা সম্পন্না। আমি সেই মানিনী চারুমতীকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তিনি আমারে বিধিমতে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। আমি সেই স্থানে বহুবিধ সুখ সম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে আমার ঔরসে চারুমতীর গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহাদিগের নাম জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ। আমি পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পন্ন হওয়াতে দেবগণপূজ্য দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সকলের পূজ্য ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইলাম। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুধের বিবাহার্থ উদ্যত হইলে, ধর্ম্মসার নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট মনে স্বীয় কন্যা প্রদান করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা আভ্যুদয়িক প্রভৃতি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাপন করিলেন। অলঙ্কৃত কামিনীগণ নৃত্যগীত বাদ্য দ্বারা প্রমোদিত করিতে লাগিল।

এদিকে আমিও পুত্রের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ, ও ঋষিতর্পণ করিবার মানসে সংযত মনে সমুদ্রতীরে গমন করিলাম।

কর্ম্ম সমাপন করিয়া জল হইতে উত্থান পূর্ব্বক যখন তথা হইতে আগমন করি, তখন দেখিলাম যে, সমুদ্রতীরে আমার পূর্ব্ব বান্ধবগণ স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন। হে নরপতিগণ! তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই উন্মনা হইলাম। পুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণগণকে বিষ্ণু সেবা ও দ্বাদশীর পারণা করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইলাম। আমার রূপ ও বয়ঃক্রমের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। পুরুষোত্তমবাসীগণ আমারে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, অনন্ত! তুমি অতিশয় বিষ্ণু-ভক্ত, তোমারে এরূপ ব্যাকুল দেখিতেছি কেন? তুমি জলে বা স্থলে কি কিছু দেখিয়াছ? আমাদিগের নিকট বল, তুমি বিস্ময় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারণা কর। আমি কহিলাম, হে জনগণ! আমি কিছুই দেখি নাই, কিছুই শুনি নাই। আমি অত্যন্ত কামমোহিত, আমার অন্তঃকরণ অতি নীচ, আমি ভগবান্ হরির মায়া সন্দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার মায়াপ্রভাবেই ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। আমি স্নেহ মোহের এরূপ বশীভূত হইয়াছি যে, কিছুতেই আর সুখী হইতেছি না। হায়! আমি যে কি পর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আর কি আশ্চর্য্য! আমি যে ভগবান্ হরির মায়ায় পতিত হইয়াছিলাম, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

এইরূপে স্ত্রীপুত্র, ধনাগার ও পুত্রের বিবাহ বিষয়ে আমার মন নিতান্ত অনুরক্ত হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতে লাগিলাম। সকল বিষয়ই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার মানিনী ভার্য্যা আমারে অবসন্ন ও মূঢ়ের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া, হায় অকস্মাৎ এ কি হইল, বলিয়া রোদন করিতে করিতে আমার অভিমুখে

আগমন করিলেন। আমি পুরুষোত্তমে আমার পূর্ব্ব স্ত্রীকে দেখিয়া ও অপরা স্ত্রীকে স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম। এমন সময় এক পরমহংস হিত বচনে আমারে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তিনি ধীর, সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ, পূর্ণ, ও পরম ধার্ম্মিক। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, প্রশান্ত মূর্ত্তি, দান্ত, শুদ্ধ ও শোকনাশন। আমার আত্মীয় বন্ধুগণ পরমহংসকে আমার সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহারে পূজা করিয়া আমার মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অংশের চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অংশ।—পঞ্চম অধ্যায়।

পরমহংস যথোপযুক্ত ভিক্ষা করিয়া উপবিষ্ট হইলে পুরুষোত্তম বাসীগণ আমার আরোগ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমহংস তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, অনন্ত! তুমি, প্রণয়িনী চারুমতী, বুধ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র, সৌধশ্রেণী বিরাজিত বিবিধ ধনরত্নসমন্বিত বিচিত্র ভবন পরিত্যাগ করিয়া কখন এখানে আগমন করিলে? তুমি কি অদ্য এখানে আসিয়াছ, না পুত্রের বিবাহ দিনে আসিয়াছ? আমি আজও তোমারে সমুদ্র কূলে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি, তত্রত্য ধর্ম্মাত্মা লোকেরা সকলেই তোমারে সমাদর করিয়া থাকেন। আজ তুমি আমারে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, কিন্তু দেখিতেছি, তুমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া এখানে আসিয়াছ, আর তোমার অন্তঃকরণও শোকে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে। হে মহাত্মন! তুমি পূর্ব্বে যেখানে বাস করিতে সেখানে

তোমারে দেখিয়াছি, তুমি সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক, কিন্তু এখানে তুমি কিরূপে ত্রিংশৎবর্ষীয় যুবা হইলে? যাহা হউক, আমার এ বিষয়ে অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। আরও দেখিতেছি, এই রমণী তোমার একান্ত অনুরক্তা ভার্য্যা! কৈ, আমি ত ইহাঁকে তথায় দেখি নাই! কি আশ্চর্য্য! আমিই বা কোথা হইতে কিরূপে এখানে আসিলাম? কেই বা আমারে এখানে আনিল? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি সেই অনন্ত, না আর কেহ? আমিই বা কে? আমি কি সেই ভিক্ষুক, না আর কেহ? আমাদিগের এই সংযোগ ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইতেছে। এস্থলে আমাদিগের পরস্পরের কথোপকথন বালক ও উন্মত্তের কথোপকথনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, কারণ তুমি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমী,আর আমি একজন পরমার্থ-চিন্তাপরায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। হে ব্রহ্মন্! আমার বোধ হইতেছে, ইহা জগৎপাতা ভগবান বিষ্ণুরই ত্রিভুবনমোহিনী মায়া প্রভাবে সংঘটিত হইতেছে। সামান্য জ্ঞান দ্বারা ইহা অনুভূত হইবার নহে, অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিলে ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। হে রাজগণ! পরমহংস আমারে এই কথা বলিয়া বিস্ময়াবিষ্ট মনে মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি ভবিষ্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

তুমি দেখিয়াছ, প্রলয়কালে পরম পুরুষের উদরমধ্যে যে মায়া অবস্থিতি করিয়াছিল, সেই মায়াই পথস্থিতা গণিকার ন্যায় সকলকে বিমোহিত করিয়া থাকে, এবং সেই মায়াই ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেই মায়াই অশেষবিধ সন্তাপদায়িনী, এবং সেই মায়াই মনুষ্যগণকে মিথ্যামর সংসারে ভ্রমণ করাইতেছে, কিছুতেই তাহার ধ্বংস নাই। প্রলয়কালে ত্রিভুবন লয় প্রাপ্ত হইলে

চতুর্দ্দিক আলোকশূন্য হওয়াতে এবং দিক্‌দেশ কালের কিছুমাত্র চিহ্ন না থাকাতে পরব্রহ্ম ত্রিভুবন স্থষ্টির অভিলাষে তন্মাত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই অংশে বিভক্ত হন। পরে কাল সহকারে পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে মহত্তত্ত্ব সমুৎপন্ন হয়। সেই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারতত্ত্বই গুণত্রয়ে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে উৎপাদন করে। অনন্তর সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরই এই ত্রিভুবনের স্থষ্টি করেন। প্রথমতঃ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে গুণত্রয়যুক্ত পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। ফলতঃ পুরুষ প্রকৃতির সংযোগেই এইরূপ স্থষ্টি হয়, পরে দেবতা অসুর মনুষ্য এবং ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর সম্ভূত অন্যান্য জীবজন্তু ও পদার্থ সকল সমুৎপন্ন হয়। জীবগণ পরমাত্মার মায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া নিরন্তর সংসারে লিপ্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে, আপনার মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। আহা! মায়ার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ব্রহ্মাদি দেবগণও নাসাবিদ্ধ বৃষের ন্যায় ও রজ্জু বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এই মায়ার বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন। যে মুনীশ্বরগণ বাসনারূপ নক্র-প্রসবিনী গুণময়ী মায়ানদী পার হইতে অভিলাষী হন, পৃথিবী মধ্যে তাঁহারাই যথার্থ অর্থ-তত্ত্বজ্ঞ ও সার্থক জন্মা।

শৌনক কহিলেন, মার্কণ্ডেয় বশিষ্ঠ বামদেব ও অন্যান্য ঋষিগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? আর অনন্তের বাক্য শ্রবণতৎপর নরপতিগণই বা এই আশ্চার্য্য কথা শুনিয়া কি বলিলেন? হে সূত! তুমি এই সকল ভবিষ্য কথা বর্ণন কর। শৌনকের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সূত তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া শোকমোহ নাশন তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় কথা পুনর্ব্বার সবিস্তরে বর্ণন করিতে লাগিলেন।

আফগানস্থান।

আসিয়াখণ্ডের প্রথিত দেশসমূহের মধ্যে আফ্গানস্থান, সাধারণতঃ কাবুল রাজ্যের নাম চিরপ্রসিদ্ধ আছে। উক্ত রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন কালাবধি নিকট সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ইতিহাস অনুসারে আর্য্য জাতি উক্ত দেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন কালে ব্যাক্‌টীয়া, পারথিয়া ও হুন রাজ্য এই দেশের সীমাবর্ত্তী ছিল। সেই সকল রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যঘটিত সন্ধি ছিল। পরে যবনরাজ্য আরম্ভ হইলেও উক্ত দেশ হইতে দিগিজয়ী বীরপুরুষেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। গজনির মহম্মদ ও ঘোরের মহম্মদ ভারতরাজ্য আক্রমণ করিয়া যে সকল উৎপাত করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকদিগের মনে এখনো জাগরূক রহিয়াছে। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য সংস্থাপক বাবর বাদশাহও এই দেশের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অধুনা ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় রাজ্য সংস্থাপন হওয়ায় উক্ত দেশের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, উক্ত দেশে কি হইতেছে, জানিবার নিমিত্ত সংবাদপত্রের পাঠকসমূহ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আফ্গানস্থানের সহিত রাজকীয় বিষয়ে আমাদিগের এইরূপ নিকট সম্বন্ধ। বাণিজ্যবিষয়

অনুধাবন করিলে আরও নৈকট্য দৃষ্ট হয়। উক্ত দেশ হইতে আনীত দ্রব্য আমরা উপাদেয় বলিয়া জ্ঞান করি। সুখদ ভোজ্যের সহিত বাদাম পেস্তা মিশ্রিত না করিলে আমাদিগের প্রীতিপ্রদ হয় না। পীড়িত অবস্থায় মুনক্কা ও কিশমিশ আমাদিগের সুপথ্য। উক্ত দেশের দ্রাক্ষা ভক্ষণ না করিলে এতদ্দেশের ধনীদিগের ভোজনে রুচি হয় না। যেরূপ ভারতবর্ষ চীনদেশীয়দিগকে অহিফেন প্রদান করিয়া প্রণয়পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ আফ্‌গানস্থান আমাদিগকে অনেক বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব এরূপ দেশের অল্পমাত্র বর্ণন এ স্থলে অনুপযুক্ত বোধ হইবে না।

আফগানস্থান তাতার দেশের পর্ব্বত শ্রেণী হইতে প্রায় আরব্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও সিন্ধু নদ হইতে পারস্য দেশ পর্য্যন্ত ইহার সীমা। ইহার পূর্ব্ব দিকে পঞ্জাব দেশ, দক্ষিণে সিন্ধু ও বেলুচিস্থান, পশ্চিমে পারস্য দেশ ও উত্তরে স্বাধীন তাতার। এইরূপ চতুঃসীমা-বদ্ধ দেশ আফগানস্থান নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পরিধি ১২৫,০০০ বর্গ ক্রোশ। এ দেশের অধিকাংশই পার্ব্বতীয় ভূমি। পূর্ব্বদিকে উপন্যাসপ্রসিদ্ধ সুলেমান পর্ব্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই অদ্রি আফগানস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী। উত্তর দিকে হিন্দুকুশ পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। এই পর্ব্বত হিমালয় পর্ব্বতের এক অংশ বলিয়া বিখ্যাত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিমাংশে আর এক শ্রেণী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, তাহা পারোপারনিসান অদ্রি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের এক একটী শৃঙ্গ অতি উচ্চ। তাহা হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ অপেক্ষা অধিক ন্যূন হইবে না। [illegible] এই [illegible] পর্ব্বত চিরকাল তুষারে আবৃত থাকে। এদেশে নদীর

সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু তাহা সমস্তই পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র নদীর ন্যায়। সকল সময়ে জল থাকে না। কোন কোম নদী মহা তীব্রতার সহিত পর্ব্বত হইতে নিঃসারিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়,কিন্তু কিছু ব্যবধানে তাহাদিগের আর চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। বর্ষাকালে সকল নদীরই মহা বেগ হয়। এদেশের বিখ্যাত নদী সমূহের নাম এই—কাবুল, কুরুম, হেলমন্দ, ক্ষুরুদ, গোমাল এবং লোরা। কাবুল নদী কাবুল নগরের ত্রয়োদশ ক্রোশ দূরস্থিত এক পর্ব্বতাংশ হইতে বাহির হইয়াছে। উক্ত নগরের অদূরে ঘোসবন্দ ও পঞ্জশর নদীদ্বয় ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। জলালাবাদ নামক স্থানে বিলুর টাগ পর্ব্বত শ্রেণীর পুষ্টিকর অংশ হইতে কাশগড় নামক নদী উত্থিত হইয়া কাবুল নদীতে মিলিত হইয়াছে। কাবুল নদী আতক নগরের প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরাংশে সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়াছে। হেলমন্দ নদী পশ্চিমবাহিনী। প্রাচীনেরা ইহাকে হরমানড্রস কহিতেন। হেলমন্দ নদী প্রায় একশত ক্রোশ পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বস্থিত ভূমি উর্ব্বর করিয়া জারা নামক জলাশয়ে মিলিত হইয়াছে।

ভূগোলের কটিবন্ধ নিয়মানুসারে এদেশের জলবায়ু উষ্ণ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী থাকাতে এপ্রদেশের উষ্ণতা অধিক নহে। ঋতু অনুসারে এখানে কখন কখন গ্রীষ্ম অধিক হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে শীতেরও আধিক্য হয়। এই দেশের উষ্ণ ভাগে এক প্রকার ভয়ানক বায়ু সময়ে সময়ে বহিয়া থাকে। তাহাকে সিমুথ কহে। এই বায়ু সদ্য প্রাণনাশক। যদিও ইহা অতি অল্পক্ষণ প্রবাহী হয়, তথাপি যে কোন ব্যক্তি এই বায়ু সেবন করে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ জীবন ত্যাগ করিতে হয়। এই বায়ু বহিবার পূর্ব্বলক্ষণ দর্শন করিয়া সকলেই স্ব স্ব জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত

নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে। এই বায়ু বহিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকের আকাশ পীতবর্ণ হইয়া উঠে। বায়ুতে এক প্রকার গন্ধক মিশ্রিত দুর্গন্ধ অনুভূত হয় এবং ভূগর্ভ হইতে একপ্রকার শব্দ উত্থিত হয়। তৎপরেই বালুকা রেণু মিশ্রিত মহা উত্তপ্ত বায়ু বহিতে থাকে। এই বায়ু গাত্রে লাগিলেই নানা পীড়া উৎপাদন করে ও শরীর ক্ষীণ করিয়া তুলে, অনেক সময়ে জীবন নাশও করে।

বর্ষা আরম্ভ হইলেই প্রকৃতি সতীর নূতন রূপ দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মের আর লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। বৃক্ষ সকল পুষ্পিত ও ফল ধারণ করিতে থাকে। সেই সময় এই দেশ দৃষ্টব্য রূপ ধারণ করে। এখানে গোধূম, যব, তণ্ডুল, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু, হরিদ্রা, আর্দ্রক, খর্জ্জূরাদি নানা প্রকার ফল উত্তম ও বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখানে স্বর্ণখনি নাই, কিন্তু কোন কোন নদীর তীরে বালুকার সহিত সুবর্ণরেণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। পার্ব্বতীয় লবণ এ প্রদেশে অনেক জন্মিয়া থাকে। কোন কোন প্রকারের মূল্যবান প্রস্তরও এদেশে উৎপন্ন হয়।

বৃক্ষ।

জগৎস্রষ্টার যে মহিমা, তাহা মনুষ্যবুদ্ধি কোনক্রমেই উপলব্ধি করিতে পারে না। যে বিষয়ের প্রতি অনুধাবন করা যায়, তাহা হইতেই নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা যদি নিতান্ত সূক্ষ্ম অণুর পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলেও এমত অদৃষ্টপূর্ব্ব কৌতুক সকল প্রকাশিত হইতে থাকে যে, তাহাতে বুদ্ধির সীমা সূচিত হয়, এবং পরমপিতাকে ধন্যবাদ প্রদান ব্যতিরেকে মনুষ্য অন্য কোন বুদ্ধির চালনা করিতে সমর্থ হয় না। আমরা অদ্য বৃক্ষের কৌতুক দর্শন কবিতে অভিলাষী হইয়াছি। ভরসা করি, পাঠক মহাশয়েরাও আমাদিগের সমভিব্যাহারী হইবেন। যেরূপ জঙ্গম জীবসমূহের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কাল নিরূপিত আছে, তদ্রূপ স্থাবর পদার্থেও দৃষ্ট হয়। কোন কোন জীব এক দিবস মাত্র জীবিত থাকে, কেহ বা এক বৎসর কাল দৈহিক সুখ ভোগ করে। কেহ বা মনুষ্য ও হস্তীর ন্যায় শত বৎসর পর্য্যন্ত জগৎমণ্ডলে বিচরণ করে, কেহ বা তিমি মৎস্যের ন্যায় তিন চারি শত বৎসর সংসারসমুদ্রে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। তদ্রূপ বৃক্ষজাতিতেও দৃষ্ট হয়। কোন কোন বৃক্ষ বৎসরের নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে উৎপন্ন হইয়া পুষ্পিত ও ফলবান হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কোন কোন বৃক্ষ জলীয় স্থানে, কোন বৃক্ষ শুষ্ক স্থানে পল্লবিত হয়। শীত ও উষ্ণতা গুণেও বৃক্ষের তারতম্য ঘটে। বৃক্ষের মূল হইতে কি প্রকারে স্নেহ আকর্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ তরুবরের পুষ্টিপ্রদ হয়, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। বৃক্ষের দীর্ঘজীবনীর বার্ত্তাই এই

স্থলে প্রকাশ করিলে পর্য্যাপ্ত হইবে। বৃক্ষতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নানা দেশীয় পাদপ সমূহের পরীক্ষা করিয়া বৃক্ষের জীবনের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জঙ্গম অপেক্ষা স্থাবর পদার্থের স্থিতির কাল অধিক। বৃক্ষ সমূহের জীবনের কাল জন্তুদিগের অপেক্ষা গড়ে অধিক। কোন কোন জাতীয় বৃক্ষের জীবন কাল নির্ণয় করণের সহজ নিয়ম আছে। বৃক্ষের স্থাণুভাগ সমান রূপে খণ্ডন করিতে হয়। অর্থাৎ স্থাণুভাগটীকে অবিকল একটী "ঢোলকের" ন্যায় কর্ত্তন করিয়া তাহার মধ্যে চক্রাকার যে সকল রেখা পরিধিরূপে দৃষ্ট হয়, তাহা সূক্ষ্মরূপে অণুবীক্ষণ দ্বারা গণনা করিলে বৃক্ষের বৎসর সংখ্যা অবগত হওয়া যায়। কারণ সেই সকল জাতীয় বৃক্ষে প্রতিবৎসর একটী মাত্র করিয়া পরিধি রেখা বৃদ্ধি পায়। ইতিহাস, প্রবাদ এবং অন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াও অনেক বৃক্ষের কাল স্থির করা হইয়াছে। "চেসনট" নামক বৃক্ষ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। "ইউ" ও "ওক" বৃক্ষ ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী। "এটনা" নামক আগ্নেয় পর্ব্বতের উপর কয়েটী "চেসনট" বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে বৃহৎটীর স্থাণুর পরিধি প্রায় ৬০ হাত হইবেক এবং পাঁচ সহস্র বৎসর হইল উক্ত বৃক্ষ সমূহ জীবিত রহিয়াছে। তুর্কদিগের রাজধানী ইস্তম্বোলের নিকট একটী "প্লেন" বৃক্ষ আছে, তাহারও বয়ঃক্রম প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর হইবেক। জেরূসেলামের "অলিব পর্ব্বতের" উপর কয়েকটী জলপায়ের বৃক্ষ আছে, তাহা আট শত বৎসর পূর্ব্বেও এইরূপ ভাবেই পল্লবিত ছিল। ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ের নামক জেলাতে কোন বিখ্যাত ভজনাগারের নিকট একটী "ইউ" বৃক্ষ আছে, উক্ত বৃক্ষ ১১৩২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন বলিয়া পরিচিত ছিল। ইংলণ্ডের অন্য অন্য স্থানেও প্রাধান প্রধান "ইউ" বৃক্ষ আছে। ভারতবর্ষে বট, অশ্ব-

থাদি বৃক্ষ দীর্ঘজীবী বলিয়া পরিচিত আছে। নর্ম্মদাতীরে "কবীর-বট" নামে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। ইহা অতি প্রাচীন, বিখ্যাত কবি মিল্টন ইহার প্রশংসা লিখিয়া গিয়াছেন। ভাগলপুরের নিকট গঙ্গাতীরে আর একটী প্রাচীন বট বৃক্ষ আছে। "সুন্দর বনের" অনেক বৃক্ষ দুই তিন শত বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। হিমাচলের উপত্যকায় অনেক প্রাচীন বৃক্ষ আছে, কিন্তু কাল নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে সেই সকল বৃক্ষের বয়ঃক্রম উল্লেখ করিবার কোন উপায় নাই। ড্রাগন বৃক্ষ ছয় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

জলপাই বৃক্ষ	দুই সহস্র বৎসর
ওক বৃক্ষ	ষোল শত বৎসর
জম্বীর সময়ে সময়ে	সহস্র বৎসর জীবিত থাকে
আকরোট বৃক্ষ	নয় শত বৎসর
নারাঙ্গা বৃক্ষ	ছয় শত বৎসর

সমুদ্রের উপকূলস্থ তাল বৃক্ষ প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। বৃক্ষকৌতুকের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে দুইটী অপূর্ব্ব বৃক্ষের কথা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। প্রথমটী "ব্রেডফ্রুট" অথবা রোটীকা ফলের বৃক্ষ। ইহা স্থির সমুদ্রের নানা দ্বীপে উৎপন্ন হয়। ইহা "কাঁঠাল" জাতীয় বৃক্ষ। যেরূপ কাঁঠালের কোষ হয়, ইহারও তদ্রূপ হয়। দ্বীপবাসীরা তাহা অগ্নি সংযোগ করিয়া ভক্ষণ করে। এই অবস্থাতে উক্ত ফল "পাউণ্ড রোটীকার" ন্যায় দৃষ্ট হয়। ইহার অস্থিও (আঁটী) ভক্ষণ করিবার যোগ্য। কিন্তু তাহা বিশেষ সুস্বাদু হয় না। দ্বিতীয় অপূর্ব্ব বৃক্ষের নাম "কাউ ট্রি" অথবা 'গোবৃক্ষ'। হম্বোল্ট সাহেব নিজের ভ্রমণবৃত্তান্তে

ইহার উত্তম বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত বেনিজোয়েলা প্রদেশের শুষ্ক ভূমিতে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ইহার পত্রাদি প্রায় সকল সময়েই শুষ্ক থাকে। ইহার মূল ভূমি নিহিত বোধ হয় না। সাধারণ দৃষ্টিতে দর্শন করিলে বোধ হয় যেন, একটী শুষ্ক বৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কিন্তু যদি লৌহদণ্ড দ্বারা বৃক্ষের নিম্নদেশে একটী ক্ষত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই স্থান হইতে দুগ্ধের ন্যায় শুক্ল এক প্রকার রস বাহির হইতে থাকে। তাহার প্রবাহও দুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালেই এই বৃক্ষজ দুগ্ধের অধিক পরিমাণ বাহির হয়। সেই সময়ে দেশীয় ব্যক্তি সকল তথায় পাত্র লইয়া উপস্থিত হয় এবং দুগ্ধপান করিতে থাকে। কেহ শিশু-দিগকে প্রদান করিবার নিমিত্ত পাত্র পূর্ণ করিয়া বাটীতে লইয়া যায়। দিবা অধিক হইলে পর দুগ্ধের বর্ণ মলিন হইতে থাকে। এমন কি, রৌদ্রের উত্তাপে এককালে পীতবর্ণ হইয়া উঠে এবং ঘন হইয়া যায়। এই বৃক্ষের ফলও উত্তম হয়। কিন্তু ইহার দুগ্ধের ন্যায় সুস্বাদু ও সদ্গন্ধ যুক্ত হয় না। জগৎস্রষ্টার কি কৌশল! অসভ্য জাতিদিগকে দুগ্ধ পান করাইবার নিমিত্ত বৃক্ষরূপে গাভী সকল স্থাপন করিয়াছেন! এরূপ বৃক্ষ দর্শন করিয়া যে, মনুষ্য মাত্রেরই আশ্চর্য্য বোধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এতদ্দেশীয় তাল বৃক্ষ ও খর্জ্জূর বৃক্ষ বিদেশীয়দিগকে আমোদিত করে। এই বৃক্ষদ্বয়ের প্রাতঃকালীয়

দু ও পুষ্টিকারক। নারিকেল ফলেরও প্রশংসা অধিক। বৃক্ষের

খাদ্য দ্রব্য এবং পানীয় সুস্বাদু জল পরম পিতা স্থাপন

ছন, ইউরোপ নিবাসীরা সে সুখ অনুভব করিতে সমর্থ

উষ্ণ প্রধান দেশের কষ্টও অধিক এবং সুখও অধিক।

পূর্ণ-শশী।

পত্রিকা আবার হাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা পূর্ণ ! তুমি রাজপুত্রকে দেখিয়াছ ? পূর্ণ শশী কথা কহিলেন না। পত্রিকা সরিয়া বসিয়া পূর্ণ শশীর দুখানি হাত ধরিলেন। চিবুকে অঙ্গুলি দিয়া, মুখখানি তুলিয়া, মধুর বচনে কহিলেন, "দোষ কি ? লজ্জা কি ? তুমি কি রাজকুমার শশীন্দ্রশেখরকে দেখিয়াছ ?"

'মনে পড়ে না,—চক্ষের পলক মাত্র ;—সে স্বপ্ন।'—অতি মৃদুস্বরে সলজ্জভাবে এই উত্তর দিয়া পূর্ণশশী পুনর্ব্বার মুখখানি অবনত করিলেন। যেন উষাকালের চন্দ্র অথবা গোধূলি লগ্নের পদ্মের ন্যায় শোভা হইল।

পত্রিকা রহস্য করিবার জন্য কহিলেন, রাজকুমার তোমারে দেখিয়াছেন ? এ প্রশ্নে পূর্ণশশীর মৃদু উত্তর 'জানি না।'

কথা ঢাকা দিয়া পত্রিকা কহিলেন, রাজকুমার পত্র লিখিয়াছেন, আমাদের এখান হইতে লক্ষ্মণাবতী নগরে যাইতে হইবে। সেখানে বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, লোকজন আসিয়াছে, তিনি নিজেও শীঘ্র তথায় আসিবেন, আমাদেরও শীঘ্র রওনা হইতে লিখিয়াছেন। অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালেই যাত্রা করিব। রাজা রাজ্‌ড়ার হুকুম তামিল করা বড় শক্ত কথা।

'রাজা রাজ্‌ড়ার হুকুম তামিল করা বড় নিগ্রহ।'—দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে এই কটী কথা বলিয়া পূর্ণশশী আবার কহিলেন, দেখ পত্রিকে ! আমি ভাই তোমাদের রাজপুত্রের হুকুমে আর জপমালার মত বারবার ঘূরিতে পারি না। একবার পাটনা, একবার এলাহাবাদ, একবার লক্ষ্মণা, আবার কাশ্মীর, আবার এখানে, আবার সেখানে ঘূরাঘূরি করা আমার কর্ম্ম নয়। তুমি একজন লোক দাও, আমি নিত্যকামীরে লইয়া পিতার

আশ্রমে যাই। তোমাদের রাজপুত্রকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিও, বনবাসিনী বনে গিয়াছে, আপনি নিরুদ্বেগে রাজত্ব করুন। আর তাঁরে এ কথাও বলিও, তিনি যেন আমারে ভুলিয়া যান। আমিও তাঁরে ভুলিলাম, এ কথাটীও জানাইও। আমার বিবাহে প্রয়োজন নাই, আমি রাজরাণী হইব না। আরো আমার জন্য তাঁর যত কষ্ট হইল, যত ক্লেশের কারণ আমি, সে অপরাধে ক্ষমা চাই। অবলা বলিয়া যেন ক্ষমা করেন, এ কথাটীও বলিও।

'কেন ভাই শাপ দাও। তুমি ব্রাহ্মণের কন্যা, আশীর্ব্বাদ—না না,—মঙ্গল কামনা কর, শাপ দিও না; ব্রাহ্মণের কি অপরাধ আছে? ও কথা কি মুখে আনিতে আছে? তাহাতে যে, রাজপুত্র অপরাধী হইবেন, তাঁর যে অকল্যাণ হইবে, অমন কথা বলিতে নাই; আর তোমারে জপমালার মত ঘূরিতে হইবে না, সময় নিকটে আসিয়াছে।' হাসিতে হাসিতে এই পর্য্যন্ত বলিয়া পত্রিকা মধুর বচনে আবার কহিলেন, ওরে আমার সরলা রে! ওরে আমার সরলা! চির দিন বনে থাকা, জপমালা বই আর কিছুই জানেন না!—

আ মরি সরলা বালা, তপোধন বালা!
জপমালা হইয়াছে, শুধু জপমালা॥

'তা ভাই আমি আর কি জানি? হরিণছানাগুলি নাচে, পাখী-গুলি ডালে বোসে গীত গায়, আর পিতা আমার চক্ষুমুদিত করিয়া মালাগুলি জপেন, তাই দেখি, তাই জানি।'

অবনত মস্তকে পূর্ণশশী এই কথাগুলি বলিলেন। পত্রিকা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য মুখে কহিলেন, আমিও সেই কথা বলিতেছি।

পূর্ণশশীর শশীমুখ একটু উজ্জ্বল হইল। কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধনয়নে

পত্রিকার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, পত্রিকে! তুমি কখন কি বল, আগে ভাবিয়া দেখ না। রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিতেছিলে! বল দেখি, সেটী তোমার কোন্ বুদ্ধির কথা?—আমার ব্রহ্মচারী পিতা এ কথা শুনিলে কি মনে করিবেন? কাশ্মীরের রাজকুমার একজন দেবতা বিশেষ, এক দেশের রাজ্যেশ্বর, আর আমি একজন সন্ন্যাসীর মেয়ে, আমি কি তাঁরে আশীর্ব্বাদ করিবার যোগ্য? আর তিনি আমার অপেক্ষা অনেক বড়।

পত্রিকা উচ্চ হাস্য করিলেন। কহিলেন,—বড়?—তাহাতে কি দোষ? ক্ষত্রিয় রাজপুত্রেতে আর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের কন্যাতে অমন হইতে পারে; অমন হইয়া থাকে!

পূর্ণশশী রহস্য বুঝিতে পারিলেন। উত্তর দিলেন না, লজ্জায় নেত্র নিমীলন করিয়া বদন নত করিলেন। পত্রিকা সেই ভাব নিরীক্ষণ করিয়া রহস্যে নিরস্ত হইলেন। কহিলেন, অভিমানিনি! অন্যমনস্ক হইও না, যুবরাজের পত্র শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে তোমারে আর জপমালার ন্যায় ঘূরিতে হইবে না, পুনরায় বনবাসে যাইতেও ইচ্ছা থাকিবে না।

কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায় পূর্ণশশী সম্মতি দিলেন, পত্রিকা পত্রিকা পাঠ আরম্ভ করিলেন, পূর্ণশশী একমনে শুনিতে লাগিলেন।

রাজপুত্রের পত্র।

(হিন্দির অর্থ।)

" নবকুসুমসুন্দরী গন্ধর্ব্বরাজকুমারী

শ্রীমতী পত্রিকাসুন্দরী দেবী

করকমল পল্লবেষু।

জনরঞ্জিকে পত্রিকে!

তোমারে একটী সমাচার পাঠাই, স্পর্শমাত্র শীতল বোধ না হইলেও অশুভ মনে করিও না। গুরুদেবের কৃপায় এই সমাচার আমাদিগের পক্ষে শুভ সমাচার হইবে। শুনিয়াছি, নীলগিরির গুহাশ্রমী পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সদাশিব ব্রাহ্মচারী ঠাকুর আমার প্রতি,—আমাদের বংশের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তদীয় অনূঢ়া কন্যাটীকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই তপস্বীপুত্রীর হৃদয় তোষণের জন্য আমি তোমারে পাটনায় পাঠাইয়া আর একবার দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলাম। তথা হইতে আরও তিন চারিটী নগর দর্শন করিয়া সম্প্রতি রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি পূর্ণশশীর তৃপ্তি সাধনে আমার আশানুরূপ যত্নবতী আছ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। প্রয়াগে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব লিখিয়াছিলাম, পারিলাম না, এখানে আসিয়া এক নূতন ঝঞ্চটে পতিত হইয়াছি। পিতা মহারাজ কি একটী

সামান্য অপরাধ করিয়াছিলেন, আমাদের মহারাজ বাহাদুর তাহাতে মহা রাগত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।—আমি—

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া পূর্ণশশী চম্‌কিয়া উঠিলেন। সংশয়াকুল হৃদয়ে কহিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তোমাদের মহারাজই মহারাজ, এই আমি জানি, আবার মহারাজ বাহাদুর কে?

পত্রিকা কহিলেন, আমাদের মহারাজ, মহারাজ বটেন, কিন্তু তিনি কাশ্মীর রাজ্যের অধীশ্বর নহেন। তিনি প্রধান অধিপতির অধীন নরপতি। মহারাজ বাহাদুরকে তিনি কর দেন।

পূর্ণশশী কহিলেন, ভাল, বুঝিলাম, পাঠ করিয়া যাও, দেখি, শেষে কতদূর যায়। পত্রিকা আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"আমি সেই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মহারাজের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। বিনয় পূর্ব্বক ক্ষমা যাচ্‌ঞা করিতে লজ্জা বোধ করি নাই, কিন্তু মহারাজ বর্গ মানিলেন না। তিনি আমারে স্নেহ জানাইয়া কহিলেন, তুমি ঐ সিংহাসনে রাজা হও, তোমার কৃতঘ্ন পিতা এ রাজ্যে বাস করিবার উপযুক্ত নহে। আমি করযোড় করিয়া কহিলাম, মহারাজ! কৃতঘ্নের পুত্র অকৃতঘ্ন হইলেও পিতার অপমান সহ্য করিতে পারে না, পিতাকে ত্যাগ করাও অকৃতঘ্ন পুত্রের উচিত হয় না। অতএব ক্ষমা হুকুম হয়, আমিও অদ্যাবধি কৃতঘ্ন হইলাম। আপনি আমাদিগের রাজ্যধন সমস্ত গ্রহণ করুন, আমরা সপরিবার দেশত্যাগ করি। মহারাজ মহাক্রুদ্ধ হইয়া তথাস্তু বলিয়াছেন। এখন আমার—

বাধা দিয়া পূর্ণশশী জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে যে, তুমি পত্রিকে! তবে যে, তুমি বলিতেছ, তৃতীয় দিবস প্রভাতে লক্ষ্মণাবতী যাত্রা করিতে হইবে, এর ভাব?

'স্থির হও, শোনো, রাজকুমার আরো কি লিখিয়াছেন।' এই কথা বলিয়া পত্রিকা পুনরায় পাঠ গ্রহণ করিলেন।

"এখন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে,—শুন পত্রিকে! —বোধ হইতেছে নয়,—আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে, সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই ষড়্‌যন্ত্রের মূল। সেই গর্ব্বিত, ধর্ম্ম-বিপ্লাবক মোগল বিজয়পুর আক্রমণ করিয়া অবধি নানা ছল অন্বেষণ করিতেছিলেন। আমি যখন দিল্লীর দরবারে ও আগরার সভায় তাঁহার সহিত তিন বার সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি বক্রদৃষ্টিতে আমারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সেই দৃষ্টি অভিধান হইয়া আমার হৃদয়কে অর্থ বুঝাইয়া দিতেছে। বিজয়পুরের মহারাজ আমার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন, সেই আক্রোশেই পররাজ্যলোলুপ যবন আমাদিগের শত্রু হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রপতি বীরবর শিবজীও আমার পিতা মহারাজের চিরমিত্র ছিলেন। তিনিও যখন ঔরঙ্গজেবের জাতবৈরী হইয়াও লোভাকৃষ্ট হইয়া বিজয়পুর বেষ্টন করেন, তখন আমার পিতা আর তাঁহাকে তাদৃশ ভক্তি করিতেন না। শিবজীও এখন আমাদের বিপক্ষ। কাশ্মীরেশ্বর শিবজীরও বাধ্য নহেন, তিনি স্বজাতির বন্ধু হইলেন না, যবনে তাঁহাকে বিমোহিত করিয়াছে। এ রাজ্যে আর থাকিতে নাই। রাজদণ্ড না হইলেও

আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাশ্মীর ত্যাগ করিতাম। অন্যান্য ক্ষত্রিয় বন্ধুগণ আমাদিগের সহায় হইবেন, জগদীশ্বর সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

"আমরা শীঘ্র এ রাজ্য হইতে লক্ষ্মণাবতী নগরীতে প্রস্থান করিব। তুমি পত্র পাঠ মাত্র পূর্ণশশীকে লইয়া অনুচরবর্গ সহিতে প্রয়াগধাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণায় যাত্রা করিবে। সেখানে আমার বাটী ও লোকজন নির্দ্দিস্ট হইয়াছে। কৈশোরবাগের পশ্চিমে আমার জননীর যৌতুক প্রাপ্ত যে বাটী আছে, তুমি জানো, সেই বাটীতেই অবস্থান করিবে। যদি আমার পৌঁছিবার পূর্ব্বে তোমরা আইস, কোনো চিন্তা নাই। শ্রীমতী পূর্ণশশীকে আমার প্রিয়-সম্ভাষণ জানাইবে। তুমিও আমার এবং প্রাণাধিকা ভগিনী চন্দ্রাবতীর সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবে।

শ্রীশশীন্দ্রশেখর।"

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে পূর্ণশশী একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কিন্তু পত্রিকা কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইলেন না। সেদিন ঐ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্ত্তাও হইল না।

দুই দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে শিবির উঠাইয়া পত্রিকা লক্ষ্মণাবতী নগরীতে যাত্রা করিলেন। রাজপুত্র যেমন লিখিয়াছিলেন, নিয়মিত সময়ে সেইরূপ ঠিকানায় তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার তখনো পৌঁছিতে পারেন নাই।

সাত আট দিন এইরূপে অতীত হইল, সমভাবে পূর্ণশশী উদ্বিগ্ন, পত্রিকা উদ্বেগশূন্য, নিত্যকামী মহা ব্যতিব্যস্ত। এক দিন শেষ রজনীতে পূর্ণশশী স্বপ্ন দেখিলেন, পত্রিকা পুরুষ হইয়াছেন, শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, হাস্যমুখে কত প্রকার পরিহাস করিতেছেন, একটী চমৎকার গীত গাইয়াছেন, সেই গীতের ভাবে যেন তিনি ক্রন্দন করিতেছেন, যথার্থই পূর্ণশশী কাঁদিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। কি দেখিলাম? কেন এমন হইল?—ভাবিয়া অন্যমনস্ক হইলেন,—একটু চিন্তার পর হাসি আসিল, পূর্ণশশী হাসিলেন।—চক্ষু মার্জ্জন করিয়া পত্রিকার শয্যার নিকটে গেলেন,—দেখিলেন, পত্রিকা অকাতরে ঘুমাইতেছেন। পূর্ণশশী দেখিলেন, অকাতর নিদ্রা, কিন্তু সত্য সত্য পত্রিকা নিদ্রিত ছিলেন না, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।—পত্রিকা জাগিয়া ছিলেন; শয্যাপর্শ্বে পদাঙ্গুষ্ঠের সঞ্চার শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? —পূর্ণশশী মুখ টিপিয়া হাসিলেন, কথা কহিলেন না।

পত্রিকা পুনরায় পূর্ব্ব স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?—পূর্ণশশী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—কহিলেন, চোর নয়। স্বরে বুঝিয়া পত্রিকা উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,—নয় কেন?—নিশাশেষে নিঃশব্দে অপরের শয্যাপার্শ্বে যে আইসে, সেই-ই চোর। যাহা হউক,—চোর হও, নাই-ই হও, কিম্বা যা-ই হও, বসো;—নিশা-কালের,—বিশেষতঃ উষাকালের অতিথি অতি পূজ্য।

পূর্ণশশী স্বতন্ত্র এক আসনে উপবেশন করিলেন,—পত্রিকা শয্যা হইতে বাহিরে আসিয়া একখানি চৌকীতে বসিলেন।—জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ণশশি! এখনো রাত্রি আছে, অসময়ে তুমি এখানে আসিয়াছ কেন?

ডিমস্থিনিস।

স্বদেশীয় বান্ধবগণকে নানাপ্রকার উপদেশ দান ও উত্তেজনা করিয়া স্বদেশানুরাগী মহাত্মা ডিমস্থিনিস পুনরায় কহিলেন, এক্ষণে কর্ত্তব্য কর্ম্মে সর্ব্বদা সতর্কতা ও পরিশ্রম আবশ্যক। তদ্বিষয় আপনারা সম্পূর্ণরূপে ও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, আমার আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কিপ্রকার প্রণালীতে সৈনিক-দল সজ্জিত হইবে, তাহাদিগের সংখ্যা কত চাই, কিরূপে তাহারা প্রতিপালিত হইবে এবং অন্যান্য প্রযোজনীয় আয়োজনে কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত,তাহা এক বার বিবেচনা করিব। আমার মতে কিপ্রকারে ব্যবস্থাপিত করিলে, সৈন্যগণের দ্বারা তন্ত্রের কার্য্যাবলি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবে এবং কি কি উপায়ে বর্ত্তমান কষ্ট ও বিপত্তি সমূহ হইতে আমরা উদ্ধার প্রাপ্ত হইব, স্পষ্টরূপে তাহা ব্যক্ত করিতেছি। কিন্তু হে অ্যাথেনীয় ভ্রাতৃগণ! আমার অনুরোধে এক্ষণে আপনারা অধিক উতলা ও অধীর হইবেন না। মনোযোগ পূর্ব্বক আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। আর আমি যে, কোন প্রকার নূতন রীতির সংগ্রাম আয়োজনের প্রস্তাব করিতেছি, ইহা আপনারা মনে করিবেন না। কিম্বা আপনাদিগের কার্য্য সমাধানে বিলম্ব ঘটাইতেছি, ইহাও মনে করা উচিত নহে; কারণ যাহারা এক্ষণেই, এই দণ্ডেই, ইত্যাদি ত্বরা সূচক বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাদিগের পরামর্শ এ সময়ে খাটে না; যে হেতু পূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যগণের দ্বারা যে যে অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, তাহার সংশোধন বা প্রতীকার এক্ষণে হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহাদিগকেও হিতোপদেশ প্রদান

করা আবশ্যক হইতেছে। যাহারা দেখাইবে, কীদৃশ সৈন্য শ্রেণী আবশ্যক, সংখ্যায় বা কত এবং যদবধি পুনরায় শান্তির প্রতিষ্ঠা না হয়, যদবধি আমরা বিপক্ষকুলকে পরাভূত না করি, কিম্বা বিপক্ষেরাই আমাদিগকে জয় না করে, তদবধি সেই সকল সেনা কিপ্রকারে পোষিত হইবে, তাহারাই তাহা বলিবার উপযুক্ত পাত্র। কারণ সাধারণ নীতিই এই যে, সংগ্রামের কার্য্য সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্যগণ যেমন বুঝিতে পারে, অপরে তেমন বুঝিতে পারে না। এই সকল বিষয় অদ্য আমি বিশেষরূপে উল্লেখ করিব। কিন্তু তাহা বলিয়া আমার এমন উদ্দেশ্য নহে যে, আমার বক্তৃতার পর অপর ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদিগের স্ব স্ব মন্তব্য ব্যক্ত করিতে দিব না। অবশ্যই সকল বিষয়ে সকলের স্বাধীনতা আছে, আমার কথা শুনিয়া আপনাদিগের মধ্যে যাঁহার বিচারশক্তিতে যাহা আইসে, তিনি তাহা অবশ্যই বলিতে পারিবেন।

এইরূপ ভূমিকা করিয়া ডিমস্থিনিস কহিলেন, আপাততঃ পঞ্চাশখানি রণতরি সজ্জিত করা আবশ্যক এবং প্রথম সুযোগেই সেই সকল জাহাজ লইয়া এই তীর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। প্রধান জাহাজের সহকারিতা করিবার নিমিত্ত যতগুলি ক্ষুদ্র তরি প্রয়োজন হইবে, তাহার সংখ্যা যেন এরূপ হয় যে, আমাদের অশ্বব্যূহের অর্দ্ধেক ধারণ করিতে পারে। ঐ সকল সহকারী তরি প্রধান রণতরির সঙ্গে সঙ্গেই চলিবে। আমরা এতদূর সুসজ্জিত ও প্রস্তুত হইয়া থাকিব যে, রাজা ফিলিপ যেন স্বরাজ্য হইতে থর্ম্মপিলি, চর্সীনসস, অলিন্থস্ ইত্যাদি স্থানে অগ্রসর কিম্বা পরাক্রম বিস্তারে কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, কারণ তিনি তখন মনে করিবেন যে, আথেনীয়েরা সম্ভবত অসামান্য আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শন দিবার উপযুক্ত

হইয়াছেন। ইয়ুবিয়া, হেনিয়টন, এবং থর্ম্মপিলিতে আপনারা যেমন তেজস্বিতা দেখাইয়াছিলেন, উদ্যোগ দেখিয়া ফিলিপ যেন তাহা স্মরণ করেন। যদিও এক্ষণে আপনারা তাদৃশ তেজস্বিতার সহিত কার্য্য না করেন, তথাপি আমার প্রস্তাবিত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে অনেক উপকার দর্শাইবে, সে উপকার সামান্যও নহে; পরাক্রান্ত ফিলিপ ভয়ে শান্ত হইয়া থাকিবেন; কিন্তু আমার ইচ্ছা আপনারা এখন অবধি সমান তেজস্বিতা দেখাইতে থাকুন। তিনি যখন শুনিবেন যে, আমরা যুদ্ধ করিতে সজ্জিত হইয়াছি, যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি, তখন তাঁহার অবশ্যই কিছু ভয় হইবে; ভয় না হয়, চৈতন্যও হইবে। যদি তিনি আমাদিগের রণসজ্জা তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তবে তাঁহার সেই অহঙ্কার এবং নির্ভীক ভাব তাঁহার পক্ষে সাঙ্ঘাতিক বিপদজনক হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা তখন সম্পূর্ণ দল বলে একত্র হইয়া বিনাকষ্টে প্রথম সুযোগেই তাঁহার রাজ্যসীমায় অবতীর্ণ হইতে পারিব।

আমার সঙ্কল্প এইরূপ। আপনারা এই সঙ্কল্প অনুসারে সমস্ত আয়োজন করুন। আরও পূর্ব্বকথিত সেনাদল ব্যতীত অন্য কতকগুলি সেনা সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাহারা ক্রমাগত ফিলিপের অধীনস্থ রাজ্য আক্রমণ করিয়া একদণ্ডও তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দিবে না। দশ সহস্র অথবা বিংশতি সহস্র বিদেশী সেনা আমাদের আছে, ইহা আর মনে করিবেন না; কারণ তাহা কেবল কাগজে অঙ্কিত দেখিতে পুষ্ট ও জাঁকাল, কাজে পাওয়া যায় না। আমার ইচ্ছা বাস্তবিক ততগুলি সেনা আমাদের তন্ত্রের স্বভাবত প্রধান অনুবল হয়, এবং তাহারা নিয়ত নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রধান সেনাপতির আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। এক্ষণে সৈন্য সংখ্যা কত হইবে তাহাদের

কি কি গুণ চাই,ভরণ পোষণের নিমিত্ত কত অর্থ আবশ্যক এবং কিরূপেই বা সেই অর্থ সংগ্রহ হইবেক, একে একে তাহা নির্ণয় করিতেছি।

প্রথম। পদাতিকদল। এই বিষয়ে আপনারা কিছু অধিক সতক হইবেন। আপনারা মনে করেন, আমাদিগের সৈন্য অধিক ও রণসজ্জাও ভয়ঙ্কর; কিন্তু এটি মহা ভ্রম। আদেশে ভয়ঙ্কর হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যে যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল ও জঘন্য। আয়োজন ও রণসজ্জা প্রথমতঃ পরিমিত হওয়া চাই। তৎপরে যদি তাহা পর্য্যাপ্ত না হয়, তবে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা অযুক্তি হইবে না। পদাতিকের সংখ্যা দুই সহস্র হওয়া আবশ্যক, তাহাদের মধ্যে অন্তত পাঁচ শত এথেন্স নিবাসী থাকা উচিত। তাহাদিগের বয়ঃক্রমের এমন একটি সীমা থাকিবে যে, তাহারা কোন নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে, অথচ সেই কালের মধ্যে অন্য একদল কর্ম্মক্ষম হইয়া কর্ম্ম শিখিয়া লইতে পারে। কোন সেনাকে অধিক কাল এক কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা ভাল নহে। দেশবাসী পাঁচ শত ও অবশিষ্ট বিদেশী হইলেও কোন ক্ষতি নাই। পদাতিদলের সঙ্গে দুই শত অশ্বারোহী থাকা উচিত। তাহারা যেন উহাদিগকে সাহায্য দান করিতে সমর্থ হয়। সেই দুইশতের মধ্যেও অন্তত পঞ্চাশ জন আথেনীয় থাকা চাই। এই সকল সৈন্যের নিমিত্ত কয়েকখানি ক্ষুদ্র রণপোত এবং দশখানি লঘু নৌকা নির্দ্দিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। কারণ ফিলিপেরও সামুদ্রিক সেনা আছে।

অল্প সৈন্য রাখিবার কথা বলিতেছি কেন, তাহা আপনারা বিবেচনা করুন। আমাদের এখন এমন ক্ষমতা নাই যে, বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করি, অতএব এরূপ কতকগুলি সেনা আবশ্যক যে, তাহারা অবিরত আক্রমণ দ্বারা

ফিলিপকে ক্ষণ কালের জন্য বিশ্রাম করিতে না দেয় এবং তাঁহার রাজ্যে কদাপি শান্তি ভোগ না হয়। এইরূপ প্রণালীতে প্রথমে যুদ্ধের সূত্রপাত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। সহসা বৃহৎ অনীকিনী সংগ্রহ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে না। তাদৃশ অধিক সেনা রাখিতে গেলে আমরা এখন বেতন দিতে পারিব না, প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইতেও সমর্থ হইব না, অথচ তাদৃশ ফলও কিছু হইবে না। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের সৈন্যশ্রেণী যে নিতান্ত অল্প হইতেছে, তাহাও নয়। যাহা আমি বলিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে তাহাই প্রচুর।

দ্বিতীয় কথা, স্বদেশীয় নাগরিকগণ আপনারাই যুদ্ধকার্য্য ও রণপোতের নাবিকত্ব করিবে। অনতিপূর্ব্বেই ইহার সুফল দৃষ্ট হইয়াছে। কোরিন্থস্ নগরে একদল সহকারী সৈন্য এই তন্ত্রকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহার সেনানীর মধ্যে পোলিষ্ট্রেটস্, ইফিক্রেটিস্, ও চেব্রিয়স্ প্রভৃতি বীর পুরুষেরা শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, আর আপনারাই নিজে নিজে সৈন্যের কার্য্য করিতেন। সেই সহকারী ও স্বদেশীয় সৈন্যের একত্রিত চেষ্টার দ্বারা লাসিডিমনীয়দিগের উপর এক মহা জয় লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর অবধি আমাদিগের সেনাদল কেবল বিদেশীয় লোকের দ্বারা পুষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদিগের জয় কেবল মিত্ররাজ্য ও অধীন রাজ্যের উপরেই হইতেছে। এ দিকে আমাদিগের শত্রুদল বর্দ্ধিত হইয়া অসম পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। বৈদেশিক সেনাদল আমাদিগের তন্ত্রের মঙ্গলার্থ কিছুই মনোযোগ করে না, তন্ত্রকল্যাণে তাহাদিগের ভ্রূক্ষেপ মাত্রও নাই। তাহারা কেবল আর্টেবেজস্ বা অন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের নিমিত্ত রণতরীতে যুদ্ধ

করিতে যায়। সেনাপতি তাহাদিগের অনুগামী হইয়া থাকেন। ইহাতে আমাদিগের আশ্চর্য্য জ্ঞান করা উচিত নহে। কারণ কোনো সেনাপতিই আজীবন স্বকীয় সৈন্যগণকে আপন বশে রাখিতে পারেন না। যিনি রীতিমত বেতন দিয়া শৃঙ্খলা রাখিতে পারেন, তাঁহার সেনারা বরং বশে থাকে, কিন্তু যিনি বেতন প্রদানে ও শৃঙ্খলা বিধানে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে সৈন্যগণকে বশীভূত রাখা কোনক্রমেই সাধ্যায়ত্ত নহে।

তবে আমি আপনাদিগকে কি পরামর্শ দিব?—এই পরামর্শ দিব যে, নিয়মানুসারে বেতন প্রদান, সেনাপতিগণের পরিদর্শক নিয়োগ, এবং আমাদিগের স্বদেশীয় কতিপয় সৈন্যকে সাধারণ অনীকিনী মধ্যে নিবেশিত করিয়া সকলকে বশীভূত রাখা চাই। কারণ আমাদিগের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী নিতান্ত নিন্দনীয় ও জঘন্য। আজি যদি কেহ আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আথেনীয়গণ! তোমরা কি এক্ষণে শান্তিসূত্রে বদ্ধ আছ? তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আপনারা এই উত্তর দিবেন যে, কোন ক্রমেই না। আমরা ফিলিপের বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, দেখিতে পাইতেছি, এবং সকলেই দেখিতেছে যে, আমরা পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে পদাতিক ও অশ্বারোহী সংগ্রহ পূর্ব্বক সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি। এখন বলুন দেখি, আপনারা যে যে ব্যক্তিকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, তাহারা ব্যতীত আর কাহারা উপকার প্রত্যাশা করে? পুরোহিতেরা পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া মহাসমারোহের সহিত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। অতএব আপনারা জড় মৃত্তিকা নির্ম্মিত নির্জ্জীব পুত্তলিকা সদৃশ দেখাইবার নিমিত্ত কেবল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকেন, কার্য্যের নিমিত্ত নহে। হে স্বদেশীয়বর্গ! বলুন দেখি, ঐ সকল সেনাপতি ও কর্ম্মচারী

কিজন্য স্বদেশ হইতে মনোনীত না হয়? যাহাতে আমাদের সৈন্য-দল প্রকৃত আথেনীয় দেখায়, তেমন কার্য্য কেন না করেন? লেমনস্ আক্রমণ করিতে হইলে স্বদেশীয় সেনা চাহি, কিন্তু আমাদের নগর রক্ষায় নিযুক্ত সেনারা মেনেলসের অধীন! আমি ঐ ব্যক্তির নিন্দা করিবার নিমিত্ত কিম্বা অপযশ গাইবার নিমিত্ত এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু যে কেহ ঐ পদে অভিষিক্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি অবশ্যই আপনাদিগের সম্মতিক্রমেই সেইপদ লাভ করিয়াছে। বোধ হয়, এই সকল কথা আপনারা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন, কিন্তু কিরূপে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা যাইবে, এবং কোন্ কোন্ রাজকীয় আয় হইতে ধন সঞ্চয় করিতে হইবে, তাহা স্থির করা আবশ্যক। সৈন্য পোষণ নিমিত্ত এবং অন্য অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহে প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা লাগিবে। দশখানি রণপোতের জন্য প্রত্যেকের মাসিক ব্যয় আট শত সাড়ে বার টাকার হিসাবে দ্বাদশ মাসে ৯৭৫০০ সপ্তনবতি সহস্র পঞ্চশত মুদ্রা আবশ্যক। দুই সহস্র সেনার নিমিত্তও উক্ত সমষ্টি লাগিবে। প্রত্যেকে যেন মাসে ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা করিয়া খোরাকী পায়। দুইশত অশ্বারোহীর জন্য ২৯২৫০ টাকা প্রয়োজন। তাহারা যেন মাসিক ১২১/০ বেতন পায়। যদি সৈনিকদিগের সঙ্গে সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য থাকে, তাহা হইলে সামান্য সুবিধা নহে। কারণ আমার দৃঢ়-বিশ্বাস আছে যে, যদি এইরূপ আয়োজন সুসম্পন্ন হয়, তবে যুদ্ধের দ্বারাই অবশিষ্ট দ্রব্যের পূরণ হইবে এবং তদ্দ্বারাই আমাদের রণসজ্জা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, কোন বিষয়ে অঙ্গহীন থাকিবে না। আমি যে সকল কথা বলিতেছি, তাহা ফলবান্ করিবার নিমিত্ত আমি রণতরিতে সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে যাইব। তাহাতেও

যদি সুফল না ফলে, তবে আমি আপনার জীবন দিয়া ক্ষতি পূরণ করিব।

কোন্ কোন্ আয় হইতে প্রস্তাবিত অর্থ সমষ্টি সংগৃহীত হইবে, মহাত্মা ডিমস্থিনিস্ সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিলে তন্ত্রসভার সম্পাদক একখানি সংকল্পপত্র পাঠ করিলেন। সভ্য সমাজে তাহা পরিগৃহীত হইল। তদনন্তর নীতিকুশল বক্তা পুনরায় কহিলেন, অর্থ সংগ্রহ করা আমাদিগের ক্ষমতার অধীন হইতেছে। চেষ্টা করিলেই আমরা তাহা সংগ্রহ করিতে পারি। আপনারা যখন পরস্পরে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিবেন, সেই সময়েই যেন এমন একটী অমোঘ প্রস্তাব করেন, যে কার্যাতঃ ফিলিপকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দেওয়া যাইতে পারে, কেবল আদেশপত্র দ্বারা তাহা হইবার নহে। আমার মতে আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালী ও রণসজ্জা সম্বন্ধীয় সমস্ত আয়োজন সুফলপ্রদ হওয়া আবশ্যক। যেখানে রণক্ষেত্র হইবে, সেখানকার দেশের অবস্থান কিপ্রকার এবং সামান্য বায়ু ও ঋতু কতদূর অনুকূল, ইহা যদি উত্তমরূপে বিবেচনা করেন, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে। ভাবিয়া দেখুন, শীতঋতু আমাদের পক্ষে প্রতিকূল। কিন্তু রাজা ফিলিপ্ বায়ু ও ঋতুর সাহায্যে এতাদৃশ দেশজয় পক্ষে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, সে সময়ে আমরা তাঁহার প্রতিবন্ধকতা করিবার জন্য কোন ক্রমেই সহকারী সৈন্য পাঠাইতে পারি নাই। অতএব এই বিষয়টী আপনারা ভাল করিয়া বিবেচনা করিবেন। সর্ব্বদাই যুদ্ধক্ষেত্রে সুসজ্জিত সৈন্য উপস্থিত ও প্রস্তুত রাখা চাই। সময়ে সময়ে কখন কখন সৈন্য প্রেরণ করিলে কার্য্য উদ্ধার হইবে না। কারণ সময় অতীত করিয়া বহু বিলম্বে তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইবে।

শ্মশান সঙ্গীত।

বরষার নিশা শেষে ছিলাম শয়নে।
নিদ্রাদেবী ছলা করি, গিয়াছিল পরিহরি,
স্থতন্দ্রা খেলিতেছিল ঝাঁপিয়ে নয়নে॥
কভু মুদিতেছি আঁখি, কভু আছি চেয়ে।
ভ্রমে যেন হাসিতেছি, মোহভাষ ভাষিতেছি,
আধ ঘুমে, আধ জেগে, শুভ উষা পেয়ে॥

আচম্বিতে মুদে আঁখি, দেখি যেন ফিরে,
বিশ্ব-ইন্দ্রজাল ভেলা, স্বপনের একি খেলা,
আসিয়া পড়েছি যেন, ভাগীরথী-তীরে॥
ঘোর অন্ধকার মেঘ, ভীম দরশন।
কড় কড় কড় ধ্বনি, গড় গড় প্রতিধ্বনি,
গুঁড়ুনি গুঁড়ুনি ধারে, করে বরিষণ॥

অদূরে শ্মশান ভুমি, অতি ভয়ঙ্কর!
চিতা অগ্নি স্থলে স্থলে, ধ্বক, ধ্বক, ধ্বক, জ্বলে,
ধূ ধূ করি ধূমশিখা, পরশে অম্বর॥
ঠাঁই ঠাঁই কাঁড়ি কাঁড়ি, পচা মড়া পড়ি।

উলঙ্গ বিকটাকার, কারো অস্থি চর্ম্ম সার,
কাদা মাখা, ভূমি তলে, যায় গড়াগড়ি !!

—

পচা গন্ধে নাড়ী উঠে, বমী হতে আসে।
শাঁকিনী ডাকিনী পালে, নৃত্য করে তালে তালে,
ভীমকায় পিশাচেরা হি হি হি হি হাসে ॥
জীহি লিহি লিহি করি, শৃগাল বেড়ায়।
কুকুরে তাড়ায়ে আনে, শকুনীরা নাড়ী টানে,
গুণ টানা দাঁড়ী যেন, দড়ী টেনে যায় !!

—

এ ঘোর শ্মশান ভূমে, হেরি এক ভিতে।
শুয়ে আছে এক দেহ, নিকটে নাহিক কেহ,
কেহ নাহি অভাগার, দেখিতে, কাঁদিতে !!
হেন কালে যেন এক দেবের কুমার।
নামিলেন ধরাতলে, শ্বেত পুষ্প মালা গলে,
কহিলেন শব দেহে, শিব সমাচার ॥

—

ওহে জীব! (একি ভ্রান্তি!) জীব কহি কারে?
মিশিতেছে * জীব শিব অনন্ত আকারে ॥
ওহে দেহ! কেহে তুমি? এ হেন সময়।
ধূলায় পড়িয়া আছ, নাহি পাও ভয়?

---

* শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

রাজা হও, দীন হও, উদাসীন হও।
যে হও সে হও আজি, আর কেহ নও ॥
মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, পুত্র পরিবার।
ধন জন দাস দাসী, কিছু নাহি আর !!
উলঙ্গ হইয়া আছ, সব নেছে কেড়ে।
একাকী পড়িয়া আছ, সবে গেছে ছেড়ে ॥
একাকী আসিয়াছিলে, যাও চলি একা।
এ ভবে কাহারো সনে, নাহি হবে দেখা ॥
যে বেশে আসিয়াছিলে, সেই বেশে যাও।
বিদেশে এ বেশে কেন ধূলায় লুটাও ?
ফুরালো সম্বন্ধ তব, ভবের সহিত।
এ ভবে কেহই তব, সাধিবেনা হিত ॥
পদ, মান, গুণ, যশ, তেজ, অহঙ্কার।
যত কিছু, জন্মশোধ, ফুরালো তোমার ॥
যাঁর কাছে যাইতেছ, তিনি সর্ব্বময়।
তাঁর কাছে নাহি থাকে, জগতের ভয় ॥
একা যাও, ভয় নাই, তাঁতে রেখো মতি।
দুটী সঙ্গী অন্ত পথে, যাইবে সংহতি ॥
সুকৃতি দুষ্কৃতি সাথী, যাবে তব সনে।
তারা গিয়ে সাক্ষী হবে, ধর্ম্ম সিংহাসনে ॥
হাতী, ঘোড়া, জপ, তপ, রত্ন ভারে ভারে।
কিছুই নজর দিতে, হবে না তাঁহারে ॥

শুক্ল কৃষ্ণ, দুটী বাটী, করিয়ে যোজন।
পুণ্য, পাপ, করিবেন, স্বহস্তে ওজন ॥
তুলামাণে যদি তব, পুণ্য ভারি হয়।
কোলে লইবেন পিতা, কিছু নাহি ভয় ॥
মোহ হেতু পাপ বাটী, যদি ঝুঁকে পড়ে।
বাঁধা যাইবে না তবু, লোহার নিগড়ে ॥
ক্ষমা চেও যুড়ি কর, খুলিয়ে হৃদয়।
দিবেন চরণে স্থান, দীন দয়াময় ॥
রবি, শশী, শিশিরের জলদের জল।
হতে পারে ঠাঁই ঠাঁই, অসম, বিরল ॥
দয়াল পিতার দয়া, সকলে সমান।
অনুপম দয়াধাম, দয়ার নিধান ॥
হবে না ডুবিতে ঘোর, কুণ্ডের ভিতরে।
দংশিবে না কৃমী কীট, তব কলেবরে ॥
কুম্ভীপাকে পড়িবে না, মাথা নীচু করে।
দণ্ডাঘাত করিবে না, কৃতান্ত কিঙ্করে ॥
দয়াময় রাখিবেন, দয়ার ছায়ায়।
জুড়াইবে চির দিন, অনন্ত দয়ায় ॥
যাও চলি, ভয় নাই, পাবে পূর্ণ বল।
যাঁর তুমি, তাঁর পদে, হইবে শীতল ॥

—

শুনিলাম, সবিস্ময়ে, অস্ত সমাচার।
চাহিলাম, হেরিবারে, মূরতি তাঁহার ॥
আর কিছু নাহি হেরি, কিছু নাহি আর।
কোথা আমি, কোথা সেই দেবেন্দ্র কুমার ॥
কোথাবা শ্মশান প্রেত বিকট আকার।
স্বপন ভোজের বাজী, সব ফক্কিকার!
কেবল স্বপনে এই লভিলাম হিত।
জীবের শিবের হেতু, শ্মশান সঙ্গীত ॥

সতীশোকে পশুপতি।

হেরিয়া বিদরে বুক মরি মরি হায় রে!
প্রণয় দেখাতে লোকে, দারুণ মানস শোকে,
কাঁধে করি সতীদেহ, পশুপতি যায় রে।

ছল ছল দুনয়নে জলধারা ঝরিছে!
হায় রে! যেন অটল, হিমময় হিমাচল,
বায়ুর পরশে সদা, গলে গলে পড়িছে।

প্রবল প্রণয় শোক অনলের প্রায় রে!
ভুবন তাপিত যাতে, সেই অনলের তাতে,
রজতের রাশি যেন দ্রব হয়ে যায় রে।

সতিনী কামিনী ছিল লুকান জটায় রে।
সেই বুঝি পেয়ে দিন, সহিল না দুই দিন,
পতির হৃদয়োপরে বসিবারে ধায় রে।

ঢুলু ঢুলু দুনয়ন শোকেতে এলায় রে।
বিহনে তারার মুখ, আর কি হেরিয়া সুখ,
তাই বুঝি একবারে মুদিবারে চায় রে।

—

স্বভাবত দুনয়ন অরুণ নেশায় রে।
কেঁদে কেঁদে আরো লাল, যেন লোহিত প্রবাল,
অথবা তুলনা আধ বিকাসি জবায় রে।

—

শোকজলে দুনয়ন অবনী ভাসায় রে।
ললাট নয়ন তাঁর, প্রকাশিছে রোষভার,
দক্ষোপরে রুক্ষভাব সকলে দেখায় রে।

—

আলু থালু জটাভার ধরণী লুটায় রে।
রুষ্ট হলে ত্রিলোচন, নষ্ট হবে ত্রিভুবন,
তাই বুঝি ক্ষম বলি ধরে গিয়া পায় রে।

—

শোকে রোষে অনুতাপে কাঁপিছে অধর রে।
কাঁপিছে সব শরীর, পদ নাহি হয় স্থির,
তারা বিনা সব শূন্য হেরে যোগীবর রে।

—

বদন ঈষত লাল অবিরত রোদনে।
মনোগত শোকানল, হইয়া অতি প্রবল,
বেরোবার তরে যেন বিদারিছে বদনে।

—

সুধাসম কথাহীন তারামুখ-চাঁদে রে।
হেরিয়া প্রমথগণ, হা রবে করে রোদন,
খল শিরোমণি যত ফণীরাও কাঁদে রে।

থেকে থেকে ফণীগণ বিস্তারে ফণায় রে।
দক্ষে নাশিবার তরে, ওঠে যেন রোষ ভরে,
প্রভুর নিকটে তাই অনুমতি চায় রে।

মহেশ পাগল হয়ে সতী লয়ে যায় রে।
কখন ভুলিয়া সব, কাঁধে হেরি জায়া শব,
জীবিত ভাবিয়া ভ্রমে চুম্বিবারে যায় রে।

হরদেহ ত্যজি যেতে দেখিয়া তারায় রে।
শ্রবণে ধুতুরাফুল, দক্ষিণ কাঁধে ত্রিশূল,
সব যেন হরদেহ ত্যজিবারে চায় রে।

থেকে থেকে দেখিছেন তারামুখ-চাঁদে রে।
অমনি শিব সুধীর, শোকেতে হয়ে অধীর,
অধর ফুলায়ে আহা অবিরল কাঁদে রে।

কেন আজি শশিমুখ মলিন দেখায় রে।
আলু থালু সে বসন, মুদিত কেন নয়ন,
সেই সুচিকণ কেশ লুটায় ধূলায় রে।

সুধার আধার সেই অধর নীরস রে।
নিশ্বাস রহিত নাসা, রসনায় নাহি ভাষা,
ঝুলিছে মৃণাল বাহু হইয়া অবশ রে।

যেই চরণের বলে ত্রিলোক তরায় রে।
সেই যুগল চরণ, অবশ হয়ে এখন,
ঝুলিতেছে দুলিতেছে মরি মরি হায় রে।

ভিখারী মহেশ গৃহী লইয়া তারায় রে।
সব করি অবসান, সে যদি ত্যজিল প্রাণ,
কি হবে কি হবে তবে শিবের দশায় রে।

স্বভাবত তারা মোর ভূষিত লজ্জায় রে।
তবে কেন রে এখন, হৃদয়ে নাহি বসন,
বসন টানিয়া কেন না দেয় মাতায় রে।

হেরিব কি এ জনমে আবার তারায় রে।
হাসিয়া হাসিয়া সতী, আসিয়া করি প্রণতি,
প্রভু আশুতোষ বলি ডাকিবে আমায় রে।

কেন বা দিলাম মত যজ্ঞেতে আসায় রে।
নহিলে ত মহামায়া, ত্যজিত না নিজ কায়া,
কেন বা হলো এমতি হায় হায় হায় রে!

ধন্য সতী ছিল সতী পতির নিন্দায় রে।
মনে ভাবি অপমান, ত্যজিল আপন প্রাণ,
প্রতিশোধ কিবা দিবে মহেশ তাহায় রে।

মৃত্যু যদি ভয় নাহি করিত আমায় রে।
কি দুখ তবে আমার, শুধিবারে এই ধার,
যেখানে গেছেন সতী যেতাম তথায় রে।

শিক্ষাগুরু।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, বার্ত্তাশাস্ত্র, শিল্প, ও সঙ্গীত প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা-সাপেক্ষ। সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে কদাচ উদার শিক্ষা হয় না। পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠ করিলে পুরা-কালের শিক্ষা প্রণালীর বিষয় অনেক অবগত হওয়া যাইতে পারে। অতি প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষে বেদ-ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য, কপিল, গৌতম প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্ব স্ব ছাত্রবর্গকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। শিক্ষাগুরুর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তাহা তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ-ভাবে ছিল, সন্দেহ নাই। তাৎকালিক আচার্য্যদিগের বিব-রণ ও গ্রন্থাদি পাঠ করিলে, বিলক্ষণ প্রতীতি হইতে পারে, যে তাঁহারা যখন স্বয়ং শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কেবল ব্যাকরণ সাহিত্যাদি-বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া এক এক জন এক একটী শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করি-তেন, সুতরাং যিনি যে শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই-তেন, তিনি তাহাতেই সবিশেষ নিপুণ হইতে পারিতেন। অধ্যাপনাকালে তাঁহারা বিদ্যা-বিষয়ে সুশিক্ষিত ছাত্র-দিগকেও উপদেশ দিতেন। ফলতঃ সেইরূপ না হইলেও

প্রকৃতরূপে শিক্ষাকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। অধুনা অনেকেই কহিয়া থাকেন, অমুক তর্কালঙ্কার সর্ব্বশাস্ত্রে বা নানাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। যাঁহারা ঐরূপ কথা অবলীলাক্রমে বলিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদিগকে হয় অজ্ঞ না হয় অযথাবাদী ইহার অন্যতর ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। যাহা হউক, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত, যিনি যে বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহার তদ্বিষয়ের অধ্যাপনা করা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যথা কদাচ সৎশিক্ষা হইতে পারে না। সেই নিমিত্তই পূর্ব্বতন ও ইদানীন্তন চতুষ্পাঠীধারী অধ্যাপক মহাশয়গণও সেই পূর্ব্বপ্রথা অবলম্বন করিয়া চলেন। ইহাঁরা প্রত্যেকে এক এক শাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া পরিশেষে তাহারই শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন।

যাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ লোকে তাঁহাদিগকে পল্লবগ্রাহী কহে। বস্তুতঃ তাদৃশ অধ্যাপক শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোনক্রমেই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন না এবং তাঁহাদিগের শিষ্যেরাও অধ্যয়নের প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হন না। অতএব ইহাই নিশ্চিত হইল, শিক্ষাগুরুর শিক্ষণীয় বিষয়ে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি চাই। কি পুরাতনকাল, কি মধ্যকাল, এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সময়েই এদেশে এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাকালে আচার্য্যগণ শিষ্য-

দিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া অবশিষ্টকাল ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন। ক্ষণকালের নিমিত্তেও অর্থের নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেন না। বিষয় ভোগ তাঁহাদিগের চক্ষে অকিঞ্চিৎকর বোধ হইত, সুতরাং বিষয় বাসনা পরিশূন্যমনে অধ্যাপনা কার্য্য করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা ঐ কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইত। যে বিষয়ে নিরন্তর মনোনিবিষ্ট থাকে, তাহাতে যে অপূর্ব্ব ফল জন্মে, তাহার সন্দেহ নাই। মধ্যকালের পণ্ডিতগণের মধ্যেও অনেকেই পূর্ব্বাচরিতপথে চলিতেন। তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া এ স্থলে উপযুক্ত বোধ হইতেছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে গুপ্তিপাড়াগ্রামে সভাকর বংশাবতংস মথুরেশ নামক একজন মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ছিলেন। ইহাঁর তর্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা ও কবিতারচনায় স্বাভাবিকী শক্তি ছিল। তিনি যে ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহার নাম মাথুরী টীকা এবং তাঁহার রচিত শ্যামাকল্পলতিকাও তাঁহার কবিত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে। ঐ মহাত্মার কিছুমাত্র বিষয় বাসনা ছিল না, সর্ব্বদাই অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। শিষ্যগণের পাঠের ব্যাঘাত হইলে তিনি গুরুতর কষ্ট বোধ করিতেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুণগ্রাম অবগত হইয়া আলাপ করিবার মানসে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন। তাহাতে তিনি তথায় যাইবার অভিলাষ থাকিলেও ছাত্রদিগের

পাঠের বিঘ্ন হইবে বলিয়া যাইতে পারিতেন না, পরিশেষে বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। পাঠনাকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিত। ইহা শ্রবণে গুণগ্রাহী রাজা সাতিশয় কৌতুকাক্রান্ত হইয়া একদিন স্বয়ং তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হন। মহারাজের আগমন ক্ষণে তিনি অধ্যাপনায় এরূপ নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন যে, তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা পর্য্যন্ত হইল না। পরে মথুরেশ আগন্তুক ব্যক্তিকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জানিয়া সম্মান পূর্ব্বক কুশাসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, মহারাজ! আরব্ধ পাঠের সমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, পাঠ শেষ হইলে, আপনার সহিত আলাপ করিব। রাজা মথুরেশের শিক্ষকতা কার্য্যের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ ও উদার ভাব দেখিয়া যারপর নাই, সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সাংসারিক অপ্রতুল ঘুচাইবার জন্য কহিলেন, মহাশয়! আপনকার যদি কোনরূপ অনুপপত্তি থাকে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন, আমি তাহার পরিহার করিব। বিষয়বাসনাশূন্য মথুরেশ তাঁহার প্রস্তাবের তাৎপর্য্য অবগত হইতে না পারিয়া কহিলেন। মহারাজ! আমি চারিখণ্ড চিন্তামণির উপপত্তি করিয়াছি, সুতরাং আমার শিক্ষণীয় ন্যায়শাস্ত্রের কোন স্থানে অনুপপত্তি লক্ষিত হইতেছেনা। রাজা তাঁহার বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র নাই দেখিয়া অধিকতর সন্তোষ প্রকাশ

পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্‌! আমি সাংসারিক অনুপপত্তি মনে করিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এক্ষণে বলুন্‌, সাংসারিক কোন বিষয়ে কোনরূপ কষ্ট আছে কিনা, আমি তাহা নিবারণ করিব। তাহা শুনিয়া তিনি তদ্বিষয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, আমার যেরূপ আয় আছে, তাহাতে কোনরূপ কষ্ট নাই। বস্তুতঃ তাঁহার ধন সম্পত্তি কিছুই ছিল না। কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভূমি ও কয়েকটী বৃক্ষ মাত্র ছিল। নিকটস্থ ধনাঢ্য লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সাহায্য করিত, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে শিষ্যবর্গের ও নিজের আহারাদি সম্পন্ন হইত। রাজা তাঁহার অসামান্য নিস্পৃহতা দর্শনে মনে মনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রভূত ভূমিদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা মথুরেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, ইহাই প্রতীতি হয়, যে অধ্যাপনা কার্য্যে অনুরাগ থাকিলে কদাচ অধ্যাপকদিগের মন বিষয়াকৃষ্ট হয় না। অতএব যাঁহাদিগের মন বিষয়প্রবণ নহে, তাঁহারাই যেন এই মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ধন সম্মান বর্দ্ধন করে, এইজন্যই অনেকে ধনাগমের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া থাকেন। অধ্যাপকদিগের সম্মানের অভাব নাই, অত্যুচ্চ পদস্থ লোকদিগেরও তাদৃশ সম্মান লাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং মহাত্মা অধ্যাপক মহাশয়েরা ধনের অভাব নিবন্ধন দুঃখিত হন না, ধনাগমের জন্যও তাঁহারদিগের মনোনিবিষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না। এই নিমিত্তই জর্ম্মন

দেশীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী লোক সকল চরমে পদত্যাগ কালে একবার অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন, বা পাইবার চেষ্টা করেন। এক্ষণে জর্ম্মন দেশে যেরূপ অধ্যাপকদিগের সম্মান, পূর্ব্বে অস্মদ্দেশেও তাদৃশ বা ততোধিক ছিল, সন্দেহ নাই। এককালে এই ভারতভূমিতে যে অধ্যাপকদিগের কত গৌরব ছিল, তাহা ভাবিলে ও আমাদিগের এক্ষণকার অবস্থার সহিত তুলনা করিলে, অত্যন্ত শোক উপস্থিত হয়। যেরূপ উচ্চপদস্থই হউন্, কোন ব্যক্তিই সম্মান বিষয়ে ইহাঁদিগের সমকক্ষ হইতে পারিতেন না, এই কারণেই অধ্যাপক মহাশয়েরা স্ব স্ব সন্তানদিগকে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারাও দেশের গুরুপদ বাচ্য। তাঁহাদিগের সমাদরের পরিসীমা ছিল না। সুতরাং কেন তাঁহারা ধনলুব্ধ হইবেন! অর্থ নিস্পৃহ হইয়া পাঠনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, বলিয়াই তাঁহারা যথার্থ শিক্ষাগুরু ছিলেন। অতএব শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইলে, অর্থ নিস্পৃহতা গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

অতি প্রাচীন কালের মহাত্মা আচার্য্যগণের অর্থের প্রয়োজনই ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবর্গের সহিত বন্য নীবার ও ফল মূল ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন। ইহাঁদিগের মধ্যে অধিকাংশই গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, না। আবার যাঁহারা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতেন, তাঁহারাও অর্থলোলুপ হইতেন না। অনায়াসলব্ধ ধনেই তৃপ্তি

লাভ করিতেন। মধ্যকালের শিক্ষাগুরু মহাশয়দিগকেও সাংসারিক ব্যয়োপযোগী অর্থের জন্য কষ্ট পাইতে হইত না। দেশস্থ সাধারণ জনগণেই সাহায্য দান করিয়া তাঁহা-দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিত। অদ্যাপি সেইরূপ উৎসাহ দানে এদেশীয় লোক সকল পরাঙ্মুখ হন নাই। এখনও ইহাঁরা নানামতে অধ্যাপক মহাশয়দিগের সাহায্য ও সমা-দর করিয়া থাকেন। তবে এক্ষণে পূর্ব্ববৎ গুণশালী অধ্যাপ-কের সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে গৌরব ও আনুকূল্যেরও ন্যূনতা ঘটিয়াছে। ফলতঃ অস্মদ্দেশে শিক্ষাকার্য্যের যেরূপ উৎ-কৃষ্ট প্রণালী ছিল, বোধ হয়, তাদৃশ সুনিয়ম কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষাকার্য্য চালাইবার জন্য কি রাজা, কি প্রজা, কাহাকেও চিন্তা বা কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না। শিষ্যগণ যত কেন দুঃস্থ হউন না, শিক্ষাবিষয়ে যত্ন থাকিলে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। সাংসা-রিক শুভাশুভ যাবতীয় কার্য্যে সমস্ত গৃহস্থগণ অধ্যাপক মহাশয়দিগের প্রতি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহারা পদে পদে শিক্ষাকার্য্যের সাহায্য করিতেন, অথচ তজ্জন্য কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিতে হইত না। অধুনা কেবল সংস্কৃতবিদ্যার সমাদর না থাকাতেই পূর্ব্ব শিক্ষা প্রণালী লুপ্তপ্রায় হই-তেছে। যদিও দেশীয় অধ্যাপনার পথ রুদ্ধপ্রায় হইয়াছে, তথাপি দেশবাসী ধনাঢ্য লোকেরা পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ অধ্যা-পকদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। অনেক

অধ্যাপক পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রালোচনা করেন না, নানাপ্রকার কুকার্য্যে রত হন বলিয়াই এক্ষণে দিন দিন তাঁহাদিগের গৌরবেরও হ্রাস হইতেছে। অধ্যাপকতা অতিপবিত্র পদ, উহার গৌরবও বিস্তর ছিল। কিন্তু তাঁহারাই এখন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাতে জলাঞ্জলি দিতেছেন। কতকগুলি ভণ্ড ভানকারী অধ্যাপক-নামধারী মূর্খলোকের দোষে প্রকৃত মহাত্মা অধ্যাপক মহাশয়দিগেরও সম্মানের হ্রাস হইতেছে। না হইবেই বা কেন ? তাদৃশ পবিত্র পথে যখন মিথ্যা প্রতারণা ক্রূরতা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তির সঞ্চার হইতেছে, তখন আর পূর্ব্ব সমাদরের আশা কোথায় ! এমন কি ইহাঁদিগের মধ্যে এমন সকল অধ্যাপক আছেন, যে রজনীযোগে বাবুদিগের বয়স্যভাব প্রাপ্ত হইয়া উপবনে ও বিলাস ভবনে যথেচ্ছাচার করেন, আবার দিবসে গঙ্গাস্নান ও ললাটে মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক নিশার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন। ইংরাজি শিক্ষা করিয়া যে সকল লোক পানভোজনের বিচার করেন না। তাঁহারাও ঐ সকল অধ্যাপকের নিকট যথেচ্ছাচার বিষয়ে পরাভূত হন, সন্দেহ নাই, সুতরাং এরূপ লোক সকল ঐ পবিত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলে কেনই উহার গৌরব রক্ষিত হইবে? অদ্য আমরা অধুনাতন ও পূর্ব্বতন অধ্যাপক মহাশয়দিগের অবস্থার বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইয়া এই সকল কথা কহিতেছি।

অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যার প্রভা যত কেন উজ্জ্বল হউক না, ইদানীন্তন সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চার যত কেন দৈন্যদশা ঘটুক না, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, অধ্যাপক মহাশয়েরা যদি পূর্ব্বাচরিত পথে চলিতেন ও অকৃত্রিমভাবে শাস্ত্র-শিক্ষা করিয়া পূর্ব্ববৎ তাহার উপদেশ দানে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদিগের এরূপ শোচনীয় দশা ঘটিত না, এখনও সাবধান হইলে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ব গৌরব পাইবার অসম্ভাবনা নাই।

আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, এদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। এক্ষণে রাজার সাহায্যদান ও গ্রাম্য চাঁদার দ্বারা যেরূপ কষ্টে সৃষ্টে সামান্য শিক্ষা সম্পন্ন হয়, ইহা অপেক্ষা যে কত উৎকৃষ্ট রূপে এদেশীয় উদার শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হইত, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করণ অপেক্ষা মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেই সহজে বোধগম্য হইতে পারে। প্রণালীগত উৎকর্ষানুসারে কাহাকেও শিক্ষাকার্য্য চালাইবার জন্য যত্ন বা আয়াস স্বীকার করিতে হইত না, অথচ যন্ত্রের ন্যায় সুচারু রূপে এই মহৎ কার্য্য চলিত। এই নিমিত্ত অধ্যাপক মহাশয়েরা নিশ্চিন্ত মনে পাঠনা কার্য্য সম্পাদন করিতেন। শিষ্য বাৎসল্য গুরুদিগের একটী প্রধান গুণ। যাঁহার এই গুণ নাই, তিনি কখনই শিক্ষাগুরুর উপযুক্ত নহেন। শিষ্যগণকে সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা

দিতে হয়। সন্তান কৃতবিদ্য হইলে পিতার যেমন আনন্দ হয়, শিক্ষকেরও তদ্রূপ হওয়া উচিত। নির্ব্বোধ ছাত্র যদি স্বীয় উপদেশের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হইতে না পারে তবে তদ্বিষয়ে সাতিশয় কষ্ট বোধ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অযোগ্য গুরুরাই ঈদৃশ স্থলে ক্রোধাকুল হইয়া উঠেন। ফলতঃ সদ্গুরু সকল শিষ্যের তাদৃশ শোচনীয় দশা দর্শনে মনে মনে কাতরভাবাপন্ন হইয়া যাহাতে তাহার বোধোদয় হয়, নানাবিধ কৌশল করিয়া তাহার চেষ্টা করিতে থাকেন। অতএব যাঁহারা শিক্ষাগুরু হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নেহপূর্ণ মনে এই গুরুতর কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। অতি প্রাচীনকালের আচার্য্যগণ ও মধ্যকালের অনেক অধ্যাপকবর্গ ঈদৃশ গুণশালী ছিলেন; তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। কিন্তু অধুনাতন অধ্যাপকদিগের মধ্যে এরূপ গুণসম্পন্ন গুরু অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শিষ্যবাৎসল্য গুরুদিগের একটী প্রধান গুণ।

মধ্যকালে হিন্দুদিগের রাজ্যাধিকার ছিল না, যবনদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজকার্য্যে দেশীয় ভাষার প্রচলন রহিত প্রায় হয়, তখন অর্থকরী পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিতে অনেকেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাৎকালিক অধ্যাপক মহাশয়েরা পূর্ব্বাচরিত প্রথা পরিত্যাগ করেন নাই। অবিচলিত অধ্যবসায় ও উদ্যম

সহকারে সংস্কৃতশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। দেশের প্রধান প্রধান জমিদারগণও বিলক্ষণরূপে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতেন। এই সময়ে ব্রহ্মত্তর দানের প্রথা বিলক্ষণ প্রবল ছিল। এই কালে নবদ্বীপ কুমারহট্ট প্রভৃতি বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বড় বড় প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক অধ্যাপক সকল অবতীর্ণ হন। তৎপরে ইংরাজাধিকার প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতশাস্ত্রের আলোচনার হ্রাস হইতে থাকে, ইংরাজি শিক্ষায় অর্থলাভ হয়, দেখিয়া এদেশীয় লোক সকল নিজ নিজ সন্তানগণকে ঐ বিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত করিতে লাগিল, ক্রমে বিদ্যোৎসাহী ইংরাজ রাজার উৎসাহ ও যত্নে দেশে অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে ইংরাজি বিদ্যার প্রভা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইংরাজি কেবল অর্থকরী বিদ্যা নহে, ইহার আলোচনায় বিশেষ ফলও আছে। এই বিদ্যার প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়াতে অনেকাংশে দেশের উন্নতিও হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দেশীয় আচার ব্যবহারের মস্তকে পদার্পণ করিয়া অনেকেই ইংরাজদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। অনুকরণ করুন্, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই, কিন্তু গুণের হইলেই মঙ্গল। কেবল পানভোজন ও পরিচ্ছদের অনুকরণ লজ্জাকর মাত্র। আর একটী দুঃখের বিষয় এই, যেরূপ ইংরাজি শিক্ষার প্রথা চলিতেছে, ইহাতে যে, পূর্ব্বকালের ন্যায় উদার শিক্ষা

লাভ্ হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। যাহাতে অস্মদ্দেশীয় যুবক বৃদ্ধ এক এক জন এক এক বিষয়ে বিশিষ্টরূপ কৃতবিদ্য হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে দেশীয় বিদ্যোৎসাহীগণের সবিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। অস্মদ্দেশীয় এম্ এ উপাধিধারীগণের সহিত পরিচয় করিয়া আমরা বিশিষ্টরূপ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না।

যাহা হউক, উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা বিভাগের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে, কথঞ্চিৎ আশা করা যাইতে পারে যে উত্তর কালে আমাদিগের সৎশিক্ষা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা প্রণালী দেখিলে একেবারে অবাক হইতে হয়। অদ্য নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা গুরুমহাশয়দিগের বিষয় আমরা কিছুই বলিতে অবকাশ পাইলাম না বারান্তরে কহিবার বাসনা রহিল।

উপসংহারকালে একটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। দেশীয় বিদ্যার উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। তাহাতে যদি এদেশ বঞ্চিত থাকে, তবে কি বিদ্যোৎসাহী রাজা ও কি বিদ্যোৎসাহী প্রজা ইহাঁরা কিছুই করিতে পারিলেন না।

কল্কিপুরাণ।

সূত কহিলেন, অনন্তর রাজন্যবর্গ সমাদরের সহিত অনন্তকে জিজ্ঞাসা করিলে, অনন্ত তপস্যা দ্বারা মোহের অপনয়ন ও ইন্দ্রিয়

নিগ্রহের বিষয় কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, হে রাজগণ! তৎপরে আমি বনে গমন করিয়া যথাবিধি তপস্যা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কোন রূপেই ইন্দ্রিয় সকল ও মনকে নিগৃহীত করিতে পারিলাম না। ঐ বনমধ্যে আমি যখন পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হই অমনি স্ত্রী, পুত্র, ধন, ও অন্যান্য বিষয় সকল আমার স্মরণ হইতে থাকে। স্ত্রী পুত্রাদির স্মরণ মাত্রেই আমার মনে নানাপ্রকার ভয় ও শোকের আবির্ভাব হয় এবং ঐ শোকভয়ে আমার জীবনে কষ্টদান করে ও তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। অনন্তর আমি ইন্দ্রিয় নিগ্রহে একবারে দৃঢ় নিশ্চয় হইলাম এবং ভাবিলাম যে, স্থির প্রতিজ্ঞ হইলে অবশ্যই ইন্দ্রিয় সকল সংযত হইবে সন্দেহ নাই। তাহার পর দিক্, বায়ু, সূর্য্য, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র; এই দশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা আমাকে ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ব্যগ্রচিত্ত দেখিয়া আপন আপন আকার ধারণ পূর্ব্বক আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, ভো অনন্ত! আমরা ইন্দ্রিয়গণের দেবতা; তোমার শরীরে বাস করিয়া থাকি। তুমি আমাদের শরীরে নখাগ্রের দ্বারা একটী সামান্য আঘাতও করিতে পারিবে না। হে অনন্ত! তোমার এই মনোনিগ্রহ রূপ দুরূহ কার্য্য কিছুতেই সুসিদ্ধ হইবে না; তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিতে গিয়া আপনিই বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। দেখ, কি অন্ধ, কি বধির, কি বিকলেন্দ্রিয়, কি বনবাসী; সকলেরই মন সর্ব্বদা বিষয়াস্বাদে ব্যগ্র। তুমি নিশ্চয় জানিও, জীবই এই সংসারের গৃহস্থ, দেহই ঐ জীবের গৃহ, এবং ঐ দেহ সর্ব্বদাই মনের বশীভূত; বুদ্ধিই ঐ জীবরূপ গৃহস্থের ভার্য্যা; আর আমরা সর্ব্বদাই ঐ বুদ্ধির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি। মনই কর্ম্মবদ্ধ জীবের বন্ধন ও বিমুক্তির হেতু

এবং ঐ মনই বিষ্ণু-মায়া দ্বারা জীবকে সংসারী করিয়া থাকে ; অতএব যদি তুমি মনের নিগ্রহ সাধনে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে বিষ্ণু-ভক্তির আচরণ কর। বিষ্ণুভক্তি হইতে সুখ ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে এবং বিষ্ণুভক্তিই সর্ব্বকর্ম্ম বিনাশিনী। বিষ্ণুভক্তি হইতেই দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞানরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মহামতে! তুমি বিষ্ণুভক্তি বলেই দেহান্তে ভগবান্ কল্কির সাক্ষাৎকার ও তজ্জনিত অক্ষয় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

আমি এইরূপে তাঁহাদিগের কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া ভক্তি সহকারে বিধিপূর্ব্বক কেশবের অর্চ্চনা করিলাম। পরে কলিকুলান্তক কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমি অরূপের রূপ দর্শন, অপদের পদপল্লব স্পর্শ, এবং বাক্যহীন পরমাত্মা কল্কির অমৃতময় বচন শ্রবণ করিলাম। অনন্ত এইরূপে মহা আহ্লাদে আপন অভীষ্টদেব কমলাক্ষ পদ্মানাথ কল্কিকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। নরপতিগণও অনন্তের বাক্যানুসারে পদ্মাসহিত ভগবান্ কল্কিকে পূজা ও নমস্কার করিয়া মুনিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ পদবী প্রাপ্ত হইল।

শুক কহিল, এই অনন্তকথা মায়া ও অজ্ঞান তিমির নষ্ট করিয়া থাকে এবং ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে লোকে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি সংসার সাগরে সন্তরণ করিতে অভিলাষী হইয়াও বিষ্ণুসেবায় তৎপর হয়, এবং ভক্তি পূর্ব্বক এই ভেদশূন্য পুণ্য আখ্যান পাঠ করেন তিনি সদ্ভক্তিরূপ দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া জ্ঞানোন্মেষরূপ অসি দ্বারা আত্মস্থিত ছয় রিপুকে জয় করিতে পারেন।

দ্বিতীয়াংশের পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অংশ।—ষষ্ঠ অধ্যায়।

নরপতিগণ গমন করিলে পর ভগবান্ কল্কি পদ্মাকে লইয়া সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে সিংহল হইতে শম্ভলে গমন করিবার অভিলাষ করিলেন। সুরপতি ইন্দ্র কল্কির ঐ অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি অবিলম্বে শম্ভলগ্রামে মনোহর উদ্যান; এবং রত্ন, স্ফটিক, বৈদূর্য্য ও মহামূল্য মণি দ্বারা অলঙ্কৃত প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া দাও। ফলত ঐ বিষয়ে তোমার শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে। বিশ্বকর্ম্মা সুরপতির ঐ কথা শুনিয়া আপন মঙ্গলকামনায় কমলাপতির নিমিত্ত শম্ভল গ্রামে মনোহর প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ সকল প্রাসাদ হংস, সিংহ ও সুপর্ণাদি জীবের মুখচিত্রে চিত্রিত, বহুসংখ্যক বাতায়নে অলঙ্কৃত ও নানাবন, লতা, উদ্যান, বাপী ও সরোবর সকলে সুশোভিত হইয়া সুরপতির অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কমলাপতি কল্কি সেই কারুমতী পুরী পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে সিংহলের বহির্দ্দেশে সমুদ্রতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃহদ্রত ও কৌমুদী তাঁহারা উভয়েই ভাবী অপত্য বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই পদ্মা ও পদ্মাপতির মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর মহারাজ বৃহদ্রত ভক্তি, স্নেহ ও আহ্লাদের সহিত কমলাসহিত কমলাকান্তকে দশ সহস্র গজ, একলক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্ব, দুই সহস্র রথ ও দুইশত দাসী প্রদান করিলেন। প্রস্থানকালে কল্কি ও পদ্মা উভয়েই বৃহদ্রত ও তাঁহার পত্নীকে কালোচিত প্রণা-

সাদি করিলেন, বৃহদ্রথও জামাতা এবং কন্যা কর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পত্নীর সহিত আপন কারুমতী পুরীতে আগমন করিলেন।

ঐ স্থানে সৈন্য পরিবৃত ভগবান্ কল্কি এক জম্বুককে সমুদ্র পার হইতে দেখিয়া একবারে স্তব্ধ হইলেন। পরে আপনিও সমস্ত বল বাহন এবং পদ্মার সহিত সমুদ্র জলের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাহার পর কমলাপতি কল্কি সাগরের পরপারে গমন করিয়া শুককে বলিলেন, দেখ শুক! বিশ্বকর্ম্মা সুরপতির আদেশে আমার প্রিয়চিকীর্ষায় শম্ভলগ্রামে সুশোভন ভবন সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তুমি অগ্রে সেই স্থানে গমন করিয়া পিতা মাতা ও জ্ঞাতি-গণকে আমার মঙ্গল সম্বাদ দাও; এবং আমার বিবাহ সম্বাদও বলিতে বিস্মৃত হইওনা, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। আকাশগামী সর্ব্বজ্ঞ সুধীর শুক কল্কির ঐ কথা শুনিয়া সুরপূজিত শম্ভলে যাত্রা করিল। শুক শম্ভল সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিল; এক্ষণে ঐ গ্রাম সপ্তযোজন বিস্তীর্ণ, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণে সমাকুল, রবিকিরণ সদৃশ সমুজ্জ্বল, শত শত প্রাসাদ সকলে সুশোভিত ও সর্ব্বর্ত্তু সুখপ্রদ। কীরবর এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া রহিল। পরে প্রফুল্ল-চিত্তে পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তর, প্রাসাদ হইতে প্রাসাদান্তর, বন হইতে বনান্তর ও বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তর অবলোকন করিয়া পরিশেষে বিষ্ণুযশার সদনে উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া মহাত্মা বিষ্ণুযশাকে সমস্ত শুভ সম্বাদ নিবেদন পূর্ব্বক পরি-শেষে বলিল; ভগবান্ কল্কি সিংহল হইতে পদ্মার সহিত আগমন করিতেছেন। মহাত্মা বিষ্ণুযশা শুকমুখে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রেই আহ্লা-দিত হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে আহ্বান পূর্ব্বক ভূপতি বিশাখ যূপের

নিকট এই শুভসম্বাদ পাঠাইলেন। নরপতি বিশাখযূপ মনোহর,কুসুম ও রম্ভা পূগ প্রভৃতি ফলদ্বারা পুরী সুশোভিত,এবং কালাগুরু ও ধূপ-দ্বারা সুগন্ধিত করিয়া রাখিলেন। লাজ, অক্ষত ও চন্দনলিপ্ত, পুণ্য-সলিলপূর্ণ সুবর্ণকুম্ভ সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। ঐ সময় শম্ভল গ্রাম সুরগণেরও মনোহর হইয়া উঠিল। পরে সেনা-পরিবৃত কৃপাময় কল্কি পুরনারীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পদ্মা ও পদ্মানাথ উভয়ে পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতামাতার চরণে প্রণিপাত করিলেন। অমরাবতীতে সুরপ্রসূতি অদিতি যেমন সুরপতি ও শচীকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, ভাগাবতী সুমতিও পুত্র এবং পুত্রবধূকে পাইয়া সেইরূপ কৃতার্থ ও আহ্লাদিত হইলেন।

তৎকালে ধ্বজ-পতাকা-শালিনী শম্ভল নগরী ভগবান্ কল্কিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া বামনয়না অঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অবরোধ উহার জঘন দেশ, প্রাসাদ উহার অত্যুন্নত পয়ো-ধর, প্রাসাদস্থ ময়ূরগণ উহার চুচক,হংসমালা উহার মনোহর হার, পটবাস ও ধূম উহার বসন, কোকিলের কলরব উহার মধুরালাপ এবং গোপুরই উহার মনোহর সহাস-বদন। কলিবিনাশন কল্কি ঐ পুরীমধ্যে বহুদিন ব্যাপিয়া পদ্মার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কামকলার গর্ভে কবির পরমধার্ম্মিক দুই পুত্র জন্মিল। উহাদের একের নাম বৃহৎকীর্ত্তি ও অপরের নাম বৃহদ্‌বাহু। উহারা দুইজনেই মহাবল পরাক্রান্ত। প্রাজ্ঞের ঔরসে সন্নতির গর্ভে সর্ব্ব-লোক পূজিত বিজিতেন্দ্রিয় যজ্ঞ ও বিজ্ঞ নামে দুই পুত্র এবং সুম-ন্ত্রের ঔরসে মালিনীগর্ভে শাসন ও বেগবান্ নামে সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্ন সাধুদিগের পরমোপকারী দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। পরিশেষে ভগ-

বান্ কল্কি পদ্মার গর্ভে জয় ও বিজয় নামে লোকবিশ্রুত মহাবল দুই পুত্র উৎপাদন করিলেন। পরে অমাত্যপরিবৃত ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর কল্কি পিতামহতুল্য পিতাকে অশ্বমেধ যজ্ঞবিধানে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, আমি দিক্‌পাল সকলকে পরাজয় করিয়া ধন আহরণ পূর্ব্বক আপনার যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দিব। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করি। পরপুর-নাশন কল্কি এই কথা বলিয়া পিতৃচরণে প্রণাম পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে সেনাগণে পরিবৃত হইয়া সুবিপুল কীকট পুরে যাত্রা করিলেন। ঐ নগর বৌদ্ধদিগের আলয়। উহারা বেদধর্ম্মশূন্য, পিতৃ ও দেবার্চ্চনাবিহীন, পরলোক বিলোপী, আত্মগৌরবতৎপর, জাতিকুল-বর্জ্জিত ও আত্মপরে অভেদদর্শী। ঐ নগর নানাধন, স্ত্রী, নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য এবং পানভোজনতৎপর জনসমূহে সমাকীর্ণ। মহাবল জিন কল্কির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া দুই অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় বহুসংখ্যক ধ্বজ পট হইতেই সমস্ত আতপতাপ নিবারিত হইল এবং পৃথিবী অসংখ্য গজ, রথ, তুরঙ্গ ও কনক ভূষণে ভূষিত অস্ত্রশস্ত্রধারী রথিগণে আবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

দ্বিতীয় অংশের ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

আর্য্য জাতির জ্যোতিষ শাস্ত্রের আদিমত্ব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত 'বেদ' হিন্দু-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। সেই 'বেদ' হইতেই বেদাঙ্গের উৎপত্তি। বেদাঙ্গ ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দস্। সুতরাং জ্যোতিষ বেদাংশানুসারে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্গত। ধর্ম্মশাস্ত্রোন্নতি সম্বন্ধে আদিম হিন্দুদিগের আকাঙ্ক্ষা যেরূপ বলবতী ছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য কি যে, জ্যোতিঃশাস্ত্র সেই ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া এরূপ মহতী উন্নতির সোপান শ্রেণীতে অধিরোহণ করিবে যে, তাহার সহস্র সহস্র বৎসর পরেও বিদেশীয় বহু পূর্ব্বাবিক্ষিত ও সমালোচিত সেই শাস্ত্রের সমকক্ষ হইতে অদ্যাপিও পারিয়াছে কিনা সন্দেহস্থল। এমন কি, যাহা খৃষ্টের শত শত বর্ষ পূর্ব্বে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি হিন্দু-দিগের সকলেই জানিতেন, তাহাও বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদেরা অনু-সন্ধান করিয়া পান নাই, যদিও পাইয়া থাকেন, সে অতি অল্পদিন মাত্র। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ব্বে বিদেশীয়দিগের কমেটকে (Comet) জড় পদার্থ (Material) বলিয়া ভ্রম ছিল. অল্প দিন হইল, সুপ্রসিদ্ধ এন্‌কি সাহেব * উহাকে বাষ্পীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কমেটের এ দেশীয় নাম ধূমকেতু। এই ধূম শব্দ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'ধূমকেতু বাষ্পীয়'। একথা হিন্দুরা শতসহস্র বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন। ফলতঃ হিন্দু-জ্যোতিষ সকলকে

* See Encke's Force and Nature.

পরাভূত করিয়া এরূপ দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়াছিল যে, কাহার সাধ্য তাহার আর অনুসরণ করে ? কিন্তু এই যে উন্নতি, এই যে জ্যোতিঃশাস্ত্রোন্নতি, এই উন্নতি কোথা হইতে আসিল ? প্রাচীন হিন্দুরা শত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে স্বকীয় বাহুবলে পার্শ্বস্থ যাবতীয় শত্রু-বিদ্রোহীগণকে (কি স্বজাতীয় কি বিজাতীয়) করতলস্থ করিয়া যে নির্ব্বিঘ্ন, নিস্তব্ধতা ও স্থিরতা ভোগ করিতেছিলেন, এবং ঘোর চিন্তাই এবং অমেয় ও অতুল অধ্যবসায়শীলতা যে নিস্তব্ধতা ও স্থিরতার অমোঘ ফল, সেই চিন্তা ও অধ্যবসায়শীলতার ফল কি এই উন্নতি ? অথবা ইহা ম্লেচ্ছদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত ?

এক্ষণে দেখা যাউক, এই ম্লেচ্ছশব্দে কাহারা বাচ্য ? সাধারণতঃ ইহা দ্বারা হিন্দুভিন্ন সকল জাতিকেই বুঝায় । কিন্তু আদিম হিন্দুরা সেই সকল জাতিকেই যে জানিতেন, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না । সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক সাহেব (Colebrooke) বলেন, বিদেশীয়-দিগের মধ্যে পারসিক, যবন, রোমক, হিন্দুদিগের জ্ঞাত ছিল । পারসিক ও যবন ক্রমান্বয়ে পারস্যবাসী ও গ্রীশবাসীদিগকে যে বুঝাইত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না, কিন্তু রোমক শব্দ ঘোর তিমিরাবৃত, এক্ষণে তাহারি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজনীয় । ' সিদ্ধান্ত শ্রীমণিতে ' ইহা কথিত আছে যে, যখন রোমকদেশে রাত্রি দুই প্রহর,তখন লঙ্কাদ্বীপে সূর্য্যোদয়, ইহাতে রোমক শব্দে ইটালীর অন্তর্গত রোমনগরীকে বুঝাইতে পারে * । উইলফোর্ড সাহেবও

* The western country called Romaka, where it is said to be midnight when it is sunrise at Lanka, may perhaps be Rome also. Elphinstone's History of India. Book III. Chap. 2.

এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন † ; কিন্তু আদিম হিন্দুরা রোমনগরী সম্বন্ধে যে কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? বর্ত্তমান সময়েও তাহা তাঁহারা জ্ঞাত আছেন কিনা সন্দেহ স্থল ‡ । এক্ষণেও পারস্যদেশে রোম শব্দে এসিয়া মাইনরকে বুঝায় । অতএব দেখা যাইতেছে যে, রোমক শব্দে রোমীয়দিগকে (Romans) বুঝাইতে পারে, এবং এসিয়ামাইনরবাসী ক্যাল্‌ডিয়ানস্‌ ও সিদিয়ানসদিগকেও বুঝাইতে পারে $; আমরা বিবাদ ভঞ্জনার্থ উভয় জাতিকেই উক্ত শব্দান্তর্গত করিলাম । ইহা ভিন্ন আর্য্যেরা চীনবাসী (Chinese)¶ এবং ইজীপ্‌টবাসী (Egyptian) দিগকেও জানিতেন । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে হিন্দুরা চীনবাসী, আরব ও পারস্যবাসী, সিদিয়ানস্‌ ও ক্যালডিয়ানস্‌, ইজীপ্‌টবাসী, রোমান ও গ্রীকদিগকে চিনিতেন । এক্ষণে এই দেখান যাইতেছে যে, আর্য্যদিগের জ্যোতিষোন্নতি এই ছয় ম্লেচ্ছ জাতিদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হয় নাই, এবং তাহাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং তাহা হইলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, হিন্দুদিগের এতৎ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় উন্নতি স্বকীয়োন্নতি,—ম্লেচ্ছদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত নহে ।

---

† See Asiatic Researches Vol VIII. p. 367.

‡ But it is to be observed that Rome and Italy are to this day quite unknown in the east. Even in Persia Rum-means Asia Minor. Elphinstone's History of India. Book III. Chap. 2.

$ There is a good reason to think that they knew the Scythians under the name of Sacas. Ibid.

¶ China they certainly knew. Ibid.

প্রথম চীনবাসী।

এই দেশে জ্যোতিষ বহু পূর্ব্বকাল হইতে আলোচিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কোন্ সময়ে এই দেশে ইহার প্রথম প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা নির্ণয় করা অতিশয় দুরূহ। এই অসাধ্য সাধন সম্পাদনের জন্য যে সকল অনুমানের সহায় লইতে পারা যায়, যাহার উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি, তাহা এরূপ অল্প সংখ্যক যে, আমরা ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য ও ভ্রমশূন্য হইবে না, তথাচ আমরা যে ক্রমেই সত্যের নিকটবর্ত্তী হইব, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। পুরাকালে এই শাস্ত্র মানব ভাগ্য সম্বন্ধে একপ্রকার ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিবেচিত হইত। যদি আকাশে গ্রহণ হইল, অথবা ধূমকেতু উঠিল, তাহা হইলে হুলস্থুল ব্যাপার! রাজার রাজ্যধ্বংস হইবে, রাজত্বে বিদ্রোহ হইবে, দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে ইত্যাদি বিপদ সংঘটনের অনুমান করিয়া দেশবাসী, গ্রামবাসী, নগরবাসী সকলেই মহাভীত হইতেন, নিস্তার নাই;—সকলকেই মরিতে হইবে। কত রাজা যুদ্ধ সময়ে এই সকল কারণবশতঃ রণে ভঙ্গ দিয়াছেন, কত রাজা শত্রুর পদানত হইয়া কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহার স্থির নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। চীন দেশেও যে এই মত প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের সহিত পরস্পর কোন সংস্রব ছিল না, এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমরা জানি না। আমরা শুনিতে পাই যে, খৃষ্টের চতুর্থ শতাব্দীতে জনৈক চীনবাসী এদেশে ভ্রমণ করিতে আইসেন, সুতরাং ইহার পূর্ব্বে যদি চীনের সহিত সংস্রব অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই সময়ের প্রমাণের

প্রয়োজন নাই ; যেহেতু চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বকালীক উভয় দেশীয় জ্যোতিষ ঐক্য কিম্বা অনৈক্য হউক, মিলুক বা নাই মিলুক, যখন আমরা সেইকালের সংস্রব মাত্রই অস্বীকার করিতেছি, তখন ইহা নিশ্চয় যে, উক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে কেহই কাহার নিকট ঋণী নহেন। কিন্তু এই অস্বীকারের প্রমাণ গুরুতর না হওয়াতে, আমরা অতি পূর্ব্ব হইতেই (যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারি) উভয় দেশীয় জ্যোতিষের কাল নির্ণয় করিয়া উহাদিগের পরস্পর অসংস্রবতা দেখাইব।

ফাদর গবিল (Father Gaubil) চীনদেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র লইয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি ঐ দেশীয় ঐ শাস্ত্রের সকল বিষয় লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই শাস্ত্র সম্বন্ধীয় চুকিং নামক আর একখানি পুস্তকে দেখা যায় যে, চীনবাসীদিগের গ্রহণ গণনার কাল খৃষ্টের ২৩০০ বর্ষ পূর্ব্বে কিন্তু তাহার অম্লান সহস্র বৎস পূর্ব্বে আর্য্যদিগের গণনার কাল দেখা যায় ||।

ইহার অনেক পরে ৭২০ হইতে ৪৮১ অব্দ পর্য্যন্ত (খৃঃ পূঃ) চীন বাসীরা প্রস্তাবিত শাস্ত্রের অধিক উন্নতি করিয়া উঠিতে পারেন নাই; বাল্যকালে যে গ্রহণগণনা, এখনও সেই গ্রহণগণনা, অধিক কিছুই শিক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গ্রহণই জ্যোতিঃশাস্ত্র, এই

|| The most curious of all the Indian tables are those brought from Trivalore by M. Le. gentil and analysed atlength by Bailly in his Indian Astronomy (chap. II). The epoch of these tables is the year 3102 before Christ at which time they suppose a general injunction on the eccliptic of the sun, moon and planets. Library of useful knowlege. Natur-al Philosophy. History of Astronomy. p. 9:

তাঁহাদিগের জ্ঞান ছিল, সুতরাং ইহা কিরূপে সম্ভব, যে সেই শাস্ত্র, যাহার এরূপ দুরবস্থা, সেই শাস্ত্রের নিকট আর্য্যেরা ঋণী।

আবার দেখা যায় যে খৃষ্টের ১৬৪ বৎসর পরে † চীনবাসীরা রোমীয়দিগের সহিত গতিবিধি আরম্ভ করে, এবং ইহাতে এই স্থির করা যাইতে পারে, যে চীনেরা রোমীয়দিগের নিকট হইতে আপনাদিগের শাস্ত্রের পুষ্টতা সম্পাদন করিয়াছেন। অত্র সাময়িক হিন্দুরা চীনবাসীদিগের নিকট হইতে আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, একথা নিতান্ত অযৌক্তিক, কারণ যে জাতির যে বিষয় এরূপ দুরবস্থায় পতিত, যাঁহারা বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে তাহার সৌষ্ঠবতা সম্পাদন করেন, সেই জাতির নিকটই যে আর্য্যেরা সেই বিষয়ের জন্য ঋণী হইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

যে বীর দস্যু সমস্ত ভারতকে বিলোড়িত করে, যাঁহার তীক্ষ্ণতরবারি অবিশ্রান্ত রুধির ধারায় ভারতকে প্লাবিত করে, সেই জেঙ্গিস্ খাঁ কর্ত্তৃক ১২১৬ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে চীনদেশ জয় সম্পাদিত হয়, এবং সেই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও ইজীপ্টবাসী কতিপয় জ্যোতির্ব্বিদ আসিয়া চীনদেশের মৃতবৎ জ্যোতিঃশাস্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে, কিন্তু সে ১২১৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যকাল, তাহার সহিত আদিম হিন্দুদিগের কোন সংস্রব নাই, এবং মধ্যকালের অসংস্রবতা প্রদর্শন করাও এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়; ফলে এখন এই দেখান গেল, যে আদিম হিন্দুরা আদিম চীনবাসীদিগের নিকট উক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে ঋণী নহেন ‡।

---

† It seems that, about the year 164 after Christ, the Chinese began to have communication with subjects of the Roman empire. Ibid p. 6.

‡ The conquest of Gent-chis-Khan, who brought with him men well versed in the languid of Ptolemy and the Arabs, gave a fresh impulse to the languid state of the Chinese astronomy; but the ameliorations then introduced belong rather to the history of middle ages. Ibid. p. 7

পূর্ণশশী।

পূর্ণশশী স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বর্ণন করিয়া তিনিও হাসিলেন, শুনিয়া পত্রিকাও হাসিলেন। কিন্তু এই হাসির সঙ্গে একটী অপূর্ব্ব ঘটনা হইল। পত্রিকা কহিলেন, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম;—অবিকল ঐরূপ। তুমি দেখিয়াছ, আমি পুরুষমানুষ হইয়াছি, আমি দেখিয়াছি, তুমি পুরুষ হইয়াছ। তুমি শুনিয়াছ, আমি গীত গাইতেছি, আমি শুনিয়াছি, তুমি গীত গাইতেছ;—চমৎকার স্বর, চমৎকার গলা, আর চমৎকার ভাব! সেই গীতটী গাইয়া তুমি আমারে বিবাহ করিতে চাহিতেছ!—আমি যেন আদর করিয়া তোমার হাত ধরিতে যাইতেছি, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে গীতটী পর্য্যন্ত এখনো অবিকল আমার মনে আছে।

"মনে আছে?—সে কি?—স্বপ্নের কথা কি মনে থাকে?" বিস্মিত নয়নে এই প্রশ্ন করিয়া পূর্ণশশী কহিলেন, আচ্ছা কই বল দেখি?

"শুনিবে?—শুনিবে?—এই শুন,—বলিতেছি।" বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রফুল্ল বদনে এই কথা বলিয়া ললিত রাগিণীতে পত্রিকা এই গীতটী ধরিলেন।—

গীত।

(হিন্দির অর্থ।)

সে যারে বাসনা করে, তারে বিধি দেন তারে।
আমার কপালে কেন, সে বিধি না হতে পারে॥
নলিনী সলিলে ভাসে, তপন রহে আকাশে,
তথাপি প্রমোদে হাসে, দোঁহে নিরখি দোঁহারে॥

মিনতি করি তোমারে, আশা বিতর আমারে,
ভাসি এসো একাধারে, প্রেম পারাবারে ঃ—
নব প্রভাকর আমি, ফুল্ল কমলিনী তুমি,
এক জীব তুমি আমি, দেহ দেহ প্রেমাধারে ॥

গীতটী সমাপ্ত করিয়া হাসি মুখে পত্রিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই নয় ?—এই গীতটী তুমি গাও নাই ?

ঈষৎ হাস্য করিয়া পূর্ণ-শশী কহিলেন, মনে নাই। স্বপ্নে কি বলিয়াছি, কিরূপে স্মরণ করিব ? কিন্তু কখনো এমন গীত আমার মনে আইসে না। কখনো কাহারও মুখে শুনিও নাই।

পত্রিকা হাস্য করিয়া বলিলেন, তাহাও কি হইতে পারে ? স্বপ্নে তুমি পুরুষ হইয়াছিলে, স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ তখন তোমার ছিল না, কিরূপে মনে করিবে ? কিন্তু ভাই পূর্ণ-শশি !—তুমি পূর্ণ-শশী,—তুমি কুমুদিনীরে ভাল বাস,—আবার প্রভাকর কবে হইলে ?—কমলিনীরে ভাল বাসিতে কবে শিখিলে ? তুমি পূর্ণ-শশী, তুমি আমারে কমলিনী না বলিয়া যদি কুমুদিনী বলিতে, তাহা হইলে আমি তোমারে বিবাহ করিতাম। যখন তুমি আমারে কমলিনী বলিয়াছ, তখন আমি তোমারে বিবাহ করিতে পারিব না। পূর্ণ-শশীর উদয়ে কমলিনী মলিনী হইয়া যায়,—আমি তোমারে বিবাহ করিব না, আমি তোমার নিত্যকামীরে বিবাহ করিব। সে ব্রাহ্মণকে আমি বাক্য দিয়াছি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমারে কমলা বলিয়াছেন, আমি তাঁহারে কমলাকান্ত বলিয়া বাগ্‌দান করিয়াছি, বাগ্‌দত্তা হইয়াছি, আমি কমলাকান্তকে বিবাহ করিব। পূর্ণশশীকে বিবাহ করিব না। কমলিনী পূর্ণশশীকে বিবাহ করে না।

পূর্ণ-শশী লজ্জা পাইলেন। লজ্জায় নতমুখী হইয়া কহিলেন, পূর্ণ-শশী মেয়ে মানুষ।

পত্রিকা আসন হইতে উঠিলেন। নিকটে গিয়া পূর্ণশশীর চিবুকে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া সাদরস্বরে কহিলেন, ওরে আমার বিলাতী দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক! এই বয়সে তোমার এতদূর শাস্ত্রজ্ঞান হইয়াছে? আমাদের দেশের পূর্ণশশী মেয়েমানুষ নয়, বিলাতের পূর্ণশশী মেয়েমানুষ।

অন্তরালে দাঁড়াইয়া নিত্যকামী তাঁহাদের বাক্‌চাতুরী শ্রবণ করিতেছিলেন। যখন শুনিতে পাইলেন, পূর্ণশশী পুরুষ হইয়াছিল, পত্রিকা তাহাকে বিবাহ করিবে, তখন আত্মাপুরুষ নিকটে ছিল না; যখন শুনিলেন, পত্রিকার বাগ্‌দান মনে আছে, কমলাকান্তকে বিবাহ করিবে বলিল, তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। আনন্দের বেগ ধারণ করিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া কহিলেন,— হুঁঃ!—সুন্দরি! হুঁঃ!—কমলাকান্ত; হুঁঃ! পূর্ণশশী মেয়েমানুষ; হুঁঃ!

পত্রিকা ও পূর্ণশশী উভয়েই চম্‌কিয়া উঠিলেন। স্বর বুঝিয়া পত্রিকা বাহিরে গেলেন, কথোপকথন বন্ধ হইল; পূর্ণশশী আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পত্রিকার সহিত নিত্যকামীর কিছু কিছু রহস্য হইল, তাহা পাঠক মহাশয়ের শ্রবণ করিয়া বিশেষ আমোদ হইবে না, অতএব তাঁহাদিগকে গোপনেই আলাপ করিতে রাখা গেল।

সর ওয়াল্‌টর স্কট্ তাঁহার নবন্যাসের নায়ক নায়িকাগণকে প্রাতঃকালে হস্তমুখ প্রক্ষালন ও মধ্যাহ্নে স্নান করিবার অবসরও উল্লেখ রাখেন নাই, মুখপ্রক্ষালন ও স্নানাদির পূর্ব্বে আহার করিতে বসাই-

য়াছেন, এই অপরাধে আজকাল ইউরোপের কৃতার্থ আলোচক যোধগণ ওয়েবরলী-ন্যাসের উরুদেশে গদাঘাত করিতেছেন। আমরা তাদৃশ পাঠকের তৃপ্তি বাসনায় লক্ষ্মণাবাসের নায়িকাদুটীকে প্রাতঃকৃত্যে ও মধ্যাহ্ন কর্ত্তব্যে প্রেরণ করিলাম। অর্দ্ধ দিবা অতিবাহিত হইল।

অপরাহ্নে পত্রিকা একটু মুখ ভারি করিয়া নিত্যকামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিত্যকামী মন খুলিয়া কথা কহিলেন না, প্রাতঃকালের আলাপে যেন কিছু কথান্তর হইয়াছিল, নির্ব্বোধ বিদূষক হয় ত সুকুমারী গন্ধর্ব্বকুমারীকে কিছু কটু কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই পত্রিকা বিষণ্ণ, নিত্যকামী রাগান্বিত। পত্রিকা কহিলেন, দ্বিজবর! যদি তুমি আমারে কন্টক বোধ করিয়া থাক, আমি চলিলাম, অনুচর-অনুচরীরা রহিল, পূর্ণশশী রহিলেন, সাবধানে যত্ন করিয়া রাখিও, আমি রাজকুমারের সহিত শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি; তাঁহার সাক্ষাতে তোমার যাহা কিছু অভিযোগ থাকে, জানাইও, যাহা কিছু বলিবার থাকে, বলিও। আমিও সেই সময় বিদায় লইব।

নিত্যকামী উত্তর দিলেন না। পত্রিকা ক্ষণকাল সেখানে অপেক্ষা করিয়া পূর্ণশশীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার প্রকৃতির ভাবান্তর। তিনি পূর্ণশশীকে কহিলেন, ঋষিকন্যে! কিছু দিন একাকিনী থাকিবে?

———"কেন?"

———"জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

———"তুমি কোথায় যাইবে?"

———"তুমি একাকিনী থাকিবে?"

———"বাটীর আর আর সকলে কোথায় যাইবে?"

——“আর কেহ যাইবে না ; কেবল আমি একা।”

পত্রিকার শেষ কথা শুনিয়া পূর্ণশশী বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, তুমি একা কোথায় যাইবে?—পত্রিকা উত্তর করিলেন, রাজকুমারের বিলম্ব হইতেছে, অগ্রণী হইয়া লইয়া আসিব।

পূর্ণশশী নিস্তব্ধ হইলেন। ক্ষণপরে মৌনভঙ্গ করিয়া কহিলেন, বিলম্ব হইতেছে, তাহাতে ভাবনা কি? তিনি রাজপুত্র,—পুরুষ মানুষ,—বীরপুরুষ,—লোকজন সঙ্গে আছে, ভয় কি?—তুমি স্ত্রীলোক, কোথায় অন্বেষণ করিতে যাইবে?

অবসর পাইয়া পত্রিকা হাস্য করিয়া কহিলেন, কেন?—তুমি ত স্বপ্নে দেখিয়াছ, আমি পুরুষ মানুষ হইয়াছি, তবে আর ভয় কি? আমি স্ত্রীলোক নই।

পূর্ণশশী মৃদু হাস্য করিলেন, কহিলেন, সত্য সত্যই গন্ধর্ব্বের মায়া বুঝা ভার! তোমার আকৃতিখানি যদি এত মনোহর না হইত, তোমার চক্ষুদুটী যদি এত ভালবাসা মাখানো না হইত, তোমার কথাগুলি যদি এত মিষ্ট মিষ্ট না হইত, তাহা হইলে কেহই তোমারে,—সত্য বলিতেছি পত্রিকে!—তাহা হইলে কেহই তোমারে বিশ্বাস করিত না।—আমি ত করিতাম না,—অপরে কি করিত, জানি না। হাসিতে হাসিতে এই কটী কথা কহিয়া হাস্য বদনে আবার কহিলেন, আরো শুন পত্রিকে, যদি তুমি আমার পরম উপকারিণী না হইতে, তাহা হইলে তোমারে বিশ্বাস করিতে আমার ভয় হইত।

“বিশ্বাস করিতে ভয়ই হয়, কি সাহসই পাও, সে কথা পরের বিবেচনা, এখন মন খুলিয়া বল দেখি, কিছু দিন একাকিনী থাকিতে পারিবে কি না?”

" পারিব।—থাকিব।—শীঘ্র আসিও।" পত্রিকার প্রশ্নে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া পূর্ণশশী গম্ভীর বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, " কবে যাইবে ? "

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া পত্রিকা উত্তর করিলেন, " অদ্যই যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। " পূর্ণশশী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, " কত দিন বিলম্ব হইবে ? "

" যে কারণে যাইতে হইতেছে, তাহা অনিশ্চিত। বোধ করি, সপ্তাহের অধিক হইবে না।"

কথোপকথনে দিবা অবসান হইল। সূর্য্যদেব সরলা পূর্ণশশীর হৃদয়কে সখী-বিরহে আকুল করিয়া অস্ত গমন করিলেন। গোধূলি, ক্রমে সন্ধ্যা, দেখিতে দেখিতে রজনী সমাগত। শুক্লপক্ষ রজনী,—আকাশ নির্ম্মল, গগনমণ্ডলে অপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল যথাসাধ্য দীপ্তি বিকাস করিল। পত্রিকা গাত্রোত্থান করিয়া কিঙ্করীগণকে ডাকিলেন। পূর্ণশশী একাকিনী থাকিলেন, সর্ব্বদা নিকটে থাকিও, যখন যাহা আবশ্যক হইবে, প্রদান করিও, আমি যেমন সাবধানে রাখিতেছি, এই প্রকার সাবধানে রাখিও, যেন অযত্ন না হয়। অনুচরীগণকে এই আদেশ দিয়া পূর্ণশশীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "অভিমানিনি ! অভিমান ত্যাগ কর, ঈশ্বর প্রসাদে শীঘ্রই আমি যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যাগত হইতেছি। পূর্ণশশী সাশ্রুনয়নে কহিলেন, যদি একান্তই যাইতে হয়, অদ্য রাত্রি হইল, রজনী প্রভাতে যাত্রা করিও, রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের বাটীর বাহির হওয়া অসম সাহস। কুলের অপ্রথা, বিশেষতঃ তুমি দূরদেশে যাইবে।

পত্রিকা হাস্য করিয়া কহিলেন, তোমার সকলই গুণ, কেবল একটী দোষ। একটী কথাও স্মরণ রাখিতে পার না। যখনি শোন,

তখনি নূতন বোধ হয়, আবার তখনি ভুলিয়া যাও। আমরা কামচারী গন্ধর্ব্বকুমারী, শূন্যে শূন্যে গতিবিধি হয়, দিবাভাগে আমাদের ভ্রমণের পদ্ধতি নাই। চন্দ্রের সহিত আমাদের কুলের অতি নিকট সম্বন্ধ, রজনীদেবী আমাদের জননী হন। ভয় নাই, নিশ্চিন্ত থাক, আমারে যেরূপ সহচরী জ্ঞান করিতে, এই সহচরীদের সেইরূপ জ্ঞান করিও, আমি নিকটে থাকিলাম না বলিয়া উৎকণ্ঠিত কিম্বা অন্যমনস্ক থাকিও না, যেমন আমোদ প্রমোদ করা অভ্যাস, তাহাতে সঙ্কুচিত হইও না। পরিণয়ের পূর্ব্বে মানবী-কুলবালারা যেমন আমোদিনী হয়, আমি ইচ্ছা করি, তোমার স্বভাবেও তাহার অন্যথা হইবে না। আমি ঘটকের কার্য্যে চলিলাম, অবিলম্বে যুবরাজ শশীন্দ্রশেখরকে আনিয়া মিলন করিব, অবিলম্বেই তোমার বিবাহ হইবে।

লজ্জায় পূর্ণশশী আর কথা কহিলেন না। বারবার তাঁহারে সাবধান করিয়া,—বারবার কিঙ্করীগণকে সাবধান হইতে আদেশ দিয়া, দুটীমাত্র অনুচরী সঙ্গে লইয়া পত্রিকা দেবী বাটী হইতে বাহির হইলেন। রজনী তখন প্রায় ছয়দণ্ড অতীত। উপদেশের বিপরীতে,—নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাতরঙ্গের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া পূর্ণশশী নিশাজাগরণ করিলেন, মানসিক চিন্তার এক লহমাও বিরাম নাই, হাস্যরসে হাস্য নাই, প্রমোদে পরিতোষ নাই,—নয়নে নিদ্রা নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে নিত্যকামী শুনিলেন, পত্রিকা চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথা ধরিয়া বসিলেন। অন্তর-সমুদ্রে পরস্পর বিরোধী দুটী তরঙ্গের ক্রীড়া।—যেন প্রবল ঝড়ে একটী ঢেউ তীরভূমি স্পর্শ করিতেছে, আর একটী তীরের দিক হইতে গড়াইয়া আসিয়া মধ্যস্থলে জলনিধির উন্নত বক্ষে প্রতিঘাত করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন, পত্রিকা গেল, আর ফিরিয়া আসিবে কিনা? যদি না আসে

তবে আমার বিবাহ হইবে না; পত্রিকার সহিত আমার কলহ হইয়াছে, সেই জন্য কি রাগ করিয়া গেল ? না, রাগ হইবে না, অভিমান হইবে ;—তবে কি অভিমান করিয়া গেল ? যদি তাহা হয়, তবে আসিবে ; যদি রাগও হয়, তবুও আসিবে। অভিমান হয়, রাগ হয়, দুই দিকেই আমার পক্ষে ভাল। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—লোকে বলে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু কৈ, বৃদ্ধ ত হই নাই। বৃদ্ধের এক লক্ষণ আমাতে আছে ; জগতের অনেক দেখিয়া শুনিয়া পরমজ্ঞানী হইয়াছি ; সকল জ্ঞানের উপর প্রণয় জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে। কিরাত যেমন কুরঙ্গিণীর প্রতি শরলক্ষ্যের অব্যর্থ সন্ধান জানে, আমিও তেমনি যুবতী কমিনীর প্রণয়ী হৃদয়ে প্রেমশর লক্ষ্য করিবার অব্যর্থ সন্ধান জানি। নায়িকা যদি অভিমান জানায়, তাহা হইলে নায়কের প্রতি তাহার অনুরাগ গাঢ় হয়। সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে প্রণয়ের নবীনত্ব থাকে না। লোকে বলে, প্রণয় পুরাতন হইলে অভেদ্য হয়, আমি তাহা ভাবি না। পুরাতন হইয়া নূতন হইলে কিম্বা কিছুদিন বিচ্ছেদের পর সাক্ষাৎ হইলে প্রণয় পরিপক্ক হয়। কেবল পরিপক্ক নয়, পরীক্ষাও হয়। পত্রিকা প্রণয় জানাইয়াছে, আমাকে পরীক্ষা করিয়াছে। হৃদয়ে প্রণয় প্রবেশ না করিলে নায়কের প্রতি নায়িকার রোষও হয় না, অভিমানও হয় না। পত্রিকার হৃদয়ে প্রণয় প্রবেশ করিয়াছে, সে প্রণয় আমারি প্রতি, তাহাতে আর কিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কারণ কিনা যে দিন আমি পত্রিকাকে পরিহাস করিয়া হৃদয়ের কমলা বলিয়া ডাকিয়াছিলাম, সেই দিন সেই সুলোচনা আমার প্রতি হাসিতে হাসিতে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিল,—"আমাকে যদি কমলা বলিলে, তবে তুমি কমলাকান্ত হইলে, আজি অবধি আমি তোমারে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বলিয়া ডাকিব।" আহা ! সরলার এই

সরল প্রণয়ের চিহ্ন আর কি আমি ভুলিব? অবশ্যই আমার পত্রিকা আমার হইবে। আমার পত্রিকা অবশ্যই কমলা হইবে, অবশ্য আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হইব। রাবণের মাতুলের ন্যায় মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ আহ্লাদে মাতিয়া উঠিলেন। আপ্পনা আপনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে যেন নৃত্যের তালে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পত্রিকা ফিরিয়া আসিবে, যদি না আইসে, তবে কি হইবে? তবে আমি পত্রিকার প্রণয়ে বিসর্জ্জন দিব। অবাধ্য পত্নীর মুখদর্শন করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে; যদি ফিরিয়া না আইসে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই পাপীয়সী আমার অবাধ্য'। আমাকে না বলিয়া যখন প্রস্থান করিয়াছে, তখন আরও অবাধ্য। সেদিন কলহের সময় যাহা মুখে আনিবার নয়, তাহা বলিয়া গিয়াছে। যদি সেই ভাব সেই অবিশ্বাসিনীর মনের ভাব হয়, তাহা হইলে আমি অভিসম্পাত করিতেছি, সে যেন আর লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া না আইসে। কেবল এখানে কেন, যেখানে আমি থাকিব, সেখানে যেন আর ফিরিয়া না আইসে। আমার বহুপুরুষ ব্রাহ্মণ, আমি পরম শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের সন্তান; ত্রিসন্ধ্যা জপতপ আমাদের কৌলিক ব্রত। আমার বাক্য, আমার অভিশাপ, নিষ্ফল হইবার নয়। বিশ্বাসঘাতিকা পত্রিকা সত্য সত্য যদি ফিরিরা না আইসে,—এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের ক্রোধ হইল। শুভ্র শ্মশ্রু থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মূর্ত্তিমান জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় উগ্রভাবে পরিপূর্ণ ক্রোধে নির্জ্জনে একাকী উচ্চৈঃস্বরে দম্ভ করিয়া কহিলেন, বিশ্বাসঘাতিকা 'পত্রিকা যদি আর ফিরিয়া না আইসে,তবে এই ব্রাহ্মণের বেদবাক্য, নিশ্চয়ই তাহাকে ব্যাঘ্রে আহার করিবে। সেই দুষ্ট পশু যদি স্ত্রীহত্যায় পাতক মনে করে, তাহা হইলে, পাপীয়সী নিশ্চ-

য়ই ব্যভিচারিণী হইবে। আমার পবিত্র অকপট প্রণয়ে অবহেলা করা সামান্য মহাপাতক নহে। পত্রিকা আসিবে, আমার সম্মুখে আসিবে, কমলাকান্ত বলিয়া পুনরায় প্রেমভাবে কথা কহিবে, আমি কথা কহিব না, মুখ ফিরাইয়া বসিব। সাপিনীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া দেবদুর্লভ ভূদেব ব্রহ্মনেত্র কদাচ কলুষিত করিব না; রোষ-ভরে গর্জ্জনকরিয়া কহিব, চাহি না;—পর-পুরুষগামিনী ব্যভিচারিণি! তুই গণিকা, আমি তোরে চাহি না। সে সময় যদি এই ক্রোধ আরও কিছু বেশী হয়,—পাপিনীর রূপ সম্মুখে দেখিলে অবশ্যই বেশী হইবে, সেই বেশী ক্রোধে আরও তর্জ্জন করিয়া কহিব, রাক্ষসি! সম্মুখ হইতে দূর হ! ভস্ম হ! ব্রহ্মণ্যদেবের এমন তেজ নয়, সেই গণিকা তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যাইবে!

এইরূপ বিকৃত অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে বকিতে নিত্যকামী যেন প্রকৃত উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। উন্মত্তের ন্যায় আরও কত কি বলিলেন, কখন হাসিলেন, কখন কাঁদিলেন, কত শাপ দিলেন, কত গালাগালি দিলেন, বিভ্রমে মাতোয়ারা হইয়া বিকট স্বরে কত প্রকার প্রণয়-ভাব জানাইলেন, সে সকল শ্রবণ করিয়া পাঠক মহাশয়ের বিরক্তি বোধ হইবে, এই শঙ্কায় উন্মত্ত অবস্থায় এই স্থানেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

কৈশোরবাগ হইতে পত্রিকার যাত্রার সাত দিন পরে পূর্ণশশী একটী কক্ষের গবাক্ষে করন্যস্ত কপোলে উপবেশন করিয়া কি ভাবিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, মৃদু মৃদু সমীরণ বহিতেছে, সেই বাতাসে চিন্তাকুলার হৃদয়-দুকুল অল্প অল্প উড়িতেছে,—সরিয়া পড়িল;—ভ্রূক্ষেপ নাই। গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে; গবাক্ষের দ্বার মুক্ত, কক্ষ-মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিল, প্রদীপ নিবিয়া গেল, ভ্রূক্ষেপ নাই।

গবাক্ষে বসিয়া পূর্ণশশী ভাবিতেছেন। কিন্তু কি ভাবিতেছেন? অস্ফুটা সরলা কুলবালার মনের ভাব কে বলিবে? গবাক্ষের দ্বার দিয়া চন্দ্রকিরণ গাত্র স্পর্শ করিয়াছে, আকাশে নক্ষত্রমালা যেন সেই গবাক্ষের দিকেই অসংখ্য চক্ষু নিক্ষেপ করিয়াছে। কি দেখিতেছে? কিছুই না। মানবী-দেহ অস্পন্দ, সংজ্ঞা আছে, কিন্তু অব্যক্ত। চক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রু; সেই অশ্রু ধীরে ধীরে কপোলে, ক্রমে বক্ষে, গলিত হইতেছে। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে। যাহার মনে কলঙ্ক থাকে, সে অন্যের সৌভাগ্যে ব্যথা পায়, দুর্ভাগ্যে হাস্য করে। পূর্ণশশীর এই-দশা দেখিয়া চন্দ্রমা হাস্য করিতেছেন। কেন, পূর্ণশশী কি তাঁহার সতিনী? কেন? আজি তো পূর্ণিমা নয়, আকাশে ত পূর্ণশশীর উদয় নাই, তবে অসহায়িনী বালিকা পূর্ণশশীর নিরানন্দে গগনবিহারী অপূর্ণশশীর এত আনন্দ কেন? কুমুদিনী নিজকান্তের পূর্ণ, অপূর্ণ, উভয় অবস্থা দর্শনেই আমোদিনী হয়, চন্দ্রমার এই এক প্রণয়-অহঙ্কার।

পূর্ণশশী চিন্তা করিতেছেন। সপ্তাহ অতীত হইবে না বলিয়া পত্রিকা গিয়াছে, আজি সেই সপ্তাহ অতীত। আসিতেছে না কেন? রাজপুত্রের অন্বেষণ করিতে গিয়াছে, রাজপুত্রে আমার প্রয়োজন কি? আমি উদাসীন ব্রাহ্মণের কন্যা, চিরজীবন উদাসিনী। রাজপুত্রের সহিত সম্বন্ধ হওয়া আমার জীবনে বিড়ম্বনা মাত্র। পত্রিকাকে নিকটে দেখিলেই আমার মন প্রফুল্ল থাকে, যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে বিধাতা যেন সেই সুখময়ী বিভাবরীর স্বপ্নটী সত্য করিয়া দেন; পত্রিকা ভিন্ন অন্যে আমার রুচি নাই। অন্য রূপ এ চক্ষে ভাল লাগে না। এমন দুরাশা আমার কেন হইল? পত্রিকা গন্ধর্ব্বকন্যা, আমি মানবী। আরও, পত্রিকা স্ত্রীজাতি, সে কিরূপে

পুরুষ হইবে ? এমন দুরাশা আমার কেন হইল ? আর, স্বপ্নও কি কখনো সত্য হয় ? আমার মন এমন অপথে কেন গেল ? আমি বিদেশিনী, পৃথিবীতে থাকি, পত্রিকা বিদেশিনী, আকাশে থাকে, পত্রিকার প্রতি এত অনুরাগিণী কেন হইলাম ? এমন দুরাশা আমার কেন হইল ? পিতা আমারে কেন এখানে পাঠাইয়াছিলেন ? আশ্রমে একাকী এখন তিনি কি করিতেছেন ? নিত্যকামী একবার যদি সেখানে আমারে লইয়া যান, তবে একবার পিতৃদেবের চরণ দর্শন করিয়া সুখী হই। সুখী হই বটে, কিন্তু পত্রিকাকে না দেখিলে অসুখ হয়। আমার মন এমন চঞ্চল কেন হইল ? এখন কোথায় যাই ? কোথায় গেলে এই চঞ্চলতা একটু দূর হয় ? শুনিয়াছি, এই—

পূর্ণশশী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, আপনা আপনি কথা কহিতেছেন, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষেপ করিতেছেন, এই অবসরে একজন অনুচরী কক্ষ প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধোক্তিতে বাধা দিল। গৃহ অন্ধকার, প্রতিফলিত চন্দ্রালোকে যাহা কিছু দেখা শুনা। অনুচরী নিকটে গিয়া কহিল, " এ কি ? আপনার এ ভাব কেন ? আপনা আপনি কি বলিতেছিলেন ? " পূর্ণশশীর তখন চৈতন্য হইল। করতল হইতে কপোল উত্তোলন করিয়া কহিলেন, " কিছুই নয়। এই বলিতেছিলাম, চন্দ্রের আলো বেশ হিম !" অনুচরী কহিল, 'মনে কি কিছু অসুখ হইয়াছে ?

'চিরদিন অসুখ !' এই মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া পূর্ণশশী মৌনাবলম্বন করিলেন। অনুচরী কিছু বুঝিতে পারিল না, কহিল, " পত্রিকাদেবী এখানে নাই, সেই জন্য অসুখ, কিন্তু আমরা রহিয়াছি, আমরাই আপনার দাসী।—যদি আমাদের দ্বারা কিছু অসুখের নিবারণ সম্ভব হয়, অনুমতি করুন, প্রস্তুত আছি।" কিয়ৎক্ষণ

নীরব থাকিয়া, পূর্ণশশী কহিলেন, "এই কারাগার হইতে যদি ক্ষণকাল কোন রমণীয় স্থানে প্রকৃতির শীতল সমীরণ সেবন করিতে পাই, তাহা হইলে বোধ করি এই তাপময় হৃদয় কতক সুস্থ হয়।" কিঙ্করী সাগ্রহে কহিল, "তাহাই হইবে। এই বাটীর সংলগ্ন একটু দূরে একটী উদ্যান আছে, আপনি এক দিনও তাহা দেখেন নাই, কি জানি কি ভাবিয়া পত্রিকা দেবী একদিনও আপনারে সেখানে লইয়া যান নাই। যদি ইচ্ছা করেন, রাত্রি এখনও অধিক হয় নাই, আর সে উদ্যানটী চারি দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, যদি ইচ্ছা করেন, আমি আপনারে সেই খানে লইয়া যাই।"

পাঠক মহাশয় স্মরণ করুন, রাজকুমার শশীন্দ্রশেখরের পত্রে যে বাটীর কথা লেখা ছিল, যে বাটীতে পত্রিকাদেবী পূর্ণশশীরে আনিয়া রাখিয়াছেন, কৈশোরবাগের সেই বাটীর অগ্নিকোণে একটী অরণ্য আছে, তাহাকে সাধারণে লক্ষ্মণারণ্য কহে। অনুচরী যে উদ্যানের কথা বলিল, তাহার পরপারেই সেই অরণ্য। অরণ্য বটে, কিন্তু হিংস্র জন্তু বাস করে না। ভাগবত-বর্ণিত নিকুঞ্জকাননের ন্যায় অতি শোভাময় ও মনোহর।

পূর্ণশশী উদ্যান বিহারের নাম শুনিয়া কৌতূহলে ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে; চল, সেইখানে যাই।" কালব্যাজ না করিয়া কিঙ্করী তাঁহাকে সেই উদ্যানে লইয়া গেল। অতি রমণীয় উদ্যান। চারি ধারে পুষ্পকানন, মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ, মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরবদ্ধ সরোবর। পূর্ণশশী কিয়ৎক্ষণ সখীর সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া প্রমোদিত মনে সেই সরোবরের সোপানে গিয়া বসিলেন। শশিকর-স্নিগ্ধ পূর্ব্বযাম যামিনীর সুস্নিগ্ধ পবন-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতে লাগিল।

ক্ষণকাল উভয়ের মুখে বাক্য নাই। বায়ুহিল্লোলে বৃক্ষলতার মৃদুল পত্রশব্দ ব্যতীত অন্য শব্দও শ্রুতিগোচর হয় না। পক্ষীরাও নীরব। তাঁহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রাচীরের বাহিরে লক্ষ্মণাটবীর এক প্রান্ত হইতে সহসা সুস্বর বংশীধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

পূর্ণশশী চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। আহা! কি সুমধুর স্বর! রাত্রিকালে এই বিজন অরণ্য মধ্যে কে আসিয়াছে? কাহার অনু-রাগে কোন্ সুখী অথবা বিয়োগী এমন মধুর বাঁশরী বাজাইতেছে? আমার হৃদয়ের ন্যায় তাহার হৃদয়ও কি কোনো অনুতাপে সন্তা-পিত? অনুচরীকে এই কটী প্রশ্ন করিয়া উত্তর শ্রবণের প্রতীক্ষা না করিয়াই বংশীস্বরে কর্ণ স্থির করিলেন। ধ্বনি নিস্তব্ধ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই জগৎমোহন কণ্ঠস্বরে তানলয় বিশুদ্ধ গীত আরম্ভ হইল। পূর্ণশশীর কৌতুহল চন্দ্রচ্ছবি-প্রতিবিম্বিত জলনিধির সলিলের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। কর্ণ, চক্ষু ও মন একত্রে লক্ষ্মণাটবীর সেই অংশে সেই সুমধুর স্বরের প্রতি এককালে আকর্ষিত হইল। অনুচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই উদ্যানের ভিতর দিয়া কাননে প্রবেশের কি কোনো পথ আছে? ইচ্ছা হয়, যাহার স্বরে হৃদয় মুগ্ধ হইতেছে, তাহার মুর্ত্তিখানি একবার চক্ষে দর্শন করি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যেন অন্যমনস্ক হইলেন। নীলগিরি মনে পড়িল;—পত্রিকার সহিত আলাপ মনে পড়িল; এই স্বর কোথাও শুনিয়াছি, তাহাও মনে পড়িল। কিন্তু কোথায় শুনিয়াছেন, কাহার স্বর, সেটী মনে পড়িল কি না, সে উত্তর কেবল স্বরমুগ্ধা পূর্ণশশীই দিতে পারেন, অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

কিঙ্করী তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া, আর আন্তরিক আগ্রহ

বুঝিয়া, সকৌতুহলেই কহিল, "দেবি! পথ আছে, কিন্তু রাত্রি হই-য়াছে। আমার বিবেচনায় রাত্রিকালে অরণ্য প্রবেশ করা ভাল দেখায় না।"

"ভালই দেখায়; আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। তুমি চল।" শশব্যস্তে এই কথা বলিতে বলিতে পূর্ণশশী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুই চারি পদ চলিয়া গেলেন। অনুচরী অগত্যা অনু-বর্ত্তিনী হইল। প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র দ্বার, উদ্যানের ভিতর দিক্ হইতে অর্গলবদ্ধ। কিঙ্করী সেই দরজা খুলিয়া পূর্ণ-শশীকে পথ দেখাইল। তিনি ধীরে ধীরে কাননমধ্যে প্রবেশ করি-লেন। অধিক দূর যাইতে না যাইতে সেই শ্রুতপূর্ব্ব স্বর নিস্তব্ধ হইল। বোধ হইল, অতি নিকট হইতেই সেই আলাপ শ্রুতিগোচর হইতেছিল। জ্যোৎস্নালোকে অল্প অল্প দৃষ্ট হইল, একটী বিশাল বৃক্ষমূলে একজন বংশীধারী পুরুষ বসিয়া আছে। স্তিমিত আলোকে আর তরুলতার ছায়ায় সুস্পষ্ট মূর্ত্তি নিরীক্ষিত হইল না। সেই পুরুষ বাক্‌শূন্য। দুই দিকেই পূর্ণশশী হতাশ হইলেন। সঙ্গীত শ্রবণে কৌতূহল ছিল, পরিতৃপ্ত হইল না; সঙ্গীতালাপীর আকৃতি দর্শনে ইচ্ছা ছিল, অফলবতী হইল। একান্তই কি নিষ্ফল? না, একান্ত নিষ্ফল নয়। স্বরকৌতুকিনী পূর্ণশশী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরেধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বংশীধারীর রূপ স্পষ্ট নয়ন-গোচর হইল। হৃদয়ে যে আশালতা এতক্ষণ পর্য্যন্ত সজীব ছিল, নিষ্ঠুর চন্দ্রমা তাহা শুকাইয়া দিল!

"ফিরিয়া যাই, লুকাইয়া অরণ্যে অবস্থান বিফল!" এইরূপ ভাবিয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে নিকটস্থ অপর এক বৃক্ষের শাখা হইতে একটী মনোহর সঙ্গীত শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট

হইল। কোন বিরহী কোন প্রকার দারুণ মনস্তাপে অতি করুণস্বরে এই গীত ধরিয়াছেনঃ— গীত।

(হিন্দির অর্থ।)

বেহাগ।—একতালা।

পিরীতি আমায় দহে ;—দহে !
বপু অথর্ব্ব, রিপু সচঞ্চল,
ছারো পরাণে কতবা সহে ॥
কভু লভিবারে, পারিবনা যারে,
কেনবা জীবন সঁপিলাম তারে,
পাপ প্রেমবিষে জরিল আমারে,
দেহে প্রাণ নাহি রহে ॥
ছিছি একি জ্বালা ঘটিল আমারে,
কেনবা ভুলিতে পারিনে তাহারে,
লাঞ্ছনা সহি বাঞ্ছিত তরে,
পোড়া লোকে কটু কহেঃ—
না হেরি নয়নে কুরঙ্গ নয়না,
স্বর্ণলতা,—পূর্ণচন্দ্র নিভাননা,
শুকাইল শেষে মানস বাসনা,
দুনয়নে ধারা বহে ॥
যোগী হইলাম রাধারি কারণে,
সাধিনু কাঁদিনু ধরিনু চরণে,
তবু ত রাধিকা করুণ নয়নে,
মোরে অনুকূল নহেঃ—
নারী তুষিবারে নারীরূপ ধরি,
তবু ত আমারি হলোনা কিশোরী,
কি করি কি করি প্রেমে ডুবে মরি,
ঝাঁপ দিয়ে কালীদহে ॥

নায়কের চিতারোহণ।

(১)

এই তো আইনু আমি ভাগীরথী তীরে,
ডুবাতে বিরহ-ব্যথা বিস্মৃতি-সলিলে
পূরাতে যুগল আঁখি আনন্দের নীরে,
জুড়াতে তাপিত কায় শীতল অনিলে।
কিন্তু আজি কেন দেখি সব বিপরীত ?
কেন এ সুখের স্থান শ্মশান সমান ?
কেন বিষাদের নীরে ভাসে মম চিত ?
কেনই না হয় মম প্রমোদিত প্রাণ ?

(২)

কেন আজি জাহ্নবীর রম্যকূল-ধারে
ভ্রমণে না হয় মম সুখের উদয় ?
কেন আর তৃপ্তি নাই নিকুঞ্জ মাঝারে ?
বিহগের মধুধ্বনি কেন বিষময় ?
কেন আজ অনিলের স্নিগ্ধগুণ নাই ?
তাহ'লে হতো কি মম শরীর এমন ?
করিছেনা কেন বিধু সুধা বরিষণ ?
তাহলে লভিত মন আনন্দ সদাই।

(৩)

(ঊর্দ্ধে চাহিয়া)

কই তারাপতি বল কিরণ তোমার ?
চেয়ে দেখ এই মম হৃদয় গগন,
কই হে তোমার তাহে জ্যোতির সঞ্চার ?
হইয়াছে এই দেখ তামস পতন।
সুনীল গগন-ভূষা দীপ্ত তারাগণ,
তোমাদের মনোহর সে রূপ কোথায় ?
যে রূপ হেরিলে মোর জুড়াত নয়ন,
চিত পুলকিত হতো যেরূপ বিভায়।

(৪)

এ সব হেরিলে পড়ে প্রিয়া-মুখ মনে,
বিগত ঘটনা যেন নয়ন সমুখে ;
উহু কি ভীষণ রূপ হায় রে স্মরণে !
কি বিষম শেল আজি বিঁধিতেছে বুকে !
কাঁপিছে গঙ্গার জল বায়ুর হিল্লোলে,
হেরে কি ভুলিতে পারি তব কেশ রাশি ?
ওই যে কুমুদী হাসে সরসীর কোলে,
হেরে কি ভুলিতে পারি তব চারু হাসি ?

(৫)

ওই যে দুলিছে ধীরে তরু পত্রগণ,
ওইরূপে ধীরি ধীরি তোমার অঞ্চল

দুলিত, নাচিত তায় মন্দ সমীরণ
তুষিতে তোমায় যেন হইয়ে চঞ্চল।
নিশানাথে যেইক্ষণে করি দরশন,
তখন তোমার ভাবি বদন কমল;
পাখীর মধুর গান করিলে শ্রবণ,
মনে পড়ে তব সেই স্বর সুকোমল।

(৬)

প্রিয়ে!

মনে পড়ে একদিন ছাদেতে বসিয়ে,
নয়নের নীরে মম ভিজেছে কপোল;
কোথা হতে তুমি মম পাশেতে আসিয়ে
জিজ্ঞাসিলে "প্রাণনাথ কি হয়েছে বল!"
নীরবে রহিনু আমি জড়জীবপ্রায়,
মুখেতে সরেনা বাক্ হলো কণ্ঠরোধ,
কপোলের অশ্রু ক্রমে পড়িয়াছে গায়,
আঁধার জগত হায় হয়েছিল বোধ।

(৭)

এদশা হেরিয়ে তুমি সজল নয়নে,
আপন অঞ্চল লয়ে মুছেছিলে নীরে,
ধরিয়ে চিবুক মম বিষণ্ণ বদনে,
আবার বলিলে মোরে সুমধুর স্বরে,—
"কি হয়েছে প্রাণনাথ! বল আজি মোরে,

নয়ন-সলিল কেন বহে অবিরল ?
কোন্ দোষে দোষী দাসী কহ দয়া করে,
এ ভাব নিরখি তব হয়েছি বিকল ! ”

(৮)

এই বলি তুমি মোরে কাঁদিতে কাঁদিতে
পড়িলে লুটায়ে ভূমে মম পদপাশে,
জ্ঞানের আলোক ক্রমে লাগিল পশিতে,
তামস পূরিত তব হৃদয় আকাশে।
চমকিনু ভয়ে হেরি ভীম কিরাতেরে
চমকে সহসা যথা সুপ্ত কুরঙ্গিণী,
অথবা পথিক যদি সম্মুখেতে হেরে
বিষময়ী ভীমমূর্ত্তি চঞ্চলা সাপিনী।

(৯)

চমকিনু শিহরিনু হেরিনু তোমায়
সজল নয়নে পড়ি মম পাদ মূলে,
যেন কোন অনাথিনী, আশাহীনা প্রায়,—
(তাড়িত করেছে যারে ভীম শত্রু দলে,)
পাইয়ে সহসা কোন পথিক দর্শন,
কাঁদিছে তাহার পাশে আশ্রয়ের তরে,
বলিতে পারেনা কোন্ বিপদ ঘটন,
মুখে কি তখন তার বচন নিঃসরে ?

(১০)

এইমত হেরি তোমা তুলিলাম কোলে,
ধরিয়ে চিবুক তব করিনু চুম্বন,
কিন্তু ভাসি হায় ঘোর বিষাদের জলে,
হেরিনু তোমায় প্রিয়ে মূর্চ্ছিত তখন,
ভাবিয়ে না পাই প্রিয়ে কি করি তখন,
হস্ত পদ রহিয়াছে ক্ষণ শূন্য গতি,
হেরিলাম কিছু পরে মেলিলে নয়ন,
অমনি ভাসিল মন আহ্লাদেতে অতি।

(১১)

উঠিয়ে তথাপি তব মুখেতে বচন,—
"কি হয়েছে প্রাণনাথ! বল আজি মোরে,
কেন আজি হলে বল নিদয় এমন?
কেন আর ব্যথা দাও বল দুখিনীরে!"
শুনিয়ে তোমার কথা ব্যাকুলিত প্রায়,
ঢাকিল হৃদয়াকাশ দুখ-জলধর,
না পারিয়ে এড়াইতে তব অনুনয়,
কহিতে লাগিনু তোমা হইয়ে কাতর;—

(১২)

বিঘোর নিশীথ কালে নিদ্রার আবেশে,
হেরেছি প্রেয়সি আমি ঘোর কুস্বপন;—
যেন আমি রহিয়াছি কোন দূরদেশে,

একা আমি মম সঙ্গে নাই কোনজন।
সকলি বিপক্ষ মম একা আমি হায়,
ছাড়িয়াছে মাতা ভ্রাতা প্রিয় সখাগণ,
ছেড়েছ জীবিতেশ্বরি! তুমিও আমায়,
বিদরে এ পোড়া হিয়া করিতে স্মরণ।

(১৩)

সেই একদিন প্রিয়ে হয় কি স্মরণে?
কতই বুঝালে মোরে সান্ত্বনার তরে,
সেই সব কথা এবে পড়ে কিরে মনে?
কিম্বা ডুবায়েছ সব বিস্মৃতি-সাগরে?
সেই দিন বল প্রিয়ে আছে কি স্মরণ?
স্মরণ থাকিত যদি, তবে কি আমায়
ছাড়িতে? করিতে কভু কুপথে গমন?
কখনই নয়, প্রিয়ে, কখনই নয়।

(১৪)

আর একদিন।
পূর্ণিমার চাঁদ যবে উদিয়া আকাশে,
ধরেছিল মনোহর স্বরূপ যৌবন,
অপনীত করেছিল বিঘোর তামসে
হেসেছিল প্রাণ ভরে—সুন্দর কেমন!
আর কে হাসিয়ে ছিল, মনে পড়ে প্রিয়ে?
বসিয়ে উদ্যান পাশে নিকুঞ্জ মাঝারে,

প্রাণের সহিত তব করেতে ধরিয়ে ?
 সে সুখের সীমা বল কে গণিতে পারে ?

(১৫)

পাশা পাশি বসি মোরা হাত ধরা ধরি,
 চাহিয়াছি প্রিয়ে ! তব বদন কমলে,
সে রূপ দেখিয়ে বিধু মস্তক আবরি
 লুকাইল ধীরে ধীরে জলধর কোলে।
উঠিলে তখন হায় ছাড়িয়ে আমায়,
 চলিলে প্রেয়সি তুমি কুসুম আগারে,
কতবার উচ্চরবে ডাকিনু তোমায়,
 প্রত্যুত্তর পশিলনা শ্রবণ মাঝারে।

(১৬)

তোমারে না হেরি বসি বকুলের তলে,
 কতভাব ভাবিতেছি আপনার মনে,
আসিয়ে পশ্চাতে প্রিয়ে তুমি হেনকালে,
 নিজহস্তে আবরিলে আমার নয়নে ;
কিন্তু সে কোমল কর লুকানো কি রয় ?
 যারে আমি সারাদিন জপেছি অন্তরে,
কেমনে লুকাবে তাহা—হস্ত মধুময় ?
 অনলের কাছে তৈল লুকাতে কি পারে ?

(১৭)

খুলিলে যখন মম আঁখি আবরণ,
হেরিনু তোমায় চারু ভূষণে ভূষিত,
সেরূপ হেরিয়ে হায় জুড়াল নয়ন,
সেরূপ করিল মোরে অতি হরষিত ;
পরেছ অলকদামে কুসুম নিচয়,
মাঝে মাঝে তার পুন লোচন বিভ্রম,
কজ্জল ভূষিত পুন দিব্য আঁখি দ্বয়,
সেজেছে কুসুম মাঝে ভ্রমরের সম।

(১৮)

হায় রে বিধাত কেন করিলি এমন ?
যেই লতা করেছিল আমারে আশ্রয়,
কিদশা তাহার এবে হইল ঘটন ?
ভাবিয়া বিরহে দহি হতাশ উদয় !
জ্বালিল ভীষণ চিতা,—চাহি তার পানে—
ক্ষণেক,—যেমন যুবা ঝটিতি পড়িল,—
তদুপরে, মুহূর্ত্তেই মরিল পরাণে,
জীবন কুসুম তার তাপে শুকাইল !!

——

আর্য্য জাতির বর্ণ-ভেদ।

মনুর মতে হিন্দুজাতি সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। একথা সকলেই জানেন, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আর অধিক কিছুই নাই। এক্ষণে দেখা যাউক, এই চারি শ্রেণী ভিন্ন হিন্দুদিগের মধ্যে আর কোন শ্রেণী ছিল কি না, কিম্বা অন্য কোন জাতি এই চারি শ্রেণীর মধ্যে আপনাদিগকে অন্তর্গত করাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া হিন্দুদিগের মধ্যে পরিগৃহীত ও গণনীয় হইয়াছিলেন কি না, এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি?—এই কথা গুলির মীমাংসা করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

হিন্দুজাতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, কিন্তু অনেকে একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা এই চারি বর্ণ ভিন্ন শিল্পকর Artisan নামক আর একটী শ্রেণীর উল্লেখ করেন। প্রথম দৃশ্যতেই ইহা যথার্থ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার অসত্যতা প্রমাণ করা বড় দুরূহ ব্যাপার হইবে না। হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্বে শিল্প-কর নামে যে এক জাতি ছিল, তাহা আশ্চর্য্য নহে, এবং

তাহার অনেক প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ানুসারে বিশেষ বিশেষ বর্ণ নির্ণীত হইয়াছে, এ কথায় যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট অনুমিত হইবে, যে, মনুর সময়ে শিল্প বিদ্যার অধিক উন্নতি হয় নাই, কারণ তাহা হইলে শিল্পকর নামে যে এক বিশেষ শ্রেণী মনুকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহাতে আর সংশয় নাই। সুতরাং মনে করুন, মনুকর্ত্তৃক হিন্দুজাতি প্রথমতঃ চারি বর্ণে বিভক্ত হইল; তাহার কিছুকাল পরে শিল্পকর নামে এক শ্রেণী আসিল; কিন্তু ইহারা কোথা হইতে আসিল? এই চারি শ্রেণী হইতেই। সুতরাং তাহাদিগকে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না। পুনশ্চ বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়।

দ্বিজাতি সংশ্রয়ংকর্ম্ম তাদর্থ্যং তেন পোষণম্।
ক্রয়বিক্রয়জৈর্ব্বাপি ধনৈঃ কারূদ্ভবেনবা॥

বিষ্ণুপুরাণে। তৃতীয়াংশ। ৮ অ ৩২

শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবা করিবে, এবং সেই সেবা-লব্ধ ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা (এসকল না করিলে) বাণিজ্য ও কারুকরের ব্যবসা করিবে।

ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যে কারুকর অথবা শিল্পকর নামে যে এক জাতি ছিল, তাহারা শূদ্রেরই অংশ মাত্র; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির ন্যায় বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নহে।

আবার দেখা যায়, কেহ কেহ রাজার উপদেশককে ব্রাহ্মণ হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উপদেশকেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা রাজ সেবা করিতেন বলিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া অভিহিত হইতেন, নতুবা এতৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আবার কেহ কেহ বৈশ্যজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; এক ভাগের কর্ম্ম মেষ পালন, অপরের কৃষিকর্ম্ম। ইহার কোনটীও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, অন্য কোন জাতি হিন্দুদিগের মধ্যে গণনীয় হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না?

দেখা যায়, সিদিয়ানেরা ব্যাকট্রিয়া জয় করিয়া ভারত লুণ্ঠনের জন্য এদেশে আগমন করেন, এবং ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেও সমর্থ হয়েন। সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল টড্ তৎপ্রণীত রাজস্থানে বলিয়াছেন, এই সিদিয়ানেরা রাজপুতদিগের মধ্যে প্রবেশ করতঃ ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং এই চেষ্টায় তাঁহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতেও অসমর্থ হয়েন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে অমিশ্র রাজপুত দেখিতে পাওয়া বড় দুষ্কর! সিদিয়ানদিগের সহিত রাজপুতদিগের আচার ব্যবহার ও ব্যক্তির নাম অনেক দূর ঐক্য হয়। ইহারই

উপর নির্ভর করিয়া উক্ত মহোদয় একথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু ইহা বোধ হয় ভ্রমাত্মক। কারণ রাজপুতদিগের নাম, যথা জয়সিংহ, অমরসিংহ প্রভৃতি সংস্কৃতাভিধানানুসারে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু সিদিয়ানদিগের নাম এরূপে ব্যাখ্যা করা বড় দুরূহ; সুতরাং ইহার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত প্রকার মীমাংসা করা নিতান্ত অসঙ্গত। আচার ব্যবহারের একতার উপরেও কোন ক্রমে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না; কারণ রাজপুতদিগের আচার ব্যবহার সিদিয়ানদিগের অপেক্ষা হিন্দুদিগের সহিত অধিকতর ঐক্য হয়। (১)

হিন্দুজাতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক্ষণে মনুর মতে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিরূপণ করিয়া আমরা এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব।

১ম ব্রাহ্মণ।—কথিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। সুতরাং অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

দানং দদ্যাৎ যজেদ্ দেবান্ যজ্ঞৈঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ।
নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্য্যাচ্চাগ্নিপরিগ্রহম্॥

---

(১) See Elphinstone's History of India notes Changes in caste.

বৃত্ত্যর্থং যাজয়েচ্চান্যান্ অন্যানধ্যাপয়েৎ তথা।
কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুর্ব্বর্থং ন্যায়তো দ্বিজঃ॥
সর্ব্বভূতাহিতং কুর্য্যাৎ নাহিতং কস্যচিদ্দ্বিজঃ।
মৈত্রী সমস্তভূতেষু ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্॥

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে, দান করিবে, যজ্ঞদ্বারা দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিবে, বেদাদি অধ্যয়ন করিবে, নিত্য স্নান তর্পণাদিতে রত হইবে এবং অগ্নি পরিগ্রহ করিবে। ব্রাহ্মণ জাতি জীবিকার নিমিত্ত কাহারও যাজন করিবে, কাহাকেও বা অধ্যয়ন করাইবে, গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে বা গুরুদক্ষিণার আবশ্যক হইলে ন্যায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিবে। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্ব প্রাণীর হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবে, কখন কাহারো অনিষ্টাচরণ করিবে না, কারণ সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহারই ব্রাহ্মণের পরম ধন। (২)

ব্রাহ্মণের এই সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইলেও তাঁহারা অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতে পারেন; তিনি কোন পাপ করিলে তাহার দণ্ড নাই, কিন্তু কেহ তাহার বিপক্ষে কোন কথা উচ্চারণ করিলে তাহাকে অসীম শাস্তি পাইতে হয়। এমন কিঃ—

---

(২) পুরাণপ্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণ। তৃতীয়াংশ ৮ম অধ্যায়।

কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

ভূতানাম্প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসুনরাঃ শ্রেষ্ঠাঃনরেষু ব্রাহ্মণাস্মৃতাঃ॥
মনুসংহিতা। ১ম অ। ৯৬।
উৎপত্তিরেব বিপ্রস্যমূর্ত্তি ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
সহি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১। ৯৮
ব্রাহ্মণোজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥ ১। ৯৯
সর্ব্বস্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতং।
শ্রেষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বংবৈব্রাহ্মণোর্হতি॥১।১০০
স্বমেব ব্রাহ্মণোভুংক্তে স্বম্বস্তে স্বন্দদাতিচ।
অনৃশংস্যাদ্ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ॥ ১। ১০১
তেষান্তু সমবেতানাং মন্যৌ স্নাতকপার্থিবৌ।
রাজস্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকোনৃপমানভুক্॥ ২ ১৩৯

সমস্ত স্থাবরজঙ্গমের মধ্যে (কীটাদি) প্রাণিরা শ্রেষ্ঠ হয়, সেই প্রাণি সকলের মধ্যে (পশু প্রভৃতি) বুদ্ধিজীবিরা শ্রেষ্ঠ, আর ঐ বুদ্ধিজীবিদিগের মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ হয়েন, এবং মনুষ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেষ্ঠ কহা যায়। ব্রাহ্মণদেহের উৎপত্তিই ধর্ম্মের নিত্যশরীর, যে হেতু ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন এবং ধর্ম্মসাধ্যে আত্মজ্ঞান দ্বারা তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন। ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিলেই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হয়েন, এবং সর্ব্ব প্রাণীর কর্ম্ম সমূহ রক্ষার নিমিত্ত তিনি

প্রভু হয়েন। পৃথিবীস্থিত এই যে কিছু ধন সে সমুদায়ই ব্রাহ্মণের; ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপত্তি রূপ যে আভিজাত্য, সেই শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ এই সকল গ্রহণের যোগ্য হয়েন। ব্রাহ্মণ আপনারই দ্রব্য ভোজন করেন এবং আপনারই ধন দান করেন, অর্থাৎ অপরেও যে দ্রব্য ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করেন, সে তাঁহার আপন বস্তুর ন্যায়। অতএব অন্য লোক সকল ব্রাহ্মণের কৃপাতে ভোগ করে।

রথচক্র যানারূঢ়, ৯০ বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষ, রোগী, ভারবাহক, স্ত্রী, স্নাতক, রাজা এবং বর একত্র মিলিত হইলে ইহাদিগের মধ্যে দেশাধিপতি ও স্নাতক মান্য হয়েন; আর রাজা ও স্নাতকের মধ্যে রাজা অপেক্ষা স্নাতক অধিক মান্য হয়েন। (৩)

ব্রাহ্মণদিগকে চতুরাশ্রমবাসী হইতে হয়। প্রথম ব্রহ্মচারী, দ্বিতীয় গৃহস্থ, তৃতীয় বানপ্রস্থ, এবং চতুর্থ ভিক্ষু। এক্ষণে এই আশ্রম চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গৃহীত হইল।

ক। ব্রহ্মচর্য্যঃ—ইহা তাঁহাদিগের পাঠদ্দশা।

বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ।
গুরুগেহে বসেদ্ভূপ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥

---

(৩) এ প্রস্তাব মধ্যে মনুসংহিতার যত অনুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা হইতে গৃহীত।

শৌচাচাররতা তত্র কার্য্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ।
ব্রতানি চরতা গ্রাহ্যো বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিনা॥
উভে সন্ধ্যে রবিং ভূপ! তথৈবাগ্নিং সমাহিতঃ।
উপতিষ্ঠেৎ তথা কুর্য্যাৎ গুরোরপ্যভিবাদনম্॥
স্থিতে তিষ্ঠেৎ ব্রজেদ্ যাতি নীচৈরাসীৎতথা সতি।
শিষ্যো গুরৌ নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রতিকূলং ন সন্তজেৎ॥

ঔর্ব্ব কহিতেছেন,—রাজন্! বাল্য কালে যখন উপন হইবে, তখন ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিত চিত্তে বেদ অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে বাস করিবে। সেখানে শুচি ও বিশুদ্ধাচার হইয়া গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিবে এবং নিত্য প্রাজাপত্যাদি-ব্রতানুষ্ঠান-পূর্ব্বক বুদ্ধি স্থির করিয়া গুরুর নিকট বেদ অধ্যয়ন করিবে। রাজন্! দুই সন্ধ্যা সমাহিত হইয়া অগ্নির উপাসনা ও সূর্য্যের উপাসনা করিতে থাকিবে এবং ঐ উপাসনার পর গুরুকে নমস্কার করিবে। নৃপশ্রেষ্ঠ! গুরু দণ্ডায়মান হইলে দণ্ডায়মান হইবে, গুরু গমন করিলে গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিলে হীন ব্যক্তির ন্যায় উপবিষ্ট হইবে, কখন প্রতিকূলাচরণ করিবে না। (৪)

পুনশ্চ মনুসংহিতায়

সেবেতে মাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌবসন্।
সন্নিযম্যেন্দ্রিয়গ্রামন্তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥ ২। ১৭৫

---

(৪) পুরাণপ্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ ৯ অধ্যায়। কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরীবাদস্তথানৃতং।
স্ত্রীণাংঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপযাতং পরস্য চ॥ ২। ১৭৯

গুরুর নিকটে বাস করিয়া ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয় সকলকে দমনে রাখিয়া আপনার পুণ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত পরে বক্তব্য নিয়ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে।

* * * * *

দ্যূতক্রীড়া ও লোকের সহিত (নিরর্থক) বিবাদ, পরের দোষ কথন, অসত্য বাক্যপ্রয়োগ (সম্ভোগের ইচ্ছায় অনুরাগ পূর্ব্বক) স্ত্রীদর্শন ও আলিঙ্গন, এবং পরের অপকার এই সকল ত্যাগ করিবে।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মচারীদিগের আরও অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে।

খ। গৃহস্থাশ্রম;—এই আশ্রমে ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্র-কলত্রাদি লইয়া সংসারী হয়েন। অপ্রয়োজনীয় দান গ্রহণ অথবা কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে একান্ত অবিধেয়। এমন কি, তাঁহার ভিক্ষা করা উচিত, ব্যবসা করা উচিত, তথাপি যেন পরান্নভোগী হইতে না হয়। গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকল প্রকার আমোদ হইতে বঞ্চিত থাকা তাঁহার আবশ্যক। (৫) পৃথিবীর মান যশ প্রভৃতিও বিষবৎ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

---

(৫) মনুসংহিতা। চতুর্থ অধ্যায় ৬৩ ও ৬৪ শ্লোক দেখ।

বিধিনাবাপ্তদারস্তু ধনং প্রাপ্য স্বকর্ম্মণা।
গৃহস্থকার্য্যমখিলং কুর্য্যাদ্ ভূপাল! শক্তিতঃ॥
নিবাপেন পিতৃনর্চ্চেৎ যজ্ঞৈর্দেবাংস্তথাতিথীন্।
অন্নৈর্মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্॥
বলিকর্ম্মণা চ ভূতানি বাক্‌সত্যেনাখিলংজগৎ।
প্রাপ্নোতি লোকান্ পুরুষো নিজকর্ম্ম সমর্জ্জিতান্॥
ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাট-ব্রহ্মচারিণঃ।
তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্॥

রাজন্! জ্ঞানী ব্যক্তি এই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক যথাবিধানে দার পরিগ্রহ করিবে। পরে স্বকর্ম্ম অর্থাৎ যাজন অধ্যাপন প্রভৃতি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া যথাশক্তি সমুদায় গৃহস্থ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। পিণ্ডদানাদি দ্বারা পিতৃগণকে, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে, অন্ন দ্বারা অতিথিগণকে, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিগণকে, সন্তান উৎপত্তি দ্বারা প্রজাপতিকে, বলি কর্ম্ম অর্থাৎ ভূতোপহার প্রদান-দ্বারা ভূতগণকে, এবং সত্যবাক্য দ্বারা সমুদায় লোককে অর্চ্চিত করিবে। লোকে এইরূপ ব্যবহার করিলে স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্যলোকে গমন করে। যে সকল পরিব্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের অবলম্বন, সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। (৬) এই কয়টী ঋণ হইতে মুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ

(৬) পুরাণপ্রকাশ বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ ৯ অধ্যায়।
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংসার ভার পুত্রস্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া গৃহেও থাকিতে পারেন, অথবা তৃতীয়াশ্রম অবলম্বন করেন।

গ। বানপ্রস্থাশ্রম ; (৭)—এই আশ্রমবাসী হইলে তাঁহাকে অরণ্যে থাকিতে হয়, ফলমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হয়, ইত্যাদি।

বয়ঃপরিণতৌ রাজন্! কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমী।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥
পর্ণমূল ফলাহারঃ কেশশ্মশ্রুজটাধরঃ।
ভূমিশায়ী ভবেৎ তত্র মুনিঃ সর্ব্বাতিথির্নৃপ! ॥
যস্ত্বেতাং নিহিতশ্চর্য্যাং বানপ্রস্থশ্চরেন্মুনিঃ।
স দহত্যগ্নিবদ্ দোষান্জয়েল্লোকাংশ্চ শাশ্বতান্ ॥

রাজন্! গৃহস্থ এইরূপ সমুদায় গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধান করিয়া বয়ঃপরিণতি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট অর্পণ করিয়া, অথবা পত্নীর সহিত বনগমন করিবেন। ভূপাল! অনন্তর বনে বাস করিয়া, কেশ শ্মশ্রু ও জটাধারী হইয়া, ফল মূল ও বৃক্ষের পত্র আহার পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিবেন, এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সকলের প্রতিই সাধু ব্যবহার ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রণিহিত হৃদয়ে এই রূপ ব্যবহার করেন, তিনি হুতাশনের ন্যায় আত্মদোষ

(৭) মনুসংহিতা ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমুদায় দগ্ধ করিতে থাকেন এবং শাশ্বত লোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন (৮)।

ঘ। ভিক্ষু ;—এ অবস্থা তৃতীয়াশ্রম হইতে অনেক সুখপ্রদ। তাঁহাকে আর এখন পঞ্চাগ্নিমধ্যে বাস করিতে হয় না, বাহ্যিক কোন কার্য্যকলাপও আর তাঁহাকে দেখাইতে হয় না।

ত্রৈবর্গিকাংস্ত্যজেৎসর্ব্বানারম্ভানবনীপতে ! ।
মিত্রাদিষুসমোমৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু ॥
প্রাণযাত্রা নিমিত্তঞ্চ ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে ।
কালে প্রশস্ত বর্ণানাং ভিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্ গৃহান ॥

অবনীপতে ! ভিক্ষু ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ও কাম রূপ ত্রিবর্গ সাধন সমুদায় আরম্ভ অর্থাৎ বেদবিহিত যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া (ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন) এবং শত্রু, মিত্র ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীর প্রতিই সমান সদয় ব্যবহার করিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, যে সময় সকলেই আহার করিবে, ঈদৃশ সময়ে প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ভিক্ষার উদ্দেশে প্রশস্ত বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির গৃহে পর্য্যটন করিবে। (৯)

---

(৮) পুরাণপ্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয়াংশ ৯.অ।
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।
(৯) পুরাণ প্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ ৮ম অধ্যায়।
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

দ্বিতীয়। ক্ষত্রিয়—বাহু হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি, সুতরাং দেশ রক্ষা করা, যুদ্ধ করা প্রভৃতি ইহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রজানাং রক্ষণন্দানামিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
মনুসংহিতা। ১। ৮৯।

প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, আর নৃত্য গীত সম্ভোগাদি বিষয়ে অতিশয় আসক্তি ত্যাগ, এই সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের প্রতি নিরূপণ করিলেন, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল।

ব্রাহ্মণসম্বন্ধে যাহা উক্ত হইল, তাহার মধ্যে দুই চারিটী ক্ষত্রিয়দিগেরও করণীয়। ক্ষত্রিয়দিগকে গৃহস্থাশ্রমী হইয়া কতিপর ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। রঘুবংশই ইহার প্রমাণ। কবি মহারাজ অজ সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

ঋষিদেবগণ স্বধাভুজাং
শ্রুতযাগপ্রসবৈঃ স পার্থিবঃ।
অনৃণত্বং উপেজিবান বভৌ
পরিধের্ম্মুক্তইবোষ্ণদীধিতিঃ॥
রঘুবংশ। ৮ম সর্গ ৩০ শ্লোক।

আবার ঐ সর্গের ত্রয়োদশ শ্লোকে দেখা যায় ঃ—

রঘুরশ্রুমুখস্য তস্য তৎ
কৃতবানীপ্সিতমাত্মজ প্রিয়ঃ।

ন তু সর্প ইব ত্বচং পুনঃ।
পতিপেদে ব্যাপবর্জ্জিতাং শ্রিয়ম্॥

অজরাজ যখন তাঁহার পিতা রঘুকে বনবাসোন্মুখ দেখিয়া তাঁহাকে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, তখন অশ্রুপূর্ণ বদন দর্শনে তাঁহার উপরোধ রক্ষা করিলেন; কিন্তু সর্প যে রূপ আপনার ত্যক্ত ত্বক্‌কে আর গ্রহণ করে না, সেই রূপ রঘু আর রাজলক্ষ্মী ধারণ করিলেন না।

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়েরাও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রস্কন্ধে সংসারভার অর্পণ করিয়া বনাশ্রয়ী হইতেও পারিতেন, অথবা গৃহেও থাকিতে পারিতেন।

ক্ষত্রিয়দিগকে আর ভিক্ষু হইতে হইত না, বানপ্রস্থই তাঁহাদিগের শেষাশ্রম। কারণ, দিলীপ রাজকে লক্ষ্য করিয়া কালিদাস বলিতেছেন ঃ—

অথ স বিষয়ব্যাবৃত্তাত্মা যথাবিধি সূনবে
নৃপতিককুদং দত্বা যূনে সিতাতপবারণম্।
মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশ্রিয়ে
গলিত বয়সামিক্ষ্বাকূণামিদংহি কুলব্রতম্॥

তৃতীয়। বৈশ্য—উরু অথবা বক্ষঃস্থল হইতে ইহাদিগের জন্ম, সুতরাং বাণিজ্যাদি করাই ইহাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

পশুনাং রক্ষণন্দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বণিকৃপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

মনুসংহিতা। ১। ৯০।

পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, এবং বৃদ্ধির নিমিত্ত ধন দেওয়া, আর কৃষিকর্ম্ম, (ইহা) বৈশ্যের প্রতি (নিরূপণ করিলেন) বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে, বৈশ্যেরা "পশুপালনে নিযুক্ত থাকিবে, বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, ও কৃষিকর্ম্ম করিবে।"

চতুর্থ। শূদ্র—পদ হইতে ইহাঁদিগের জন্ম কথিত বলিয়া, দাসত্বই ইহাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম; ইহা মনু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। যে হেতু ঃ—

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রুষামনসূয়য়া॥
মনুসংহিতা। ১। ৯১।

পুনশ্চ।

মাঙ্গল্য ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং॥

ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক ও শূদ্রের নিন্দাবাচক নাম করণ করিবেক।

কল্কি পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর জয়শীল কলি-বিনাশন ভগবান্ কল্কি, কেশরী যেমন করিণীকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে, সেইরূপ সেই বৌদ্ধসেনাগণকে

একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তিনি অস্ত্রব্রণরূপ সুরক্ত-ক্ষত-শালিনী শোণিতার্দ্র-বসনা বিবৃত-মধ্যা বিকীর্ণ-কেশা ও রোরুদ্যমানা বৌদ্ধ-সেনা রূপ অঙ্গনাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিলেন, রে রে বৌদ্ধগণ! পলায়ন করিও না, রণস্থলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপন আপন পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। ক্ষীনবল মহারাজ জিন কল্কির ঐ কথা শুনিয়া রোষারুণ নয়নে খড়্গচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার মানসে বৃষারোহণে আগমন করিলেন। নানাশস্ত্র-কুশল বিবিধ যুদ্ধ-বিশারদ সুধীর জিন দেবগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর জিন শূল দ্বারা অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া শরাঘাতে কল্কিকে মূর্চ্ছিত করিয়া ধরাশায়ী করিলেন; কিন্তু বহু যত্নেও তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিতে না পারিয়া পরিশেষে দাসের ন্যায় তাঁহার কবচ ও শস্ত্র সকল ছেদন করিয়া দিলেন। এই অবসরে মহারাজ বিশাখযূপ জিন শরীরে গদাঘাত করিয়া অবলীলাক্রমে মূর্চ্ছিত কল্কিকে লইয়া রথারোহণ করিলেন। সেবকগণের উৎসাহ-বর্দ্ধন ভগবান্ কল্কি সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিশাখযূপের রথ হইতে লক্ষ প্রদান পূর্ব্বক জিন সমীপে আগমন করিলেন, এবং বাণব্যথা বিস্মৃত হইয়া রিঙ্গণ, ভ্রমণ ও পাদবিক্ষেপ দ্বারা সেনাগণ মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক কাহাকে হনন, কাহাকে দণ্ডাঘাত, কাহাকেও বা সটাক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে একবারে শত সহস্র অরাতি সেনা বিনাশ করিলেন। তৎকালে তাঁহার নিশ্বাস-বায়ুতে সৈন্যগণ দ্বীপান্তরে পতিত হইতে লাগিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল রণস্থলেই শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় গর্গা ষষ্টি শত, ভর্গা দশসহস্র শত কোটি, বিশাল পঞ্চবিংশ সহস্র, পুত্রদ্বয়ের

সহিত, কবি দুই অযুত, প্রাজ্ঞ দশ লক্ষ এবং সুমন্ত্র পঞ্চ লক্ষ সৈন্য বিনাশ করিলেন। অনন্তর কল্কি হাস্যবদনে জিনকে বলিলেন, রে দুষ্ট! তুমি আমার সম্মুখে আইস। আমাকে সর্ব্বত্র শুভাশুভ ফলদাতা দৈব বলিয়া জানিও। তুমি এই দণ্ডেই আমার শরজালে বিদ্ধ ও অচৈতন্য হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। আর তোমাকে বন্ধুবান্ধবের সুকোমল বদনকমল দর্শন করিতে হইবে না। কল্কির এই কথা শুনিয়া বলবান্ জিন হাসিতে হাসিতে বলিল, দেখ, আমরা দৈবদ্বেষী ও প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ; আর শাস্ত্রেতেও বৌদ্ধ হস্তে দৈবের বিনাশ লিখিত আছে; অতএব তোমাদের এই পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল। আর যদিও তুমি দৈবস্বরূপ হও, তথাপি এই আমি তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছি, যদি সামর্থ্য থাকে আমাকেই শরজালে বিদ্ধ কর, অন্যান্য বৌদ্ধগণে তোমার প্রয়োজন কি? আজ তুমি আমার প্রতি যে সকল তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ তাহা তোমাতেই প্রযুক্ত হউক। বলবান্ জিন ক্রোধভরে এই সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ভগবান্ কল্কিও দিবাকর যেমন নীহাররাশি অপনীত করেন, তদ্রূপ সেই সমস্ত শরজাল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্ম, বায়ব্য, আগ্নেয় ও পার্জ্জন্য প্রভৃতি জিন-নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ কল্কির দর্শন মাত্রেই ঊষর ক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায়, অশ্রোত্রিয়ে দানের ন্যায় এবং সাধুদ্বেষী ব্যক্তির বিষ্ণুভক্তির ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া গেল।

তখন ভগবান্ কল্কি লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বৃষারোহী জিনের কেশ ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া তাম্রচূড়-পক্ষীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ভূমিনিপতিত জিন একহস্তে কল্কির কেশ ও অপর হস্তে তাঁহার হস্ত

ধারণ করিলেন। তৎপরে দৈত্য চানূর ও কেশবের ন্যায় উভয়েই ভূমিতল হইতে উত্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের কেশ ও হস্ত ধারণ করিলেন এবং আয়ুধশূন্য হইয়া প্রবলপরাক্রান্ত ঋক্ষদ্বয়ের ন্যায় মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রমত্ত দ্বিরদ যেমন তালবৃক্ষ ভগ্ন করে, সেই রূপ মহাবীর কল্কি পদাঘাতে জিনের কটিদেশ ভগ্ন করিয়া তাঁহারে ধরাশায়ী করিলেন। সেনাগণ জিনকে পতিত দেখিয়া হা হা শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। শত্রুর নিধন দর্শনে কল্কি-সেনাগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

জিন সমরক্ষেত্রে নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতা মহাবীর শুদ্ধোদন গদাগ্রহণ পূর্ব্বক কল্কিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। তখন গজারোহী পরবীরহন্তা কবি বাণ বর্ষণে শুদ্ধোদনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ কবি জিন-ভ্রাতা গদাপাণি শুদ্ধোদনকে পাদচারে গমন করিতে দেখিয়া আপনি গদাগ্রহণ পূর্ব্বক পাদচারী হইয়া শুদ্ধোদনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। ভীমপরাক্রম শুদ্ধোদন তৎকালে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ কবিতে লাগিল। মাতঙ্গ যেমন দন্তদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ তাঁহাবাও গদাদ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং রণৌদ্ধত্য-প্রযুক্ত ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন। পরস্পর অব-লীলাক্রমে পরস্পরের গদাঘাত নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবল কবি সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদাঘাতে শুদ্ধোদনের হস্ত-স্থিত গদা অপনীত করিলেন এবং পুনর্ব্বার গদা ঘূর্ণিত করিয়া তাহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। শুদ্ধোদন গদাঘাতে ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, এবং ক্ষণকাল মধ্যেই গাত্রোত্থান করিয়া গদা ধারণ পূর্ব্বক কবির মস্তকে আঘাত করিল। মহাবীর কবি তাহার

গদাঘাতে আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন না বটে, কিন্তু বিহ্বলেন্দ্রিয় ও অচেতনপ্রায় হইয়া স্থাণুর ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শুদ্ধোদন কল্কিকে মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্যক করীগণ-পরিবৃত দেখিয়া মায়াদেবীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিলেন।

অনন্তর শুদ্ধোদন প্রভৃতি বৌদ্ধেরা, যাহার দর্শনমাত্রেই সুরাসুর ও নর প্রভৃতি সকলেই পুত্তলিকার ন্যায় নিঃসার হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেই মায়াদেবীকে অগ্রে রাখিয়া এবং এক লক্ষ কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। ফেরু ও কাক প্রভৃতি জন্তুগণে সমাবৃত, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রসবিনী, ষড়্‌বর্গ সেবিতা, নানারূপ-ধারিণী, বলবতী, ত্রিগুণ-ধারিণী মায়াদেবীকে সিংহধ্বজরথে অবলোকন করিয়া সমস্ত কল্কিসেনা প্রতিমার ন্যায় অসার হইয়া অস্ত্রশস্ত্রের সহিত একবারে ভূতলশায়ী হইল। ভগবান্ কল্কি আপন জ্ঞাতি ভ্রাতা ও সুহৃদ্‌গণকে পরমসুন্দরী শ্রীরূপিনী নিজ জায়া মায়া কর্ত্তৃক মোহিত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন দেবী মায়াও কল্কিকে দেখিবামাত্র তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। সমস্ত বৌদ্ধেরা মায়ার অদর্শনে নিতান্ত দীন ও হীনবল হইয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল এবং নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল "হায়! দেবী কোথায় গমন করিলেন"। ভগবান্ কল্কি আপন দর্শন প্রদানেই স্বীয় সৈন্যগণকে উত্থাপিত করিয়া সুশাণিত অসি গ্রহণ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছবিনাশে উদ্যত হইলেন। ধর্ম্মনিন্দক বৌদ্ধেরা সেই অশ্বারূঢ়, খড়্গধারী, ধনুষ্পাণি, বাণজাল-বিকাশিত, হস্তত্রাণ ও তনুত্রাণে আবৃতাঙ্গ সুতরাং মেঘোপরুদ্ধ নক্ষত্র সদৃশ, স্বর্ণবিন্দু সদৃশ দশন রাজি বিরাজিত, কিরীটস্থিত মণি

সমূহে, সুশোভিত কামিনীগণের নয়নানন্দ বিধানে অপূর্ব্ব রসমন্দির স্বরূপ, বিপক্ষগণের উপর নিতান্ত রুক্ষদর্শী, চরণ-কমল দানেই সমস্ত ভক্তজনের আনন্দদায়ী ভগবান্ কল্কিকে অবলোকন করিয়া যারপর নাই ভীত হইয়া উঠিল, এদিকে আকাশে যাগাহুত হুতাশ-নের ন্যায় সুপ্রকাশিত সুরগণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না।

সুসৈন্য সংমিলনে হৃষ্টচিত্ত, শত্রুবিনাশী, সমরবিনাশী, সাধুসৎকারী, স্বজনগণের দুরিতহর্ত্তা, জীবসমূহের অদ্বিতীয় ভর্ত্তা, এবং কাম পূরণের একমাত্র অবতার ভগবান্ কল্কি তোমাদিগের মঙ্গল-বিধান করুন।

দ্বিতীয় অংশের সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অংশ।—প্রথম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর কল্কি করবাল দ্বারা ম্লেচ্ছগণকে এবং বাণ সমূহে অন্যান্য শত্রুগণকে সন্তাড়িত করিয়া যমসদনে প্রেরণ করি-লেন। বিশাখযূপ এবং গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল, কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্র ইহাঁরাও বহু সংখ্যক ম্লেচ্ছগণকে যমভবনে গমন করাইলেন। পরে কপোতরোমা, কাকাক্ষ ও কাককৃষ্ণ প্রভৃতি শুদ্ধোদনের অধীন বৌদ্ধসৈন্যেরা কল্কি সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। উহাদিগের যুদ্ধ সমস্ত জীবের ভয়প্রদ হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে সংগ্রামস্থল আহত গজ ও অশ্বগণের রুধিরস্রাবে একবারে অরুণবর্ণ ও কর্দ্দমময় হইয়া গেল। দুষ্পার শোণিত-নদী-প্রবাহিত হইতে

লাগিল। সৈন্য সমূহের বিকীর্ণ কেশ সকল উহার শৈবাল, অশ্বগণ উহার গ্রাহ, ধনু সকল উহার তরঙ্গ, গজসমূহ উহার প্রবাহ, ছিন্নমস্তক সকল উহার কূর্ম্ম, রথ সকল উহার তরি, এবং ছিন্নহস্ত সকল ঐ নদীর মীন। মনস্বী জনমাত্রেই ঐ যুদ্ধ দর্শনে নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। দুন্দুভির রবে দিক্ সকল ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল; ফেরু ও শকুন সমূহের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। হস্তী, অশ্ব, খর, উষ্ট্র ও রথ সকল আহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। বলনিপতিত সৈন্যগণের বদন সকল ভস্মাচ্ছন্ন, বস্ত্র সকল শোণিত-ময়, এবং কেশগুচ্ছ নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হওয়াতে উহাদিগকে সন্ন্যাসীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কেহ কেহ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, কেহবা পুনঃ পুনঃ জল যাচ্ঞা করিতে লাগিল। ফলত সমস্ত ম্লেচ্ছগণ কল্কি সৈন্যের বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া কোনমতেই শান্তিলাভ করিতে পারিল না। বৌদ্ধসৈন্য সকল নিহত হইলে পতিশোক সন্তপ্তা পতিব্রতা যুবতীগণ এবং অন্যান্য স্বৈরিণী অতি কামিনী ও পুংশ্চলীগণও ভূষণ প্রভায় দশদিক্ আলোকিত করিয়া কেহ কেহ রথারোহণে, কেহ কেহ গজারোহণে, কেহ কেহ অশ্বারোহণে, কেহ কেহ খরারোহণে, কেহ কেহ উষ্ট্রা-রোহণে, কেহ কেহ বা বৃষারোহণে, খড়্গ, শক্তি, ধনু ও বাণ ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কল্কিসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমাগত হইল। যখন মৃণ্ময়, ভস্মময়, কাষ্ঠময়, বস্তুর রক্ষণে সম্পূর্ণ প্রভুতা বিস্তৃত হইয়া থাকে তখন যুবতীগণ স্বচক্ষে পতিনিধন নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপে সুস্থির থাকিতে পারে! ঐ সমস্ত নারীগণ আপন আপন পতিগণকে বিকলেন্দ্রিয় ও বাণ-ভিন্নাঙ্গ দেখিয়া কল্কিসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

কল্‌কিসৈন্যগণ ঐ সকল রমণীকে আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং হাসিতে হাসিতে কল্‌কির নিকট গমন করিয়া ঐ বিষয় নিবেদন করিল। মহামতি কল্‌কি স্ত্রীগণের সংগ্রামবাসনা শ্রবণ করিয়া অনুচর ও সৈন্যগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রধারিণী নানাবাহনসংরূঢ়া কৃতব্যূহ কামিনী-গণকে অবলোকন করিয়া বলিলেন, রে স্ত্রীগণ! তোমরা আমার এই হিতজনক বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। বিবেচনা কর, ঐ অলকরাজি-বিরা-জিত নয়নানন্দকর চন্দ্র সদৃশ মুখ চন্দ্রে কে প্রহার করিতে পারে! যাহাতে তারারূপ ভ্রমর অনুক্ষণ বিচরণ করিতেছে সেই কোকনদ সদৃশ সুদীর্ঘ নয়নে কে প্রহার করিবে! হাররূপ ফনিগণে বিভূষিত কামদর্প দলন পয়োধররূপ শম্ভুর গাত্রেই বা কে প্রহার করিবে! আর দোদুল্যমান অলক সমূহরূপ চকোরগণে আক্রান্ত অকলঙ্কিত মুখচন্দ্রে কোন্ ব্যক্তি প্রহার করিতে পারে! অত্যুন্নত স্তন যুগলের ভরে নিতান্ত আক্রান্ত সুসূক্ষ্ম লোম রাজি-বিরাজিত পাণিমিত মধ্য-দেশেই বা কে প্রহার করিতে পারে! আর যাহা দর্শন মাত্রেই নয়নের আনন্দ জন্মে এবং যাহাতে নিন্দার লেশমাত্রও নাই, কোন্ ব্যক্তি প্রাণ ধারণ করিয়া সেই মনোহর জঘন দেশে বাণ বর্ষণ করিবে!

রমণীগণ কল্কির এই কথা শুনিবামাত্র হাস্য করিয়া বলিল, হে বিভো! আপনি আমাদিগের পতি বিনাশ করিয়াছেন তাহা-তেই আমরা বিনষ্ট হইয়াছি। এই বলিয়া তাহারা কল্‌কির প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু অস্ত্র সকল কোন মতেই তাহা-দিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল না।

অনন্তর খড়্গ, শক্তি, ধনু, বাণ, শূল ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ-ভূষণ-ধারিণী কামিনীগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, হে কামিনীগণ! আমরা আপন আপন তেজ দ্বারা যাঁহার হিংসা করিব তিনি সর্ব্বময় আত্মা, ইহা নিশ্চয় জানিও। হে রমণীগণ! আমরা যাঁহার অনুজ্ঞায় ইতস্তত বিচরণ করিতেছি, যাঁহা হইতে আমরা নাম ও রূপ ভেদে জগতে বিদিত হইয়াছি এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাত্মক পঞ্চভূত যাঁহার অধিষ্ঠানবলেই বিচরণ করিয়া থাকে, ইনিই সেই পরমাত্মা কল্কি। যিনি কাল, স্বভাব, সংস্কার, নাম ও আদ্য প্রকৃতি স্বরূপ, যাঁহার দৃষ্টি মাত্রেই এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ও অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব সকল সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহার মায়ায় এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সংজ্ঞিতা জগৎযাত্রা সংসাধিত হইতেছে, যিনি এই বিশ্বসংসারের আদি, সেই ভগবান্ কল্কিই জগতের অন্ত এবং পরম ঈশ্বর। ইনি আমার পতি, আমি ইহাঁর ভার্য্যা এবং আমার পুত্র ও আমার বন্ধুবান্ধব এই সকল স্বপ্নোপম ও বিবিধ ইন্দ্রজাল সদৃশ। কালই বা কোথায়! মৃত্যুই বা কোথায়, যমই বা কোথায়, আর দেবতাই বা কোথায়! ভগবান্ কল্কিই মায়াপ্রভাবে নানাবিধরূপে আবির্ভূত হইতেছেন। কামিনীগণ অস্ত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং স্নেহ মোহপরিত্যাগ পূর্ব্বক কল্কির শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ মাধব তাহাদিগকে আত্মবিহিত কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ প্রভৃতির বিষয় বলিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া স্ত্রীগণ অনায়াসেই ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিলেন, এবং ভক্তিপ্রভাবে যোগীগণের দুর্ল্লভ পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

ভীমকর্ম্মা ভগবান্ কল্কি এইরূপে যুদ্ধ করিয়া বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণকে নিহত করিলেন এবং তাহাদিগের কামিনীগণকে মো[illegible]

প্রদান করিয়া তাহাদিগের জ্যোতিস্থান সকল পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন আদর পূর্ব্বক এই শোকহর, শুভকর, হরিভক্তিপ্রদ মায়ামোহ-বিনাশন ও সংসার-তাপনাশন সর্ব্বার্থ-সাধক বৌদ্ধ-নিধন ও মেস্লচ্ছক্ষয় শ্রবণ করেন ও পাঠ করেন তাহাদিগের আর এই সংসারে জন্ম মরণ হয় না।

তৃতীয় অংশের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

পূর্ণশশী।

গীত সমাপ্ত হইলে পুনরায় বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় বংশীধ্বনি হইল। পূর্ণশশী একমনে তাহা শ্রবণ করিলেন। পুনরায় আর একটী গীত হইল। কিন্তু কে গাইল, শ্রোতারা দেখিতে পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিলম্বে বংশীধারী পুরুষ আপন আসন হইতে উঠিয়া বৃক্ষান্তরালে গমন করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল; আর দেখা গেল না। অনেকক্ষণ আর কিছু সাড়াশব্দ হইল না।—পূর্ণশশী এই সময় এত অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, নিকটে অনুচরী দাঁড়াইয়া ছিল, জ্ঞান ছিল না, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার রসনা হইতে শেষের গীতের একটী চরণ প্রতিধ্বনিত হইল। তখনি আবার যেন কি ভয় পাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কাতর কণ্ঠে কহিলেন, নিকটে কি কেহ আসিতেছ?—নিকটে কি কেহ আছ? যেই হও, আমারে ধর!—না—না,—আমারে ধরিও না,—আমারে ছুঁইও না;—আমি কুমারী,—আমি অবলা,—আমি সন্ন্যাসিনী,—আমি কাঙ্গালিনী!

সহচারিণী পরিচারিকা চমকিত হইয়া পূর্ণশশীর হস্ত ধারণ করিল।—চঞ্চলস্বরে কহিল, দেবি! এ কি? আপনি এমন হইলেন কেন?—অকস্মাৎ কি কিছু ভয় পাইলেন? ভয় কি? এই দেখুন, আমি নিকটে রহিয়াছি। আমি আপনার কিঙ্করী।

চৈতন্যের সহিত পূর্ণশশীর ভাবান্তর হইল। তিনি অনুচরীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখি! তুমি জানিতেছ না, ইহা দেবমায়া! কোন্ দেবতা আমাদের অসহায়িনী অবলা দুটীকে রজনীতে কাননে দেখিয়া ছলনা করিলেন! দেখিতেছ না, আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, আমি কাঁপিতেছি, পিপাসা হইয়াছে!

যথার্থই পূর্ণশশী তখন কাঁপিতেছিলেন। অনুচরী ব্যস্ত সমস্ত

হইয়া কহিল, তবে আর এখানে বিলম্ব করা নহে, চলুন, শীঘ্রই গৃহে যাই। পূর্ণশশী শিরশ্চালনে সম্মতি সঙ্কেত করিলেন, মুখে উত্তর করিলেন না। অনুচরী পূর্ব্ববৎ গুপ্ত দ্বার দিয়া উদ্যান পার হইয়া তাঁহারে ধরিয়া গৃহে লইয়া গেল।—গৃহে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ পরে, পূর্ণশশী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। অনুচরী কহিল, দেবি! আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা সত্য হইতে পারে। উহার নাম লক্ষ্মণাটবী। রাম লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমা ঐ বনে আছে। রাত্রি হইলে তাঁহারা লীলা করেন। পূর্ণশশী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, হুঁঃ!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীর-যাত্রা।

সুবর্ণ পিঞ্জরে বাস কত সমাদর।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুধা পেলে, মিলে ক্ষীরসর।
তবু পাখী এত সুখ, ভুঞ্জিতে না চায়।
কানন জনম ভূমি ক্রোড়ে মন ধায়।

যে রজনীতে লক্ষ্মণাটবীতে গীত শ্রবণে পূর্ণশশীর মনোবিকার জন্মিল, সে রজনীতে সে গৃহে আর কাহারও নিদ্রা হইল না। সকলেই ঐ কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। পূর্ণশশী কত কি ভাবিতে লাগিলেন। নিত্যকামী নিকট বসিয়া সমস্ত নিশা জাগি-

লেন। আর এখানে থাকিব না, তোমারে লইয়া কল্যই নীলগিরিতে চলিয়া যাইব, এই কথা বলিয়া বুঝাইলেন।

পর দিন বেলা এক প্রহরের পর একজন দূত আসিয়া গৃহরক্ষীকে জানাইল, এই বাটীতে যাহারা অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে কাশ্মীর রাজধানীতে যাইবার হুকুম হইয়াছে। আর একখানি চিঠি আছে, অন্তঃপুরে দিবার আদেশ। দ্বাররক্ষক একজন কিঙ্করীকে ডাকিয়া রাজার আদেশ জানাইল এবং সেই পত্রখানি তাহার হস্তে দিল। দূত বিদায় হইয়া চলিয়া গেল।

পত্রের শিরোনামায় পূর্ণশশীর নাম। কিঙ্করী তাহা দর্শন করিয়া পূর্ণশশীর হস্তে লইয়া গিয়া দিল। পূর্ণশশী শুনিলেন, এখান হইতে কাশ্মীরে যাত্রা করিবার সংবাদ আসিয়াছে। পত্রেও তাহাই আছে, ভাবিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে একপার্শ্বে রাখিয়া দিলেন,—খুলিলেন না। একবার ভাবিলেন, কে লিখিয়াছে?—রাজা?—তিনি আমারে পত্র লিখিবেন কেন?—রাজপুত্র?—তিনিও ত আমারে চিনেন না; হঠাৎ পত্র লিখিবার কারণ কি? রাজারা এমন অনুচিত কাজ করেন না। তবে কে লিখিল? পত্রিকা?—তাহাই সম্ভব। পত্রিকা কাশ্মীরে গিয়াছেন, শীঘ্র আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারেন নাই, সেইজন্যই বোধ হয় কিছু লিখিয়া থাকিবেন। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন,—প্রফুল্ল মুখখানি মলিন হইয়াছে, এক দৃষ্টে পত্রের খামের উপর চাহিয়া আছেন, চক্ষুদুটী ছলছল করিতেছে। পত্রখানি পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন, হস্তে তুলিয়া লইলেন। পত্রবাহিকা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, পূর্ণশশীকে বিষণ্ণ ও বিমনা দর্শন করিয়া কহিল, দেবি! কি চিন্তা করিতেছেন? পত্র পাঠ করুন। বোধ করি, পত্রিকা দেবীর লেখা। পূর্ণশশী তাহার মুখপানে চাহিয়া গদ্ গদ্

স্বরে কহিলেন, তুমি কিরূপে জানিলে ?—আমিও ঐরূপ ভাবিতে-ছিলাম। দেখি, প্রিয়সখী পত্রিকা এই প্রিয়পত্রিকায় কি সংবাদ লিখিয়াছেন। অনুচরীকে এই কথা বলিয়া সকৌতুহলে পত্রিকাখানি খুলিলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিতেছিলেন, তাহাই বটে। পত্রিকা-রই পত্রিকা। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিলঃ—

"স্নেহময়ী প্রেমময়ী পূর্ণশশি ! আমি তোমারে ছাড়িয়া এখানে আসিয়া বড় অসুখে রহিয়াছি। আর কোনো অসুখ নাই, তোমার অদর্শনই প্রধান সুখের অবসান। শীঘ্র যাহাতে দর্শন পাই, তাহার উপায় করিয়াছি। ভাই শশি ! তোমারে একটী শুভ সংবাদ দিই।—প্রয়াগে রাজকুমারের পত্র পাঠ করিয়া তুমি অসুখী হইয়াছিলে, আমিও চিন্তিত হইয়াছিলাম, এখন সে অসুখ ও সে চিন্তার কারণ দূর হইয়াছে। দুর্দ্দিন গিয়াছে। মহারাজের সহিত আমাদের মহারাজের পুনরায় মিলন হইযাছে। মহারাষ্ট্রপতি শিবজী এখন আমাদের মহারাজের পূর্ব্ব বন্ধুত্ব পুনর্ব্বার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ধূর্ত্ত মোগল ঔরঙ্গজেব একাকী হইয়াছেন। এটী আমাদের পক্ষে শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। রাজকুমার বিপাকে পড়িয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, পিতা ও স্বজন-বর্গের সহিত লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে যাত্রা করিবেন, তাহা আর হইল না। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় আপন রাজপ্রাসাদেই সুখে ও নিরুদ্বেগে অবস্থান করিয়া পূর্ব্ব অধিকার ধারণ করিবেন। এক্ষণে তোমাকে লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করিয়া এই রাজ্যে শুভাগমন করিতে হইতেছে। রক্ষীবর্গ, অনুচরীবর্গ,

ও কিঙ্করীবর্গকে সঙ্গে লইয়া সত্বর,—যত সত্বর পার, তথা হইতে যাত্রা করিবে। ঋষিবর নিত্যকামীও যেন তোমার সহিত আইসেন। আমি তাঁহারে বিবাহ করিব অঙ্গীকার করিয়াছি। ব্রাহ্মণ যেন মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া না যান। আমি এখন এখান হইতে যাইতে পারিলাম না,—রাজকুমার আমারে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিলেন। তোমারে আনিবার জন্য উপযুক্ত যান, বাহক ও রক্ষক রওনা হইল। সাবধানে আসিও। নিকটস্থ হইলেই আমরা সকলে আগু বাড়াইয়া লইব। তুমি এখানে আসিয়া পৌঁছিলেই পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইব। এই খানেই তোমার শুভ বিবাহ হইবে। সেজন্য চিন্তা করিওনা,—রাজপুত্র বলিয়াছেন, শীঘ্রই বিবাহ হইবে। আমি তোমারে আনিতে যাইতে পারিলাম না বলিয়া কিছু মনে করিওনা। রাজকুমারের অনুরোধে আবদ্ধ থাকিতে হইল। আমার মন তোমার নিকটে আবদ্ধ; শরীরগতিক ভাল আছি।

তোমারি অধীনী

শ্রীমতী পত্রিকা"।

পত্রিকা পাঠ করিয়া পূর্ণশশী উন্মনা হইলেন। নিকটবর্ত্তিনী কিঙ্করীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে লোক এই পত্র আনিয়াছিল, সে কি বিদায় হইয়াছে? কিঙ্করী কহিল, হাঁ, চলিয়া গিয়াছে।

পূর্ণশশী বিষাদ-নিমগ্ন হইলেন। কিঙ্করী জিজ্ঞাসা করিল, সে বিদায় না হইলে কি হইত?,

পূর্ণ।—জবাব লিখিতাম।

কিঙ্ক।—শীঘ্র এখান হইতে যাইতে হইতেছে, আর জবাব কেন?

পূর্ণ।—তবু লিখিতাম।

কিঙ্ক।—কি লিখিতেন?

পূর্ণ।— এই লিখিতাম যে, কাশ্মীরে যাইব না।

কিঙ্ক।—সে কি?

পূর্ণ।—আরো লিখিতাম, কেহ কারু নয়।

কিঙ্ক।—কি জন্য?

পূর্ণ।—জগৎ মিথ্যা।

কিঙ্ক।—যদি কাশ্মীরে যাইবেন না, তবে কোথায় থাকিবেন?

পূর্ণ।—যেখানে ছিলাম।

কিঙ্ক।—এইখানে?

পূর্ণ।—না।

কিঙ্ক।—তবে কোথায়?

পূর্ণ।—বনবাসে।

শেষ কথা শুনিয়া কিঙ্করীর হৃৎকম্প হইল। একবার মনে করিল, গত রজনীতে কাননের বাতাস লাগিয়াছে, পীড়া হইয়াছে; আবার ভাবিল, হয় ত উনি পরিহাস করিতেছেন। অনেক তোলাপাড়া করিল, কিছুই স্থির করিতে পারিল না,—জিজ্ঞাসা করিতেও মন সরিল না। পূর্ণশশী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অনুচরী বসনাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। পূর্ণশশী আকাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া সাশ্রুনয়নে করুণস্বরে কহিলেন, নিষ্ঠুর! আর কি তুমি বাঁশী বাজাইবার সময় পাও নাই?—তুমি দেবতা হও, যক্ষ হও, রাক্ষস হও, কিন্নর হও, নাগ হও, পিশাচ

হও, কিম্বা কোনো মায়াধারী মানব হও,—যেই হও, আর কি তুমি মোহন বাঁশী বাজাইবার সময় পাইলে না?—আর কি বাঁশী শুনাইবার ক্ষেত্র পাইলে না?—আর কি কাহারও কর্ণ নাই?—এই অভাগিনীর তপ্ত হৃদয় ভিন্ন আর কি তোমার বাঁশী বিদ্ধ করিবার স্থান জগতে নাই? হৃদয়! দ্বিধা হও! আমি——

বলিতে বলিতে সহসা সেখান হইতে উঠিয়া চলিলেন। কোথায় যান, এ অবস্থায় কোথায় যাইবেন?—এই কথা বলিয়া অনুচরী অনুবর্ত্তিনী হইল। পূর্ণশশী নিত্যকামীর নিকটে চলিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক কথা কহিলেন, নিত্যকামীর চক্ষেও জল আসিল,—দুই জনেই কাঁদিতে লাগিলেন।

দিবামান এই প্রকারেই অতিবাহিত হইল। সূর্য্যদেব পূর্ণশশীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া পূর্ণশশীর প্রতি গগন রাজ্যের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক বিষণ্ণ রক্তিম বদনে অস্তগমন করিলেন। পূর্ণশশী আকাশে উঠিলেন, চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নাময় হইল, পূর্ণশশী আকাশে নেত্রপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। রজনীর ঘটনাগুলি সমধিক কষ্টকর।

পরদিন প্রাতঃকালে কাশ্মীর হইতে লোকজন আসিল,—আবাস উঠাইয়া যাত্রা করিবার অবসর উপস্থিত। পূর্ণশশী উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন। নিত্যকামী অনেক বুঝাইলেন, কিঞ্চিৎ উপকারও হইল। অবশেষে নিত্যকামীর অনিচ্ছাতে, পূর্ণশশীর সম্পূর্ণ অমতে লক্ষ্মণাবতী হইতে সাজপাট উঠিয়া চলিল;—সকলে একত্রে যাত্রা করিলেন।

———

নবম পরিচ্ছেদ।

উদাসিনী।

" কে তুমি কার কুলবালা !
আলো করি বিল্বতলা !
কি বিষাদে মনের ক্ষেদে
মুখে বল ববম্ ভোলা !
এ নবীন বয়সে ধনি !
(তুমি) কেন হলে সন্ন্যাসিনী !
জটা ভস্ম বিভূষিণী !
গলেতে রুদ্রাক্ষ মালা !"

পূর্ণ-শশী কাশ্মীরে উপনীত হইলে যুবরাজ সবিশেষ সমারোহে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আলয়ে লইয়া গেলেন। সখী উপলক্ষ করিয়া পূর্ণ-শশী রাজকুমারকে শুনাইলেন, ব্রত আছে, রাজপ্রাসাদে থাকা হইবে না। সুচতুর রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। রাজবাটীর সংলগ্ন মনোহর উদ্যানে সুসজ্জিত বাটীতে পূর্ণ-শশীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কতক পরিচিত, কতক অপরিচিত নূতন অনুচরী নিযুক্ত হইল। পূর্ণ-শশী সুন্দর শিবিকা আরোহণে তথায় প্রবেশ করিলেন। নিত্যকামীর নিমিত্ত স্বতন্ত্র আবাস নির্দ্দিষ্ট হইল।

আয়োজনে দিনমান গেল, রাত্রি হইল। রাত্রিকালে উদ্যান-বাটীতে নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদ হইতেছে, চারি দিকে আলো জ্বলিতেছে, বিহগকুলের সুমধুর সঙ্গীতে নয়নমন মুগ্ধ হইতেছে, পূর্ণশশীর কিছুই ভাল লাগিতেছে না;—পার্থিব বৈকুণ্ঠধামের এত সুখ—এত ঐশ্বর্য্য পূর্ণশশীর কিছুই ভাল লাগিতেছে না! তিনি একবার এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পবিত্রা দেবী কোথায়?—' "এখনি আসিবেন, শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে।"—সংক্ষেপে এই উত্তর পাইলেন। সংক্ষিপ্ত উত্তরে তৃপ্তি বোধ হইল না, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি এখানে নাই?"—এ প্রশ্নে কিছুই উত্তর হইল না.—সকলেই গীত বাদ্যের আনন্দে উন্মত্ত। পূর্ণ-শশী উন্মনা হইয়া আপনা আপনি কহিলেন, কতক্ষণ?—শেষ বর্ণটী দীর্ঘ নিশ্বাসের টানে অনেকক্ষণে উচ্চারিত হইল।

রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্যগীত হইল। যতক্ষণ আমোদ, ততক্ষণ পূর্ণশশী বিষণ্ণ—অন্যমনস্ক। মধ্যে মধ্যে নয়নে, কপোলে, বক্ষে অশ্রুধারা।—গীতবাদ্যের অবসানে সকলে স্ব স্ব স্থানে বিশ্রাম করিতে গেল, পূর্ণশশী আর কয়েকটী স্ত্রীলোক একটী কক্ষে রহিলেন। বড় অসুখ, এই ছল করিয়া সে রজনীতে পূর্ণশশী কিছুমাত্র আহার করিলেন না। গভীর ত্রিযামকালে সহচরীগণ নিদ্রিত হইলে, পূর্ণ-শশী ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলেন, তাঁহার নিদ্রা নাই। ধীরে ধীরে উঠিয়া আর একটী পার্শ্বকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহ নির্জ্জন; —নির্জ্জন, কিন্তু সুন্দর সুন্দর সজ্জায় সুশোভিত। নানাবিধ আস-বাবে পরিপূর্ণ। সুগন্ধে আমোদিত। পূর্ণশশী সেই গৃহের মধ্যস্থলে গিয়া বসিলেন। নয়ন ঘূরাইয়া চতুর্দ্দিক একবার দেখিলেন।—দেখি-লেন, বিবিধ বেশ ধারণের উপযুক্ত উপকরণ ঝুলিতেছে। ভাবিলেন,

এই সুযোগে ছদ্মবেশ ধরিয়া পলায়ন করি। আবার ভাবিলেন, না,—তাহা হয় না; স্ত্রীলোক, বিদেশ, কোথায় বা যাইব, পথ চিনি না, লোক চিনি না, দেশ চিনি না, রাজাদের আইন কানুনও জানি না কোথায় যাইব, কে ধরিবে, কাহার হাতে পড়িব, কিসে কি হইবে,—ভাল হয় না। দূর হউক, কাজ নাই, এই খানেই থাকি। যা থাকে অদৃষ্টে, তাহাই ঘটিবে;—তাহাই ঘটুক। এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া অচলভাবে সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিলেন। শেষে এই স্থির করিলেন যে, যাহাতে এ বেশ আর কেহ দেখিতে না পায়, তাহাই করি। এই ভাবিয়া গাত্রের অলঙ্কারগুলি একে একে উন্মোচন করিলেন, নিবিড় কাদম্বিনী কেশগুচ্ছ আলুলায়িত করিলেন, সঙ্গে তীর্থমৃত্তিকার একটী ছোট ঝুলি ছিল, তাহা হইতে মৃত্তিকা বাহির করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন, আলুলায়িত কুন্তলেও মাটী মাখিলেন, অবিকল একটী সন্ন্যাসিনী সাজিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া সোপানমঞ্চে নামিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক সম্মুখে পথরোধ করিল।—জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে কে উদ্যানগৃহ হইতে বাহিরে যায়?" —পূর্ণশশী নিশ্চল নিস্তব্ধ।—ভয়ে নিস্তব্ধ?—হইতেও পারে; তাহাই সম্ভব; কিন্তু ভয়ই বা কিসের?—কাহারো কিছু চুরি করিয়া যাইতেছেন না, অঙ্গে অলঙ্কারও নাই, ভয়ই বা কি?—পূর্ণশশী আপন মনোভাবেই আপনি নিশ্চল নিস্তব্ধ।

পথরোধকারিণী অগ্রসারিণীকে নিরুত্তর দেখিয়া আরো কিছু উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে?— কথা কও,—কথা না কহিলে শিরশ্ছেদনের আদেশ!" পূর্ণশশী কম্পিত হইয়া কথা কহিলেন।—কহিলেন,—"যদি ভয় দেখাও, পরিচয় পাইবে না; যদি পরি-

চয় দিই, বুঝিতে পারিবে না, এইজন্য নিরুত্তর ছিলাম। আমি উদাসিনী।”

উভয়ের কথা উভয়ে শুনিলেন। যিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বর উত্তরকারিণী বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু উত্তরদায়িনীর স্বর তিনি বুঝিতে পারিলেন। পাঠক মহাশয়ও বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন, প্রশ্নকারিণী রমণী আপনার পূর্ব্ব পরিচিতা পত্রিকা।

পত্রিকা কহিলেন, রাজার আদেশ নাই, আমি তোমারে ছাড়িতে পারি না, কক্ষমধ্যে ফিরিয়া চল। উদাসিনী মৃদুস্বরে কহিলেন, আমি উদাসিনী, রাজার আদেশে আমার কি সম্পর্ক? উদাসিনীর গৃহে প্রয়োজন কি? পত্রিকা কহিলেন, কি সম্পর্ক, কি প্রয়োজন, তাহা আমি জানি না, রাজার আজ্ঞা পালন করিব, তোমারে গৃহমধ্যে লইয়া যাইব।

এই কথা বলিয়া পূর্ণশশীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উদ্যানগৃহে লইয়া গেলেন। দীপালোকে পূর্ণশশী দেখিলেন, পত্রিকা।—দেখিয়াই লজ্জা হইল,—লজ্জার সঙ্গে আনন্দের চিহ্নও দেখা দিল; অপ্রস্তুত হইয়া বদন নত করিলেন। পত্রিকা ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন, রাজপ্রহরীকে দেখিয়া লজ্জা করিলে হইবে না;—বল, কোথায় যাইতেছিলে?—পূর্ণশশী মৃদুবচনে কহিলেন, তুমি বল, এতদিন আমারে ভুলিয়া কোথায় ছিলে? পত্রিকা কহিলেন, তুমি বল, তোমার এ বেশ কেন? পূর্ণশশী কহিলেন, তুমি বল, আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই কেন? এইরূপ পরস্পর বাক্‌চাতুরীতে যামিনী বাড়িতে লাগিল,—বাড়িয়া বাড়িয়া শেষ হইতে লাগিল,—উভয়েই প্রশ্ন করেন, কেহই উত্তর করেন না।

রজনী চারি দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট। পত্রিকা এই অবসরে পূর্ণশশীকে কহিলেন, দেখ শশি! ব্যঙ্গ ছাড়, পরিহাসের এ সময় নয়;—পরিহাস ত্যাগ কর; বল, তোমার এ বেশ কেন? রজনীপ্রভাতে তোমার বিবাহ, তুমি কি দুঃখে সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছ?

"দুঃখ?"—পূর্ণশশী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, দুঃখ?—এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, কি বলিব, অপর কাহারো মুখে এ প্রশ্ন শুনিলে এই শাণিত ভুজালী বক্ষে বিদারণ করিয়া এখনি এ জীবনের,—এ পাপজীবনের অবসান করিতাম! এই কথা বলিয়া পত্রিকার মুখপানে চাহিয়া পূর্ণশশী একখানি তীক্ষ্ণ ভুজালী দেখাইলেন,—রোদন করিতে লাগিলেন। পত্রিকা বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। কহিলেন, অভিমানিনি! মনে মনে তোমার এতদূর ভয়ঙ্কর সংকল্প?

সাশ্রুনয়নে পূর্ণশশী কহিলেন, হইত না; কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক।

পত্রি।—আমি স্ত্রীলোক, তাহাতে তোমার কি?

পূর্ণ।—মনে বুঝিয়া দেখ। প্রয়াগধাম মনে কর, লক্ষ্মণা মনে কর, স্মরণ হইবে।

পত্রি।—মনে করিলাম, মনে পড়িল না। আমি স্ত্রীলোক, এই জন্য তুমি আত্মহত্যা করিবে?

পূর্ণ।—সুতরাং।

পত্রি।—সুতরাং? তাৎপর্য্য বুঝিলাম না।

পূর্ণ।—স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে কর।

পত্রিকা হাস্য করিয়া কহিলেন,—এইজন্যই লোকে মেয়ে মানুষকে অবলা বলে। স্বপ্ন ইন্দ্রজাল,—স্বপ্নও কি সত্য হয়? স্বপ্নের মায়া মনে করিয়া,—স্বপ্নের মায়ায় বিশ্বাস করিয়া যাহারা স্বইচ্ছায়

অমূল্যধন জীবন বিসর্জ্জন দেয়, তাহারা ইহলোকে অবোধ, পরলোকে পাতকী।

পূর্ণ।—তবে তখন তেমন কথা বলিয়াছিলে কেন?

পত্রি।—প্রবোধের নিমিত্ত;—আশু প্রবোধের নিমিত্ত।

পূর্ণ।—গন্ধর্ব্বকুমারী কামচারী, এ কথাও কি প্রবোধ?

পত্রি।—যেমন ক্ষেত্র, সেখানে তাহার উপযুক্ত সকল কথাই প্রবোধ।

পূর্ণ।—তবে এখন কি বলিয়া প্রবোধ দিবে?

পত্রি।—রাজকুমারকে বিবাহ কর, কাশ্মীরের রাজরাণী হও, সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া রাজার মা হও, লোকে পাটরাণী বলুক, আমি বাহু তুলিয়া শুভকীর্ত্তন করি, চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি হউক, এখন এই কথায় প্রবোধ দিব।

পূর্ণ।—মন এ প্রবোধ মানে না, আমি বিবাহ করিব না।

পত্রি।—এক কথাই চিরকাল?

পূর্ণ।—হাঁ।

পত্রি।—তবে এতদূর পর্য্যন্ত আসিলে কেন?

পূর্ণ।—বিধাতার বিড়ম্বনা।

পত্রি।—লোকে তপস্যা করিয়া রাজরাণী হইবার বর লয়; কাশ্মীরের রাজকুমার শশীন্দ্রশেখর ইচ্ছা করিয়া তোমারে রাজরাণী করিতে চাহিতেছেন, তুমি পুনঃপুন অস্বীকার করিতেছ; এটিও কিন্তু ভাই তোমার পক্ষে বিধাতার বিড়ম্বনা।

পূর্ণ।—হয় হউক।

পত্রি।—তাহার পর?

পূর্ণ।—তাহার পর একদিকে জীবন, একদিকে আমি। ছুরি দেখিয়াছ, মন জানিয়াছ, তবে আর প্রশ্ন কেন?

পত্রি।—রাজপুত্র তোমার প্রণয় পরীক্ষা করিবেন।

পূর্ণ।—প্রণয়?—পরীক্ষা?—আমার প্রণয় নাই।— আমার প্রণয় নাই,——আমার প্রণয় নীলগিরির হরিণশাবকেরা,—তরু-শাখার সুন্দর বিহগেরা অধিকার করিয়াছে। আমার হৃদয়ে প্রণয় নাই; আমি একাকিনী আছি। আমি উদাসিনী।

ছাড়া ছাড়া কথায় কেহ কাহারও মনোভাব অবগত হইতে পারিলেন না। পত্রিকার প্রতি পূর্ণশশীর অনুরাগ জন্মিয়াছে। পত্রিকা বলিয়াছিলেন, আমি কামচারী গন্ধর্ব্বকুমারী। ইচ্ছা করিলে পুরুষ হই, ইচ্ছা করিলে নারী হই। সেই আশ্বাসে আর ঘনিষ্ঠতার মহিমায় পত্রিকার প্রতি পূর্ণশশীর অনুরাগ জন্মিয়াছে। পত্রিকা যদি পুরুষ হইয়া পূর্ণশশীকে বিবাহ করেন, তবেই বিবাহ হইবে, নতুবা তিনি আজীবন কুমারী থাকিবেন, এই প্রতিজ্ঞা। কথায় কথায় রজনী প্রভাত হইল। উদ্যানের বিহঙ্গ বিহঙ্গিণীরা শুভপ্রভাতী গীত আরম্ভ করিল। শশব্যস্তে পত্রিকা উঠিয়া চলিলেন। পূর্ণশশী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, যাও, বাধা নাই, মনে রাখিও, আমি উদাসিনী।

দশম পরিচ্ছেদ।

নূর্তন সংঘটন।

কোথায় কনকলঙ্কা, কোথা লঙ্কেশ্বর,
কোথায় জানকীসতী, কোথা রঘুবর।
বনবাসী তপোধন, আজি আচম্বিতে,
মিলিলেন শুভক্ষণে, মিলন দেখিতে।

প্রাতঃকালে তেজঃপুঞ্জ কলেবর এক ঋষি রাজবাটীতে উপনীত হইলেন। গলদেশে ধবল উত্তরীয়, ধবল যজ্ঞোপবীত, কর্ণে ধবল লোমাবলী, বক্ষে ধবল লোমরাজী, ভ্রূযুগল ধবল, কেশ ধবল, মস্তকে জটা, বাস ধবল, সমস্তই ধবলবর্ণ। দেহ পক্ক আম্রের ন্যায় লোল পীতবর্ণ। দেখিলেই তেজোময় মূর্ত্তিমান ভৈরব মনে হয়। তিনি রাজসভায় আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা চিনিতে পারিলেন না, হস্ত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। ব্রহ্মচারী মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিয়া হর হর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজের জয় হউক! মহারাজ তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারিলেন না, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মচারী কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাজ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়াকুলচিত্তে পুনঃ পুনঃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মচারী নূতন কথা কহিয়া সে কথা চাপা দিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত আগমন? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, দর্শন করিতে আগমন। রাজা বিস্মিত হইলেন। বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, তবে কি পূর্ব্বে কখনো দেখা শুনা হইয়াছিল?—জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিবর! ক্ষমা

করিবেন, এ দাস কি আপনাকে আর কখনো কোথাও দেখিয়াছে? সন্ন্যাসী কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া কহিলেন, না—না—মহারাজ, দাস বলিবেন না; মহারাজের সহিত অন্য সম্বন্ধ আছে।

"সম্বন্ধ?—সে কি কথা?—সন্ন্যাসীর সহিত সম্বন্ধ? কি সম্বন্ধ?—স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, কোনো সন্ন্যাসীর সহিত এপর্য্যন্ত আমার ত কোনো সম্পর্ক হয় নাই!—তবে এ কি?" এইরূপ না না চিন্তা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! বুঝিতে পারিতেছি না, দোষ লইবেন না, আপনি কি তবে ছদ্মবেশে আমারে ছলনা করিতে আসিয়াছেন?

সন্ন্যাসী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কি?—ছলনা? জন্মাবধি যাঁহাদিগের ছলনা অভ্যাস, তাঁহাদিগের নিকট সংসারত্যাগী বনবাসী যোগীর ছলনা?—মহারাজ! আপনার রাজ্যের মঙ্গল হউক, আপনি অমন আজ্ঞা করিবেন না। আপনি একটী বনবাসিনী উদাসিনী কন্যাকে ছলনা করিয়া আপন রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছেন, আমি তাহারি তত্ত্বে এখানে আসিয়াছি,—মহারাজ! সেই কন্যাটী আমারে প্রদান করুন।

রাজা হতভম্ব হইলেন। কি শুনিলেন, কি বলিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। পুত্রের বিবাহের জন্য একটী পাত্রী আসিয়াছে জানেন, দেখেন নাই, কিন্তু সেটী যে বনবাসিনী তপস্বীকন্যা, তাহা জানিতেন না। ভয়ে তটস্থ হইলেন। যোগীবরের পাদদ্বয় ধারণ করিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, মুনিবর! ছলনা করিয়া আমি কাহারো কন্যাকে এ রাজ্যে আনয়ন করি নাই। আমি—

কথায় বাধা দিয়া সন্ন্যাসী ঈষৎ রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, তুমি আনয়ন কর নাই, তোমার পুত্র আনয়ন করিয়াছেন।

রাজা সশঙ্ক বাক্যে কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, সাধুবর! আপনি যোগবলে সকলি জানিতে পারেন, আমার পুত্র শশীন্দ্রশেখর বালক, সে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া এক ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, তাঁহার কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ তজ্জন্য তাহাকে বিষম পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। আমার বংশে কখনো এরূপ অধর্ম্ম্য কর্ম্ম হয় নাই. সেই জন্য আমি সন্দিগ্ধ-চিত্তে সম্মতি দিতে পারিতেছি না,—সেই কন্যাকে ব্রাহ্মণ স্বয়ং পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি আনিতে বলি নাই। পথে নানা স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া তাঁহারে রাখা হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত কোনো নিশ্চিত তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই, সম্প্রতি কল্য সেই কন্যাটীকে কাশ্মীরে আনয়ন করা হইয়াছে। সেটী যে, আপনার কন্যা, তাহা জানিতাম না, ইহার মধ্যে ছলনা প্রবঞ্চনা কিছুই নাই, যদি ইচ্ছা হয়, এখনি লইয়া যাইতে পারেন।

ব্রহ্মচারী পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন, মহারাজ! আপনি রাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার মুখে এমন কথা শোভা পায় না। আপনার পুত্র শশীন্দ্রশেখর নীলগিরি পর্ব্বতে আমার সাক্ষাতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। ক্ষত্রিয় রাজারা জাতি বন্ধনে তাচ্ছীল্য করিয়া যবনের গৃহে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, তবে আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এত শঙ্কা,—এত সঙ্কোচ কেন?—যেখানে প্রতিশ্রুতি, সেখানে দ্বিধামত করিতে নাই।

রাজা এই বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর দিতে পারিলেন না। কি বলি-বেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতেও পারিলেন না।—ভয়ে, লজ্জায়, সন্দেহে ইতস্তত করিতেছেন, ইত্যবসরে কুমার শশীন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আগন্তুক ব্রহ্মচারীর প্রতি অনেক-

ক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। রাজা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। রাজপুত্রকে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারী সস্নেহ মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! যুবরাজ! শান্ত হও, উঠ, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বিশ্ববিজয়ী হও, আমার কন্যা—

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে রাজকুমার কহিলেন, মহাশয়! একবার আপনারে অনুগ্রহ করিয়া উদ্যান বাটিকায় পদার্পণ করিতে হইতেছে। তথায় কিছু অভীষ্ট বস্তু আছে, দর্শন করিবেন।

"চলো, তোমার যেমন অভিরুচি।—কিন্তু মহারাজকে চাই;—মহারাজ সেখানে না থাকিলে আমার অভীষ্ট বস্তু দর্শন বৃথা হইবে।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী আসন গুটাইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। রাজা আর রাজপুত্র সশঙ্কহৃদয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তিনজনে একত্রে উদ্যানবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। যে গৃহে পূর্ণশশী উদাসিনী বেশে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া ছিলেন, সেই গৃহের দ্বার দেশে উপনীত হইবা মাত্র পূর্ণশশী ঊর্দ্ধদৃষ্টে তিন মূর্ত্তির প্রতি প্রশান্ত সজল নেত্র নিক্ষেপ করিলেন। লজ্জা ভয় কিছুই হইল না, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মচারীর পদতলে পতিত হইলেন। কহিলেন, পিতা! আমার পিতা! দুঃখিনীর পিতা! অভাগিনীর পিতা! উদাসিনীর পিতা! সন্ন্যাসিনীর পিতা! এত দিন কোথায় ছিলে? অভাগিনী বলিয়া তোমার কি মনে ছিল? তুমি কেমন ছিলে? কেমন আছ? আমার মৃগশাবক, পক্ষীশাবকেরা কেমন আছে?—পিতা! আমার বনমালিকা মাধবীলতা কেমন আছে? তাহার কি ফুল হয়?—সে ফুল তুমি কি কর?—আমার সেই তরুণ

অশোকতরুর কি ফুল ফোটে? সে ফুলে কি হয়?—আমার সেই ছোট গিরিনদীতে তেমনি পবিত্র নির্ম্মল জল আছে ত?—ছোট হংস দম্পতী সে জলে খেলা করে ত? তাহারা দুটীতে কেমন আছে? হ্যাঁ পিতা! তারা এখন কত বড় হইয়াছে? তারা কি খায়? পিতা! তোমার পূজার আয়োজন কে করিয়া দেয়?—পূজার সময়, আহারের সময় এ অভাগিনীকে কি তোমার মনে হয়? এ দুঃখিনীর দুঃখের কথা কি তোমার মনে পড়ে?

ব্রহ্মচারী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, সকলেই ভাল আছে, তুমি কেমন আছ মা? পূর্ণশশি! আমার অনাথিনী পূর্ণশশি! তুমি কেমন আছ মা?

পূর্ণশশী ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, পিতা! অনেক দিনের পর তোমার মুখে আজ শুনিলাম, "পূর্ণশশী কেমন আছে?"—পূর্ণশশী কেমন আছে, আজ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দিব, আর ৪ দণ্ড পরে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিবার লোক থাকিত না। পূর্ণশশী জগতে থাকিত না। পূর্ণশশীর হস্তে তীক্ষ্ণধার ছুরী আছে, সেই ছুরী একটু পরেই বক্ষে উঠিত, বক্ষে উঠিয়া প্রাণান্ত করিতে বসিত। ভাগ্যে তুমি আজ আসিয়াছ। পূর্ণশশী বাঁচিয়া আছে।—এই কথা বলিয়া পূর্ণশশী আরো উচ্চরবে রোদন আরম্ভ করিলেন।

রোরুদ্যমানা পূর্ণশশীকে সান্ত্বনা করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী কহিলেন, মহারাজ! বিজয়পুরের বন্ধুত্ব স্মরণ হয়?

রাজা কপালে করাঘাত করিলেন।

শোক সম্বরণ করিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, রাজা উদয়সিংহের একটী বালিকা কন্যা ছিল, মনে হয়?

রাজা সাশ্রুনয়নে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, হা দুরাশয় নিষ্ঠুর

ঔরঙ্গজেব! অবোলা শিশু বালিকা তোমার কি অপকার করিয়াছিল ?

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে ?

রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে সকরুণ স্বরে কহিলেন, সেই দুগ্ধপোষ্যা কন্যাটীকে যবনে নষ্ট করিয়াছে !

ব্রহ্মচারী কহিলেন, মহারাজ ! ততদূর হইতে পায় নাই। এই পূর্ণশশীই সেই মহারাজ উদয়সিংহের বালিকা কন্যা।

রাজা চমকিত চিত্তে সকৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিরূপ ?

ব্রহ্মচারী কহিলেন, যখন এক দিক হইতে ঔরঙ্গজেব, অন্য দিক হইতে শিবজী বিজয়পুর বেষ্টন করেন, সেই সময় আমি এই কন্যাটীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলাম।

রাজা কতক বিষাদে কতক সন্দেহে, কতক কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তবে কে মহাশয় ?

ব্রহ্মচারী কহিলেন, আমি অগ্রে আপনার রাজ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রী ছিলাম, শেষে বিজয়পুরের রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলাম, আমার নাম রামব্রহ্ম স্বোয়ামী।

রাজা কম্পিত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্ব কথা সমস্ত স্মরণ হইল। কহিলেন, মন্ত্রিবর ! আপনি আমাদের পরম হিতকারী মিত্র। আপনার ঋণ এ জন্মে শোধ হইবে না।

"অদ্যই শোধ হইবে ! রাজকুমার শশীন্দ্রশেখরের সহিত পূর্ণশশীর বিবাহ হইলেই আমি সিন্ধুনদে জীবন বিসর্জ্জন করিব। চিরকষ্ট স্মরণ করিয়া আর দেহ ধারণের আবশ্যক নাই।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী বারম্বার ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন

রাজা কহিলেন, শিবজী আমাদের বন্ধু হইয়াছেন, যবনেরা নিস্তেজ হইয়াছে, তবে আর আপনি হতাশ হইতেছেন কেন ?

" মুখের কথা কোনো কাজের নহে। ক্ষত্রিয় বীর্য্য ভারতবর্ষে
ার নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয় বীর জীবন আহুতি দিয়া
র্গের দীপে আরুতি দিয়াছেন, এখন পুণ্যভূমি ভারতভূমি যবন
দতলে দলিত হইবে, এ সময় আমাদের তুল্য হতভাগ্যের বাঁচিয়া
াকা বিড়ম্বনা।"

রাজা ব্রহ্মচারীর এ বাক্যে কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না।
াবিলেন, এ একপ্রকার নূতন সংঘটন।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, পূর্ণশশী আমার কন্যা নহেন, ব্রাহ্মণের
ন্যা নহেন, ক্ষত্রিয় রাজার কন্যা, আপনার পূর্ব্ব মিত্র বিজয়-
রাধিপতি মহারাজ উদয় সিংহের কন্যা। অতএব সমস্ত সংশয়-
ছদ করিয়া কুমার শশীন্দ্রশেখরের সহিত পূর্ণশশীর বিবাহ দিন।
টীও একপ্রকার নূতন সংঘটন।

রাজা চমৎকৃত চিত্তে পরমানন্দে সম্মত হইলেন, শশীন্দ্রশেখর
। পূর্ণশশী চমৎকৃত হইলেন, ইহাও এক প্রকার নূতন সংঘটন।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

" তাই তব রূপ ভাল বাসি।
তুমি কখনো হও ধনুকধারী,
কভু বাজাও মোহন বাঁশী॥
আবার কখনো হও ত্রিশূলপাণি,
কভু ধর করে অসি॥"

রামপ্রসাদ।

রামব্রহ্ম স্বামী কহিলেন, মহারাজ! এই কন্যাটী লইয়া আমি নীলগিরি পর্ব্বতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। কন্যার নাম রাজধানীতে মহালক্ষ্মী ছিল, আমি পূর্ণশশী নাম দিয়াছি। আমার নিজের নামও গোপন করিয়া সদাশিব ব্রহ্মচারী নামে পরিচয় দিতাম। ভূধর মিশ্র নামে একজন নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ বিজয়পুরের রাজসভায় থাকিতেন, তাঁহাকেও আমি সঙ্গে লইয়াছিলাম, তাঁহাকেও মহারাজ চিনিতে পারিবেন। তিনি একবার যবনের পদানত হইবার জন্য দিল্লীর দরবারে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেই ভয়ে আমি তাঁহাকে বনবাসে লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার নাম নিত্যকামী রাখিয়াছি ; তিনিও রাজকন্যার সহিত এই রাজধানীতে আসিয়াছেন। কুমার শশীন্দ্রশেখর তীর্থযাত্রা করিলে পথভ্রান্তে নীলগিরির গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই সময় পূর্ণশশীর পাণিগ্রহণে তাঁহাকে প্রতিশ্রুত

করিয়াছিলাম। তদনুসারেই নিত্যকামীকে সঙ্গে দিয়া রাজকন্যাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছি।

রাজা বিস্ময়াকুল নয়নে ব্রহ্মচারীর মুখপানে চাহিয়া উপন্যাসের ন্যায় একে একে সকল ঘটনা শ্রবণ করিলেন। কখনো শোক, কখনো হর্ষ তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। অন্যান্য অনেক আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহারা উদ্যান বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

শুভ দিনে শুভক্ষণে পূর্ণশশীর সহিত শশীন্দ্রশেখরের শুভ পরিণয় হইল। কিন্তু পূর্ণশশী ভাল করিয়া শুভ দৃষ্টি করিলেন না,— পূর্ব্ববৎ সখী সম্বোধনে জানাইলেন, ব্রত আছে, রাজ প্রাসাদে থাকা হইবে না। সুতরাং উদ্যানেই বাস করিতে লাগিলেন। ৪।৫ দিন গেল, এক দিন রাজপুত্র পূর্ণশশীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, রাজকুমারি! তোমার মনের অসুখ কি, শুনিতে ইচ্ছা করি; আর ব্রত কত দিন থাকিবে, তাহাও জানিতে চাই। পূর্ণশশী লজ্জায় বদনাবৃত করিলেন, কথা কহিলেন না। রাজপুত্র বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। অনেক কাকুতি মিনতির পর পূর্ণশশী নত মস্তকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, পত্রিকা কোথায় গেল? রাজপুত্র মনোভাব বুঝিয়া উৎসাহের সহিত কহিলেন, কোথাও যায় নাই, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, আমিই তোমার সেই পত্রিকা। প্রণয় পরীক্ষার জন্য আমিই পত্রিকাবেশে গন্ধর্ব্বকুমারী পরিচয়ে তোমার নিকট ছিলাম। এই কথা বলিয়া পত্রিকা বেশের আদ্যোপান্ত সকল কথা, স্বপ্ন বৃত্তান্ত, কামচারী রূপ, লক্ষ্মণাটবীর গীত, সমস্তই বর্ণন করিলেন। পূর্ণশশী একবার কটাক্ষ করিয়া সমস্তই সত্য বুঝিতে পারিলেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সত্যই তুমি গন্ধর্ব্ব, কখন কিরূপ ধারণ কর, মানুষে

বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, রাজকুমার! স্ত্রীলোককে স্বামির নাম ধরিতে নাই, তুমি বহুদিন পত্রিকারূপ ধরিয়া ছিলে, আমি তোমারে পত্রিকা বলিয়াই ডাকিব। তাহাতে আমার মনের তৃপ্তি হইবে। যুবরাজ হাস্য করিয়া কহিলেন, চরিতার্থ হইব। এইরূপ নিত্য নূতন নূতন আলাপে উভয়ের প্রণয়রাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রামব্রহ্ম স্বামী ও ভূধর মিশ্র কিছুদিন রাজধানীতে থাকিয়া অকস্মাৎ অদৃশ্য হইলেন। কোথায় গেলেন, সন্ধান হইল না।

সম্পূর্ণ।

——